রচনাবলী

[অষ্টম খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোকিত মানুষ চাই

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

অষ্টম খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0465-4

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 8)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 375.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়	৯
বিদেশে	১১১
বাংলাদেশ	
অবতরণিকা	২১৯
ইস্তের	২৩৫
শেখের জয়	২৩৮
ইয়েহিয়া-ভুট্টো	২৪৩
ভুট্টাঙ্গ পুরাণ	২৪৬
'বিচিত্র ছলনাজাল'	২৫০
'বীরের সবুর সয়।'	২৫৩
যক্ষ রক্ষ গুপ্ত	২৫৮
সংখ্যালঘুর অনধিকারমত্ততা	২৬২
পিণ্ডির পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	২৬৫
'দুঃখ সহার তপস্যাতেই/ হোক বাঙালির জয়—'	২৭০
আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—	২৭৪
রক্ষী বনাম নর্তকী	২৭৮
মুজিব আউট!	২৮১
অখণ্ড পাকের চাঁই/ ভুট্টো বিনে কেউ নেই	২৮৩
'সাত জর্মন এক জগাই তবু জগাই লড়ে!'	২৮৭
বুড়িগঙ্গা	২৮৯

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা

উভয় বাঙলা— রিপ ভান উইঙ্কল	২৯৬
উভয় বাঙলা— বিস্‌মিল্লায় গলদ	২৯৭
উভয় বাংলা— বর্বরস্য পূর্বরাগ	২৯৯
উভয় বাঙলা— পুস্তকসেতুভঙ্গ	৩০২
উভয় বঙ্গে— আধুনিক গদ্য কবিতা	৩০৪
উভয় বাঙলা— সদাই হাতে দড়ি, সদাই চাঁদ	৩০৭
উভয় বাঙলা— নীলমণি	৩১০
উভয় বাঙলা— 'হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল'	৩১৩
উভয় বাঙলা— শত্রুর তূণীর মাঝে খোঁজো বিষবাণ	৩১৫
উভয় বাঙলা— গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ	৩১৮
উভয় বাঙলা— স্বর্ণসেতু রবীন্দ্রসঙ্গীত	৩২১
উভয় বাঙলা— ফুরায় যাদেরে ফুরাতে	৩২৪
উভয় বাঙলা— অকস্মাৎ নিবিল, দেউটি দীপ্ততেজা রক্তস্রোতে	৩২৭
উভয় বাঙলা— বাঙলা দেশের প্রধান সমস্যা	৩৩০
অপিচ	৩৩২

www.pathagar.com

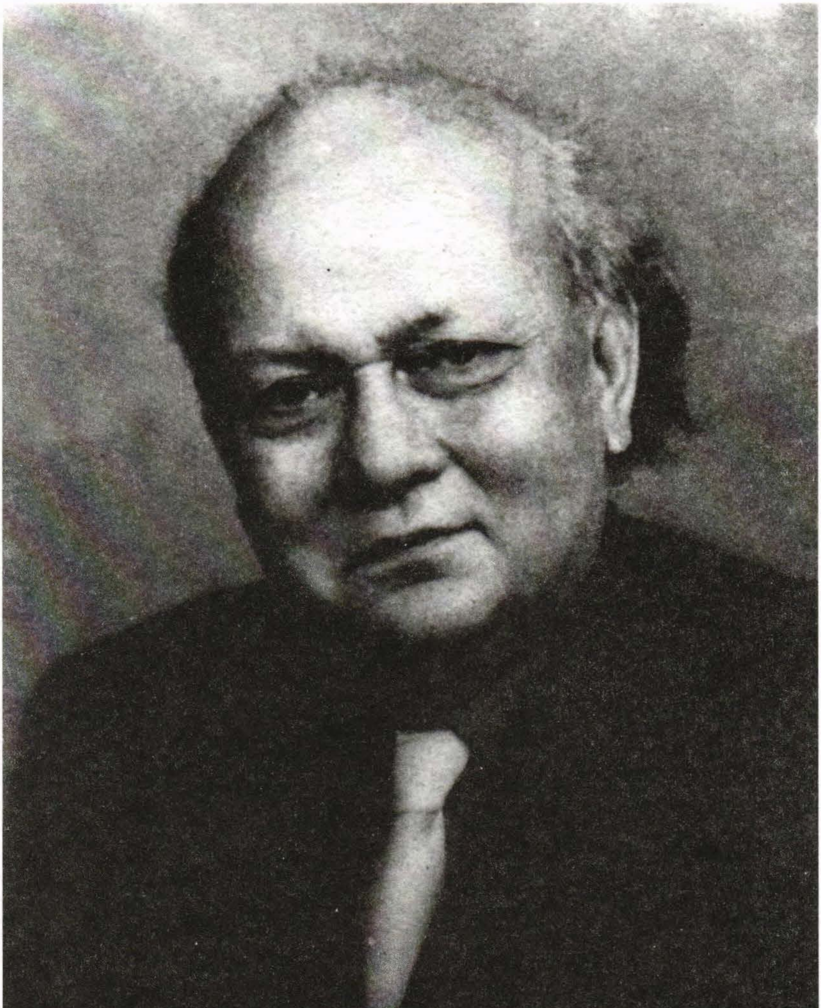

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একদা এক ফরাসির সঙ্গে পেভমেন্টের উপর শামিয়ানা-খাটানো কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে রসালাপ করছি এমন সময় আমার পরিচিত এক ইংরেজ চেয়ার-টেবিল বাঁচিয়ে এগুচ্ছে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। ফরাসির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললুম, 'ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট— অনার্স।' ফরাসি পরম আপ্যায়িত হয়ে উৎসাহভরে শুধাল, 'কোন সাবজেক্টে, মসিয়োঁ? হকি না টেনিসে?' ফরাসি মাত্রই বিশ্বাস, পড়াশুনা বাবদে ইংরেজ এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর মুগ্ধকণ্ঠে বললে, 'ধন্যি জাত, মসিয়োঁ। খেলাধুলা বিশেষ করে ক্রিকেটে— যেটাকে ওদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম (জাতীয় চিত্তবিনোদন) বলা যেতে পারে— সেটাকে তুলে নিয়েছে শিক্ষাদীক্ষার উচ্চ পর্যায়ে। আপনাদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম কী, মসিয়োঁ?' আমি ঈষৎ চিন্তা করে বললুম, 'আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, পা-সুদ্ধ জানু ঘন ঘন দোলানো। বাচ্চারা বেঞ্চিতে বসে দুটো পা-ই। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, ওদের জানু পা-তে দড়ি বেঁধে পাওয়ার তৈরি করলে তাবৎ দেশের বিজলি-সাপ্লাই পাওয়া যাবে।' ফরাসি বললে, 'ওটা তো নিতান্তই হার্মলেস, নির্বিষ। শুনেছি জর্মানদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম, বিশ-ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া।' আমি প্রতিবাদ মুদ্রা দেখাবার তরে ডান হাত দিয়ে এক কোণে সামনের বাতাস, দু টুকরো করে কেটে দিয়ে বললুম, 'নস্যি, নস্যি মসিয়োঁ, বিলকুল ধূলিপরিমাণ! আফগানিস্তানের নাম শুনেছেন? সেখানে কওমে কওমে ধনাধন্ গুলি ছোড়াছুড়ি করে দু দশ জনকে খতম করে দেওয়া তো নিত্যদিনের ওয়ারজিস, জিমনাসটিক্। আর তাবৎ মুল্লুক জুড়ে লড়াই, এক বাদশাহকে তখ্ৎ থেকে হটিয়ে অন্য বাদশাহ বসানো— যদিও তারা বিলক্ষণ জানে, তাতে করে ফায়দা হবে না আদৌ, কুল্লে 'পিদরসুখতেই' (পিতৃদহনকারী, কুট্টি ভাষায় সব হা-ই) বরাবর, সোওয়াদ পাল্টাবার তরে একবার একটা ডাকুকে এস্তেক এস্তেমাল করে তজরুবাভি করেছে— এসব মুল্লুক-জোড়া প্যাসটাইমে ভদ্র আফগান মাত্রই মশগুল হয় বছর পাঁচেক অন্তর অন্তর।'

ফরাসি একগাল হেসে বললে, 'আমরা যে রকম ৩১ ডিসেম্বরের দুপুররাতে গির্জেয় গির্জেয় ঘণ্টা বাজিয়ে ফি বছর পুরনো সালটাকে ঝেঁটিয়ে খেদিয়ে দিয়ে নয়া একটা নিয়ে আসি। কেন, বাওয়া, পুরনোটা কীই-বা এমন অপকর্ম করেছিল? দিব্য ওই দিয়ে কাজ চলছিল না? তা-ও, মসিয়োঁ বুঝতুম, নয়াটাকে যদি বছর-বিশেকের গ্যারান্টিসহ আমদানি করত! সেটাকে ফের ঝেঁটা!'

আমি গদগদ কণ্ঠে বললুম, 'তাই না বেবাক মুল্লুকের সাকুল্যে লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে হেথায় এই প্যারিসে ঝামেলা লাগায়। তোমরা সব-কুচ চট্‌সে সমঝে যাও।'

www.pathagar.com

আরেক গাল হেসে বললে, 'তা আর জানব না? ফ্রেন্স রিভলুশনে রাজা থেকে আরম্ভ করে নিত্যি নিত্যি কত না মুণ্ডু কেটেছি— কিন্তু মাইরি, রাজারও তো মাত্র একটা মুণ্ডু, সেটা কাটা গেলে, ইতিহাস সেটা নিয়ে আসমান-জমিন ফাটায় কেন? আমরা জানব না তো জানবে কে?'...ফরাসির সরেস মন্তব্য শুনে আম্মো ভাবি, কাবুলি বাদশাহর মুণ্ডুটা তো পার্মেনেন্ট এড্রেসেই রয়েছে। তবে অত ধানাই-পানাই ক্যান?

রইবে শুধু তাস
আর এক রাজার সর্বনাশ

(প্রাক্তন) রাজা ফারুক নাকি একদা রাজসিক একটি আপ্তবাক্য ছেড়েছিলেন, 'এই দুনিয়ায় একদিন টিকে থাকবেন শুধু পাঁচজন রাজা। তাসের চারটি আর ইংল্যান্ডের রাজা— একুনে পাঁচ, ব্যস।' জানি, রাজার কথা সব কথার রাজা। তা সে রাজার মুখ থেকে বেরুনো কথাই হোক আর রাজা নিয়ে রূপকথাই হোক।

কিন্তু, পাপ-মুখে কী করে কই, পেত্যয় যেতে মন যেন চাইছে না, মিসর রাজের ক্রমশ প্রকাশ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই কি কাবুলি-মেওয়ারূপে প্রকাশ পেল? কাবুলে গণতন্ত্র! ডাকুহীন, রাজাহীন কাবুল! প্রকাশ, আলা হজরত পাদিশাহ্ ই দীন ওয়া দুনিয়া আগা ই আগা বাদশাহ মুহম্মদ জহির শাহ্, জিদ আজলালাহু দামৎ শওকতোহু ওয়া ইকবালোহু— তাঁর গৌরব বর্ধমান হোক, তাঁর শওকৎ এবং শ্রীসৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক— আমি সংক্ষেপে সেরে, আশা করি কোনও অলঙ্ঘ্য প্রোটোকল অমান্য করে সখৎ গুনাহ্ বা মোলায়েম মকরূহ-এ লিপ্ত হইনি— তাঁর তাজ ও তখৎ হারিয়েছেন। অতএব আমরা ফারুকের ভবিষ্যদ্বাণী মাফিক আখেরি পঞ্চরাজ চক্রবর্তীর আরও নিকটবর্তী হয়েছি। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু এ তো অতিশয় পুরনো কাসুন্দি। তথাকথিত ঐতিহাসিক টয়েনবি যাকে বলেন প্যাটার্ন। না, এবারে যে গাজি— কালক্রমে ইনি কাজি উপাধি অবশ্যই পাবেন— তখৎ-তাজ কেড়ে নিলে তিনি নাকি সেগুলো এস্তেমাল করবেন না। তিনি দেশের জন্য, তাঁর কথায় 'ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী' গণতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও যে প্রশ্নটা প্রাগুক্ত ফরাসিসও আজ জিগ্যেস করতেন সেটা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়, 'এত ল্যাটে কেন?' ১৯৩৩-এ জহির শাহ্ উনিশ বছর বয়সে রাজা হন। তাঁর পিতা বাদশাহ নাদির শাহ্ আততায়ীর গুলিতে শহিদ হন। আফগানরা সেই শেষ জাতীয় চিত্তবিনোদনের পর ঝাড়া চল্লিশটি বছর ধরে এই মহামূল্যবান প্রতিষ্ঠানটিকে এ-রকম নির্মম বেদরদ পদ্ধতিতে অবহেলা করল কেন? আফগান চরিত্র যাঁরা কণামাত্র চেনেন তাঁদের কাছে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে ব্যাপার, বেআইনি তিলিসমাৎ বলে মনে হবে।

এর মোদ্দাটা আমাদের সোনার বাংলার একটি প্রবাদে অনায়াস-লভ্য। একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তার ওপর পেল মৃদঙ্গের তাল। পাঠান-আফগানরা নাচবার তরে হরহামেশা তৈরি, কিন্তু ওই যে মৃদঙ্গটা ওতে দু চারটে চাটিম চাটিম বোল তুললে তবে তো মৌজটা জমে এবং সে মৃদঙ্গ বাজাতেন আকছারই ইংরেজ মহাপ্রভুরা পেশোয়ারে বসে। ১৯১৭-এর

www.pathagar.com

পূর্বে কখনও-বা রাশার জার— আমু দরিয়ার ওপারে বসে। এনারা নাচবার তরে কড়ি ভি দিতেন, নাচের সময় শাবাশি দিতেন, নাচ শেষে আপন আপন পছন্দসই 'আমির'কে তখ্‌তে বসাতেন। শেষবারের মতো ডুগডুগি বাজিয়েছিল ইংরেজ ১৯২৮/২৯-এ। নাদির শাহ্‌কে মারার পিছনে কেউ ছিল কি না, সঠিক বলতে পারব না।

পটভূমি

আমান উল্লাহ্ যখন দেশের তরে লড়াই দেন, তখন তাঁর জঙ্গিলাট ছিলেন নাদির খান। স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেই, যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর মনে নাদিরের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হল, লোকটা আফগান ফৌজের এতই প্যারা যে, কখন যে একটা মিলিটারি ক্যু লাগিয়ে নিজেই রাজা হয়ে বসবে না, তার কি প্রত্যয়! আমান উল্লাহ্ নিজেই তো রাজা হলেন সৎভাই, যুবরাজ এনায়েত উল্লাকে তাঁর হক্কের তখ্‌ৎ থেকে বঞ্চিত করে— যদিও সমস্ত ষড়যন্ত্র বলুন, প্যাস্‌টাইম বলুন ব্যাপারটার পরিপাটি ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর আম্মাজান,— আমান উল্লাহ্‌র পেটে কতখানি এলেম ছিল সে তারিফ তাঁর পরম প্যারা দোস্তকে করতে গেলে বিষম খেত। কিন্তু তার চেয়ে একটা মোক্ষমতর তত্ত্ব আছে, সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি বাবদে। আর্যদের ভিতর বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে— পিতা গত হলে বড় ছেলে পরিবারের কর্তা হবে। কোনও কোনও আর্য গোষ্ঠীতে তো সে আইন এমনি কট্টর যে, বড় ছেলে ভিন্ন অন্য ভাইরা পিতার সম্পত্তির কানাকড়িটাও পায় না, গ্রাসাচ্ছাদনও না। সর্বব্যবস্থার মতো এ ব্যবস্থাটারও সদ-গুণ বদ-গুণ দুই-ই আছে। কিন্তু আফগানদের ভিতর সে আইন খুব একটা চালু হয়নি। আমান উল্লাহ্ নাদিরকে বিদেশে চালান দিয়েছিলেন।

লাঠি যার দেশ তার

কাবুলের সিংহাসনে বসার হক্ক শেষটায় বংশানুক্রমে গিয়ে দাঁড়ায় মূলত কান্দাহারের আব্দুর রহমান, হবীব উল্লা, আমান উল্লাহ্‌র গোষ্ঠীতে। তার অর্থ ওই গোষ্ঠীর 'যার লাঠি তার মোষ।' আমান উল্লাহ্, নাদির, জহির আর আজকের জেনারেল মুহম্মদ দাউদ খান সক্কলেরই যে কেউ গায়ের জোরে একবার কাবুলের তখ্‌তে বসে যেতে পারলে, ক্রমে ক্রমে জালালাবাদ, গজনি, কান্দাহার শায়েস্তা করে তাঁবেতে আনতে পারলে তাবৎ আফগানিস্তান তাঁকে আলা-হজরত বাদশাহ্ বলে মেনে নেয়। কাতাখান-বদখশান মজার-ই-শরীফের বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য নেই।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল দাউদ মাত্র কাবুলের প্রধান। সদরও বলতে পারেন। বেতার বলছে, কাবুলের বাইরে এখনও তাঁর রাজ্যবিস্তার আরম্ভ হয়নি। তবে কাবুল উপত্যকার বাইরে উত্তর দিকে, অন্তত মাইল দশ-পনেরো দূরের একটা জায়গা (চল্লিশ বছর হয়ে গেল, নামটা ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব জাবাল উস্-সরাজ) থেকে আসে বিজলি। সেটা

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই জেনারেল দাউদের তাঁবেতে। নইলে সিমলে পাহাড় থেকে কাবুল বেতারে দাউদের জয়ধ্বনি আকাশবাণীর মনিটর শুনল কী করে?

ওদিকে যদিও কাবুল বিমানবন্দর একেবারে শহরের গা ঘেঁষে তবু বিলেত ছেড়ে কাবুলে যে প্লেন আসছিল সেটা সোজা দিল্লি চলে গেল কেন? লাহোর কিংবা করাচিতেই নামল না কেন? হয়তো প্লেনে রাজপরিবারের দু-চারজন কিংবা/এবং জহিরপন্থি কিছু লোক ছিলেন যাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কাবুল যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। পাকিস্তানে নামাটাও খুব সুবুদ্ধিমানের কাজ হত না। ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের কোনও দুশমনি নেই। ভারতই ভালো। কাবুল অ্যার-পোর্টে নামাটা টেকনিক্যালি সম্ভবপর হলেও।

বহুকাল হল কাবুল বেতার শুনিনি। একদা সন্ধে সাতটা-আটটা থেকেই বিদেশের জন্য তাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যেত, পশতু এবং ফারসিতে। রাত এগারোটার ঝোঁকে ইংরেজিতে, এবং পিঠ পিঠ ফরাসিতে। দেখি, রাত ঘনালে পাই কি না। তবে 'ক্যু দেতা', বা 'কু দ্য পালে' হয়ে যাওয়ার পর নানা কারণে সচরাচর জোরদার ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয় না বা যায় না।

অর্থই পরমার্থ

কার্ল মার্কস বলেছেন, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন ইহ-সংসারে কোনও বিরাট পরিবর্তন হয় না। ইংরেজ এই নীতি অবলম্বন করে তার ন্যাশনাল প্যাস্‌টাইম— 'জাতীয় চিত্তবিনোদন' প্রতিষ্ঠান ফুটবল-ক্রিকেটকে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে সমাসন স্থলবিশেষে উচ্চাসন দিয়ে যে অত্যদ্ভুত সমন্বয় সাধন করল তারই অর্ধশিক্ষিত-অর্ধমল্লবীর সন্তানগণ স্থাপন করল বিশ্বজোড়া রাশি রাশি উপনিবেশ। কন্টিনেন্টের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ামোদ তার চতুঃসীমানায় প্রবেশ করতে দিত না। অতএব উপনিবেশ স্থাপন ও তথায় রাজত্ব করার জন্য শিক্ষিত লোক পাঠালে তারা মরত পটাপট করে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ৎসে ৎসে ফিভার ইত্যাদির নানাবিধ রোগে; পক্ষান্তরে আখড়া থেকে ধরে ধরে ডানপিটে গাঁট্টাগোঁট্টাদের পাঠালে তারা পট পট পটল তুলত না বটে, কিন্তু পটলক্ষেতের হিসেব-নিকেশ থেকে আরম্ভ করে উপনিবেশের বাজেট, অডিট, আইন-কানুন, এককথায় দেশ শোষণ করার জন্য যে সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে হয় তার জন্য নিরঙ্কুশ অনুপযুক্ত। কেউ কেউ তো নামটা পর্যন্ত সই করতে পারত না।

তাই ইংরেজ গলফ্‌ খেলার সময়ই হোক আর রিলেটিভিটি কপচাবার ওক্তেই হোক, সবকিছু মা-লক্ষ্মীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

পাঠানের বর্ণচোরা সংস্করণের নাম ইংরেজ। পাঠানও তার ন্যাশনাল প্যাসটাইম— দু-দশ বছর পর পর কাবুলের তখ্‌ৎ থেকে পুরনো বাদশাহকে সরিয়ে নয়া বাদশাহ বসানোর জাতীয় চিত্তবিনোদনের সময় মার্কস-নির্দিষ্ট নীতি, ইংরেজ কর্তৃক হাতে-কলমে তার ফলপ্রাপ্তি, কোনওটাই ভোলে না।

"বিআ ব্‌-কাবুল, বরওম ব্‌-কাবুল,
বিআ ব্‌-কাবুল ব্‌রওয়িম ব্‌-কাবুল ॥

www.pathagar.com

আয় তুই কাবুল, আমি চললাম কাবুল,
আয় তুই কাবুল আমরা চলি কাবুল ॥"

'দীন্ দীন্' রবে হুহুঙ্কার চিৎকার পাঠানের কাছে বিলকুল ফজুল। কাবুল লুট করাতে কী আনন্দ কী আনন্দ!

ন্যাশনাল প্যাস্‌টাইমের সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির সমন্বয়।

দোনলা-বন্দুক

প্রেসিডেন্ট দাউদ খানের সর্বপ্রধান শিরঃপীড়া হবে এই পাঠান ডাকুর পাল। ওদের সামলাতে হলে দরকার ফৌজ। দাউদ খান তাঁর ভাষণারম্ভে সম্বোধন জানিয়েছেন পেট্রিয়টদের, 'দেশপ্রেমিকদের'— ফারসিতে 'দোস্তান-ই-মূলক' বা সমাসবদ্ধ 'ইয়ার-উল-মুল্‌ক' কিংবা আরব্য রজনীর 'শহর-ইয়ার'-এর ওজনে 'মুল্‌ক-ইয়ার' অথবা সাদামাটা 'হম্ ওয়াত্‌ন' 'স্বদেশবাসী' যা-ই বলে থাকুন না কেন, পাঠান-হৃদয়ে আফগানিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি কোনও প্রকারের খাস, দিল-তোড় মহব্বতের কোনও নিশান আমি দেখিনি। যে অঞ্চলে সে বাস করে অর্থাৎ কওমি এলাকার প্রতি তার টান থাকা অসম্ভব নয়— পাখিটাও তার নীড়ের শাখাটির মঙ্গল কামনা করে— কিন্তু দেশপ্রেম! অতএব দেশপ্রেমী দাউদ দেশের দোহাই দিয়েছেন দোনলা বন্দুকের মতো। কাবুল ও কাবুলাঞ্চলের সরকারি ফৌজ যেন তাঁর কাছ থেকে বড্ড বেশি টাকা-কড়ি না চায়। কাবুলের ভিতরকার আর্ক-দুর্গের তোষাখানায় কী পরিমাণ অর্থ তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁর প্রথম ভাষণেই ফাঁস করে দেবেন এমনতরো দুরাশা তাঁর নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীও করবেন না। এবং এটাও অসম্ভব নয় যে, জহির শাহ ভিন-দেশ যাবার মুখে বাগ-ই-বালার (আমাদের তেজগাঁও) কেন্দ্রীয় শাহী সৈন্যদের কমান্ডান্ট আপন দামাদ জেনারেল শাহ ওয়ালি খানের হেফাজতে গ্যারিসনের মধ্যেই রেখে গিয়েছিলেন। বলা শক্ত মানুষ আপন দামাদ, না ভগ্নীপতি, কাকে বেশি বিশ্বাস করে? খবর এসেছে, জেনারেল ওয়ালিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই গ্যারিসন জয় করার পূর্বে দাউদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ করে দাউদ ওটাকে জয় করার মতো ফৌজ আর হাতিয়ার পাবেন কোথায়? এবং আর্ক-দুর্গই-বা তিনি কাবু করলেন কী করে? সেখানে তো তাঁর বাস করার কথা নয়।

দাউদের পূর্বকথা

আফগান রাজনীতিতে বলা উচিত ছিল কাবুলের রাজনৈতিক দলাদলির প্রধান নেতা রাজ-গোষ্ঠীর সরদারগণ। দাউদ এদেরই একজন। জহির রাজা হন ১৯৩৩-এ। দাউদ তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, তিনি কুড়ি বৎসর ধরে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে চলছিলেন অর্থাৎ সরদারদের মধ্যে যে কজনকে পারেন আপন দলে টানছিলেন। এটা যে প্রকাশ্যে তখৎ-নশিন বাদশাহর বিরুদ্ধে করা হয় তা নয়। গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান

www.pathagar.com

মেনে নিয়ে প্রত্যেক পলিটিশিয়ান যে রকম আপন দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে হুবহু সেই রকম কাউকে দলের উচ্চাদর্শ দেখিয়ে, কাউকে মন্ত্রিত্বের ওয়াদা দিয়ে, কাউকে-বা ডাঁই ডাঁই কন্ট্রাক্টের লোভ দেখিয়ে ইত্যাদি। কোনও সরদার যদি সত্যই পালের মধ্যে বড্ড বেশি জোরদার হয়ে যান, তবে বাদশাহ যে ঈষৎ শঙ্কিত হন সেটাও জানা কথা। তখন তাঁকে নিতান্ত নিজস্ব আপন দলে টানার জন্য বাদশাহ তাঁর বোন বা মেয়েকে সেই সরদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হন। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমির হবীবউল্লাহ যখন দেখলেন, মোল্লাদের চিত্তজয় করে তাঁর অনুজ নসরউল্লাহ এত বেশি তেজিয়ান হয়ে গিয়েছেন যে তিনি রীতিমতো শঙ্কিত হলেন— তাঁর মৃত্যুর পর আপন পুত্র যুবরাজ ইনায়েৎউল্লাহ হয়তো রাজা হতে পারবেন না, রাজা হয়ে যাবেন নসরউল্লাহ। তাই তিনি যুবরাজকে বিয়ে দিতে চাইলেন নসর-কন্যার সঙ্গে। নসর হয়তো-বা আপন দামাদকে খুন করতে ইতস্তত করবেন— ওই ছিল তাঁর গোপন আশা।... এ স্থলে, যদিও টায় টায় খাটে না, তবু হয়তো-বা দাউদকে আপন দলে টানবার জন্য জহির বোনকে আদমের আপেলের মতো তাঁর সম্মুখে ধরলেন। বস্তুত আফগান রাজগোষ্ঠীর হতভাগিনী কুমারীকুল সে দেশের রাজনৈতিক দাবা খেলায় বড়ের মতোই এগিয়ে গিয়ে ছকের মাঝখানে প্রাণ দেন, রাজার দুর্গ অভেদ্যতর করবার জন্য (কাসলিং)। কেউ কেউ আমৃত্যু কুমারীই থেকে যান— ক্রীড়ারম্ভে যে ছকে জন্মগত অধিকার বা কিস্মতবশত তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল কিস্তিমাৎ পর্যন্ত সেখানেই অর্থহীন নিষ্কর্মার মতো অবশ অচল হয়ে থাকেন। ষাট বছরের বুড়ো সরদারের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের কচি মেয়ের বিয়ে হওয়াটাও আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু উপস্থিত থাক সে দীর্ঘ দয়াধর্মহীন কাহিনী। শুধু বাদশাহ'র নয়, কুল্লে সরদার-বালাদের ওই একই হাল।

পট বদল

১৯৪৭-এ হঠাৎ ইংরেজের পরিবর্তে দেখা দিল পাকিস্তান। আমানউল্লাহ ইংরেজ এবং রুশ দুই সপত্নের (সপত্নীর পুংলিঙ্গ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে সপত্ন— মডার্ন কবিদের ভাষায় 'পুং-সতীন') মাঝখানে ছিলেন মোটামুটি ভালোই। আখেরের নতিজা— সে কাহিনী প্রাচীন ও দীর্ঘ।...বাদশাহ জহির হঠাৎ দেখেন তাগড়া ইংরেজ সপত্নের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাকিস্তান— সে-ও আবার কাবুলের সঙ্গে ফ্লার্ট করা দূরে থাক, ইন্ডিয়া নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত। খুদ বাদশাহর কী মতিগতি ছিল জানিনে, কিন্তু সরদার দাউদ হয়ে দাঁড়ালেন পয়লা নম্বরের চ্যাম্পিয়ান, পাঠানদের তাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে কামড় মেরে এক খাবলা গোশ্‌ত, ফোকটে মেরে দিতে। তাঁর দল হল আরও ভারী। 'বিআব-পেশাওয়ার' 'চলি, চলো পেশাওয়ার/চে খুব উমদা সে-ভাণ্ডার।'

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ রকম একটা জিগির চিত্তহারিণী হবেই। পেশাওয়ারে খাস পাঠানদের বাড়ি-গাড়ি অত্যল্পই। পাঞ্জাবিরা সেখানে বিস্তর ধনদৌলত সঞ্চয় করেছে পার্টিশনের সময় বেধড়ক লুট করে। এবারে পাঞ্জাবি মৌমাছিদের খেদিয়ে দিয়ে বাড়ি আনতে হবে ইয়াব্বড়া বড়া মধুভাণ্ড! আজ সদর দাউদ খাইবারপাস থেকে শুরু করে জালালাবাদ, সিমলা, খাক-ই-জব্বার

www.pathagar.com

তক সব 'দেশপ্রেমী' পাঠানদের যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেটা কিঞ্চিৎ বঙ্কিম হলেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কাবুলে বাদশা-বদল হলে ওইসব অঞ্চলের যে পাঠানরা একজোট হয়ে ধাওয়া করে জালালাবাদ লুটতে— দাউদ তাদের বলছেন, 'হে দেশপ্রেমী পাঠান, তুমি আপন দেশ লুটতে যাবে কেন? তোমাকে তো বলেছি, পাকিস্তানের সঙ্গে; আমার যে বোঝাপড়া এতদিন তোমাদের ওই নিষ্কর্মা জহিরের জন্য মুলতবি ছিল, এখন সে শুভ-লগ্ন উপস্থিত। তোমাদের কম্পাসের কাঁটাটা ঘুরিয়ে দাও।' ভালো-মন্দের কথা হচ্ছে না; এটা সহজ পলিটিক্স। বেতারে শুনতে পেলুম, দাউদ প্রেসিডেন্ট হয়েই বিদেশি রাজদূতদের ডেকে পাঠান— নিদেন প্রেসিডেন্টের তখ্‌তে না বসা পর্যন্ত ওঁদের ডাকা যায় না— এবং তাঁদের শান্তি শান্তি, সালাম ইয়া সালাম, সর্ববিশ্বে শান্তি এই বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে এইবারে আমার বোঝাপড়া শুরু হবে।' বেতারের রিপোর্টার মন্তব্য করেছেন, প্রেসিডেন্টের বলার ধরনটা আদৌ সুলেহ্‌-সন্ধি সূচক ছিল না। (আমি নিজে ধরনটার গুরুত্ব অত বেশি দিইনে; কে না জানে, মানুষ রান্নার সময় যে গরমে ভাত ফোটায়, অতখানি গরমা-গরম গেছে না)।

এই মামুলি লেখনের গোড়াতে যে দোনলা বন্দুকের উল্লেখ করেছিলুম, এই তার দোসরা নল।

কিন্তু পাকিস্তান যে ইসলামি রাষ্ট্র? আমরা পাকিস্তান-আফগানিস্তান কোনও রাষ্ট্রেরই অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু দাউদ কী উত্তর দেবেন সেটা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি। জালালাবাদ অঞ্চলের পাঠানদের চাপে পড়ে— যদিচ সেটাই একমাত্র চাপ ছিল না— একদা আমান উল্লাহর তখ্‌ৎ যায়। এখন এরা যদি— অবশ্য সেটা অনুমান মাত্র— জেনারেল দাউদকে সমর্থন না করে তবে তাঁর তো গত্যন্তর নেই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁকে তখন কট্টরস্য কট্টর সুন্নি পাঠানদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে হবে, 'পাকিস্তানের সদর (শব্দার্থে বক্ষস্থল), ডিক্টেটর কে, যার হুকুমে তামাম পাকিস্তান ওঠ-বস করে? স্বৈরতন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। সে তো শিয়া।'

নজিরস্বরূপ আরেকটা তথ্য সদর দাউদ বলবার হক্ক ধরেন। তিনি বলতে পারেন, '১৯৫৮ সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী তখন পাকিস্তানের যে সদর ইসকন্দর মির্জা আমাদের সঙ্গে সুলেহ করতে চেয়েছিল, সে কথাবার্তা বলেছিল তার সঙ্গে? বাদশাহ্ জহিরের সঙ্গে। আমি কথাই বলিনি। কেন? সে-ও ছিল শিয়া। তারও একটুখানি পরে কে? ইয়াহিয়া। সে-ও শিয়া।"

মুশকিল!!

* * *

ক্যু দে তা মূলত ফরাসি। ক্যু = আঘাত, গুঁতো; দ্য— ইংরেজি অব; এতা = রাষ্ট্র ইংরেজি স্টেট ওই একই শব্দ। অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগ করে, সচরাচর দেশের সংবিধান বা ঐতিহ্য উপেক্ষা করে যদি এক রাজার বদলে আরেক রাজা তখতে বসে যান, কিংবা রাজাকে হটিয়ে গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্রকে হটিয়ে স্বৈরতন্ত্র (ডিক্টেটরি) পত্তন করেন তবে সেই বলপ্রয়োগ (ক্যু) দ্বারা রাষ্ট্রের (এতা) রূপ বা ভাগ্য পরিবর্তনের নাম ক্যু দে তা। দেশবিভাগের পর সর্বপ্রথম একটা ক্যু দে'তার পূর্বাভাস দেন আধ-সেদ্ধ ডিক্টেটর ইসকন্দর মির্জা, আসল সুসিদ্ধ ক্যু করলেন আইয়ুব। তাঁর পরের মাল সব ঝুট। ভুট্টো যদি মিলিটারি জুন্তাকে নির্মূল করে যা-ইচ্ছা-তাই বা যাচ্ছেতাই করতে পারেন তবে সেটা হবে তাঁর ব্যক্তিগত ক্যু।

www.pathagar.com

ক্যু দ্য পালে রাজপ্রাসাদের (পালে, পেলেস, প্রাসাদ) ভিতরকার আকস্মিক পরিবর্তন। ক্যু দ্য পালে প্রতিষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন, কিন্তু বাক্যটি প্রচলিত হয়েছে হালফিল। একদা যে কোনও ব্যক্তি রাজাকে গুম-খুন করে দুম করে সিংহাসনে বসে যেতে পারলেই দেশের লোক গড়িমসি না করে তাঁকে রাজা বলে মেনে নিত। এখন অত সহজে হয় না। রাজা ফারুককে হটানোটার আরম্ভ হয় ক্যু দ্য পালে দিয়ে, কিন্তু নজিব-নাসিরের পিছনে দেশের (এতা-র) লোক ছিল বলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ক্যু দে তা-তে পরিবর্তিত হয়।

অতএব কু দে তা বিরাটতর রাষ্ট্রবিপ্লব ক্যু দ্য পালের চেয়ে।

জেনারেল দাউদ যে কর্মটি সমাধান করলেন সেটা স্পষ্টত ক্যু দ্য পালে দিয়ে আরম্ভ; এখন যদি সেটা ক্যু দে তাতে পরিবর্তিত না হয় তবে বেশ কিছুকাল ধরে চলবে অরাজকতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র-শক্তিধারীহীন রাষ্ট্রবিপ্লব না সিভিল ওয়ার। ইহ-সংসারে যত প্রকারের যুদ্ধ হয়, কোনও দেশের কিস্মত ভাণ্ডারে যত রকমের গজব আছে, তার নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতম উদাহরণ ভ্রাতৃ-যুদ্ধ।

চাণক্য বলেছেন, যে ব্যক্তি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে (যখন পুলিশ কাউকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করায়) এবং সর্বশেষে বন্ধুকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যায়, সে-ই প্রকৃত বান্ধব।

> "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
> রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব ॥"

দোস্ত কুজা আস্ত্?

মিত্র কুত্র অস্তি?

দোস্ত কোথায় আছে?

অতএব, উল্লেখ নিতান্তই বাহুল্য যে, সদর দাউদকে বন্ধুর সন্ধানে— ব্ তলাশে দোস্ত— বেরুতে হবে। ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় বান্ধবের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ওদিকে সম্ভাব্য বান্ধবরাও রাষ্ট্রনেতাকে বাজিয়ে দেখতে চান, তিনি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবেন কি না। পূর্বেই বলেছি, কাবুলের কর্ণধার হলেই যে তিনি তাবৎ আফগানিস্তানের প্রভু হতে পারবেন, এমন কোনও কথা নেই। অতএব, আফগানিস্তানের সঙ্গে যেসব রাষ্ট্রের স্বার্থ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিজড়িত তারা সদর দাউদের নতুন রাষ্ট্রকে পত্রপাঠ ঝটপট স্বীকৃতি দেবার পূর্বে কান্দাহার, গজনি, জালালাবাদ তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়েছে কি না, না মেনে থাকলে সেগুলোকে শায়েস্তা করবার মতো তাঁর সৈন্যবল, অস্ত্রবল, অর্থবল পর্যাপ্ত কি না তারই সন্ধান নেবে। ওদিকে, বলতে গেলে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কাবুল এইসব এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। যেসব রাষ্ট্র আফগানিস্তানের প্রতিবেশী, যেমন রুশ, ইরান, পাকিস্তান— এঁরাও এসব এলাকার কোনও পাকা খবর পাচ্ছেন না।

তৎসত্ত্বেও বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ রুশের মতো রাষ্ট্র, যার 'ওরিয়েন্টাল ধর্ম' শত শত বৎসর ধরে বিশ্বময় সুপরিচিত, এস্তেক দশক দুত্তিন পূর্বে হিটলার-চেম্বারলেন উভয়কে প্রায় উন্মাদাশ্রমে পাঠাবার মতো বাতাবরণের সৃষ্টি করে তুলেছিল আর এদানির কেষ্ট বিষ্টু, রাজনীতির স্কুলে নিতান্তই 'তিফল-ই-মক্তববৎ' চ্যাংড়া, যাদের কোনওকিছুতেই তর সয় না, রাতারাতি চৌষট্টি-তলার এমারৎ নির্মাণ যাদের কাছে ডাল-ভাত— থুড়ি, হট-ডগ-হাম-

www.pathagar.com

বুর্গার— সেই নিকসন-কিসিংজারকে পকেটে পুরেছে যারা, তারা কি না অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, প্রতিবেশী কুল্লে মুল্লুককে সুপারসনিক স্পিডে তালিম দিয়ে তেরাত্তির যেতে না যেতে দুশমনি মার্কিনি কায়দায়, বহু বৎসরের হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া ভাইটির মতো সদর দাউদকে নিয়ে পাঠানি বেরাদরি কায়দায় একই বর্তন থেকে গোশ্‌ত-রুটি খেতে আরম্ভ করে দিল? আমি মূর্খ, বার বার আহাম্মুখ বনে বনে ওই তামাশায় দস্তুরমতো চ্যাম্পিয়ন, আম্মো বেবাক অবাক। ক্ষণতরে ভাবলুম, 'পূর্বদেশে' বিজ্ঞাপিত ধারাবাহিকের ধারাটা বেলাবেলিই পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিই। পরে দেখলুম কিলটা হজম করে নেওয়াই প্রশস্ততর।

রুশের এই সৃষ্টিছাড়া আচরণের কারণটা কী?

অবশ্যই প্রথম কারণ, সতের বৎসরের পুরনো ইংরেজ সপত্ন বঁধুয়ার আঙিনাতে আজ আর নেই। সে থাকলে এই বরমাল্য দানের বদলাই নেবার তরে এনে দিত মোতির মালা। রুশকে আনতে হত লাল-ই-বদখশান— চুন। ইংরেজ আনত... গয়রহ ইত্যাদি।

অর্থাৎ দাউদ যাত্রারম্ভের পূর্বে হয়তো-বা রুশের আশীর্বাদ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হয়তো-বা রাজা জহিরের নিরপেক্ষ নীতি রুশ পছন্দ করত না। দাউদ হয়তো ভিন্ন ওয়াদা দিয়েছেন। জহিরের নীতি একদিন হয়তো মার্কিনকে ইংরেজের ভ্যাকুয়ামে টেনে আনত। কান্দাহার-জালালাবাদকে ঘায়েল করার জন্য রুশ আজ সদর দাউদকে যা দেবে, মার্কিন তার বদলে দাউদ বৈরীদের দিত মোতির মালা, রুশকে ছুটতে হত বদখশান... উপরে দেওয়া আড়াআড়ির 'বাজার দর' দ্রষ্টব্য। অতএব মার্কিন নাগর রসবতীর সন্ধানে আসার পূর্বেই দাও স্বীকৃতি।

কয়েক বছর আগেও রুশ ঝটিতি দাউদকে এরকম স্বীকৃতি দিত না, কারণ কিংবদন্তি অনুযায়ী যে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হবার সময় সে পর্বত বিস্তর হিন্দুর (আর্যের) প্রাণহরণ করে (কুশ্‌ৎ, তাই 'হিন্দুকুশ'), সেটাকে অতিক্রম করে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও ট্যাঙ্ক-কামান কাবুলে আনাটা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেশ কয়েক বছর হল বাদশাহ জহিরের অনুরোধে রাশানরা অপথে-বিপথে কয়েকটা টানেল খুঁড়ে, লেভেল রাস্তা বানিয়ে, কে জানে ক হাজার ফুট চড়াই-উৎরাই তো এড়িয়েছে বটেই, তদুপরি না জানি ক-শো মাইল রাস্তাও কমিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় পক্ষ পাকিস্তান

তদুপরি সরাসরি দুশমন না হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে রুশের ঠিক বনছে না। কারণটা অতীব সরল। পাকিস্তান নিক্‌সনের চতুর্দিকে সাত পাকের বদলে সত্তর পাক খাচ্ছেন। পাকিস্তানই অগ্রণী হয়ে মার্কিনের সঙ্গে তার দুশমন চীনের ভাবসাব করিয়ে দিয়েছে। এখন তার দাদ নিতে হবে। এবং এর সঙ্গে জড়িত আছে আরেকটি ফৌজি চাল। শেষ পর্যন্ত যদি চীনের সঙ্গে লেগে যায় তবে আফগানিস্তানের ঘাঁটি থেকেও চীনকে কিছুটা বিব্রত করা যাবে।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মনে ধন্ধ সৃষ্টি করেছে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমান উল্লাকে বিতাড়িত করার পিছনে ছিলেন, যাঁকে প্রায় আফগানিস্তানের পোপ বলা যেতে পারে, সেই শোর বাজারের হজরৎ। ডাকু বাচ্চা-ই-সাকোও কাবুলের দিকে এগিয়ে আসার

www.pathagar.com

পূর্বেই তাঁর আদেশে শাহি ফৌজের সেপাইরা বাগ-ই-বালা ত্যাগ করে যে যার বাড়ি চলে যায়। আমি পূর্বেই প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম, আর্ক এবং বাগ-ই-বালা দাউদ খান দখল করলেন কী করে? যতদূর জানা গেছে, বলবার মতো কোনওই প্রতিরোধ সেখানকার সৈন্যরা দেয়নি— হয়তো-বা ক্যু-র পূর্বেই এরা আপন আপন গাঁয়ে শোর বাজারের বর্তমান-গদিনশিনের আদেশে চলে গিয়েছিল। এবং এটাও লক্ষ করেছি, সদর দাউদ সরকারি পদ্ধতিতে সাড়ম্বরে তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছেন, তাঁর নবীন রাষ্ট্র যদিও রিপাবলিক তবু সেটা 'ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী' গঠিত হবে। বলা বাহুল্য, সেটা সুন্নি মজহব অনুযায়ী। তদুপরি দাউদ খান যখন দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়ার মতো অনেক কিছু অনেক দিন থেকেই তাঁর রয়েছে, তখন শোর বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে আনেন, স্বয়ং মরহুম জিন্নাহ থেকে আরম্ভ করে কোন কোন পাকনায়ক শিয়া। এমনকি শিয়া না হয়েও জফরউল্লাহ এঁদের আরেক ধাপ নিচে— তিনি কাদিয়ানি। গোঁড়া আফগান সদাসর্বদা কাদিয়ানি মাত্রকেই ইসলাম-ত্যাগী মুলাহিদ বলে গণ্য করে এবং তারা ওয়াজিব উল-কৎল্— যাদের কতল করা ওয়াজিব। কাবুলবাসী জাত হিন্দু বা শিখের কাছ থেকে হয়তো-বা জিজিয়া তোলা যায়, কিন্তু তাদের ওপর অত্যাচার করার বিধান নেই। স্বয়ং আমান উল্লাহর আমলে শহর-কাজির হুকুমে একজন তথাকথিত কাদিয়ানিকে পাথর ছুড়ে ছুড়ে মারা হয়। দাউদেরও শিয়াদের প্রতি নিজস্ব উৎকট জাতক্রোধ আছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইরানের শিয়া শাহের প্ররোচনায় জহির তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত করে সরদারদের হিসেবে না নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাদামাটা ড. ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দেন।'[১]

শোর বাজার-যাজক-সম্প্রদায় আমানউল্লাহর বিরোধী ছিলেন বলে 'ধর্মবিদ্বেষী' সোভিয়েত আমান উল্লাহকে যতখানি পারে সাহায্য করে— সেটা অবশ্য যৎসামান্য। কিন্তু তখন সোভিয়েত রাষ্ট্র মাত্র এগারো বৎসরের বালক। কম্যুনিস্ট-বৈরীরা বলে সোভিয়েত ইতোমধ্যে ধর্মবাবদে যথেষ্ট সহিষ্ণু হয়ে গিয়েছে, এমনকি প্রয়োজন হলে যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঁতাত করতেও এখন তার বিশেষ কোনও বাধা নেই। ইতালির শান্ত সংযত কম্যুনিস্ট নেতা নাকি এ পথ সুগম করে দেন।

এ সব জল্পনা-কল্পনা যদি সত্য হয় তবে একটা অভিজ্ঞতা-জাত তত্ত্ব এস্থলে স্মরণে রাখা ভালো। কাবুল রাজদূতাবাসের একাধিক ইংরেজ কূটনীতিক আমাকে বলেন, আফগান ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, বিদেশি কোনও রাষ্ট্রের মোটা রকমের মদত নিয়ে যিনিই এযাবৎ আফগান রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন, তিনিই আজ হোক কাল হোক, জনপ্রিয়তা হারান এবং তাঁকে হটাবার জন্য নতুন ষড়যন্ত্র নতুন বিপ্লববাদীর অভাব হয় না। একটা প্যাস্‌টাইম শেষ হতে না হতেই অন্য দুর্দৈবের কথা কল্পনা করতেও আমার মন বিকল হয়ে যায়। আমরা গরিব, আফগানিস্তান আমাদের চেয়েও নিঃস্ব। সেখানে অযথা শক্তিক্ষয় রক্তপাত সার্বিক দৈন্য বৃদ্ধি করার জন্য গ্রহ-কুগ্রহের যোগাযোগ।

ভারত একদা আফগানিস্তানের প্রতিবেশী ছিল, এখন নয়। সে স্বীকৃতি দিয়েছে একটিমাত্র বিষয় বিবেচনা করার পর। যে কোনও কারণেই হোক, তার বিশ্বাস হয়েছে সদর দাউদের

১. ড. ইউসুফ বুদ্ধিজীবী ও রবিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরের বৎসরই শান্তিনিকেতনে এসে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা সফল হবে। তদুপরি হয়তো-বা কেউ কেউ বলবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যে বিলম্ব করেছিলে সেটার পুনরাবৃত্তি কর না। ব্যক্তিগতভাবে আমি অতি অবশ্য বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানকে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একাসনে বসাই না, যদ্যপি আমি চিরকালই আফগানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। নীতির দিক দিয়ে, মানবতার দৃষ্টিবিন্দু থেকে বাংলাদেশের দাবি বহু বহু উচ্চে।

মি. ভুট্টো পড়েছেন ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। ওদিকে মুর্শিদ নিক্‌সনও 'অসুস্থতা' ও ওয়াটার-গেট দুই গেরোর চাপে পড়ে সদর ভুট্টোর ভেট নামঞ্জুর করেছেন, এদিকে পাকদ্বেষী শিয়াবৈরী সদর দাউদ বড্ড বেশি মাত্রায় ভেট করতে চাইছেন যে।

রাজনীতি অবিশ্বাসে

ভারতের এক প্রাচীন রাজা তাঁর দেশের সর্বোত্তম চিকিৎসক, কামশাস্ত্রবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞকে ডেকে বললেন, 'তোমরা সবাই যে যার শাস্ত্রে পর্বতপ্রমাণ কেতাব-পুঁথির যেসব কাঞ্চনজঙ্ঘা নির্মাণ করেছ সেগুলোতে আরোহণ করার প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমার নেই। তোমরা তিনজন মিলে মাত্র একটা শ্লোকে আপন আপন বিদ্যে পুরে দাও। ওই দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে।' এস্থলে অক্ষম লেখকের সসঙ্কোচে নিবেদন, আসলে রাজা চার শাস্ত্রের চার সুপণ্ডিতকে ডেকেছিলেন, আমি চতুর্থ পণ্ডিতের বিষয়বস্তু তথা শ্লোকের চতুর্থাংশ বেমালুম ভুলে গিয়েছি। অতএব আশুতোষ ও অল্পতোষ পাঠককে বক্ষ্যমাণ ত্রিলেগেডরেস দেখেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

বৈদ্যরাজ তাঁর বরাদ্দ শ্লোকাংশে লিখলেন : 'জীর্ণে ভোজনং!' অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা খেয়েছ সেটা হজম— 'জীর্ণ'— হলে পর তবে 'ভোজনং' অর্থাৎ তখন খাবে। এই বিসমিল্লাতেই ডাক্তার এবং কবিরাজে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডাক্তারের আদেশে, রুটিনমাফিক, পানকচুয়ালি, প্রতিদিন একই সময়ে ভোজনং! পক্ষান্তরে কবিরাজ বলেছেন, পূর্বাহ্ণের পূর্বান্ন হজম হলে পর আপনার থেকেই ক্ষুধা পাবে, তখন খাবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশনের উল্টো বিধান। যেদিন শারীরিক পরিশ্রমের বাড়াবাড়ি সেদিন ক্ষিদে পায় তড়িঘড়ি। যেদিন কারফ্যুর কানমলায় উঠান-সমুদ্র পেরোনো প্রাণের দায়, সেদিন ক্ষিদে পায় কি না পায়! অতএব পানকচুয়ালি ভোজন হয় কী প্রকারে? তদুপরি অদ্যদিনের সুপার ডাক্তার রোগ ধরতে না পারলেই বলেন, নার্ভাস— একদা যেমন বলতেন এলার্জি। তা তাঁরা যা বলুন, যা কন— পাড়ার বারিক মালিক অবধি সব্বাই জানে, হৃদয়মন বিকল থাকলে ক্ষিদে পেট ছেড়ে মাথায় চড়েন।

মমেকসদয় পাঠক ঈষৎ অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, কোথায় কাবুলের হানাহানি আর কোথায় তুমি করছ ডাক্তার-বদ্যি নিয়ে টানাটানি!

কনফেশন বা কৈফেয়ৎ

পয়লা কদম ফেলার নাম মকদ্দমা, এর হুবহু সংস্কৃত প্রতিশব্দ অবতরণিকা। মকদ্দমা বলতে আরবিতে মামলা দায়েরের পয়লা পর্ব— প্রিমা ফাঁসি কেস— বোঝায়। বাংলায় সাকুল্যে মোকদ্দমাটা বোঝায় এবং তারও বেশি আগাপাশতলা মোকদ্দমা এবং তার সাথি আর পাঁচটা

www.pathagar.com

বিড়ম্বনা বোঝাতে হলে বলি, মামলা-মোকদ্দমা। 'ইতিহাসের দর্শন' শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা ইব্‌ন খলদুন তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের অবতরণিকা 'মুকদ্দমা'র জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

আসলে যা বলার কথা সেটি মোকদ্দমাতেই বলে নিতে হয়। আমারও 'শাদির পয়লা রাতেই বেড়াল মারা' উচিত ছিল, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ধারাবাহিকের পয়লা কিস্তিতেই। কিন্তু সে সময় ভাই-বেরাদর পাড়ার পাঁচো ইয়ার ছোঁক ছোঁক করছেন সদ্য সদ্য তাজা কাবুলি মেওয়া চাখবার তরে। আমার ফরিয়াদ শুনবে কে?

বাংলাদেশের পাঠক আমাকে চেনেন অল্পই। এর ভিতরে অনেকেই আবার আমার ওপর রাগত ভাব পোষণ করেন। মরহুম 'পূর্ব পাকিস্তানের' সেকেন্ডারি বোর্ড আমার সর্বনাশকল্পে মল্লিখিত প্রথম পুস্তক থেকে তাঁদের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে বেপরোয়া ঝালে-ঝোলে-অম্বলে অর্থাৎ ক্লাস সিক্‌স্ থেকে ম্যাট্রিক অবধি দু পাঁচ পাতা তুলে দিতেন। আর কে না জানে, এনুয়েলের আজরাইল না আসা পর্যন্ত— রবি-কবির ভাষায়, 'অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা'— কোন মূর্খ পাঠ্যপুস্তককে পাঠের উপযোগী বলে মনে করে? বললে পেত্যয় যাবেন, 'কাবুলিওয়ালা'র মতো সরেস গল্প ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়েছি? বরঞ্চ বাচ্চাটাকে জোর করে কুইনিন গেলানো যায়, কিন্তু জোর করে রসগোল্লা গেলাতে গেলে সে যা লড়াই দেয় তার সামনে যোদ্ধাও ভাবে মিঞা ওসমানীর জায়গায় একে জঙ্গিলাট বানালে ন মাস আগেই স্বরাজ আসত।

আমার লেখা ভালো না মন্দ তার সাফাই আমি গাইব কি? মোদ্দা কথা— আমার রচনা পাঠ্যপুস্তকে তুলে সেটা জোর করে জোরসে যাদের গেলানো হয়েছে তাদের বর্তমান আবাস ঢাকার ভিন্ন ভিন্ন হল-এ। সাধে কি আমি ওসব পাড়া এড়িয়ে চলি!

সূর্যসেন হল, বাপস! নব পরিচয়

তাই আমি নতুন করে আমার পরিচয় দিতে চাই। প্রায় বিশ বৎসর ধরে আমার লেখা এ দেশে পাওয়া যেত কালে কস্মিনে। ওপার বাংলা আমায় কিছুটা চিনেছে ওই দুই দশক ধরে। 'পূর্বদেশে'র বিজ্ঞপ্তি যে আমি সনাতন 'আফগানিস্তান আজকের দৃশ্যপটে' ফেলে ধারাবাহিকভাবে লিখব, এ খবরটা যদি পাক-চক্রে সেখানে পৌঁছায় তবে ঘটিরা যে কী অট্টহাস্য ছাড়বে সে আপনারা হাইকোর্ট দর্শনে না গিয়ে স্রেফ বুড়িগঙ্গার পারে বসেই ঘটিগঙ্গার জলমর্মরের সঙ্গে শুনতে পাবেন। ওরা এবং এ-পারে, বহু দূরের বগুড়াবাসীরা মাত্র গুহ্য তত্ত্বটি অবগত আছেন; পার্টিশনের পরেই একটি বিশেষ দ্রব্য হেথাকার নওগাঁ থেকে চালান বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ছেলে সরাসরি নওগাঁ যাই কী প্রকারে? তাই সেটাকে বগুড়াবাসের কামুফ্লাজে ঢেকে সেখানে কয়েক মাস কাটাই। কিন্তু কপাল মন্দ। চিফ-সেক্রেটারি আজিজ আহমদ— আহা, কী 'আজিজ' প্যারা দোস্তই না পেয়েছিল মহাপুণ্যবান মরহুম পূর্ব পাকিস্তান— তিনি আমাকে হাতের কাছে না পেয়ে লাগলেন আমার ইষ্টিকুটুমের পিছনে। কীই-বা করি তখন আমি আর? গুটি গুটি ফের কলকাতা। মেহেরবান আজিমুশ্‌শান আজিজ আহমদ খান জান-প্রাণ ভরে তসল্লির ঠাণ্ডি সাঁস ফেললেন! পাকের চেয়ে পাক মশরিকি পাকিস্তানকে বরবাদ পয়মাল করার তরে যে

www.pathagar.com

বদ্-বখৎ হিন্দুস্থানি এসেছিল হেথায়, সে-ইবলিস গেছে। 'জিন্দাবাদ সাহেবজাদ আজিজ' যদিও তিনিই পুব পাক বাবদে যে পাজ-সে-পাক সব-সে পহলি পালিসির (পলিসির খাঁটি আজিজি পাঞ্জাবি উচ্চারণ) পালিশ লাগিয়েছিলেন, তারই ফলে ডজন দুই বছর যেতে না যেতেই উপরকার দুই পাকের 'ভাই বেরাদরি' ভণ্ডামির পলকা পলেস্তরা উবে গিয়ে বেরিয়ে এল— গিল্টি, গিল্টি, নির্ভেজাল গিল্টি; আজিজের দুই চোখ, দিলজানের দুশমন রবিঠাকুরের কণ্ঠে তখন পাগলা মেহের আলীর চিৎকার "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

ব্ এক্ গর্দিশে চর্খ-ই-নীলুফরি
ন্ আজিজ বজ্-আমদ ন্ নাদরি ॥

"সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশ একটি বারের মতো পরিবর্তিত হইয়াছে কি, না— নাদির এমনকি তাহার নাদরি হুকুম পর্যন্ত লোক পাইল"— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। আমি শুধু প্রথম 'নাদিরে'র স্থলে আজিজ লোকটাকে দিয়ে নাম পরিবর্তন করেছি; স্বাধিকারপ্রমত্ত আজিজ 'চোটাওয়ালা' নাদিরের মতো ফরমান ঝাড়তেন বলে 'নাদরী'র পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

মেহেরবান সম্পাদক, কারণ অকৃপণ অভাজন-অনুরক্ত পাঠক, আজ যদি প্রাণ খুলে দুটি মনের কথা কই তবে অপরাধ নিয়োনি। সিকি শতাব্দী ধরে ট্যাঁ-ফুঁ-টি করার উপায় ছিল না। ওপার বাংলাতেও না। এপারে যে আমার শতাধিক প্রিয়ের চেয়ে প্রিয়তর জন রয়েছে।

আচ্ছা, সে নয় আরেকদিন হবে।

গঞ্জিকা মিশ্রণ

নওগাঁয়ের সেইসঙ্গে বিশেষ বস্তুটি 'গুল' যোগ করে যে অনির্বচনীয় রস তৈরি হয় আমি তারই রাজা— গুলম্‌গির। আলম্‌গিরের ওজনে টায় টায়। এর পুরো ইতিহাস বারান্তরে।... নিতান্তই কপালের গেরো, গ্রহের গর্দিশে আমি দু পাঁচজন গুণীর সংস্রবে একাধিকবার আসি। তাদেরই ঝড়তি-পড়তি মাল নিজের নামে চালিয়ে বাজারে কিঞ্চিৎ পসার হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত অবিমিশ্র সত্যঃ— গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা তথ্য ভেজাল না দিয়ে পরিবেশন করাটা আমার ধাতে সয় না, স্যাকরা যেমন আপন মায়ের জন্যে গয়না গড়ার সময়ও সোনাতে খাদ মেশাবেই মেশাবে। আমি উভয় বাংলার ক্লাউন ভাঁড়। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, সার্কাসের ক্লাউন হরেক বাজিকর, প্রত্যেক ওস্তাদের কিছু না-কিছু নকল করতে পারে। আম্মো পারি।

অতএব প্রকৃত চাণক্য, আজকের দিনের রাজনৈতিক ভাষ্যকার আলাস্টের কুক-এর অনুকরণে আমি অতি যৎসামান্য কিছু বলতে গেলেও তার সঙ্গে গাঁজাগুল মিশে যায়। আমি মূল বক্তব্যে নিজেকে কিছুতেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারিনে। কবিত্বরস রক্তে থাকলে বলতুম, নাক বরাবর মোকামের দিকে হনহন করে না এগিয়ে মোকা-বেমোকায় আকছারই পথের দু পাশে নেমে ফুল কুড়োই, প্রজাপতি-স্পন্দন ভ্রমর গুঞ্জনে বার বার মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ

www.pathagar.com

দেখি, তপ্তদিনের শেষে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে— এবং মন্‌জিলে মা দূর আস্ত্‌। পথের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ি। পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এ যাবৎ বাঘ-সিঙ্গির পেটের ভিতর যাইনি। সেই কুড়োনো ফুলের দু চারটে পাঠকের সামনে অবরে-সবরে পেশ না করতে পারলে আমার মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।

কামশাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লিখলেন, 'তন্বী সকাশে মৃদ্বাচারী' অর্থাৎ তন্বী-শ্যামা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তথা সর্বনারীজনকে মৃদু-আচারে জয় করবে। জর্মন দার্শনিক বলেছেন, "নারী সকাশে গমনকালে বেত্রদণ্ডটি নিয়ে যেতে ভুলো না— ফেরগিস ডি পাইট্‌শে নিস্ট্‌'; প্রাগুক্ত কাম-পণ্ডিতের একদম বিরুদ্ধ বাণী, বিরুদ্ধ উপদেশ। আমার কোনও মন্তব্য নেই। আমি হাড়-আল্‌সে জড়ভরত। তাই বেকার বখেড়া না বাড়িয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

রাজনীতিবিদ পণ্ডিত দুটি শব্দেই মোক্ষমতম তত্ত্ব 'রাজনীতিতে অবিশ্বাস' প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ রাজনীতির আগাপাশতলা অবিশ্বাসে গড়া।

রাজনীতিতে অবিশ্বাস নয়, অবিশ্বাসে রাজনীতি।

আমান বনাম নাদির

আমান উল্লা অবিশ্বাস দিয়ে কর্মারম্ভ করে থাকলেও আখেরে নীতিভ্রষ্ট হয়ে রাজ্য খোয়ালেন।

নাদির শাহকে নির্বাসনে পাঠালেন। কিন্তু সসম্মানে অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজদূতরূপে। দারাপুত্রকে জামিনস্বরূপ কাবুলে আটকে রেখেছিলেন কি না, সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক। আমি কাবুলে রাজগোষ্ঠীর অনেক বালক-কিশোরকে চিনতুম। বেশ কজন আমার ছাত্র ছিল। কিন্তু জহির খানের কথা একবারও শুনিনি। হয়তো-বা কয়েক বৎসর পর নাদির যখন রাজদূত-কর্মে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তখন স্বভাবজাত কোমল-হৃদয় আমান উল্লা নাদিরের দারাপুত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো গোড়ার থেকেই আটক রাখেননি।

একটা কথা এখানে ভালো করে মনে গেঁথে নিতে হয়। নাদির ফ্রান্সে পৌঁছেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধজয়ী মার্শাল পেতাঁ এবং স্যাঁ সির-এর ফরাসি অফিসারদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং আমি লোকমুখে শুনেছি, নাদির-পেতাঁতে দিনের পর দিন বিরাট বিরাট মিলিটারি ম্যাপ খুলে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। একদিন আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারাবেন আর তিনি স্বদেশ জয় করার জন্য লড়াই লড়বেন, এহেন আকাশ-কুসুম তিনি তখন চয়ন করেছিলেন কি না, সে তথ্য নির্ধারণ করবে কে? প্রবাদবাক্য আছে, 'ভাগ্যলক্ষ্মী' কোনও না কোনও সময়ে হাতে একটা সুযোগ নিয়ে প্রতি মানুষের দোরে এসে আগল ধরে নাড়া দেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেন, তাঁর কৃপাধন্য জন সে সুযোগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেনি। নাদির অতি অবশ্যই ব্যত্যয়!... একদিন ফ্রান্সে খবর পৌঁছল আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। নাদির তদ্দণ্ডেই স্বদেশমুখী হলেন। কিন্তু তিনি অর্থ-হীন, অস্ত্রহীন। কী করে তিনি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন সে ইতিহাস দীর্ঘ। ভারতে তখন আমান উল্লাহর প্রতি মাত্রাধিক সহানুভূতি। নাদির কিন্তু আমান উল্লাহর পক্ষে না বিপক্ষে সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বললেন, "প্রথম কর্তব্য, ডাকু বাচ্চা-ই-সকাওকে খেদানো; তখন দেখা

www.pathagar.com

যাবে।" তার পর 'আফগান জনসাধারণ' তাঁকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে তিনি স্বীকৃত হলেন। অবশ্য একথা সত্য, তখন তখ্‌তের জন্য অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা; যদিও এস্থলে অবান্তর, তবু বহুজনহিতায় বলে রাখা ভালো, উপস্থিত তিনি তদ্বিরভোগ্যা।

প্রেসিডেন্ট দাউদ খান কীভাবে 'নির্বাচিত' হয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু তাজ্জব মানতে হয়, অবিশ্বাস-শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হলেও জহির শা'র নিরেট অতি-বিশ্বাসের আহাম্মুকি দেখে। তিনি কি আদৌ জানতেন না, দাউদ খান কতখানি শক্তিশালী? সেটা তো পরিষ্কার বোঝা গেল একটিমাত্র সাদামাটা তথ্য থেকে : ইহ সংসারে আর কোন্ ক্যু দে তার নায়ক চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কিংবা অল্পাধিককালের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করার পর ঢাউশ ধামা নিয়ে বসতে পেরেছেন স্বীকৃতি লাভের কামতরুতলে। পটাপট পড়তে লাগল দুনিয়ার গোটা গোটা মোটা মোটা সরেস সব মেওয়া— কাবুলি মেওয়াকে সঙ্গ দেবার তরে, একটা হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে! এস্তেক অভিমানভরে, গোসসা করে কমনওয়েলথ বিবিকে তিনতালাক দেনেওয়ালা হি-ম্যান, হজরত আলীর তরবারি নামধারী অপিচ বাংলাদেশকে মেনে-নিতে-নিতান্তই-লজ্জাবতী নখ্‌রা রানি সদ্‌র-ই-আলা আগা-ই-আগা মুহম্মদ জুলফিকার আলী ভুট্টো।

সু-উচ্চ স্বীকৃতিতরু শাখা থেকে তাঁর বাং-মাছ-পারা মোচড় খাওয়া পতনভঙ্গির রঙ্গটা দেখতে আমার বড়ই সাধ যায়।

অবিশ্বাসস্য পুত্রা

মিস্টার ভুট্টোর অত্যধিক ভয় পাবার এখনও কোনও কারণ নেই। রুশ, মার্কিন, চীন, ইরান সবাই যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে এবং মল্লভূমিতে সুদ্দুমাত্র সদর দাউদ পাকিস্তানের সদর ভুট্টোর মোকাবিলা করেন তবে ভুট্টোর বিশেষ কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি কোনও স্ট্যাটিসটিক্‌সের ওপর নির্ভর করে এই ভাগ্যফল গণনা করিনি। ধরে নিলুম, দুই মল্লবীর লড়াই লাগার পর তাঁদের আপন আপন দেশে যা অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যদল আছে তাই নিয়ে লড়ে যাবেন। কোনও পক্ষই বিদেশি কোনও রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি কানাকড়ি কিংবা ডাড বুলেটও পাবেন না। জানি, আজকের দিনে এ রকম একটা ভ্যাকুয়ামে দুই পক্ষ বেশিদিন লড়তে পারবেন না। মার্কিন, রুশ, চীন— তিন রাষ্ট্রই যে বিশ্বের একচ্ছত্রাধিপত্য চান এ রকম একটা সিদ্ধান্ত কেউই কসম খেয়ে করতে পারবেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এই তিনজনের প্রত্যেকেই প্রতিদিন ঘামের ফোঁটায় একে অন্যের কুমির দেখেন। মাঝরাতে হঠাৎ রাশা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে বসে ককিয়ে ওঠে, "ওইয্-যা! মার্কিন ব্যাটারা বুঝি কাম্বোজ গিলে ফেলল! হুঁ, কাল আবার রিপোর্ট পেয়েছি, মার্কিন মুরগিটা এক ঝটকায় আরও এক ডজন এটম বোম পেড়েছে। একুনে তা হলে কত হল? আমার ভাঁড়ারে কটা?" মার্কিন ওই একই দুঃস্বপ্ন দেখে, "বলশি ব্যাটারা যে বড্ড বেশি গুড়ি গুড়ি জাপানের সঙ্গে দোস্তি করার তরে এগোচ্ছে। আর মাটির তলায় কিংবা ওই বহুদূর আর্কটিকের

www.pathagar.com

সমুদ্রগর্ভে যদি এটম বোম ফাটায় তবে হেথায় কি সেটা যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়বে? হুঁ, সত্যি বটে বাবাজি ব্রেজনেভ এসেছিলেন বোষ্টমের নামাবলি পরে, বাজালেন শ্রীখোল, কিন্তু, দাদা কিসিংজার, ভুলে যেয়ো না মাইরি, শ্রীযুত মলটফও বৈষ্ণবতর চন্দনের এ্যাব্বড়া তিলক কপালে এঁকে ঘোরতর-শাক্ত শ্রীহিটলারের সঙ্গে দু দণ্ড রসালাপ করতে এসেছিলেন শ্রীবৃন্দাবন— বার্লিন কুঞ্জে। ফলং? সর্বশেষ ফল হিটলারের গোটা মুল্লুকসুদ্দু গেলেন টেঁশে।" চীন কী স্বপ্ন দেখে তার ছোট্ট একটি নমুনা বলে গেছেন সাধনোচিতধামপ্রাপ্ত জওয়াহির লাল। চীন নেতা নাকি তাচ্ছিল্যিভরে বলেছিলেন, "লড়াইয়ের নামে শিউরে উঠবে তোমরা, এরা-ওরা, আর-সব্বাই— সে তো বাংলা কথা! কিন্তু আমি ডরাব কোন্ দুঃখে! দু পাঁচ কোটি মরে গিয়ে তোমরা সবাই যখন চিৎপটাং, তখনও আমার আরও ক কোটি রেস্ত থাকবে, হিসাব করে দেখেছ? দুনিয়াটা দখল করতে তখন আমাদের গাদা-বন্দুকটারও দরকার হবে না।" জাপানও যে কোনও স্বপ্নই দেখছে না, কে বলবে? কুল্লে দুনিয়ার 'ত্রাহি ত্রাহি' চিৎকার বেপরোয়া ডোন্টো-কেয়ার করে ওই যে হোথা ফ্রান্স পরশুদিন এটম বোম ফাটাল, সেটা কি খয়রাতি হাসপাতাল খোলার হুলুধ্বনি? ... অবিশ্বাস অবিশ্বাস, সর্ব বিশ্বে অবিশ্বাস! "শৃন্বন্তু বিশ্বে অবিশ্বাসস্য পুত্রা—"

অসকার ওয়াইল্‌ড্ বলেছেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই বেশকিছু বেকার বাজে জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু ভয়, পাছে কেউ কুড়িয়ে নেয়!" আফগান দেশে মাইলের পর মাইল শুধু পাথর আর পাথর, কিংবা সিন্ধুদেশে বালি আর বালি, কিন্তু হলে কী হবে, আমি— মার্কিন যদি দখল না করি তবে বলশি ব্যাটা যে নেবে না, তারই-বা কী পেত্যয়? ইন্ডিয়াই-বা কোন তক্কে আছে কে জানে? এই হল বিশ্বভুবনের শঙ্কা, বিভীষিকা!

অতএব এটা নিতান্তই কল্পনা-বিলাস যে, দাউদ খান আর ভুট্টোর ব্যারিস্টারে রোঁদের পর রোঁদ লড়ে যাবেন আর দুনিয়ার কুল্লে নেশন রাস্তার ছোঁড়াদের মতো শুধু হাততালি দিয়েই মজাটা লুটে নেবেন। কথাটা খুবই খাঁটি কিন্তু এই কল্পনা-বিলাসেও সুদ্দুমাত্র যে আকাশ-কুসুম চয়ন করা হয়, তা নয়। বিজ্ঞানীরা বিস্তর এক্‌স্‌পেরিমেন্টে প্রথম ভ্যাকুয়ামে সফল হলে পরে স্বাভাবিক বাতাবরণের প্রভাবদুষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ রুশ-মার্কিন-ইন্ডিয়া-ইরানের আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির মতলবের মাঝখানে— সেই এক্‌স্‌পেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেন।

যদিস্যাৎ

ভ্যাকুয়ামের লড়াইয়ে ব্যারিস্টারের বিশেষ ভয় পাবার কিছু নেই।

ধরে নিলুম, দাউদ খান প্রধানত রুশ বা/এবং যে-কোনও জাতের কাছ থেকেই হোক, অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু জমায়েত অবস্থায় পেয়েছেন তথা জহির শাহ চল্লিশ বছর ধরে যা-সব কিনেছিলেন তাই নিয়ে নামলেন লড়াইয়ে। মোল্লাদের হুকুমে সেপাই পেতেও অসুবিধে হবে না। আর সরাসরি হুকুমটাও গৌণ— শোর বাজার বারণ না করলেই হল। আসল যে যুক্তি

www.pathagar.com

শাহি ফৌজকে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ করবে, তার দিল্ জানে জোশ পয়দা করবে সেটা অতি অবশ্যই— লুট করার সম্ভাবনা কতখানি? আফগান সরকার সেপাইদের যে কী মাইনে দেন সে আমার জানা আছে। পূর্বেই ধরে নিয়েছি অন্য কোনও রাষ্ট্র সদর্ দাউদকে কোনও অর্থসাহায্য উপস্থিত করবে না। আর করলেও যা হবে সেটা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করতে পারি। ইনফ্লেশন। আঁতকে উঠলে নাকি সোনার বাংলার পাঠক? সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেলে নাকি? কিন্তু পাঠান এই সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি চেনে না।

ইনফ্লেশন

ঈষৎ অবান্তর হলেও, পাঠক, তুমি উপকৃত হবে। বিশেষ উপস্থিত আমরা যখন কাবুল পেশাওয়ার নিয়ে আলোচনা করছি। আমার জানা মতে যে মহাপুরুষ এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইনফ্লেশন নামক গজবটা অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি বাবুর বাদশা। হিন্দুস্থান জয় করার পর বাবুর বাদশাহর আমিররা কাবুলে ফিরে গিয়ে লুট-তরাজে বিস্তর যে সব ধন-দৌলত জমা করেছিলেন সেগুলো দু হাতে ওড়াবার জন্য বাবুরের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি বিস্তর যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, হিন্দুস্থানের মতো ঐশ্বর্যশালী বিরাট রাজত্ব ত্যাগ করে কাবুল-কান্দাহারের মতো নির্ধন দেশে ফিরে যাওয়াটার মতো আহাম্মুকি তাঁর কল্পনাতীত। আমিররা পণ ছাড়েন না। শেষটায় তিনি যা বললেন (আমি স্মৃতি থেকে বলছি, পাঠক 'বাবুরনামা'তে পাবেন) তার বিগলিতার্থ : 'ধরুন, এখন কাবুল-বাজারে দৈনিক ওঠে এক হাজার আণ্ডা। আপনার বিস্তর টাকা-কড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তো সেখানে তিন হাজার আণ্ডা হাজির হবে না। কাবুল এবং তার আশেপাশের শক্তি তো আর রাতারাতি বেড়ে যেতে পারে না। আপনারা একে অন্যের সঙ্গে লড়ালড়ি করার ফলে আণ্ডার দাম তখন যাবে চ'ড়ে। যে আণ্ডা আগে এক পয়সা দিয়ে কিনতেন সেটা কিনবেন এক টাকা দিয়ে, যে গালিচা কিনতেন একশো টাকা দিয়ে সেটা কিনবেন এক হাজার টাকা দিয়ে। লাভটা তা হলে কী হল? আগে যে-রকম আমোদ-আহ্লাদ করতেন এখনও করবেন ততখানিই। মাঝখানে শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি মোহর-দিনার ঢালাই হবে সার।'

অবশ্য আমিররা এই সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক তত্ত্বটির কানাকড়িও বুঝতে পারেননি। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত বাবুর বাদশাহকে বর্জন করে কাবুল চলে যাননি তার অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমিরদের দোষ দিলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। দুষ্টলোকে বলে বাংলাদেশে এখন ইনফ্লেশন। কেনবার জিনিস নেই, ওদিকে নোটের ছয়লাপ, ইনফ্লেশন হবে না তো কী, আসমান থেকে মন্না সলতা ঝরবে? আমি নিজে জানিনে। মার্কিন মুল্লুকে তো কোনও দ্রব্যের অভাব নেই। তবে ডলার মার্কেটের ধাক্কায় বিশ্বজোড়া ধুন্দুমার লেগে গেছে কেন? একাধিক গুণী বলছেন, নিক্সন কর্ণধার হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন, অবশ্য আমাদের তুলনায় ধূলি পরিমাণ এবং অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন অর্বাচীন ডাঙর ব্যাঙ্কার প্রফেসার বাণিজ্যের কর্ণধার সব্বাই বলেছেন, এ ইনফ্লেশনের কারণ এবং দাওয়াই যে মুনি বাৎলাতে পারবেন তিনি অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে অজরামর হয়ে বিরাজ করবেন।

www.pathagar.com

দুশমন বাইরে না ভিতরে

মোদ্দা কথায় ফিরে আসি।

কবে সেই ১৯৫৩ থেকে দাউদ খান দাবি জানাচ্ছেন, ফ্রনটিয়ার এলাকাকে স্বায়ত্তশাসন দাও, আর (হিটলারি কায়দায়) আমাকে দাও খাইবারপাস পেরিয়ে করাচি অবধি একটা করিডর। আমাদের একটা বন্দর না হলে চলবে কেন? পাঞ্জাবিরা বুদ্ধু। তারা তখন চাইল না কেন, খাইবার গিরিপথের পশ্চিম মুখ থেকে কাবুল অবধি একটা করিডর? কাবুলের গাছপাকা আঙুর, আপেল, নাসপাতি, জরদ-আলু, আলু বালু, শফৎ-আলু, গেলাস, চিলগুজা, বাদাম, আখরোট আপন হাতে পেড়ে পেড়ে না খেলে তাদের গায়গত্তি লাগবে কী করে? স্বাস্থ্য বরবাদ হয়ে যাবে না? ইয়ার্কি পেয়েছ?

দাউদ পাকিস্তানকে আক্রমণ করবেন সঠিক কোথায়? বেলুচিস্তানের চমন অঞ্চলে না খাইবারপাস অঞ্চলে— না উভয়ত? হিটলারের পয়লা নম্বরি ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি পর্যন্ত রাশার দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতেই ঘায়েল হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখানে অত দূরের পাল্লা নয়। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলোও তেমন সরেস নয়। আর রাস্তার চওড়াই? না ওসব কোনও কাজের কথা নয়। বোমারু প্লেন? হঃ! ইয়েহিয়া পূর্ব পাক হারাল, তবু জাবড়ে ধরে রইল তার প্লেনগুলো।

ফ্রন্টিয়ার নো-মেনস-ল্যান্ডের পাঠানদের লেলিয়ে দেওয়া যায় না?

লুটতরাজ কোন অবস্থায়, কাকে করা যায়, কাকে করা যায় না, সেটা পুরুষানুক্রমে করে করে পাঠান এ বিষয়ে পৃথিবীর সেরা স্পেশালিস্ট। টিক্কা খান কীভাবে নিরীহ, নিতান্ত নিরস্ত্র বেলুচের ওপর বেদরদ বে-এক্তিয়ার কায়দায় বোমা ঝরাতে পারেন সে তো তারা বেলুচিস্তানে পাহারা দেবার সময় স্বচক্ষে দেখেছে, এবং এই বাংলাদেশেও তারই মদতে তারা লুট করার সময় পাঞ্জাবিদের খুব-একটা পিছনে ছিল না। তার আখেরি নতিজা কী হয়েছে, সেটা ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা অবগত হয়েছে।

হিটলার বার বার তাঁর জেনারেলদের বলতেন, অত সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে রুশ দেশে অভিযান চালাবার কোনও প্রয়োজন নেই। ওই রুশ দেশটা হুবহু একটা ঝুরঝুরে কুঁড়েঘরের মতো, দরজাটার কাঠও পচাহাজা। মারো জোরসে বুট দিয়ে গোটা দুই লাথি। হুড়মুড়িয়ে বেবাক ঘর ধুলায় ধূলিসাৎ।

রাশার বেলা রোগ নির্ণয়ে হিটলার গোভলেট করেছিলেন।

ব্যারিস্টার ভুট্টোর পশ্চিম-পাক বাড়িটা দেখে সক্কলের মনে কিন্তু, কিন্তু-কিন্তু না-ও হতে পারে।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়— টীকা

জন্মের দিনই মানুষের নামকরণ হয় না, কিন্তু প্রবন্ধ লেখার প্রারম্ভেই শিরোনামা একটা না দিয়ে উপায় নেই। এ সুবাদে কবিগুরুর একাধিকবার বলা বিশেষ একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ল। তদুপরি বাইশে শ্রাবণ আসন্ন। প্রাচীন দিনের কথা। ১৯২১ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'ষাট বছরের যুবক'। পূর্ণোদ্যমে বিশ্বভারতীয় সদ্যোজাত কলেজ বিভাগে ক্লাস নিতেন। নিজের

www.pathagar.com

কবিতা উপন্যাস এবং তাঁর প্রিয় ইংরেজ কবি শেলি কিটসের লিরিক। পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলোর কোনও শিরোনামা নেই। তিনি নিজের থেকেই বললেন, 'কবিতায় শিরোনামা পড়ে পাঠক ধরে নেয়, গোটা কবিতাটা বুঝি ওই নামটা সার্থক করার জন্যই লেখা হয়েছে। তা তো নয়। কবিতা যখন উৎস থেকে বেরিয়ে যাত্রাপথে নামে তখন আপন গতিবেগে চলার সময় শিরোনামার প্রতি দৃষ্টি রেখে সোজা পথে এগিয়ে যায় না। সে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে নিয়ে তার নতুন নতুন রূপ দেখায়। (এই ভাবাংশটুকু কবি গানে বলেছেন, "নতুন নতুন বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে/পাতার ভেলা ভাসাই নীরে")। মিশরির সুতোটা থাকে চিনির টুকরোর ঠিক মাঝখানে। তাই বলে সুতোটাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য তো ধরেই না, ওই সুতোটার অস্তিত্ব সার্থক করার জন্য মিশরি আপন সত্তারও বিকাশ করে না। কবিতার বেলা তারও বেশি। কবিতা তার শিরোনামার চতুর্দিকে ঘোরপাকও খায় না।'

বলা বাহুল্য, আমি জরাজীর্ণ ছলনাময়ী স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই কবির বক্তব্যের নির্যাস নিবেদন করলুম। খোজা সম্প্রদায়ের লোক 'জামাৎ-খানায়' তাদের 'নামাজ' শেষ করার পর যে রকম বলেন, 'ভুলচুক, মৌলা, বখ্‌শো' আমিও উন্নাসিক পাঠকের কাছে নিবেদন জানাই, ভুলচুক যা হয়েছে বখশিশরূপে মাফ করে দিয়ো।

কিন্তু 'বলাকা'র পরের কাব্যগ্রন্থ 'পলাতকা'য় কবি পুনরায় শিরোনামা দেবার প্রথায় ফিরে গেলেন। বোধহয়, নামের পরিবর্তে কবিতাতে অঙ্ক-শাস্ত্র-সুলভ নম্বর লাগালে সেটা অপ্রিয় দর্শন তো হয়ই, তদুপরি এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, কোনও কোনও কবিতার শিরোনামা আমার মতো কবিত্বরসবঞ্চিত পাঠককে মূল বক্তব্য বুঝে নিতে সাহায্য করে— অবশ্য তাবৎ কবিতাতেই যে মিশরির সুতোর মতো মূল সূত্র থাকবে এহেন ফতওয়া কোনও আলঙ্কারিকই এ তাবৎ কবিকুলের স্কন্ধে চাপাননি।

বক্ষ্যমাণ ধারাবাহিকের জন্মদিনেই একটা নাম, নিতান্তই দিতে হয় বলে প্রথম লেখার কপালে সেঁটে দিয়েছিলুম। আজ তার ষষ্ঠী— যাকে আমার দেশে 'ছুটি', উত্তরবঙ্গে বোধহয় 'ষাইটলা' না কী যেন বলে। এদিনে অন্তত নামটা সম্বন্ধে দু একটা কথা বলতে হয়।

আসলে 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' বাক্যটি একটি ফরাসি প্রবাদবাক্যের আবছায়া অনুবাদ। 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা ম্যাম শোজ'— "যতই সে নিজেকে বদলায়, ততই তার মূলরূপ একই থাকে"— যতই তার 'পরিবর্তন' হয় না কেন, ততই ধরা পড়ে, 'সে অপরিবর্তনীয়'। এটাকেই অন্যভাবে বলা হয়, 'ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে।' তার অর্থ যতই ভিন্ন দেশে ভিন্ন বেশে কোনও একটা ঘটনা ঘটুক না কেন, আখেরে ধরা পড়ে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ঘটনাটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া নতুন নয়। তাই এক শ্রেণির ঐতিহাসিক দাদা আদমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই বিরাট বসুন্ধরা খুঁজে বেড়ান 'প্যাটার্নের' সন্ধানে। যেমন কাশ্মিরী শালে আমের প্যাটার্ন পশমের উপর সোনার জরি দিয়ে করা, বানারসি কিংখাপে সেই প্যাটার্নই রেশমের উপর রুপোর জরি দিয়ে করা, রাজশাহীর আম-সন্দেশে সেই প্যাটার্নই স্রেফ ছানা-চিনি দিয়ে গড়া। মালমশলা যাই হোক, নির্মিত ও-বস্তুটির চেহারাটি একই। খোলনলচে যতই পালটান— যেই হুঁকো সেই হুঁকো। কিংবা বলতে পারেন, একটা পশম আরেকটা রেশম— হরেদরে হাঁটুজল। কিংবা বলতে পারেন, পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন। কিংবা— না থাক্!

www.pathagar.com

যাত্রারম্ভেই বলে রাখা কর্তব্য, আমি কট্টর মোল্লাকুলজাত পাতি মোল্লা। আমার পূর্ব-পুরুষ ছিলেন রাজহাঁস, আমি ভাগ্যবিপর্যয়ে পাতিহাঁস। প্যাটার্ন হরেদরে একই। আমার পক্ষে মোল্লাদের নিন্দাকীর্তন, যে-শাখায় বসে আছি তারই মূল কর্তন। আমি অত পাঁড় কালিদাস বা শেখ চিল্লি নই। তা সে যাই হোক, মূল কথা এই, আফগানিস্তানের ইতিহাস মোল্লা-মৌলবী ভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

আমির হবীবউল্লা মোটের ওপর সুখেই রাজত্ব করছিলেন কিন্তু কেন জানিনে, শেষের দিকে হঠাৎ তাঁর শখ গেল বিলিতি কায়দা-কানুন অনুকরণ করতে। খুবসম্ভব তাঁর এবং রাজপরিবারের দু একজন রোগীকে বিলিতি ডাক্তার সারিয়ে দিয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বেস জন্মে, বিলিতি আর পাঁচটা রীতিনীতি আমদানি করলে গোটা দেশটার ধন-দৌলত বেড়ে যাবে। সাধারণ জন ভাবে, আমান উল্লাহই বুঝি সর্বপ্রথম বিলেত-পাগলা রোগে আক্রান্ত হয়ে রাতারাতি দেশটাকে গোরা-সায়েব বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বস্তুত দু একটা ব্যাপারে তিনি আমান উল্লাহরও একতলা উপরে বসে বসে বিলিতি খুশবাই-বিলাস উপভোগ করতেন। হবীবউল্লার হারেমটি ছিল বাছাই বাছাই সুন্দরীতে ভর্তি। কুল্লে আফগানিস্তানের তাবৎ কওমের তরো-বেতরো পরী হুরী দিয়ে তিনি হারেমটিকে করে তুলেছিলেন বহু বৈচিত্র্যময় গুল-ই-বাকাওলির গুলিস্তান। জানিনে, কী করে তাঁর নজরে পড়ে, রাশান ব্যালে নর্তকীদের কিছু ফটোগ্রাফ এবং রঙিন ছবি। বড়ই পছন্দ হল তাঁর হাঁটুর ইঞ্চি ছয় উপরে হঠাৎ যেন ছেঁটে দেওয়া সাতিশয় শর্ট স্কার্ট। হারেমের অপেক্ষাকৃত তরুণীর পালকে তিনি সেই বেশে সাজিয়ে দিয়ে এক অজানা-অচেনা ভিনদেশি আনন্দদায়ী চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করলেন।

হারেমের ভিতর কী হয় না হয় সে নিয়ে মোল্লা সম্প্রদায়ের মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু তবু এই বিজাতীয় বেশ— বেশাভাবও বলা চলে— উৎকট পল্লবিত বর্ণনাসহ তাঁদের কানে পৌঁছল। মোল্লাদের ভিতর রাজদ্রোহী মনোভাব দেখা দিল। সেইটেকে প্রথম উস্কিয়ে দিয়ে নস্‌র উল্লা হয়ে গেলেন তাঁদের প্রিয়পাত্র। বহু বিচিত্র কৌশলে আমান উল্লাহর মাতা নস্‌রকে হটিয়ে করে দিলেন আমান উল্লাকে তাঁদের প্যারা। আখেরে হবীবউল্লা আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

আমান উল্লাহও ওই একইরূপে রাজ্য হারালেন। তাঁর মাতা অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী গোড়ার থেকেই বাবাজিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, "আর যা করবার করিস, বিলিতি সং সাজিসনি।" হবীবউল্লাকে তাতিয়েছিল ছবি, ফটো; আমান উল্লাহকে খেপিয়ে দিল বিলিতি সিনেমা। কাবুলের সিনেমাহলে আমি যেসব রদ্দি ছবি দেখেছি সেগুলোর অনেকগুলি, সে আমলে তো নয়ই, এ আমলেও বোধহয় উভয় বঙ্গের সদাশয় সেন্সর দেখবারই সুযোগ পান না। মঞ্জুর না-মঞ্জুরির কথাই ওঠে না।... প্যারিসের বুলভার, লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাসের স্বপ্ন দেখছিলেন আমান বিলেত যাবার পূর্বেই। আচম্বিতে বাস্তবে নেবে মালুম হল, সিংহাসন নেই, তিনি পিতৃনগর কান্দাহারের পথমধ্যে দাঁড়িয়ে।

যুবরাজ ইনায়েৎ রাজা হলেন। একে তো তখ্‌ৎ তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি, তদুপরি তিনি শরিয়তের এমন কোনও বিধান ভঙ্গ করেন নি যে তাঁর বাদশাহ হতে কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা। কিন্তু শোর বাজারের হজরত রাজি হলেন না। ইনায়েৎ উল্লাকে কিন্তু তখ্‌ৎ-মুল্‌ক ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। তিনি প্লেনে চড়ার সময়

www.pathagar.com

স্বয়ং শোর বাজার অ্যারপোর্টে হাজির ছিলেন। সে প্লেন আকাশে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরত রানওয়ের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আজান দিলেন। সময়টা কোনও নামাজের আসন্নকাল নয়। আজানটা প্রতীক; "আফগানিস্তান থেকে কুফ্‌রের শেষ চিহ্ন ঝেঁটিয়ে বের করা হল।" আমার ভালো লাগেনি।

সেই প্যাটার্নের পুনরাভিনয় হল চুয়াল্লিশ বৎসর পর। সদ্‌র দাউদ সিংহাসনচ্যুত জহির পরিবারের অধিকাংশ জনকে প্লেনে করে বিদেশ চলে যেতে দিয়েছেন। বিবেচনা করি, এবারে কোনও আজানধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। এই যা তফাৎ। এই তফাৎটুকু থাকাতেই 'পরিবর্তন'টা চোখে আঙুল দিয়ে 'অপরিবর্তনীয়ে'র দিকে নির্দেশ দিল। প্ল্যু সা শাঁজ— ইত্যাদি।

রিপাব্‌লিক!

বাংলাদেশ-ভারত উভয়ই দাউদি সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন— আপনার-আমার বলবার আর কী থাকতে পারে, কিন্তু ওই রিপাবলিকের ঢেঁকিটা গিলতে আমি অক্ষম এবং অনিচ্ছুক। বলা নেই, কওয়া নেই, কাবুলির সেই কাঁঠাল-খাওয়ার কাহিনী থেকে কাঁঠাল বের করে অকস্মাৎ আমার মাথায় ফাটানো! কবেকার সেই ১৯৩০-৩১ থেকে অদ্যাবধি কেউ তো কখনও রিপাবলিকের কথা পাড়েনি। সরদারদের সবাইকে জিরোতে দিয়ে রাজা জহির যখন খানদানি ফিউডেল ঐতিহ্য ভঙ্গ করে গেরস্তঘরের ছেলে ডক্‌টর ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রী করলেন তখন তো রাজা দেশটাকে গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন— কই, তখনও তো কেউ রিপাবলিকের কথা তোলেনি। দাউদও ইউসুফকে মদ দেবার তরে হিন্দুকুশ উত্তোলন করেননি। তিনি উষ্মাভরে গোসসা ঘরে ঢুকে খিল দিলেন— গোড়াতে। পরে কী কী করলেন সেইটেই তো বিশ্ববাসী জানতে চায়। জানবে নিশ্চয়ই, একদিন।

রিপাবলিক, জম্‌হুরিয়া যে নামে খুশি ডাকুন, পুরনো সেই হুঁকোটা এখন অবধি সেই ডাবা-হুঁকোটাই রইল।

শ্রাবণ হয়ে এল ফিরে

হঠাৎ শেষরাত্রে নামল আধো-আধো বৃষ্টি— রিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌। সঙ্গে সঙ্গে পুরবৈয়া হাওয়া জানালার পর্দাটাকে যেন নৌকোর ঝুলে-পড়া পালটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে করে দিল পূর্ণাঙ্গী। মাঝে মাঝে বারিপতন ক্ষান্ত দিচ্ছে, কিন্তু পুরবৈয়া হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ সমুদ্র থেকে, তরঙ্গিত নদীধারার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলায় দোলায় যে-বাতাস উত্তর পানে পাড়ি দিয়েছে মানস সরোবরের তীর্থ-যাত্রায়— সে আমারই বাড়ির এক কোণে বেণুবনে পুরবৈয়া হাওয়াকে, গত বর্ষার দীর্ঘ বিরহের পর ঘন ঘন আলিঙ্গন করছে। বেণুবনের পাতায় পাতায় মৃদু কূজন-গুঞ্জন-মর্মর আমার মর্মে যেন বিলোল হিল্লোল তোলে ক্ষণে ক্ষণে। দক্ষিণ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল মৃদু মৃদু, ভয়ে ভয়ে, কবে সেই শীতের শেষে। হিমালয়ের হিমানী মাখা

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর শীতল উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই দিতে গিয়ে সে ভীরু হার মেনেছিল প্রথম অভিযানে— হুহু করে আবার দীনদরিদ্রের সর্বাঙ্গে কাঁপন তুলে ধেয়ে গিয়েছিল উত্তরী-হাওয়া দক্ষিণ থেকে দক্ষিণতর দিকে, যেন পলাতক দখিন হাওয়ার বর্জিত রাজ্যে সম্মার্জনী সঞ্চালন করতে করতে। দখিন হাওয়া কিন্তু মনে মনে সান্ত্বনা মানে; জানে, একা সে-ই ভীরু নয়, তার চেয়েও ভীরু আছে, একটি ক্ষুদ্র পুষ্প-মাধবী। উত্তরের বাতাসকে শেষ অভিযানে সম্পূর্ণ পরাজিত করে আবার সে যখন বনে বনে আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ডালে ডালে তার বিজয়পতাকার কুসুম-কুসুম গরম পরশ বুলিয়ে দেবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে পারুলপলাশ পারিজাত, করবী দেবে সাড়া, বকুল পাবে ছাড়া, শিরীষ উঠবে শিউরে, চমকি নয়ন মেলি চামেলি রইবে তাকিয়ে, অপলক দৃষ্টিতে। তবু ভীরু মাধবীর দ্বিধা যায় না, দখিন পবনের প্রতি-বিজয় অভিযানের পরও আঙ্গিনায় এসে যেন থমকে দাঁড়ায়— কিন্তু ওই ভীরুটি, ওই শঙ্কিতা-হিয়া কম্পিতা-প্রিয়া না এলে তো উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গেয়ে ওঠে সবাই সমস্বরে :

> হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
> আসিবে কি ফিরিবে কি—
> আঙ্গিনাতে বাহিরিতে
> মন কেন গেল ঠেকি ॥

দেখেছি দেখেছি, সব দেখেছি যুদ্ধশেষের প্রথম বসন্তে।

দখিন বাতাস বসন্তে ঘুরে মরে একা একা। তার পর আকাশের গুরু হয় গুরু গুরু— গ্রীষ্মের দহন দাহ সাঙ্গ হয় যখন। নেমে আসে বারিধারা আর তখন বায়ু বয় পুরবৈয়া। দুই পবনে ওই বেণুবনে হয় তাদের পুনর্মিলন।

অমা যামিনীর অন্ধকার। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে আর কোনও শব্দ নেই— শুধু মৃদু ঝর্ঝরে ক্ষণে ক্ষণে বরিষণ— রিম ঝিম রিম ঝিম। কখন যে বর্ষণ শান্ত হয় বুঝতে পারিনে। বাঁশের পাতার ভিতর দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণের বাতাস তোলে একই মর্মরধ্বনি। এবারে এসে দেখি প্রতিবেশী তাঁর অশত্থগাছটাকে কেটে ফেলেছেন। অশত্থের পাতা বাতাসে অতি সামান্য আভাস পেলেই আমাকে শোনাত সারা দিনমান যেন ঝরনার গান। বাঁশবনের চেয়েও তার পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে থরথর কম্পন দিয়ে ক্ষীণ বরিষণ ধ্বনির অনুকরণ করে রুদ্র তৃষা-তপ্ত বৈশাখের দ্বিপ্রহরে, নিদ্রাহীন ত্রিযামা যামিনীতে পীড়াতুর জনকে ওই অশত্থ অকারণ ছলনা দেয় বার বার। এখানে নয়, বীরভূম, ছাপরা, আগ্রা-দিল্লিতে যেখানে দিনের পর দিন পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল কাটে তাম্রসম বিবর্ণ আকাশ-বাতাসের মাঝখানে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে নিরম্বু নিরাশায়— তার পর আসে ধূসর পয়োধরহীন আষাঢ়, জনপদবধূ তাকিয়ে থাকে মায়ামমতাহীন দিকচক্রবালের দিকে, আসে শ্রাবণ— কোথায় সে বিরহী যক্ষের মেঘ-শ্রেণি যার দাক্ষিণ্য কঠিন পাষাণপ্রায় অম্বরকে মধুর মেদুর করে দেবে?— এমন সময় বাতায়নপাশে, মৃদু পবন যখন অশত্থ-পল্লবে মর্মরধ্বনি তুলে বর্ষণের ঝিরিঝিরি রব অনুকরণ করে ধ্বনি-মরীচিকার নিষ্ঠুর মোহজাল পেতে কাতরজনকে ছলনা করে, তখন কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা আসে স্মরণে, তার পরিপূর্ণ রুদ্র অর্থ নিয়ে—

www.pathagar.com

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।"

থাকুন দিল্লি, আগ্রা, দূরেই থাকুন তাঁদের বিরাট সৌধ বিপুল বৈভব নিয়ে। আর, আর ওই 'মিথ্যা বিশ্বাসের বিচিত্র ছলনাজাল' নিয়ে। আমার এখানে, এই নির্ধন দেশে, সেই সুধাধারা আবার আসুক, আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, এসো বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।

আর আমার দুই আঁখি যাক হারিয়ে সজল ধারায় ওই ছায়াময় দূরে, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে, ভরা গাঙ্গের কূলে কূলে, দেশ থেকে দেশান্তরে, হয়তো-বা জরাজীর্ণ এ জীবনের শেষপ্রান্তে।

ওই নেমেছে; এবারে কিন্তু ঝমাঝম বিষ্টি। বিষ্টি আর বিষ্টি। বেণুবন-মর্মর, ছিন্ন কদলীপত্রের ঝর্ঝর সব ছাপিয়ে দিয়ে। এবারে আর কোনও ছলনা নয়। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ-ভারে নুয়ে পড়া আকাশ নীরন্ধ্র অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়নি। আমারই মতো নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে রাজপথের যামিনী-জাগরিণী দিবান্ধ প্রদীপমালার বিচ্ছুরিত জ্যোতি আকাশের নিম্নপ্রান্তে আতাম্র আরক্ত মৃদু প্রলেপ দিয়ে আলোকিত করে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে দূর ভিন গাঁয়ে আগুন লাগলে যে রকম তার লালচে আভা পশুপক্ষীর প্রাণেও আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

হ্যাঁ, আতঙ্ক। হিটলারও এই রকমেরই এক অনৈসর্গিক চন্দ্রালোকের বিবরণ শুনে শঙ্কাতুর কণ্ঠে শুধিয়েছিলেন, 'কৃত্রিম চন্দ্রালোক? সে আবার কী?'

নিত্যদিনের প্রথানুযায়ী দ্বিপ্রহরে সামরিক মন্ত্রণাসভার দিবসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম-উত্তর রণাঙ্গনে মন্‌ট্‌গমেরি তখন হল্যান্ডের ভিতর দিয়ে হামবুর্গ পানে এগোচ্ছেন। সে রণাঙ্গনে শত্রু-মিত্রের অগ্রগতি, পশ্চাৎ অপসারণ, তাদের বর্তমান ঘাঁটি ইত্যাদি সর্বশেষ প্রতিবেদন বলে যাচ্ছেন বিরাট ম্যাপে অঙ্গুলি নির্দেশ করে করে আঞ্চলিক অ্যাদদাকাঁ। বলতে বলতে তিনি উল্লেখ করলেন, 'অতিশয় অন্ধকার রাত্রি। এ রাত্রে মন্‌ট্‌গমেরির পক্ষে আক্রমণ করা অসম্ভব। হঠাৎ বিরাট রণাঙ্গন আলোকিত হল কৃত্রিম চন্দ্রালোকে—'

বিস্মিত হিটলার অ্যাদ্-এর কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে শুধোলেন, 'কৃত্রিম চন্দ্রালোক! সে আবার কী?' ধূম্রজাল, কুয়াশা বহুকাল ধরে রণ-কৌশলে সুপরিচিত কিন্তু কৃত্রিম চন্দ্রালোক!

অ্যাদ : "পূর্বেই বলেছি, রাত্রি ছিল অত্যন্ত অন্ধকার। অমাবস্যার রাত্রেও নুয়ে-পড়া রাশি রাশি মেঘ না থাকলে নীরন্ধ্র অন্ধকার সৃষ্ট হয় না। মেঘগুলো ছিল তুষারধবল। মন্‌ট্‌গমেরি অ্যারপ্লেন-অন্বেষণকারী সবকটা সার্চলাইট মেঘের উপর তাগ্ করতে আদেশ দিলেন। সার্চলাইটের তীব্র রশ্মি মেঘে মেঘে প্রতিবিম্বিত হয়ে অত্যুজ্জ্বল যে-আলো সৃষ্টি করল সেটা মেঘমুক্ত পূর্ণিমার মতো।"

এখানে বর্ষা নামে তার ঘনতম ঘনাবরণে। মাঝে মাঝে পশ্চিম থেকেও বৃষ্টি আসে— সে বৃষ্টি অতিদূর আরবসাগর থেকে বেরিয়ে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে দুর্বল হয়ে যায়। তাই বিরহী যক্ষ যে-রামগিরি জনকতনয়ার স্নান-পুণ্যোদকে অভিষিক্ত হয়েছিল তারই উপরে দাঁড়িয়ে মেঘপুঞ্জকে অনুরোধ করেছিল, 'আমার বিরহবার্তা নিয়ে তুমি, হে মেঘ, অলকায় গমন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর। কিন্তু আমি জানি, তুমি দয়াশীল, দাতা। যেসব ভূখণ্ডের

www.pathagar.com

উপর দিয়ে তুমি ভেসে যাবে সেগুলো নির্মম গ্রীষ্মের অত্যাচারে বিবর্ণ শুষ্ক দগ্ধপ্রায়। কাতর নয়নে জনপদবধূ ঊর্ধ্বে তোমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে, বারিধারা ভিক্ষা চেয়ে। আমার অনুরোধ, নিজকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ কর না, বিরহিণী প্রিয়াকে আমার সন্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত।'

যে শ্যামাম্বুরাজি যক্ষের কাতরতা শুনতে পায়নি তারা অলকার দিকে না গিয়ে মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, রাঢ়ভূমিতে বিগলিত আত্মদান করতে করতে যখন দীর্ঘ যাত্রাশেষে এই পুণ্যভূমিতে পৌঁছয়, তাদের সঞ্চয় সেকালে প্রায় নিঃশেষ! কিন্তু, ভো ভো বর্ষণ-ক্লান্ত মুসাফির! আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট। যৎ অল্পং তদ্ মিষ্টং। তোমার পদধ্বনি পূর্বাঙ্গণে, পূর্বদেশে নন্দিত হোক।

ওই, ওই যে বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে, আঁচলখানি দোলে। বাতাসে বাতাসে বর্ষণসিক্ত সজলভরা কণ্ঠে ভেসে আসছে ভোরের আজান। সাধ যায়, এই বর্ষণমুখরিত নগরীর উপকণ্ঠ পেরিয়ে দেখে আসি, বুড়িগঙ্গায় কতখানি জল বাড়ল।

না, আমাকে কেউ যেতে দেবে না। এ বয়সে। বয়সের শেষে।

মনে পড়ল এক জাপানি কবির করুণ শেষ প্রশ্ন। ক্ষয়রোগে তিনি যাত্রার শেষপ্রান্তে প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল, প্রতি বৎসর বাতায়নপাশে বসে অবিরল বরফপাত দর্শন। বরফ জমে উঠছে, মাঠে-ঘাটে-বাটে, জমে উঠছে, জমে উঠছে। তিনি দেখছেন, আর দেখছেন।

কিন্তু এবারে তুষার-বর্ষণ দর্শনার্থে তাঁর বিছানাতে উঠে বসাও কঠিন বারণ। মাঠ-বাট দেখতে পাচ্ছেন না। জাপানি তিন কলির হাইকাই পদ্ধতিতে রচা তাঁর শেষ কবিতা রেখে গেছেন তিনি :—

শুধায়েছি বার বার, কত বার!
হায়, শুধু প্রশ্ন— এ আমার,
এবারেতে কত উঁচু হয়েছে তুষার?

হাউ অফটেন,
হ্যাভ আই আসক্ট
হাও হাই ইজ দি স্নো ??

ডানপিটে দুঁদে

একাধিকবার পরাজিত হয়ে জহির উদ্-দীন মহম্মদ বাবুর মনস্থির করলেন, আপন পিতৃভূমি ফরগনা 'পীর মানে না দেশে দেশে, পীর মানে না ঘরের বউয়ে', নীতি অবলম্বন করে তাঁর প্রকৃত মূল্য নিতান্তই যখন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না, তখন ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তর অভিযানই প্রশস্ততর। এ-যুগে কিন্তু, কি তুর্কমানিস্তান, কি আফগানিস্তান সর্বত্রই ভাগ্যান্বেষণকারীর সংখ্যা কমে আসছে। তার প্রধান কারণ, সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে যে গুণটি মাত্রাধিক, অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন তার নাম আত্মবিশ্বাস। এ যুগের সবচেয়ে নামকরা এডভেনচারার আডলফ হিটলারের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক, কূটনৈতিক, সংগ্রামবিদ, মনস্তাত্ত্বিক, অতিশয় সীমিত সংখ্যক তাঁর অন্তরঙ্গ জন অ্যাদ্-দকাঁ সেক্রেটারি স্টেনো পরিচারক ভ্যালে— এমনকি তাঁর বৈরীকুল পর্যন্ত এক বাক্যে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন সেটি তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর অবিচল সদাজাগ্রত প্রত্যয় ছিল, নিয়তি (প্রভিডেন্স) তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, জর্মনির ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। পরাজয়ের পর পরাজয়, পুনরপি পরাজয়,— তথাপি তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং সর্বশেষ সংগ্রামে তিনি বিজয়ী হবেনই হবেন প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলছিল তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ, নিত্য সহচরগণ বিস্মিত অবিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, তাঁর কল্পনাপ্রসূত স্বকৃত অনৈসর্গিক আত্মবিশ্বাসের এই ইন্দ্রজাল। বস্তুত তিনি ঠিক কোন মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন সেটা চিরকালই অভেদ্য রহস্য থেকে যাবে।.... জহির উদ্-দীন বাবুরের আত্মবিশ্বাস হিটলারের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। কিন্তু বাবুরের সহচরদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাসের প্রতিনিয়ত বর্ধমান দার্ঢ্য লিপিবদ্ধ করার মতো লিপি-কৌশলী কেউই ছিলেন না, অপরঞ্চ বাবুর অতিশয় সযত্নে রোজ-নামচার মাধ্যমে তাঁর আত্মজীবনী রেখে গিয়েছেন; ওদিকে হিটলার এ ধরনের 'অপকর্ম' রীতিমতো বিপজ্জনক বলে মনে করতেন এবং তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা একান্ত একা-একাই করে, সফলতা কামনা করতে পারে একমাত্র সেই-ই।"

দলপতি মাত্রই আর্টিস্ট

এইসব এডভেনচারারদের সম্বন্ধে এতখানি সবিস্তর লেখার কারণ এই যে, পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় এ ধরনের লোক এখনও লুপ্ত হননি। এঁদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল হতে হলে এঁদের ক্রমবিকাশ লক্ষ করতে হয়। এডভেনচারার হওয়া মাত্রই এঁদের সর্বপ্রথম কর্ম হয় সাঙ্গোপাঙ্গ জোগাড় করা। ঐতিহাসিক মাত্রেরই বিস্ময়ের অবধি নেই, চব্বিশ বছরের 'অপদার্থ' যে-ভ্যাগাবণ্ড স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে ম্যুনিকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে পূর্ববৎ আশ্রয়-সম্বলহীন ট্র্যাম্প, সে কী করে তার চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে হরেক রঙের চিড়িয়া জোগাড় করে ফেলল? এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর ছিলেন সে যুগের দুই নম্বরের জঙ্গিলাট জেনারেল লুডেনডর্ফ। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আমরা যে 'আত্মবিশ্বাস' নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই তারই বাহ্য প্রকাশ। এখানে দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষীকে আর্টিস্টরূপে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। আর্টিস্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঋষি তলস্তয় বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন অনুভূতি অন্যজনের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে সে আর্টিস্ট।" হিটলার তাঁর আত্মবিশ্বাস যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির নর-নারীতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত করবার মতো অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন সে সত্য তাঁর নিকটবর্তী প্রচ্ছন্ন শত্রুরা পর্যন্ত নিরতিশয় ক্ষোভ ও উষ্মার সঙ্গে স্বীকার করেছেন..... বাবুরের সে টেকনিক বিলক্ষণ আয়ত্তাধীন ছিল, তদুপরি ভাগ্যান্বেষণের অরুণোদয় থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হয়েছে। অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রণাঙ্গনে যেখানেই সঙ্কটময় অবস্থা সেখানেই তিনি নির্ভয়ে

www.pathagar.com

তীরবেগে উপস্থিত হয়েছেন, যে কারণে একাধিক পরাজয়ের পরও দূরদর্শীজন তাঁকে পরিত্যাগ করেনি।

সাবধান! ভেজাল চিনে নেবেন!

অদ্যকার ভুট্টো, ইরানের শাহ্— বাবুরের তুলনায় শিশু। নিতান্তই যোগাযোগ এবং হতবুদ্ধি মজ্জমান জুন্তার শেষ ত্রাণ-তৃণ-খণ্ডরূপে প্রথম জনের কর্তৃত্ব লাভ, দ্বিতীয়জনও দ্রুতবেগে পলায়নের পর অবশেষে রুশের সদয় নিরপেক্ষতা ও ইংরেজের প্রতি নতিস্বীকার, এই দুই গ্রহের যোগাযোগের ফলে আপন পূর্ব সত্তায় প্রত্যাগমন। আমার মন লয়, কৈশোরে চতুরঙ্গ খেলায় গজচক্র অশ্বচক্র বড়েচক্র পুনঃপুন ঢেঁকিবৎ ভক্ষণ করার পর, আপন আপন দেশে যখন গেলবার মতো আর কোনও ঢেঁকি কোনও চাষিবউই তামাশা দেখবার তরেও দিতে রাজি হল না, তখন দু জনাই সহজতর কূটনীতি-চতুরঙ্গ-অঙ্গনে রঙ্গ-ব্যঙ্গে সঙ্গ দিলেন। — একে অন্যকে।

নিক্সন আর পাঁচটা ভুঁইফোড় মার্কিনের মতো 'খানদানি মনিষ্যিদত্ত' বাদশাহি হাতের পিঠ চাপড়ানোটা পাবার তরে হামেহাল বড্ডই ছোঁক ছোঁক করেন। তদুপরি, আড়াই-তিন হাজার বছরের প্রাচীনস্য প্রাচীন রাজসিংহাসনে আসীন— জানিনে, হয়তো কুল্লে দুনিয়ার প্রাচীনতম মনার্কি, যদ্যপি বর্তমান শাহটির পিতামহ-প্রপিতামহের প্রস্তাব তুলছিনে— সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলে শাহ-ইন-শাহের অনুগতজন অকস্মাৎ সাময়িক স্মৃতিস্তম্ভন বা আংশিক বধিরতায় আক্রান্ত হন। সর্বোপরি প্রশ্ন, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পেহলভি (সংস্কৃতে পহলবি) খেতাব হঠাৎ করে ভুড়ভুড়ি দিয়ে উঠল কোন রসাতল থেকে? একদা যেরকম তারই অক্ষম অনুকরণে গওহরি মহিমায় আড়াই-তিন হাজার বছরের পুরনো গান্ধার (প্রাচীন পেশাওয়ার-জালালাবাদ অঞ্চল) ফান্দার আমাদের মতো গাঁইয়া বেকুবদের চমক লাগবার তরে মরা লাশে ভূতের মতো চাড়া দিয়ে উঠেছিল? এর খাতিম উল্-খিতাব হয়, যদিস্যাৎ অকস্মাৎ সদর-ই আলা ভুট্টো তাঁর এলাকার পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষীয় মোন-জো-দড়োর বলদ-মার্কা সিল সেঁটে কিছু একটা পাঁচহাজারি মনসব তলব করে তাবৎ পাপী-তাপী পাকিজনকে শরিফ উল্-আশরাফ খানদানে তুলে নেন।

প্রাণনাথ ডাকো

শ্রুতিধর পাঠক! অস্বীকার করতে পারবে না, এইমাত্র সেদিন আমি তোমাকে ফেয়ার ওয়ার্নিং দিয়েছি, গুলতানি না করতে পারলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এবং আফসোসের কথা, বর্তমান গুলটি খুব সম্ভব তোমার ন সিকে চেনা। কিন্তু পাঠক, আমরা সব্বাই চেনা জন, চেনা জিনিসকেই কি বেশি পছন্দ করিনে? মেলায় গিয়ে চেনা জনের মুখ খুঁজি, অচেনা লাইব্রেরিতে ঢুকলে তার দাম যাচাই করি চেনা বইয়ের সন্ধান নিয়ে, গোরস্তানে খুঁজি মরহুমদের চেনা নাম। তবু অতি সংক্ষেপেই সারছি। বাঙ্গাল গেছে শেয়ালদ বাজারে ঘটির তরকারি পট্টিতে।

www.pathagar.com

'বাইগনের সের কত?' ঘটি হেসে কুটি কুটি। 'বাইগন! কী কইলে মাইরি!' বাঙ্গাল— চটিতং : 'ক্যান, কইছি তো কইছি, অইছে কী?' ঘটি : 'ছোঃ! কিবা নাম, বাইগন! বেগুন— আহা, কী মিষ্টিই না শোনায়!' বাঙ্গাল— উচ্চহাস্যে : 'হঃ! মিষ্টি নামেই ডাকবা তয় 'প্রাণনাথ' ডাকো না ক্যান? স্যার কত প্রাণনাথের? ডাঙ্গর ডাঙ্গর প্রাণনাথ গুলাইন?'

শাহ্, গওহর, গদ্দিটা আরেকটু দড় হলে মিস্টার ভুট্টোও— সবাই এ নীতিতে আমাগো 'প্রাণনাথ নীতি'র প্রবর্তক প্রাণনাথ বাঙ্গালের অতিশয় অনুগত বশংবদ শাকরেদ। 'খানদানি খেতাবই যদি লইবা, তয় লওনা কইলজাডা ভইরা পুরানার পুরানা, হিডারও পুরানা খানদানি খেতাব।' হিটলারও বলেছেন, 'মিথ্যে যদি বলতেই চাও তবে পাতি মিথ্যে বল না। বল পাঁড় মিথ্যে— ইয়াব্বড়াবড়া কেঁদো কেঁদো মিথ্যে। মিথ্যেটা যত বিরাট কলেবর হবে, পাবলিক গিলবে সেটা তত সহজেই।'

নিক্সন শাহ-এর মেহেরবানি পেয়ে বে-এক্তেয়ার। কোন্ চাঁড়াল বামুনের হাতে দৈবযোগে পৈতে পেলে— বুদ্দু জানবে কী করে, বিটলেটা খাঁটি নদীয়ার মাল, না জিঞ্জিরা-মার্কা ভেজাল— উল্লাসে নৃত্যভরে ধানের মরাই খুলে দেয় না। অবশ্য নিক্সনের মুক্ত হস্তে ট্যাঙ্ক, প্লেন ঢালার অন্য কারণও আছে। কিন্তু তাঁর গোড়ার গলদ, শাহকে একটা মস্ত বড় এডভেনচারার বলে ধরে নেওয়া।... বরঞ্চ সদর দাউদের যা-হোক তা-হোক একটা ক্যালিবার আছে। লোকটি এডভেনচারার এবং গ্যামবলার। অসম্ভবের আশায় তিনি সম্ভাবনীয়টাকে বাজি ধরতে রাজি আছেন।

ঐতিহাসিক দাবি

এবারে আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা কোনও ঠাণ্ডা-মগজের লোক বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু যে সত্য আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, যে সত্যের সমর্থন আমি দীর্ঘকাল ধরে পেয়ে এসেছি সেগুলো এই দাউদ-সুবাদে আমাকে বলতে হবে। বিশ্বাস না করলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।

(১) ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে আফগান স্বাধীনতা দিবসে (জ্শ্ন্-এ) জনগণ তথা কাবুলস্থ সর্ব রাজদূতের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য গণসভায় আমান উল্লা ঘন ঘন করতালি হর্ষধ্বনির মাঝখানে নানা কথার মাঝখানে সদম্ভে সগর্বে বলেন, "সিকন্দর শাহ্ পাঞ্জাব জয়ের পর বিরাট ভারত দখল না করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করল কেন? কারণ, আমরা— আফগানরা— তার 'লেজ কেটে দিয়েছিলুম' বলে", অর্থাৎ আফগানরা আলেকজান্ডারের লাইন অব কম্যুনিকেশন কেটে দিয়েছিল! বিগলিতার্থ : আফগান জাত সিকন্দর-বিজয়ী।

(২) আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস কোনও আফগান লিখেছেন কি না জানিনে। যে অর্বাচীন ইতিহাস কাবুলের স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় তার পনের আনা, ভারতের গবেষণা-জাত, ভারতে লিখিত ইতিহাস থেকে আফগানাংশ কেটে বের করে, আফগান জাতির গৌরব-গরিমা শতগুণ বৃদ্ধি করে স্থূল হস্তে প্রলেপ লাগানো দম্ভোক্তি।

(৩) সাধারণ আফগান নিরক্ষর। কাবুল-কান্দাহারের স্কুলবয় 'সে ইতিহাসের' দু পাতা পড়ে বিশ্বাস করে, ভারতে ইংরেজাধিকার না হওয়া পর্যন্ত ওই ভূখণ্ড ছিল আফগানিস্তানের

www.pathagar.com

কলোনি, জমিদারি— যা খুশি বলতে পারেন। মোদ্দা কথা : মুহম্মদ ঘোরির আমল থেকে, বিনয় যাদের ভূষণ নয়, তাদের মতে গজনির মাহমুদের কাল থেকে ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত আফগানিস্তান হিন্দুস্থানের ওপর রাজত্ব করেছে, সাতশো, মতান্তরে হাজার বৎসর ধরে। হ্যাঁ, কোনও কোনও আফগান রাজা দিল্লি-আগ্রায় কিছুকাল বাস করছেন বটে। যদি বলা হয়— আর বলবেই-বা কোন্ উন্মাদ— বাবুর তো তুর্কোমান, তিনি তো পাঠান বা আফগান নন, তবে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সরল উত্তর : বাবুর ছিলেন কাবুলের রাজা। সেই কাবুল-রাজ দিল্লি জয় করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় আদেশ দেন, তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর 'রাজধানী' কাবুলে গোর দেওয়া হয়। এর পর আর কী প্রমাণ চাই? বাবুর যে কাবুলের রাজা ছিলেন, সেটা তো তর্কাতীত! পরের মীমাংসাগুলো প্রথম সিদ্ধান্ত থেকে পিল পিল করে বেরোয়।

(৪) ইংরেজ কর্তৃক ভারত শাসন একটা অতি আকস্মিক অতিশয় সাময়িক দুঃস্বপ্ন মাত্র। আফগানিস্তান পুনরায় তার হক্কের উপনিবেশ জয় করবে। ঘোরি, গজনবি, লোধি (লোদি) এ সব কওম, তাদের বাসভূমির নাম, এখনও কাবুলে নিত্যদিনের কাজকর্মে কথাবার্তায় ফিরে ফিরে আসে; হিন্দুস্থানে এসব ইতিহাসের শুষ্কপত্রে মুদ্রিত নামমাত্র। সরকারিভাবে প্রচারিত পাকিস্তানই-বা কি, আর ভারতই-বা কি, আর বাংলাদেশই-বা কি? আসলে সবকটা মিলে ওটা অখণ্ড হিন্দুস্থান (ভারতের কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এতচ্ছ্রবণে অবশ্যই নিরতিশয় উল্লাস বোধ করবেন!)। সেইটে আমাদের প্রাপ্য।

(৫) সরদার দাউদ খান কাবুলের ওয়ারিসানের এই 'অতিশয় সীমিত বিনয়ভরে' দাবি-দাওয়ায় কতখানি বিশ্বাস করেন, জানিনে, কিন্তু তিনি যে-দশ-বৎসর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় স্বাধীন, বিকল্পে আফগানিস্তানের প্রদেশরূপে পখতুনিস্তান এবং পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে করাচি অবধি করিডরের (পুরোপাক্কা সরকারি ওয়ারিসানসূত্রে) পুনঃপুন দাবি জানিয়ে তথাকথিত ইতিহাসপুষ্ট স্কুলবয়দের ড্যাম ফেভরিট হয়েছিলেন সেটা সর্ববাদীসম্মত। সে-সব বয়-রা এখন 'ইসটুডিনট' এবং ফৌজি 'আপিসর'— এরাই নাকি দাউদের প্রধান সহায়ক।

আমি জানি, আসমুদ্রহিমাচল আফগানের এই দাবি, গৃহে প্রত্যাবর্ত আবুহোসেনের তখ্‌ৎ দাবির মতো বুদ্ধির অগম্য, হাস্যস্কর বলে মনে করবে। তা হলে স্মরণ করিয়ে দিই প্রায় একশো বছর ধরে তৎকালীন ভারত-রাজ ইংরেজের সমুখে কাবুল-রাজ কখনও লাহোর-মুলতান, কখনও পেশাওয়ার-আটক্ অবধি দাবি করেছেন। ইংরেজের কাছে তখন ঠিক আজকের মতো ওই রকম 'দাবি' বুদ্ধির অগম্য হাস্যস্কর বলে মনে হয়েছে।

আর সত্যি বলতে কী, কোন্ দেশে এ ধরনের দাবিদার একদম নেই? তারতম্য শুধু সংখ্যাতে এবং দাবির চৌহদ্দি নিয়ে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমরা বুক ফুলিয়ে গিয়েছি, এখনও যে একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি তাই-বা কিরে কেটে বলি কোন হিম্মতে—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়!"

হেলায়!!

www.pathagar.com

হাইকোর্ট দর্শনস্য দর্শনং

"বাঙ্গালে"র হাইকোর্ট দর্শনের তবু একটা অর্থ আছে। কিন্তু যখন ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে মার্কিন-বাঙ্গাল কলকাতা বা কাবুলের হাইকোর্ট দর্শনে যায় এবং সেখান থেকে দারুণ দারুণ রগরগে রিপোর্ট পাঠায় তখন 'বাঙ্গাল'কে তসলিম জানাতে ইচ্ছে করে।

পূর্ববঙ্গবাসী একশো বছর ধরে জানত, নোয়াখালি বা সন্দ্বীপের সুদূরতম প্রান্তেও যদি খুন হয় এবং সদরের দায়রা-আদালতে যদি আসামির ফাঁসির হুকুম হয়, তবে সে হুকুম কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মঞ্জুরি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ঝুলতে হয় না। রাঢ়ের তুলনায় পূর্ব বাংলার গ্রামবাসী একটু বেশি গরম মেজাজের হয়, তার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশি টনটনে। উচ্চশিক্ষিত শান্তিকামী নাগরিক এটাকে স্থলবিশেষে হিংস্র বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমার মতো শক্তিহীন অর্থদীনকে দেশ-বিদেশে এত লাঞ্ছনা অবমাননা সক্ষোভে সহ্য করতে হয়েছে, এবং হচ্ছে যে, সে রগচটা বাঙ্গালের ধৈর্যচ্যুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সখা সুপক্ক বংশদণ্ডের অনুসন্ধান দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং অতি অবশ্যই তার মঙ্গল কামনা করে। সে কথা থাক। অতএব খুন-খারাবি দেখে দেখে অপেক্ষাকৃত অভ্যস্ত মিম্বর উল্লা বা গদাই নমশূদ্র পাকেচক্রে যখন কলকাতা যায় তখন যদি সে সেই ভবনটি দেখতে চায় যার গর্ভগৃহে প্রতিদিন স্থির করা হয়, কে ঝুলে ঝুলে লম্বমান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করবে আর কে-ই-বা রোগশয্যায় মা-ধরণীর বক্ষ থেকে সমান্তরাল রেখাবৎ বিদায় নেবে, তখন আমি গাঁইয়া আশ্চর্য হব কেন? শহুরে কলকেত্তাই ব্যাপারটা আদৌ বুঝতে পারে না, কারণ তার সীমাসরহদ্দের ভিতর তার অতি সুদূর ক্ষীণ পরিচিতজনের কাউকে কণ্ঠদেশে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় লম্ববান দেহে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়নি কিংবা সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়নি। সে হাইকোর্টের মর্ম বুঝবে কী করে? তাই হাইকোর্টের প্রতি 'বাঙ্গালে'র গভীর শ্রদ্ধা, তার দর্শন-লাভ তীর্থ-দর্শনের সমতুল্য বিবেচনা করাটা নিয়ে ঘটি ঠাট্টা-মস্করা করে!... ঢাকাতে যখন হাইকোর্ট নির্মাণ আরম্ভ হয়, তখন আমার কী উল্লাস, কী নৃত্য! আমি তখন কর্তাব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ উপরোধ করি— অবশ্য ফোন মেরামতির নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি পর্বতপ্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ নস্যবৎ— আমাদের হাইকোর্টটিকে যেন কলকাতার তুলনায় লাগসই জুৎমাফিক বেশ খানিকটে উচ্চতর পর্যায়ে রূপায়িত করেন— যাতে শ্যামবাজারের রকে বসে ঘটিদের সগর্বে আদেশ দিতে পারি, ঢাকা গিয়ে সেথাকার হাইকোর্ট দর্শনজনিত অশেষ পুণ্যার্জন করতে পারে! কেউ শুনল না আমার 'উচ্চাদর্শে'র প্রস্তাবটি! শুনলে কী হত? ওই যে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ হুদো-হুদো ইন্ডিয়ান সেপাই হেথায় এসেছিল তারা আমাদের হাইকোর্ট দেখবার তরে মাথা উঁচু করতেই— দ্যাখ-তো-না-দ্যাখ— তাদের টুপি, পাগড়ি এস্তেক মন্টিতক মস্তকচ্যুত হয়ে গড়াগড়ি যেত না? যে দু চারটি শেষ কুট্টিবেরাদর এখনও লিকলিক করে বেঁচে আছে তারা সরেস সরেস গণ্ডাদশেক মস্করা-কিসসা বানিয়ে টেরচা নয়নের বাঁকা টিটকিরি কেটে আপন জীবন ধন্য মেনে, স্বয়ং আপন জানাজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কুট্টি বংশের শেষ প্রদীপটি ফুঁ মেরে নিভিয়ে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে পুলসিরাত পেরিয়ে যেত না? শুনতে পাই, কলকাতার লোক আজ নাকি আমাদের হ্যানস্তা করে। করবে না? দাসীর কথা বাসি হলে ফলে। তখন যদি হাইকোর্টটা উঁচু করে বানাত তবে— যাক গে।

www.pathagar.com

মার্কিন খট্বাঙ্গ ভুটাঙ্গ পুরাণ

কড়ি আছে মার্কিনের। পয়লা ধাক্কাতেই তাঁরা হাজির হয়েছেন কাবুলে— হাইকোর্ট দেখতে। ঝটপট একাধিক রিপোর্ট ভি তেনাদের কাগজে বেরিয়েছে। কুল্লে এক দফা চোখ বুলিয়েই পুনরায় সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলুম, পৌনঃপুনিক 'পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয়' খুদা-দাদ আফগানিস্তানের জিন্দাবাদ শহর-ই আলা কাবুল। অর্থাৎ কাবুল তথা আফগানিস্তান আপাতদৃষ্টিতে যতই পরিবর্তিত বলে মনে হোক না কেন, একটু ঘষলেই উপরকার গিল্টি উপে যায়, আর বেরিয়ে পড়ে আসল দস্তা— খাজা মাল। তুলনা দিয়ে চোখের সামনে আনি, ফরেন মিনিস্টার ভুট্টো, হঠাৎ আইয়ুবের বিরুদ্ধে তাঁর চেল্লাচেল্লি, "গণতন্ত্র চাই, পিপলস পার্টিই পিপল, তাদের হুকুমেই চলবে দেশ', তার পর 'অখণ্ড পাকিস্তান যে সংবিধানই তৈরি করুক না কেন (১৯৭১ শীতকাল) পিপিপি সেটা মানবে না?', তার পর ঢাকাতে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হলে 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তান ইজ সেভড', তার পর 'ভুল বলেছিলুম, এই পোড়ার দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না, চাই সর্বাধিকারসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্রাধিপত্য'— ইত্যাদি ইত্যাদি, পাঠককে আরও উদ্ধৃতি দিয়ে বেকার বিরক্ত করব না। মোদ্দা কথা, তিনি যতবার যত তরো-বেতরো ভোল পালটান, ভেক বদলান, ক্ষণে যাত্রার দলের ইয়া দাড়ি-গোঁফওলা নারদমুনি সাজেন, ক্ষণে কামিয়ে-জুমিয়ে চাঁচা-ছোলা শ্রীরাধার সাজ ধরেন, একটি ভেংচি কেটেছেন কি না কেটেছেন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন ডিকটেটর ভুট্টো, যিনি তাঁর কলোনি মরহুম পূর্ব-পাকের ওপর একদিন-না-একদিন কুলি সর্দারের ডাণ্ডা বুলোবেনই বুলোবেন। একেই বলে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলা মুরশিদ মিয়া নিক্সন। এতখানি সবিস্তর বুঝিয়ে বলার কারণ : এদানির আমার এক মিত্র, আইনকানুনে পয়লা নম্বরি খলিফে বললেন, তাঁর ঘুঘু মক্কেলরা পর্যন্ত 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' তকমাটার অর্থ সঠিক ধরতে পারেননি! এই নিয়ে তিনে কত্তি তিন, তিন দফে এফিডেভিট পেশ করা হল।

সেই ডাবা হুঁকো

মার্কিনি রিপোর্টে যে-সব মোক্ষম মোক্ষম খবরের উল্লেখ মাত্র নেই তার থেকেই আমি সত্য নির্ণয় করেছি।

"নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথা পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।"

গরুর ল্যাজটা কাটা পড়ে যাওয়ায় সেখানে যে ঘা হয়, মাছিগুলো তারই ওপর মোচ্ছব লাগিয়েছিল। মার্কিন রিপোর্টের দগদগে ঘা থেকে আমি অক্লেশে অনুমান করলুম, আদি ল্যাজটার আকার-প্রকার গড়ন-ঢং কী ছিল এবং তৎসহ যুগপৎ আরেকটি ফালতো তত্ত্ব আবিষ্কার করে বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের সম্বন্ধে বড়ই শ্লাঘা অনুভব করলুম : মার্কিনি রিপোর্টাররা নিতান্তই সস্তা মার্কিন-কাপড়; কাবুলের হাইকোর্টটা যে কোথায়, সে তত্ত্বটাও নিরূপণ করতে পারেননি।

www.pathagar.com

এনাদের এক মহাপ্রভু বলছেন, "প্রশস্ত ধূলিধূসরিত কাবুল উপত্যকার হেথাহোথা এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙাচোরা বুড়ঢা কাবুল শহর, সেই আদিকালের 'অপরিবর্তনীয়' চেহারা নিয়ে। কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে, মন। 'পরিবর্তন' এসেছে আগাপাশতলা প্রকম্পিত করে।

বটে!! কী সে যুগান্তকারী খুনিয়া পরিবর্তনটি?

"পূর্বে যেখানে ঢুলুঢুলু নয়নে আধো ঘুমে আধা-চেতন কাবুলি কাস্টমস্ কর্মচারী যাত্রীদের আধাখেঁচড়া তদারকি করে না করে হাতের অলস ইশারায় বিমানবন্দর থেকে তাদের বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিত, সেখানে" রোমহর্ষিত বিস্মিত মার্কিন বাঙ্গাল দেখলেন, "হাতে টমি-গান নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে যোদ্ধা (অশ্বারোহী কি না, বোঝা গেল না— লেখক) ট্যারমাকের উপর পাহারা দিচ্ছে, প্লেন থেকে নামবার পূর্বেই যাত্রীগণকে নিরাপত্তা-পুলিশ বাজিয়ে দেখে নিচ্ছে (ইন্সপেকট করে)।"

মার্কিনের বিস্ময় দেখে আমারও বিস্ময়ে বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না।

আচ্ছা, পাঠক তুমিই বল, কোন্ সে মুল্লুক, হটেনটট বুশমেন যাদেরই হোক, যেখানে চল্লিশ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজাকে বরখাস্ত করে ক্যু দেতা হলে বিমানবন্দর, রেল ইস্টিশন জাহাজ বন্দর (কাবুলে এ দুটোই নেই), ছাউনি, থানা, গয়রহের সামনে তিন ডবল সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা হয় না? পঁচিশের কথা বাদ দাও, আইয়ুব যখন মেনি-বেড়াল মার্কা ক্যু করেছিলেন তখন রাজধানীতে না, প্রাদেশিক শহরিকা ঢাকা, তারও নিচের সিলেট-কুমিল্লায় সেপাই শান্ত্রি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড করেনি?

আরও গণ্ডা দুই কারণ আছে যেগুলো দফে দফে বলার কী প্রয়োজন? ধুন্দুমারের সময় আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের অবাধ আগমন, প্রাক্তন রাজা জহিরের গুপ্তচর প্রেরণ, ক্যু-জনিত ইনফ্লেশনে টু-পাইস কামাবার তরে বিস্তর চিড়িয়ার গমনাগমন, দাউদের রুদ্রদৃষ্টিতে বিপন্ন (প্রধানত জহিরের) আত্মজনের যেটুকু সোনাদানা আছে সেটুকু সস্তায় ক্রয়করণ, বিশেষ করে জাল পাসপোর্টের সাহায্যে পাকিস্তানি চরদের অহরহ শুভাগমন, আরও কত না বহুবিচিত্র রবাহূত জনগণ— অস্বাভাবিক অবস্থায় এদের সবাইকে মেকি সিকিটার মতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে হয়, ডবল জালের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ইস-পার উস-পার করতে হয়। এ কর্ম নিদ্রালু একগণ্ডা কেরানি দিয়ে হয় না। বাংলা কথা!

বাচ্চা-ই সাকাও ছিল ডাকু। তদুপরি তার আমলে কাবুলের ভিতরে-বাইরে কোনও অ্যার সার্ভিস ছিল না। তথাপি সে ফরেন অফিসের গুটিকয়েক জাঁদরেল কর্মচারীকে অ্যারপোর্টে মোতায়েন করেছিল। মার্কিন রিপোর্টার কাবুল বাজারে দু চারটি নাতিবৃদ্ধ মুরুব্বিকে শুধালেই তো জানতে পেতেন, ব্যাপারটা রত্তিভর নতুনত্ব ধরে না— তাই বলছিলুম, হাইকোর্টটা যে কোন মোকামে অবস্থিত সে খবরটাও সায়েব জোগাড় করেননি।

শেষ প্রশ্ন, এই ভোজবাজির লীলাখেলা কদিনের তরে? পাঠক, আইয়ুবি জঙ্গি চৌকিদারি এ দেশে কতদিন চলেছিল সে বাবদে তুমি স্পেশালিস্ট, আমি স্কুলবয়। টমিগান হাতে থাকলে ঘুষ খাওয়ার সনাতন সিসটেমে ঢোকার পন্থা সহজতর, প্রলোভন খরতর। আখেরে মায় আপিসার, বেবাক সেপাইকে ছাউনিতে ডেকে নিতে হয়— করাপশন আগাপাশতলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে। আইয়ুবের গদিতে যখন ইয়াহিয়া আসন নিলেন তখন 'ফিল্ড-মার্শালে'র প্রতি

www.pathagar.com

অনুরক্ত কোনও সেপাই-আপিসার উল্টো ক্যু করল না কেন? উত্তরটি প্রাঞ্জল। সব্বাই করাপট। করাপট-জনের কোনও নেমক-হালালি থাকে না, কারও প্রতি।

রুটি নেই? কেক খাব

ক্যু যত নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হোক, ভোজ্যদ্রব্যের দাম বাড়বেই। মার্কিন সংবাদদাতা সুসমাচার জানিয়েছেন, দাউদ মোটা মুনাফাখোরদের গুলি খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে চালের দাম নাকি অর্ধেক কমে গিয়েছে। মার্কিন সুদ্দুমাত্র চালের কথাটা তোলায় বুঝতে পারলুম তাঁর পেটে এলেম কতখানি! কাবুলের সাধারণজন ভাত খায় না। ওটা অতিশয় বিরল বিলাসবস্তু। একশো মাইল দূরের জালালাবাদ অঞ্চল, দু-শো মাইল দূরের পাকিস্তান থেকে বিস্তর পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে তণ্ডুলকে পৌঁছতে হয় কাবুলে। পাকিস্তানি চাল কালোবাজার মারফত। সাদায় ক শো গুণ ট্যাকসো, জানিনে। কাবুলের পয়সাওলা লোকও নিত্যি নিত্যি পোলাও খায় না। বনেদি ফারসিতে প্রবাদ, 'প্রতিদিন ঈদ নয় যে হালুয়া খাবে— হর রোজ ঈদ নিস্ত কে হালওয়া ব-খুরিদ'। কাবুলে হালুয়ার পরিবর্তে পোলাও বলে।

কথিত আছে, বাচ্চা-ই সাকাও রাজবাড়িতে পয়লা খানার সময় দেখে, সমুখে আমান উল্লাহর প্রাসাদ-পাচক প্রস্তুত জাফরানের ভুরভুরে খুশবাইদার পোলাও। সে নাকি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'ওই খেয়েই তো আমান উল্লাহ বিলকুল বুজ-দিল (ছাগলের কলিজাওলা ভীরু) হয়ে যায়, আর রাজধানী ছেড়ে পালায় কান্দাহার।' সে নাকি রুটি, কিশমিশ আর দু-চিলতে পনির— তার মামুলি খাবারই খেয়েছিল।

মার্কিন সাংবাদিকের অত্যুজ্জ্বল রিপোর্ট তথা কিশমিশের স্মরণে আমার হৃদয়ে সাংবাদিক হয়ে ফোকটে দু পয়সা কামাবার প্রলোভন জ্বলজ্বল চিতার মতো প্রজ্বলিত হয়েছে— তদুপরি পাওনাদারের ভয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ। ভাগ্যিস, আকছারই বিজলি মারে ফেল; তখন অন্ধকারের সঙ্গে আমার খুদাদাদ ঘোরতর কৃষ্ণ চর্মবর্ণটি অক্লেশে মিশিয়ে দিয়ে মিরপুর রোডের মোড়ে এক ইয়ারের অন্দরে দু ছিলিম তামুক খেয়ে কলিজাডা ঠাণ্ডা করে আসি।

ভাবছি, কালই বহির্বিশ্বে টেলিগ্রাম ঝাড়ব :

'ঢাকায় কিশমিশের সের আশি টাকায় উঠেছিল। সমাজসেবীদের ভীতি প্রদর্শনহেতু কাল চড়াকসে চল্লিশে নেমেছে।'

লুফে নেবে, স্যর, সব্বাই লুফে নেবে।

বাবুর-নাম অবহেলা বিপজ্জনক

বাবুর বাদশাহর নাম স্মরণে এলেই আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। একাধিক মিত্র অবশ্যই বলবেন, কটা লোকের আদৌ এই বিরল গুণটি থাকে যে, সে তোমার কিংবা এবং তোমার মতো আর পাঁচটা চুকুম-বুদাইয়ের মস্তিষ্কে ঘন ঘন আনাগোনা করবে? অথচ ইংরেজিতে এই কাণ্ডজ্ঞান সমাসটির অনুবাদ কমনসেন্স এবং স্বয়ং ইংরেজই স্বীকার করে যে নামকরণের সময়

www.pathagar.com

ব্যাকরণে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমনসেন্স সর্বদেশে সর্বকালে বড্ডই আন্‌কমন। বরঞ্চ এটাকে আন-কমন-সেন্স বা রেয়ার-সেন্স বলাই প্রশস্ততর— যিনি কি না গুণীজনের চৈতন্যলোকেও নিতান্তই ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, বাংলায় বলি রাঙ্গা শুক্কুরবারে অবতীর্ণ হন! অর্থাৎ, অতিশয় কালে-কস্মিনে, নিতান্তই জীবনের বিরলতম শুভ মুহূর্তে। যেমন ধরুন এ বাড়ির, পাশের বাড়ির, হয়তো-বা আপনার বাড়ির টেলিফোনটি। এনার বেলাতেই বোঝা যায়, ইনি মহাপুরুষ। অসাধারণ অর্থাৎ আন-কমন সেন্স দ্বারা যন্ত্রটি টুইটুম্বুর। সাতিশয় কালেভদ্রে আপনি এঁকে জাগ্রত অবস্থায় পাবেন। দুষ্টলোকে কয়, আমাদের রাজকর্মচারীরা এ বাবদে অলিম্পিক। আমি তীব্রকণ্ঠে, মৌলামুরশিদের দোহাই দিয়ে, যদি পাঠক হিন্দু হন তবে গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় তামা-তুলসী স্পর্শ করে, ক্যাথলিক হলে তিনবার দেহের উত্তমার্ধে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, বৌদ্ধ হলে উচ্চকণ্ঠে ত্রিশরণ মন্ত্রের শরণ নিয়ে, জৈন হলে— থাক্, ওই তো সেকুলার স্টেটের চিরন্তনী শিরঃপীড়া, সব্বাইকে আপন আপন অতিশয় ন্যায্য হিস্যে দিতে হয়, এস্তেক বেতার-প্রতিষ্ঠানেও শপথ নিয়ে বলছি, এটা অতিশয় অন্যায়। অলিম্পিকের কুল্লে গোল্ড-মেডেল পাবার গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী কুম্ভকর্ণবিজয়ী হক্ক ধরেন আমার টেলিফোনটি। অবিচল, অবিরল, নিশ্চল, সুবিমল এর কাল-কালান্তর-ব্যাপী নিদ্রাটি। সুবিমল বলার সুযুক্তি : এনার নিদ্রাতে কোনও মল নেই। যথা :

শুধু বেঘোরে ঘুম ঘোরে
গরজে নাক বড় জোরে,
বাঘের ডাক মানে পরাভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

(রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য থেকে উদ্ধৃত)

আমার টেলিফোনটি নাসিকাগর্জনের মতো ইতরজনসুলভ কুকর্মদ্বারা ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত প্রতিবেশীকে অযথা অত্যাচার করেন না। করলেই তো তাঁর সর্বনাশ। তদ্দণ্ডেই তাঁর কান দিয়ে

অনেক কথা বলে নেব
এবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ অন্ধকারে
ছিল কত গোপন গানে ॥

অর্থাৎ তখন তাঁকে ফের কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে।

টেলিফোন সম্বন্ধে এতখানি বলার প্রয়োজন হল এই কারণে যে, গত রবিবার ১১-৮ তারিখে আমি লিখেছিলুম আমাদের হাইকোর্টটিকে কলকাতারটির চেয়ে উচ্চতররূপে নির্মাণ করার জন্য আমি হেথাকার 'কর্তা-ব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ করি— অবশ্য ফোন মেরামতির নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি পর্বত-প্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ নস্যবৎ।' ইয়াল্লা ছাপাতে বেরুল, 'কোন মেরামতির নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি' ইত্যাদি অর্থাৎ 'ফোন' স্থলে 'কোন' ছাপা হয়ে গিয়েছে। পূর্বে কিংবা পরে ফোনের কোনও ইঙ্গিত ছিল না বলে পাঠকের পক্ষে আগাগোড়া বাক্যটাই অবোধ্য রয়ে গেল। কিংবা

www.pathagar.com

পাঠক ভাবল, আমি একটা বুদ্দু, কী একটা বাজে রসিকতা করেছি যার মাথামুণ্ডু কোনও অর্থ হয় না— রস তো দূরের কথা। কিন্তু এর সঙ্গে তড়িঘড়ি একটা সত্য এস্থলে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। টেলিফোন বিভাগ সরকার চালান। যদি বা সাহস সঞ্চয় করে টেলিফোনের প্রতি বক্রোক্তি করব বলে মনস্থির করেছিলুম, সরকার বাবদে আমার সতত সশঙ্কিত অচেতন মন— যার জন্ম ইংরেজের গোলামির যুগে— আমার কলমের কানটি আচ্ছাসে মলে দিয়ে শাসিয়েছে, 'অমন কম্মটি করতে যাসনি। ফোন না লিখে ল্যাখ কোন।' এবং কলমও তাই লিখেছে, ছাপাখানাও তাই ছাপিয়েছে! এর সঙ্গে এটাও বলা উচিত মনে করি, ছাপাখানা যতই ভুল করুক, সে আমাদের মতো কাঁচা লেখকের কত যে বানান সংশোধন করে দেয় সে তত্ত্ব কি কেউ জানে? ন্যাশনাল প্রফেসর সুনীতি চাটুয্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। একদা অর্বাচীন এক সাহিত্যিক আমাদের সম্মুখে ছাপাখানার বিস্তর কুৎসা গেয়ে চলে যাওয়ার পর বাঘা বৈয়াকরণিক সুনীতি চট্টো বললেন, 'হুঁঃ, ছাপাখানা যে আমাদের কত না বানান-ভুল শুধরে দিয়ে সমাজে ইজ্জত বাঁচায়, তার খবর এ-চ্যাংড়া জানবে কোত্থেকে?' আমি ঘন ঘন সম্মতি তথা কৃতজ্ঞতাসূচক মাথা নাড়িয়েছিলুম।

টেলিফোনের বেলাও তাই। ওই বিভাগের কর্মচারীরা ভদ্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে এঁদের অনেকটা মিল আছে। ডাক্তার কি কখনও রোগীকে বলে, 'দাদা, যা গোরস্তান মার্কা নিউমোনিয়াটি ঝড়-বিষ্টিতে জোগাড় করে এনেছ, এতে নিদেন তিন হপ্তার ধাক্কা!' ফোন অফিসার কী করে বলেন, 'ঝড়বৃষ্টিতে ফোনের তারটির যা হাল হয়েছে, সে তো দাদা নতুন তারের দাওয়াই না আসা পর্যন্ত সারবার কথা নয়— সে তো দেড় মাসের ধাক্কা।' নিউমোনিয়া সারতে এক মাস লাগলেও কি আপনি ডাক্তারকে তাড়া লাগান? তবে? ফোনের বেলাই যত গোস্সা?

আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা মস্ত সুবিধা রয়েছে। ফোন মারফত আমার বেশুমার পাওনাদার আমাকে বেলা-অবেলায় আর হুনো দিতে পারে না। ওই তো মানুষ মাত্রেরই দোষ। ভালো দিকটা দেখে না; দেখে শুধু খারাপ দিকটা।

হঠাৎ মনে পড়ল, কাবুলের দূর-আলাপনী প্রতিষ্ঠানটির চেহারাটা। সে কেচ্ছা আরেকদিন হবে।

আহাম্মুকি

বিষয়টি গুরুতর। সমস্যাটি জটিল। আমার বিদ্যে অত্যল্প।

বাবুর বাদশাহ তাঁর ইয়ার-আমিরদের মুদ্রাস্ফীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা কাঁড়া কাঁড়া দিনারমোহর নিয়ে কাবুল পৌঁছনমাত্রই তো কাবুলের উৎপাদন ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মারবে না। বাজারে আগে যে-রকম হাজারটা আণ্ডা উঠত সেই হাজারটাই উঠবে। মাঝখানে শুধু তোমাদের দরাদরির আড়া-আড়িতে এক পয়সার মাল এক টাকা দিয়ে কিনবে।'

ঠিক ওই পরিস্থিতিই গড়ে তুলেছিলেন ইংরেজ কোম্পানির জাঁদরেলরা বাবুরের মৃত্যুর তিনশো বছর পর, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে। জঙ্গিলাট কিন কান্দাহার গজনি জয় করার

www.pathagar.com

পর বিপুল গৌরবে প্রবেশ করছেন কাবুলে এবং তাঁদের হাতের পুতুল শাহ সুজাকে তখতে বসিয়ে লেগে গেলেন বিপুলতর পরাক্রমে নববিজিত রাষ্ট্র আফগানিস্তানের ওপর রাজত্ব করতে।

একে তো পুতুল রাজা মাত্রই আফগানের দু চোখের বিষ, তদুপরি সুজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ— জনসাধারণ করল অসহযোগ। অর্থাৎ খুব একটা স্বেচ্ছায় সেই সতেরো-আঠারো হাজার, কাবুলে মোতায়েন, ইংরেজ সেনাদলকে খাবার-দাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কাবুল উপত্যকার লোক এবং নিকটবর্তী জনপদবাসী বেচতে চায় না। ওদিকে গোরার পাল চায়, 'প্রতিদিন হালুয়া খেতে'! জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে চড়বার পূর্বেই 'সদাশয়' ভারতস্থ ইংরেজ সরকার ইনফ্লেশন ইন্ধনের জন্য সৈন্য এবং অফিসারদের বিলাস-ব্যসনের তরে পাঠাতে লাগলেন বে-হিসাব বে-শুমার বস্তা বস্তা মোহর, টাকাকড়ি। এমনিতেই, স্বাভাবিক অবস্থাতেই সতেরো-আঠারো হাজার ফালতো, তায় শ্বেতহস্তীকে পুষবার মতো গম-যব ফসল, ভেড়ি-মুরগি কাবুল উপত্যকা ও সেই দূর হিন্দুকুশ এলাকা পর্যন্ত জনপদ উৎপাদন করে না। মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াই, অর্থনীতির সনাতন আইনেই দ্রব্যাভাববশত বাজারে লাগল আগুন। ইতোমধ্যে আসছে, দিনের পর দিন হিন্দুস্থানের ভাণ্ডার উজাড় করে, সেখানকার তীব্র প্রতিবাদ, করুণ আর্তনাদ উপেক্ষা করে টাকার ঘি কাবুলের ইনফ্লেশন আগুনে ঢালবার তরে। গোরাদের ছাউনি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। শহরগামী গ্রামবাসী আণ্ডাওলা মুরগি-ওলাকে গোরা সেপাইরা করে চোটপাট এবং লুটপাট। ফলে সাপ্লাই গেল আরও কমে— যোগানদার সুদূর গ্রাম থেকে বেরুতেই রাজি হয় না।

গোরা মার্কা আজব ইনফ্লেশন

কাবুল শহরের কাছে ইনফ্লেশন হুমা জাতীয় আজব চিড়িয়া নয়। মাহমুদ, তিমুর নাদির বিস্তর লোক, বিস্তর না হোক, অল্প-বিস্তর ইনফ্লেশন ঘটিয়েছেন কাবুলে, লুটের টাকা ঢেলে। কিন্তু এবারের ইনফ্লেশনে মার খেল কাবুলের ফকির-আমির দুই পক্ষই। সে যা দাম— সে দাম দিয়ে রুটি, আণ্ডা, মটন, আঙ্গুর, নাসপাতি, আপেল খেতে পারেন স্রেফ গোরা রায়রাই। ২৫ মার্চের পর টিকা গুষ্ঠীরও নিত্যি নিত্যি ছিল হালুয়া। আমির মোল্লা গেরস্ত সবাই গেল একসঙ্গে ক্ষেপে।

ওদিকে ভারতের রাজকোষে মারাত্মক অর্থাভাব। রব উঠেছে, সরকার মহলেই, 'খর্চা কমাও, কড়ি বাঁচাও।' তখন এই পাগলা-অভিযান, ইটারনেল পিকনিকের খর্চা না কমিয়ে ইংরেজ করল আরেক গো-মূর্খামি। মাসোহারা ঘুষ দিয়ে যেসব আফগান সরদার-আমিরদের একদিন কোনও গতিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গণবিক্ষোভের আবর্ত থেকে, তাদের ভাতা দিল কমিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তারা আর তাদের পুষ্যির পাল গেল ক্ষেপে। কোথায় না একদিকে গোরাদের বে-এক্তেয়ার খর্চা কমিয়ে, অন্যদিকে সরদারদের ভাতা বাড়িয়ে এবং তাদের মাধ্যমে গেরস্তদের হাতে টাকার একাংশ পৌঁছিয়ে বাজারদরে ভারসাম্য আনা হবে, তা না উল্টো দাঁড়ি-পাল্লার যে দিকটা হাল্কা হয়ে হয়ে হিন্দুকুশের চুড়ো ছুঁই ছুঁই করছিল তার থেকে আচমকা থাবা মেরে সরিয়ে নেওয়া হল তিন খাবলা। ভারী দিকটা এক ঝটকায় ঠাং করে ঠেকল কাবুলের পাথরে।

www.pathagar.com

জাহান্নামের পথে

উন্মত্ত জনতা তিনজন ইংরেজ অফিসারকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে খুন করল কাবুলের রাজপথোপরি— চিৎকারে চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে।

এর পরের কাহিনী সবাই জানেন। অশেষ লাঞ্ছনা অবমাননার পর প্রায় সাড়ে ষোল হাজার গোরা, নেটিভ— নেটিভ যৎসামান্যেরও কম— কাবুল থেকে বেরুল ভারতের পথে। সেই ভয়াবহ জগ্‌দলক্-গিরিপথ, যেটাকে বাবুর পর্যন্ত সমঝে চলতেন, তারই ভিতর কচুকাটা হল শেষ লোকটি পর্যন্ত— না, মাত্র একজন ডাক্তার যখন কোনও গতিকে ছন্নের মতো টলতে টলতে জালালাবাদের ইংরেজ ছাউনিতে পৌঁছল তখন সে অর্ধোন্মাদ। এটা আমাকে আর নতুন করে বলতে হবে না, এমনকি আমি স্বয়ং, মোটর ভেঙে যাওয়ার দরুন, জগ্‌দলকে যে-এক রাত্রি কাটাই সে কাহিনী উপস্থিত মুলতবি থাক।

সর্বজনীন সর্বদেশের প্রশ্নমালা

কাবুল শহরে আজও যদি অকস্মাৎ একগাদা টাকা ফেলা হয় তবে ফল কী হবে? আফগানিস্তানে চিরকালই খাদ্যাভাব। বহির্বিশ্ব থেকে যে গম-ডাল আসবে— মার্কিন রিপোর্টারের শৌখিন চাল মাথায় থাকুন— সেটা আসবে কোন দেশ থেকে, কোন পথ বেয়ে, সেই হঠাৎ-পাওয়া টাকার জোরে? (সে কড়ি কাবুলে ছেড়ে ইনফ্লেশন ডাকার কোনও অর্থ হয় ন)। যে দুটো পথ দিয়ে প্রধান শহর কাবুল, গজনি, কান্দাহার, জালালাবাদ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত, সেগুলোর উপর দিয়ে একদা চলাচল করত উট গাধা ইত্যাদি ভারবাহী পশু। এখনও বেশিরভাগ তাই। তবে হ্যাঁ, এখন ট্রাকও চলে। এস্থলে মনে রাখা ভালো, ট্রাকের ইসকুরু বল্টু থেকে আরম্ভ করে পেট্রলের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত কিনতে হয় বিদেশ থেকে। এবং দুটি রাস্তার একটা জগ্‌দলক-জালালাবাদ হয়ে পৌঁছয় পাকিস্তানের পেশাওয়ারে, অন্যটিও পাকিস্তানের চমন-কুয়েটাতে।

পাকিস্তানের খুব একটা ফালতো গম-ডাল আছে বলে শুনিনি। তদুপরি দুই দেশে খুব একটা দিল-জানের দোস্তি আছে এ কথা আরও কম শুনেছি। তবু পাকিস্তান হঠাৎ খামোখা দাউদ খানকে ভারতে কেনা বা মার্কিনদত্ত গম তার দেশের ভিতর দিয়ে পাস করতে দেবে না, এটা চট করে বিশ্বাস করা যায় না। পাকিস্তান খুব-একটা টাকার কুমির তালেবর মুল্লুক নয়। মধ্যবর্তী ব্যক্তি হামেশাই দু পয়সা কামায়।

কিন্তু প্রশ্ন, আজ যদি দাউদ খান রুশের সঙ্গে বড্ড বেশি ঢলাঢলি আরম্ভ করেন এবং মার্কিন চটে যায়, ফলে মার্কিন-পাকিস্তান-ইরান একজোট হয়ে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ সিল করে দেয় তবে শুধুমাত্র উত্তরের পথ দিয়ে রুশ তাবৎ আফগানকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি, চাইবে কি? আমার জানা নেই, পাঠক বলতে পারবেন, এযাবৎ রুশ কটা দেশকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাই আফগানিস্তানকে আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে প্রশ্ন, না হয় মেনে নিলুম জহির আর তাঁর ইয়ার-বখশিরা ছিলেন করাপ্‌ট্ কিন্তু আমান উল্লাহ? লোকটা তো তখ্‌ৎ

www.pathagar.com

হারাল প্রগতিশীল ছিল বলে। হবীবউল্লা ছিলেন অলস, কিন্তু তিনিও কি চেষ্টা দেননি দেশটাকে সচ্ছল করার? তাঁর পূর্বের বাঘা বাঘা আবদুর রহমান, দোস্ত মুহম্মদ? এঁদের বলবুদ্ধির তারিফ বিস্তর বিচক্ষণ বিদেশি করেছেন। এঁদের মূলধন ছিল না? দাউদ খান যদি পান, তবে পাবেন, একা রুশের কাছ থেকে। হবীব, রহমান, দোস্ত পেতেন দু পক্ষ থেকেই। সে সোনা-দানা তো তাঁরা চিবিয়ে খাননি। সে-সব গেল কোথায়? যদি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক কিছু করা যায়, তবে শুধোই, ভারত যে ছাব্বিশ বছর ধরে কুল্লে টেকনিক্যাল কল এস্তেমাল করল তার ফলে জনগণের দরিদ্রতা ঘুচল কতখানি? তবু তো ভারত অনেক কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ধরে, উৎপাদন করে। নেই নেই করে বাংলাদেশেরও গরিবানা-সুরৎ দু একটা খুদাদাদ দৌলত আছে, শিক্ষিত লোক আছেন, 'নো-হাউ' গুণী আছেন। আমরাই কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুখ-স্বপ্ন দেখার খুব একটা সাহস পাই? আমি হাড়ে-মিষ্টি অপটিমিস্ট— আমার কথা বাদ দিন।

আফগানিস্তানের আছেটা কী?

হাজার বছর পূর্বে একজন চৌকশ বাদশাহ্ আটঘাট বেঁধে আফগানিস্তানকে আপন পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

* * *

সাধারণজনের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের দৈনন্দিন ব্যবহার দুনিয়াটাকে ন্যাজ-মুড়ো বদলে দিয়েছে। টেলিগ্রাফ, বেতার, বিজ্ঞান-বদৌলত নিত্যি নিত্যি নয়া নয়া দাওয়াই ইন্‌জেকশন, খুদায় মালুম আরও কত কী! কিন্তু বিজ্ঞান যে আমাদের এই বাংলাদেশের কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করেছে মানুষ সেদিকে নজর ফেলে না। এবং সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বলে মনে হয়, এই মুখ-পোড়া বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের সে সর্বনাশের অগ্রগতি ঠেকাতে হবে। এ ব্যাপারটা শুধু যে আমাদের বেলাই প্রযোজ্য তা নয়, কী আফগানিস্তান, কি ইরান এমনকি পূর্ব ইউরোপের একাধিক অনুন্নত দেশও বিজ্ঞানের প্রকৃতির স্বরূপটা সঠিক ধরে উঠতে পারছে না। সবাই ভাবছে, একবার কোনও গতিকে গাদা গাদা টাকা পেয়ে গেলে তাই দিয়ে কিনে নেব লেটেস্ট মডেলের যন্ত্রপাতি, তৈরি করব হুদো হুদো মাল— ইংলন্ড, জর্মনি, আমেরিকা যে রকম করেছে আর সম্বৎসরে দুধে-ভাতে থাকে,— আমাদের বেলাও হবে তাই।

এই বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, এ দেশ বহু শতাব্দী ধরে অসাধারণ বিত্তশালী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূপর্যটক ইবনবতুতা বাংলাদেশ দেখার পর বলেছিলেন, এত সস্তায় (এত বিচিত্র) জিনিস তিনি আর কোথাও দেখেননি। চীনের মতো বিশাল ধনবান রাষ্ট্র, নানা রকমের দ্রব্য নির্মাণে সিদ্ধহস্ত বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীতে অন্য কোনও রাষ্ট্র ছিল না। সেই চীন দেশের লোক বহুশত বৎসর ধরে বাংলাদেশে নিত্য-নিয়ত এসেছে নিপুণ হস্তে নির্মিত বহু বিচিত্র পণ্যসম্ভারের জন্য। সেসব বস্তুর ফিরিস্তি, এদেশের সমৃদ্ধি সাচ্ছল্যের বিবরণ চীনা ভাষা থেকে অনুবাদিত হয়ে এ দেশে যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের মতো অজ্ঞ লোক বিশ্বাসই করতে পারিনি, এতসব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়োজনীয় তথা বিলাসবস্তু এই দেশেরই লোক একদা নির্মাণ করেছে। কিন্তু সে-দিনের ঐশ্বর্য নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

আজ আমার বিষয়বস্তু নয়। আমার উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন দরিদ্রদেশ কী প্রকারে একদা ধনবান হয় এবং আবার সেই দরিদ্রতায় ফিরে যায়। পাঠক যদি বাংলাদেশের কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে সে-দেশ মিলিয়ে তুলনা করে নেন, তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। বহু দেশের বহুবিচিত্র উত্থান-পতনের বহুরূপী ঘটনা, তাদের ধনোপার্জন-শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ইত্যাদির প্রত্যেকটি অঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে এ দেশের একই প্রচেষ্টা, সাফল্য লাভ, অধঃপতন তুলনা করতে গেলে এ রচনার নির্ধারিত তনু বে-সামাল কলেবরে পরিবর্ধিত হবে? রহমান রক্ষতু!

অসামান্য মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি এস্থলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একাধিক গুণীজন দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, ইংরেজ আগমনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এ দেশ দরিদ্র ছিল না। মাত্র শতকরা ষাটজন লোক চাষবাস করত, শতকরা চল্লিশজন শিল্পদ্রব্য নির্মাণে নিযুক্ত থাকত। ইংরেজ যেমন যেমন কলে তৈরি সস্তা মাল এ দেশে ছাড়তে আরম্ভ করল— নানা কৌশলে দেশের ধনদৌলত লুণ্ঠন করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে আনার কর্মটা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বেড়েই চলছিল— তেমন তেমন এ দেশের কুটির-শিল্প লোপ পেতে লাগল। শিল্পীদের ধনোপার্জনের পন্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সামনে রইল শুধু চাষের কাজ। পূর্বে যে জমি এ দেশের ষাটজনকে কাজ যোগাত, ক্রমে ক্রমে সেটা নব্বুই-পঁচানব্বুইয়ে গিয়ে দাঁড়াল। জমি সে-ভার, তদুপরি জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ সইতে পারবে কেন? দেশের দারিদ্র্য চরমে গিয়ে পৌঁছল।

রাজার এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্টের রাজা

গজনির মাহমুদ বাদশাহ উত্তমরূপেই লক্ষ করেছিলেন ভারতের উৎপাদন-ক্ষমতা, শিল্পনৈপুণ্য, শিল্পদ্রব্য-বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য। এসব রফতানি করে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছিল ভারতের অতুল ধনসম্পদ। কথিত আছে, সর্বসুদ্ধ অষ্টাদশবার তিনি ভারতলক্ষ্মী-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। এই অষ্টাদশ অভিযানের চেয়ে অল্প লোমহর্ষক একটিমাত্র সংগ্রাম নিয়ে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে শূন্য শ্মশান, মাহমুদের প্রতি অভিযানান্তে গজনিতে বৃহত্তর স্বর্ণোদ্যান! পাঠান্তরে সপ্তদশ অভিযানের উল্লেখ আছে। এ পাঠও গ্রহণযোগ্য। মহাভারতের মুষলপর্ব মূল মহাকাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর, সে তত্ত্ব অনস্বীকার্য। অতএব সপ্তদশ পর্বে সম্পন্ন মহাভারত অনাসৃষ্টি নয়।

সর্ব ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ একমত যে, মাহমুদের লুণ্ঠনের ফলে এদেশের ধনদৌলত সর্বনাশা রক্তক্ষরণের মতো বেরিয়ে গিয়ে (এপোলিং ড্রেন অব ওয়েলথ) সম্পূর্ণ দেশটাকে হীনবল অসাড় করে দিয়েছিল। এ লুণ্ঠনের খতিয়ান, দফে দফে বয়ান দিয়ে এর পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ সম্পূর্ণ অসম্ভব! একমাত্র নাগরকোট-এর মতো দ্বিতীয় বা ইন্টার ক্লাস নগরিকা থেকে তিনি পান সাতলক্ষ সোনার মোহর, সাতশো মণ সোনা এবং রুপার পাত, দু মণ খাঁটি সোনার তাল, দু হাজার মণ খাঁটি রুপার তাল এবং কুড়ি মণ হীরে, পান্না, মুক্তো ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ-ইনভেনট্রিতে হস্তী, অশ্ব, কামধেনু, অস্ত্রশস্ত্র, বহুবিধ ধাতু, বিচিত্র কারুকার্যময় পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠদ্রব্যাদি— শতাধিক আইটেম ধরা হয়নি। একটা অভিযানে, মাত্র একটা নগরিকা থেকে যদি এতখানি সম্পদ লুণ্ঠিত হতে পারে তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ অভিযানে অগণ্য নগরে কতখানি পাওয়া যায় তার কল্পনাও অসম্ভব। মাত্র এই 'পরশুদিন' ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

www.pathagar.com

শেষে মিত্রপক্ষ ইউরোপে কী পরিমাণ, কত বিচিত্র বস্তু, মায় গণ্ডায় গণ্ডায় সমুচা কারখানা আপন আপন দেশে বাজেয়াপ্ত-জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই কি লেখাজোখা হয়?

বস্তুত মাহমুদ কী পরিমাণ সম্পদ স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন সেইটেই এস্থলে প্রধান বক্তব্য নয়। কত রাজা কত লুটই না করছেন, সে সব নিয়ে আলোচনা বৃথা। এই 'শান্তি'-কালেই যা-লুট পৃথিবীর সর্বত্র 'ন্যায়ত ধর্মত' মায় ওয়াটারগেট হচ্ছে তারই খবর রাখে কজন? এবং সবচেয়ে সর্বনেশে লুণ্ঠন— দেশের ভিতর যখন 'রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি!'

আমার বক্তব্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বটে কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির।

একবাক্যে সর্বজন স্বীকার করেছেন, সুলতান মাহমুদ ছিলেন অসাধারণ গুণগ্রাহী, সর্বমুখী গুণসম্পন্ন বিদগ্ধ পুরুষ। কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞানের গুণীজনকে তিনি এমনই অকাতরে অর্থসম্পদ দান করতেন যে দেশ-দেশান্তর থেকে প্রতিভাবান অসংখ্য গুণীজ্ঞানী তত্ত্ববিদ সেই শুষ্ক কঠিন সৌন্দর্যহীন, প্রাকৃতিক সর্বসম্পদে নিরঙ্কুশ বিবর্জিত গজনি শহরে জমায়েত হয়েছেন, সমস্ত জীবন সেখানে কাটিয়েছেন। আজ থেকে বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে রাজা মাহমুদের সভাকবি ফিরদৌসি, সভাপণ্ডিত অল-বিরুনির সহস্র বার্ষিকী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিদ্বজ্জন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছেন। অলবিরুনি সংস্কৃত জানতেন। ভারতের অপর্যাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও তিনি বা অন্য কোনও সভাপণ্ডিত অর্থনীতি নিয়ে বাদশাহ্‌র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেননি, এটা অবিশ্বাস্য।

তদুপরি মাহমুদ তো মাত্র একবার ভারতবর্ষ লুট করে সে ধন গজনিতে ছড়িয়ে দিয়ে তার কুফল-সুফল দেখেননি। অধিকাংশ লুণ্ঠনকারীরা মাহমুদের মতো, পরবর্তীকালে বাবুরের মতো পর্যবেক্ষণশীল ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকর্মে নিয়োজিত করার মতো জ্ঞানী ছিলেন না; তদুপরি তারা বার বার পুনর্বার লুণ্ঠন করার মতো সুযোগ-কুযোগ পাননি যে আপন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু দু একবার লুট করার পর সুলতান মাহমুদ নিশ্চয়ই অর্থ কী, ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থের গুরুত্ব কী, অর্থের সফল ও নিষ্ফল প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এই আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস।

লুট করা ধনদৌলত সুদ্দুমাত্র সঞ্চয় করা বা নিছক উড়িয়ে দেওয়াই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি প্রতিবারে প্রধানত বন্দি করে অথবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সর্বপ্রকারের আর্টিজান, ছুতোর, তাঁতি, স্থপতি, প্রস্তর কর্তনকারী, স্বর্ণকার, তাম্রকার, বস্তুত হেন শিল্প নেই যার দক্ষ হুনুরি— পালে পালে তিনি সুদূর গজনিতে নিয়ে যাননি। অতি অবশ্যই তিনি প্রতিমা-নির্মাণকারীদের সন্ধানে কস্মিনকালেও বেরোননি, ওই যা একমাত্র ব্যত্যয়। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কোথায় সে শীতল মলয় আর শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনী মাতা? সেই নির্জলা, নিষ্ফলা, সেই পোড়ারমুখো দেশটাকে তিনি চেয়েছিলেন ফলপ্রসূ করতে, কিন্তু কী সে দেশ! তবে কি না, আমি কোনও দেশ সম্বন্ধে কী বলি না বলি, কোনও দেশের কী বয়ান দিই না দিই, তারই ওপর যদি সুচতুরজন আস্থা রাখতেন তবে তো আমি এ্যাদ্দিনে বিলেত, নিদেন কাবুলের ফরেন মিনিস্টার হয়ে যেতুম! তা হলে শুনুন, সর্বশাস্ত্রবিচারদক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে শার্লক হোমস মাসুদরানা যাঁর কাছে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো 'আবুদিয়া', সেই বাবুর বাদশাহ্ গজনি সম্বন্ধে কী বলেছেন,— অনুবাদ প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁর।

www.pathagar.com

গজনির স্বরূপ

"গজনি একটা দরিদ্র নগণ্য স্থান। আমি ভেবে হামেশাই তাজ্জব বোধ করেছি যে, হিন্দুস্তান-খুরাসানের যাঁরা অধীশ্বর ছিলেন তাঁরা খুরাসানকে বাদ দিয়ে এমন একটা নগণ্য স্থানকে কী করে রাজধানী করেছিলেন। ...গজনি ছোট দেশ। এখানে কৃষিকাজ অতি কঠিন। যে জমি এক বছর আবাদ হয়, পর বছর সে জমি ফের ভাঙতে হয়।" অথচ বাবুরই বলছেন, গজনি অঞ্চলে পানির অভাব নেই। তদুপরি মাহমুদ এখানে কৃষির জন্য তিনটে বাঁধ তৈরি করেছিলেন। "তার একটার উচ্চতা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ!" বাবুর যখন গজনি যান তখন তার একটি বাঁধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, অন্যটি মেরামতির জন্য বাবুর কিছু টাকা পাঠিয়ে বলছেন, "আমি আশা করি আল্লাহ্'র রহমে বাঁধটি নিশ্চয়ই আবার নির্মিত হবে।" তৃতীয়টি তখনও কার্যক্ষম। তাবৎ গজনি জেলা ঘুরে বাবুর বলবার মতো যা পেলেন সে "গজনির আঙ্গুর কাবুলের আঙ্গুরের চেয়েও ভালো, এখানে তরমুজের উৎপাদনও অনেক বেশি, আপেলও খুব ভালো।" এবং আরও তাজ্জব লাগার কথা যে "গজনির প্রধান চাষ লাল রঙ উৎপাদক এক প্রকার লতা। এটি বেশ লাভজনক কৃষি। এ লতা প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্তানে চালান হয়।"

একাই এক লক্ষ

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতই পড়ি ততই সন্দেহ দৃঢ়তর হয়, যে কটি দ্রব্য বাবুরের আমলেও গজনিতে উত্তম, সেগুলো কারও না কারও চেষ্টার ফলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে তোলা হয়েছে। আমার পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, মাহমুদ ভালো করেই বুঝেছিলেন, বিদেশ থেকে যত সোনা এনেই গজনিতে ছড়াও না কেন, বিদেশিরা সেই টাকার লোভে যতই উৎকৃষ্ট বিলাসব্যসনের জিনিস এমনকি খাদ্যদ্রব্যাদিও গজনিতে এনে বিক্রি করুক না কেন, লুটের টাকাও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে— যদি না কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য দেশ উৎপাদন করতে পারে। এই যে লতার কথা বাবুর বলছেন, এর থেকেও সন্দেহ হয়, মাহমুদ রফতানির জন্য এটার চাষ প্রবর্তন করিয়েছিলেন। হুনুরি এনেছিলেন সর্বপ্রকারের— পোড়ার দেশের লোক যদি কোনও একটা শিল্প শিখে নিতে পারে! কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি ঘি ঢালছিলেন ভস্মে। ভারতের অর্বাচীন ঐতিহাসিকরা বলেন, মাহমুদের স্বর্ণতৃষা ছিল অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, প্রতি প্রচেষ্টাতে নিষ্ফল হয়ে, লোকটা আবার বেরুত নয়া ক্যাপিটালের সন্ধানে। আমরা যে রকম এক একটা ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষে নিরাশ হয়ে ফের বেরোই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে।

এ কথা সত্য, গজনি শহরটাকে মাহমুদের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর ঘোর-অধিপতিরা পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এ রকম কত শহর কতবার লুট করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে— কোনও প্রকারের উৎপাদন-ক্ষমতা থাকলে সে-নগর ফের পুনর্জন্ম লাভ করে। গজনি এক ধাক্কাতেই খতম।

হিন্দুস্তানের বিরাট স্বর্ণভাণ্ডার বার বার লুট করে, সে দেশটাকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে, কুল্লে দৌলত পাঁড় দেশপ্রেমী একগুঁয়ে সুলতান মাহমুদ অকাতরে ঢাললেন ওইটুকু একচিলতে গজনি অঞ্চলে। আজকের দিনে একশো জর্মন বা রুশ 'নো-হাউ' শ্বেতহস্তীকে পুষতে গেলে আমাদের

বেল্টখানা তিন ফুটো টাইট করতে হয়! মাহমুদ এনেছিলেন হাজার হাজার 'নো-হাউ' হুনুরি জলের দরে। পুরোপাক্কা প্ল্যানিংয়ের জন্য তাঁর সভায় বিজ্ঞজনের অভাব ছিল না।

সেই দোস্ত মুহম্মদের আমল থেকে আজকের প্রেসিডেন্ট দাউদ। অপরিবর্তনীয়তে কী এমন পরিবর্তন ঘটল, কী এমন সোনাদানা জুটল— তা-ও ধারকর্জায়— যে 'রিপাবলিক্' নামক নয়া নাম দিতেই কুল্লে আফগান মুল্লুকে মধু-দুগ্ধের ছয়লাপ লেগে গেল?

তা হলে আর ভাবনা কী? কাল থেকে ঢাকার নাম পালটে বলব লন্ডন, 'পূর্বদেশে'র নাম পালটে বলব 'দি টাইমস', আর, হে পাঠক, তোমারও আয়ের অঙ্ক হুশ করে উঠে যাবে লন্ডনবাসীর কাঁধ মিলিয়ে। ঘরে ঘরে টি-ভি, গ্যারাজে গ্যারাজে মোটর। বছরে দেড় মাস ছুটি মন্টিকার্লোতে!!

সাধারণ আচরণ

কাবুল থেকে ১৮ আগস্ট প্রেরিত, কলকাতায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা গাউস বখস্ বিজেনজো এবং আতাউল্লা খান মেঙ্গলের গ্রেফতারিতে আফগান সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফলে আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাবুলে অবস্থিত পাক রাষ্ট্রদূতকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন এবং গ্রেফতারির বয়ান দিতে বলেছেন।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, আফগান পররাষ্ট্র বিভাগ শুধু যে জনসাধারণকে তাঁদের প্রাগুক্ত উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন তাই নয়, পাক রাষ্ট্রদূতকে সর্বপ্রথম এই চিত্তবৈকল্যের দুঃসংবাদ জানিয়েই তাঁকে 'অভ্যর্থনা' জানাবেন। কাগজে বেরিয়েছে 'ডেকে পাঠানো' অতএব হয়তো অভ্যর্থনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

শুনেছি, এদেশে নাকি ইংরেজ আমলে হোম মিনিস্টার বা স্টেট সেক্রেটারি ফাঁসির আসামির করুণাভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর করলেও পত্রশেষে পাদনামায় লিখতেন, "মহাশয় আপনার একান্ত বশীভূত ভৃত্য হওয়ার গৌরবপ্রাপ্ত' অমুক— 'আই হ্যাভ দি অনার টু বি, স্যার, ইওর মোস্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট' লেখার পর নাম সই করতেন। প্রকৃত সত্য নিরূপণার্থে দু চারজন ইয়ারবখশিকে এই সাতিশয় সিভিল প্রশ্নটি শুধোলে তাঁরা রীতিমতো মিলিটারি হাঁক ছেড়ে গাঁক গাঁক করে যে-সব অশ্রাব্য উত্তর দিলেন তার থেকে অনুমান করলুম, তাঁদের প্রতি কখনও সরকার এমন অনুগ্রহ করেননি যে, জনৈক সবৈতনিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারী স্বহস্তে সসম্মানে একটি প্রয়োজনাতীত সুদীর্ঘ নেকটাই তাঁদের গলায় পরিয়ে, পায়ের নিচের টুলটি এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে, কবিবরের ভাষায় 'দোদুল দোলায়' দোদুল্যমান করবে। তথাপি আমার মনে ধোঁকা রয়ে গেল, সদাশয় সরকার এবম্প্রকার দুর্লভ গৌরব দেখালে তাঁরা মহারানির জন্মদিনে প্রদত্ত খেতাবের মতো সে নেকটাই গ্রীবাদেশে পরিধান করতেন কি না। আমার প্রশ্ন, আদব-কায়দার প্রটোকল সংক্রান্ত।

সচরাচর কাবুলে এগানা-বেগানা কেউ এলেই উচ্চকণ্ঠে সংবর্ধনা জানানো হয়, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক— ব-ফরমাইদ, তশরিফ আনয়ন করুন— তশরিফ বিয়ারিদ, আপনার কদম মবারক হোক— কদম তান মবারক, আপনার চশম রৌশন হোক— চশমে

www.pathagar.com

তান রওশন।" সম্পূর্ণ পাঠটি বেহদ দরাজ পত্রিকায় গুনজাইশ নেহায়েত তঙ্গ। আমি মজবুর হয়ে মুখতসরে কাবুলের সিভিল প্রটোকলটি সেরে নিলুম।

কিন্তু এস্থলে কার্যকরী হবে, ডিপ্লোম্যাটিক অর্থাৎ কূটনৈতিক কিংবা, রাজদূত সমাগম-সুলভ রাজসিক প্রটোকল। সে প্রটোকল বহুরূপী। যেমন ধরুন একটি সুপরিচিত নজির : বার্লিনস্থ ফরাসি রাজদূত কুলোঁদ্র পূর্বাহ্নে এত্তেলা দিয়ে গিয়েছেন জর্মন ফরেন অফিসে— জর্মন পররাষ্ট্রমন্ত্রী য়োখিম ফন রিবেন্ট্রপকে স্বহস্তে একটি মহামূল্যবান রাজপত্র সমর্পণ করতে। রিবেন্ট্রপ কেন, ফরেন অফিসের নগণ্য ফুট-ফরমাইশের ছ্যামড়াডাতক জানে সে দলিলটি কী।

বিঘোষক দৌবারিক দ্বার উন্মোচন করে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিবে, "হিজ এক-সেলেনসি সম্মানিত ফরাসি রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ অধিকারাধার (প্লেনিপোটেনশিয়ারি) রাষ্ট্রদূত সর্বোচ্চ সম্মানাধিপতি মসিয়োঁ কুলোঁদ্র!" গৃহমধ্যে উচ্চাসনে বসে আছেন একদিকে ফন রিবেন্ট্রপ। সম্মুখে বি-টিম ফুটবল খেলার মতো বৃহৎ টেবিল। অন্যদিকে অভ্যাগতের জন্য একখানা নাতি উচ্চাসন। কুলোঁদ্র অন্যদিনের মতো ফরাসি ভাষায় বুজুর বা জর্মনে গুটন টাখ বলবেন না। যে চেয়ারে বসার কথা, সেটাকে উপেক্ষা করে ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড টান টান করে খাড়া দাঁড়িয়ে সুদ্ধমাত্র গ্রীবাটি ক্ষণতরে পোয়াটাক ইঞ্চি নিচু করে বাও করবেন। রিবেন্ট্রপও উঠে দাঁড়িয়ে সম-মেকদারে বাও করবেন, মেহমানকে অন্যদিনের মতো আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন না বা হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াবেন না। বলা বাহুল্য, দু জনারই মুখমণ্ডল দেখে মনে হবে দু জনারই দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য।

আমি একটি প্রকৃত ঘটনারই বিবরণ দিচ্ছি। এটা ঘটেছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। তার আগে আরেকটা ঘটনার উল্লেখ করে নিই। আজ ২২ আগস্ট। চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠিক গতকাল আমাদের প্রাগুক্ত রিবেন্ট্রপ গিয়েছিলেন মস্কো। সেখানে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এমনই সম্মান, যেটা রাজার রাজার কপালেও কালেকস্মিনে লেখা থাকে। রিবেন্ট্রপ তাঁর প্রভু হিটলারের হয়ে স্তালিনের সঙ্গে বিশ্বসংসারের অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় এক মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর স্তালিন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প গালে, প গালে— গেলাশ গেলাশ।' সঙ্গে সঙ্গে জনা ছয় কমরেড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। সমবেত কমরেডদের জন্য সেই জার আমলের ফেনসি গেলাশ, আর ইহলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যামপেন। ফটাফট বোতলের কর্ক লম্ফ মেরে ঠোক্কর দেয় ছাতে। শ্যামপেন বইতে লাগল যেন, জাহ্নবী-যমুনা, বিগলিত করুণা, নাহি তার তুলনা। স্তালিন মদ খেতে পারতেন জালা জালা! আর-সব কমরেড টেবিলের তলায় বেহেড মাতাল হয়ে অচৈতন্য হওয়ার পরও স্তালিন একা একা চালিয়ে যেতে পারতেন আরেক পাল শুষ্ক-কণ্ঠ নয়া কমরেড না আসা পর্যন্ত। তাদের অবস্থাও হত তদ্বৎ। হিটলার ছিলেন নিরামিষ-ভোজী, মদ্যে বিরাগ। অথচ তাঁর দোস্ত ছিলেন পাঁড় পিনেওলা, ফটোগ্রাফার হফমান। তাঁকে রিবেন্ট্রপের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, মৈত্রী-পরবের ছবি তুলতে, আর স্তালিনের সঙ্গে সুধাপানে পাল্লা দিতে। হফমানই সে জলসার রসময়— উভয়ার্থে— সরেস বর্ণনা দিয়েছেন, হিটলার গত হওয়ার পর তাঁর কেতাবে 'হিটলার ছিলেন আমার দোস্ত'। এটা হল সৌজন্যের প্রটোকল সুধাপান ম্যাচ ও সেই প্রটোকল অনুযায়ী ড্র যায়।

সে সন্ধ্যায় হিটলার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ জর্মনিতে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আকাশে 'উত্তরের আলো' দেখছিলেন। নৈসর্গিক এই সূর্যরশ্মি মাঝেসাঝে দেখা যায়। হিটলারের

www.pathagar.com

অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মন্ত্রী স্পের (যুদ্ধ চালনার অপরাধে কুড়ি বৎসর জেল খেটে বেরুবার পর) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন, সমস্ত আকাশ টকটকে লালে লাল হয়ে গিয়েছে, আমাদের হাত-মুখ যেন সে লালের ছোপে লাল হয়ে গিয়েছে। লালের সেই লীলা-খেলায় আমাদের মন যেন অদ্ভুত এক চিন্তায় নিমজ্জিত। হঠাৎ হিটলার তাঁর অন্যতম মিলিটারি অ্যাডজুটেন্টের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গাদা গাদা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এবারে বিনা রক্তপাতে আমরা সফল হব না।'

আমার এক বোন এবং সিলেটের আরও কে একজন বলছিলেন, তাঁরা ১৯৭১-এর ২৫ মার্চে রক্তে রাঙা অস্বাভাবিক টকটকে লাল সূর্যাস্ত দেখেছিলেন। এঁদের দু জনাই অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ, সর্ব কুসংস্কার বর্জিত। তবু নাকি তাঁদের মনে এক অজানা অস্বস্তি অনেকক্ষণ ধরে জেগে রয়েছিল।

হিটলারি হেকমত

যাক সে-কথা। খুব একটা দূরে চলে আসিনি। আর সামনেই ৩ সেপ্টেম্বর। কুলোঁদ্র-রিবেনট্রপ দু জনাই যেন আজন্ম মূক বধির— এতক্ষণ অবধি। অতঃপর কুলোঁদ্র প্রতিটি শব্দ যেন হরফ গুনে গুনে পড়ে গেলেন জর্মনির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঘোষণা। ঘোষণান্তে এস্থলে রিবেনট্রপ ত্রিবিধ পন্থার যে কোনও একটা বেছে নিতে পারেন। নীরবে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে পারেন, কিংবা বলতে পারেন তিনি এ ঘোষণা আন্তর্জাতিক বিধিবিধান-বিরোধী বে-আইনিরূপে গণ্য করে ঘোষণাটা রিজেক্ট করছেন, কিংবা ঘোষণা সম্বন্ধে আপন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। রিবেনট্রপ কষায় বদনে, প্রকৃতিদত্ত তাঁর বেতমিজ কণ্ঠে অতি দীর্ঘ এক বিবৃতি পড়ে যেতে লাগলেন— অবশ্য দুই পালোয়ানই তখনও ঝাণ্ডার ডাণ্ডার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়ন চড়ন-নট-কিচ্ছু— দফে দফে বয়ান করলেন ফ্রান্সের অগুনতি অপরাধ, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন গুনাগার হারামি একমাত্র ফ্রান্সই, জর্মন গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতাটি। সর্বশেষে কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, যুদ্ধ যদি লাগে তবে ফ্রান্সই সর্বাংশে দায়ী।

মসিয়ো কুলোঁদ্র স্থিরদৃষ্টিতে রিবেনট্রপের দিকে তাকিয়ে দুটিমাত্র শব্দ বললেন, 'লিস্তোয়ার জ্যুজরা'— 'বিচারিবে ইতিহাস।' বৃথা বাক্য। ইতিহাসই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ বিচারক।

প্রথম দর্শনের মাথা নিচু করে বাও করা থেকে মাষা পরিমাণ কমিয়ে পুনরায় বাও করার আভাসটুকু ছুঁইয়ে কুলোঁদ্র ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। ব্যস। ইরানি জবানে বলে, 'অতঃপর আলোচনার গালিচাখানি গুটিয়ে গুটিয়ে রোল করে বোন্দা পাকিয়ে ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হল।'

এ ধরনের ঘোষণার শেষে প্রথম পাঠেই, উভয় দেশের ইলচির স্বদেশ প্রত্যাগমন ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দু-একটি নিতান্তই প্রতি পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ফরমুলা থাকে। আমার টায়-টায় মনে নেই। এ দুনিয়ায় নাতিহ্রস্ব জিন্দেগির চন্দ রোজের মুসাফিরিতে এ-তাবৎ 'তোকে আমি দেখে নেব চারটি মাত্র শব্দ বলে কাউকে নিরস্ত্র কথা-কাটাকাটির নির্জলা যোঝাযুঝিতেও দাওয়াত জানাতে এ ভীরু আদার ব্যাপারি ধারকর্জ করেও হিম্মৎটুকু জোগাড় করতে পারেনি— সে রাখবে মানওয়ারি জাহাজের খবর!

www.pathagar.com

কাবুলি কায়দা

বেলুচিস্তানে কয়েকজন হোমরাচোমরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তা তাঁরা যতই গেরেমভারি হন না কেন, তাই নিয়ে আফগানিস্তান হিটলারি হেকমতে তুলকালাম কাণ্ড করবে অর্থাৎ সেটাকে আন্তর্জাতিক আইনে যাকে বলে 'কাজুস বেল্লি'— 'ওয়ার কজ', 'যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট কারণ' এ কথা বলবে না। অবশ্য আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে খুন-জখমের মতো মারাত্মক ব্যাপারের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রায়ই শেষটায় দেখি, অতি তুচ্ছ 'কারণে' বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। বড় বড় যুদ্ধের পিছনে আকছারই দেখা গেছে, যে কারণে আখেরে লড়াই শুরু হয় সেটা কোনও কারণই নয়, ইতিহাস বার বার সে সাক্ষ্য দেয়। উপস্থিত আফগান পক্ষ কীভাবে তাঁদের বক্তব্য, আপত্তি, প্রতিবাদ, শাসানো যেটাই হোক পেশ করবেন বা চোখ রাঙাবেন তার ওপর আখেরি নতিজা অনেকখানি নির্ভর করছে। আমরা তাই একাধিক কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারি মাত্র :

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বয়ং সরদার দাউদ বা তাঁর প্রতিনিধি : বেলুচিস্তানে এসব কী হচ্ছে?

মি. ভুট্টোর নির্দেশ অনুযায়ী পাক রাষ্ট্রদূত (যদি মোলায়েম হওয়ার নির্দেশ থাকে) 'হেঁ হেঁ হেঁ! কিছু না, কিচ্ছুটি না।' (যদি গরম নির্দেশ থাকে) 'তোমার তাতে কী ভেটকি-লোচন?'

আফগান পক্ষ : 'বটে! আমার তাতে কী? এসব জুলুম চলবে না। দেশ শান্ত করো।'

পাক পক্ষ : 'ওটা আমার ঘরোয়া ব্যাপার।' এই ঘরোয়া-ব্যাপারের জিগির গেয়ে গেয়ে পাকিস্তানের গলায় কড়া পড়ে গেছে।

আ প : 'নিতান্তই আন্তর্জাতিক, দ্বি-রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এটা। দেশের লোককে বেধড়ক ঠ্যাঙ্গাবে, তারা শুধু বেলুচ নয়, পাঠানও বিস্তর, তারা সীমান্ত পেরিয়ে আমার দেশে ঝামেলা লাগাচ্ছে, এদেশের পাঠানকে তোমার দেশের পাঠান দিবারাত্তির তাতাচ্ছে, তোমার সঙ্গে লড়াই দিতে।'

পা প : 'তোমার দেশ তুমি সামলাও।'

আ প : 'ইন্ডিয়ার ঘাড়ে একবার লক্ষ লক্ষ বাঙালি চাপিয়ে যে আক্কেল সেলামিটা দিলে তার পরও তোমার হুঁশ হল না?'

পা প : 'কেন, খারাপটা কী হল? ইয়াহিয়া গেছে, বেশ হয়েছে। আমরা 'নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলুম তাক ডুমাডুম ডুম।' আমরা ইয়াহিয়া দিয়ে ভুট্টো পেলুম, তাক ডুমাডুম ডুম। জ্ঞানে লুকমান, বিচারে সুলেমান, বুদ্ধিতে—'

আ প : (বাধা দিয়ে) 'সুলেমান শব্দের সঙ্গে মিল একটা বিশেষ জনের আছে, কিন্তু—'

পা প : (বাধা না মেনে)

"সুধা পানে এজিদ শা।
জঙ্গি লড়ায়ে কামাল পাশা ॥
ফলসফাতে আফলাতুন—"

অকস্মাৎ দৌবারিকের প্রবেশ। হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'বাঙ্গালা দেশ, না কী যেন নাম, সেখান থেকে কিছু লোক সোঁদরি, না কী যেন লকড়ি, না লাঠি— নিয়ে এসেছে।'

আ প : 'কী তাজ্জব! পাকিস্তানের লোকটা গেল কোথায়?'

www.pathagar.com

ঘরে বাইরে, জেলে বাইরে

বিংশ শতাব্দীর যে একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিবর্তন দেশের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একদা চিন্তিত করে তোলে এবং আজ যেটা নিতান্ত বুড়ো-হাবড়া ছাড়া আর-সবাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, সেটা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে। আজ যদি ঢাকাতে কোনও একটা ঘটনা সর্বসাধারণের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পরদিন তারই ফলে দেখা যায়, আপিস-আদালত-দোকানপাট বন্ধ, বেতার কথা কয় না, কাগজওয়ালা কাগজ দেয়নি আর রাস্তায় রাস্তায় বিরাট বিরাট মিছিল কুল্লে শহরটাকে গিলে ফেলল, শুধু— শুধু কোনও মিছিলে একটিমাত্র ছাত্র— সরি— ছাত্রীছাত্র নেই, তবে আপনার-আমার মন কী ধরনের ঝাঁকুনি, বরঞ্চ বলা উচিত, কী ধরনের বিজলির শক্ খাবে সেটা কল্পনা করতে পারেন কি? কারণ শুধিয়ে যদি শুনতে পান, ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে হোস্টেলে দোরে খিল দিয়ে পাঠ্যবই পড়ছে এবং বলছে, 'প্রসেসনে যোগ দিলে লেখা-পড়া করব কখন? তোমরা মিছিল করে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, জুন্তাতন্ত্র, যে ঢপের গবরনমেন্টই কায়েম কর না কেন, দু দিন বাদে সেটা চালাবার জন্য আমরাই তো হব মন্ত্রী, সেক্রেটারি, পার্লামেন্টের মেম্বার, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার। এখন যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, এডমিনিসট্রেশন গয়রহ্ ভালো করে না শিখি, তবে সরকারের রূপটা পাল্টে কিই-বা এমন পাকা ধান ঘরে তুলবে তোমরা?'

সত্যিই তো। '৪৭-এ যখন ভারত সরকার তৈরি হল, তখন দেখা গেল যেসব আত্মোৎসর্গকারী নেতারা মন্ত্রী হলেন, যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার হলেন, তাঁদের বেশিরভাগই কলেজজীবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কাটিয়েছেন জেলে জেলে। মাঝে-মিশেলে আম-কাঁঠালের ছুটিটা-আসটা পেয়েছেন বটে, কিংবা অতীব অকারণে হঠাৎ করে গাঁধী-বড়লাটে একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়ার বরকতে এবং ওই সুবাদে জেলগুলোর চুনকাম-মেরামতি, তদুপরি জেল-সাম্রাজ্যের ইনসপেক্টর জেনারেল গোরা রায়দের বহুদিনের প্রাপ্য 'হোম' যাওয়ার মুলতুবি ফার্লো ছুটি যখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এহেন ত্র্যহস্পর্শ উপলক্ষে তাঁদেরও কিছুদিনের তরে নেটিভ হোম দেখার জন্য মহামান্য সম্রাটের রাজসিক অতিথিশালা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে— এ-সত্যটাও অস্বীকার করা যায় না। ততোধিক অস্বীকার করা যায় না, কেউ বেরিয়েছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কেউ ডিগ্রিহীন জ্বর-যক্ষ্মা নিয়ে, কেউ-বা স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে বাড়ি এসেছেন, যাতে করে তাঁর হাড্ডিগুলো বাপ-পিতেমোর হাড্ডির সঙ্গে সম্মিলিত হয় : সরকারি ইংরেজিতে বলা হয় যাতে করে 'হিজ বোনস আর গ্যাদার্ড আনটু হিজ ফোর-ফাদার্স', অথবা একই শ্মশানে পিতৃপুরুষের ভস্মের সঙ্গে তাঁর ভস্ম মিলিত হবে বলে।

সুস্থই হোন আর নিম-মরাই হোন, ওই চন্দরোজের ফুরসতে তাঁরা যে মার্শাল মার্কস কেইনস লাসকি পড়ে বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে যাবেন কিংবা দেশের বাজেট কীভাবে চৌকস ব্যালানস করে বানাতে হয়, অথবা নামকে-ওয়াস্তে যেসব এসেমব্লির তখনও সেশন হচ্ছে, সেগুলো নিত্যদিন এটেন্ড করে তর্কাতর্কি, নন-কনফিডেন্‌সের ঘোল খাওয়ানোর কায়দা-কেতা রপ্ত করে নেবেন এমনতরো দুরাশা করা যায় না।

www.pathagar.com

আমার পাপ-মন থেকে কেমন যেন একটা বেয়াদব সন্দেহ কিছুতেই দূর হতে চায় না, মহাত্মা গাঁধী তাই বোধহয়, স্বরাজ লাভের পর সভয়ে পার্লামেন্টের ছায়াটি পর্যন্ত মাড়াননি। হিন্দু মহাসভার হামলাতে কুপোকাৎ হয়ে যেতেন না তিনি? আপনারা বলবেন, 'ক্যান? বারিসডরিডা তেনার পাস করা আছিল না?' হঃ! খুব আছিল! কলকাতা পার্কে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর জন্য যখন একদিন আসামি হয়ে দাঁড়ালেন, ততদিনে বেবাক ব্যারিস্টারি বিদ্যে কর্পূর হয়ে উবে গিয়েছে— হাওয়ায় হাওয়ায়! সঠিক মনে নেই, কাকে উকিল পাকড়ে ছিলেন। আমাদের চাটগাঁয়ের সেনগুপ্তকে? তিনি তখন জেলে না বাইরে, তা-ও ভুলে গিয়েছি। বাইরে থাকলে তাঁকেই ধরা উচিত ছিল। তাই বলছিলুম, আইনের এলেম যদি তাঁর পেটে এক দানাও থাকত তবে কি তিনি নিদেন একটা ডেপুটি মিনিস্টারও হতে পারতেন না। পক্ষান্তরে স্মরণে আনুন, গাঁধী যে রকম পার্লামেন্টের মুখদর্শন করেননি, লেট ব্যারিস্টার জিন্নাও হুবহু তেমনি জেলের মুখ দর্শন করেননি। তিনি কাইদ-ই আজম, সদর-ই-পাকিস্তান হবেন না, তো হবে কে? গাঁধী?

এই জেলের কথা যখন নিতান্ত উঠলই তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। তিনি তো কোনও প্রকারের দেশ-সেবা করেননি, কোনও প্রকারের 'বাণী' রেখে যাননি, তাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ যখনই খবর পেতেন তাঁর কোনও প্রাক্তন ছাত্র, কোনও ছাত্র বা শিক্ষকের আত্মীয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জেল থেকে বেরিয়েছে বা তার কোনও পরিচিত রুগ্ণ যুবার পিছনে পুলিশ বড্ডবেশি তাড়া লাগাচ্ছে, সে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলতেন, 'এখানে থাক। শরীরটা সারিয়ে নে। লাইব্রেরি রয়েছে। পড়াশোনা কর।' যদি তাঁর মনে হত, পুলিশ নাছোড়বান্দা, তা হলে টেগার্টকে জানিয়ে দিতেন, 'আমার এখানে অমুক এসেছে, রুগ্ণ শরীর সারাতে। আমি কথা দিচ্ছি, সে যতদিন এখানে আছে, অ্যাকটিভ পলিটিকস করবে না।' কেন জানিনে, টেগার্ট কবির কথা শুনতেন এবং আরেকটি ঘটনার কথা আমি ভালো করে জানি। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এক যুবা, এ-দেশে কম্যুনিজমের উদয়-কালে সে মতবাদের অত্যুৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক হয়ে যায়। টেগার্ট যে কোনও কারণেই হোক, তাঁকে ধরতে চাননি। কবিকে জানান, 'অমুককে বলুন না, সে মস্কো চলে যাক। কম্যুনিজম স্বচক্ষে দেখে আসুক। আমি তাকে পাসপোর্ট দেব।' হয়তো টেগার্ট ভেবেছিলেন, দূর থেকে অনেক জিনিসই সুন্দর দেখায়, কবি বায়রনের ভাষায়,—

"সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
দূর হতে মনোলোভা।"

যুবার সঙ্গে আমার বার্লিনে দেখা হয়। টেগার্টের আশা আধাআধি সফল হয়েছিল। ভদ্রলোক তখন স্তালিনের নাম শুনলে ক্ষেপে যেতেন। মস্কো থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। তাঁর মতবাদ হয় স্তালিনের পছন্দ হয়নি কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, তাঁকে রাশা ছেড়ে বার্লিন চলে আসতে হয়। কিন্তু মার্কসিজমে দৃঢ়তর বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে তিনি কম্যুনিজমের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন।

www.pathagar.com

পলিটিক্‌স্‌-হীন ছাত্রসমাজ?

কল্পনাও করা যায় না, কি গুমোট গরমে এই ঢাকায়, কি কাবুলের মোলায়েম ঠাণ্ডায়— আজকের দিনে।

গুন গুন করছি,

রজনী নিদ্রাহীন
দীর্ঘদগ্ধ দিন,
আরাম নাহি যে জানে।
ভয় নাহি ভয় নাহি,
গগনে রয়েছি চাহি
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে ॥

রাত দুটো বাজতে চলল। আল্লা মেহেরবান। ঝঞ্ঝা থাক মাথায়। ঝঞ্ঝার গুরু সাইক্লোনের কৃপায় এ-দেশটা যায়-যায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বুড়িগঙ্গা ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ রাইফেলসের বিরাট মাঠ পেরিয়ে, চাঁদমারি টিলাটার বেণুবনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু হায়, কোথায় সে বেণুবন— দেড় বছর আগেও যা ছিল? টিলাটার নিচ দিয়ে বারো মাস বয়ে যায় ক্ষীণ জলধারা, কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে এগোয়, ছোট্ট নালা বেয়ে সাত-মসজিদ-রাস্তার দিকে। আর বর্ষায় তার কী দাপট! এই এখন মৃদু পবনে আকাশ-ছোঁয়া বাঁশ দুলে দুলে এ ওর গায়ে পড়ে মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী শোনাত, কানে কানে, কত গোপন গানে গানে। আর বর্ষার আকাশ-বাতাসের দাপটের সময় দেখেছি, অরণ্য হতাশ প্রাণে, আকাশে ললাট হানে— শহিদের মাতারা যেন আকাশে মাথা কুটছে, বিরাম না মেনে চলছে তাদের ক্রন্দন!

সে বেণুবন দেড় বছরে আজ প্রায় নিঃশেষ। যে পারে, যার ইচ্ছে কেটে নিয়ে গেল প্রথম দীর্ঘাঙ্গীদের। এমন কচি বাঁশগুলো যখন কাটে, তখন আমি দু কানে আঙ্গুল গুঁজে দাঁতে দাঁত কাটি। হাউসমানের কবিতায় পড়েছিলুম, হতভাগার ফাঁসি হবে পরের দিন ভোরে। নিরেট অন্ধকারে চোখ মেলে সমস্ত রাত ধরে শুনছে, খট খট শব্দ। বাইরে ফাঁসিকাঠ তৈরি করছে মিস্ত্রিরা— তারই পেরেক ঠোকার খট খট আওয়াজ রাতভর। ওই কাঠেই সে ঝুলবে; ঘাড়ে দড়ি বেঁধে দেবে ফাঁসুড়ে। হাউসমান কবিতা শেষ করেছেন এই বলে, যে ঘাড় খুদাতালা তৈরি করেছিলেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে... মট করে মটকাবার জন্য না।

শেষ বাঁশ কাটা হয়ে গেলে আমিও শান্তি পাব। কিন্তু মরবে আরেক জন। যে-টিলাটার উপর চাঁদমারির পাঁচিল, সেটা নালার সম্বৎসর বয়ে যাওয়া পানিতে, বিশেষ করে বর্ষার প্রবল আঘাতে যেন ক্ষয়ে গিয়ে ধস নেমে পাঁচিলটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে না পড়ে, তাই টিলাটার সানুদেশ, নালার কিনারা অবধি সমস্তটা ছেয়ে বাঁশ লাগিয়েছিলেন সেই দূরদর্শী গুণী যিনি চাঁদমারির পুরো প্ল্যানটা তৈরি করেছিলেন— তিনি বাঙালি। আমার মতো মূর্খও বাঁশবনের তত্ত্বটা বুঝতে পারে। এখন অন্ধকার— কৃষ্ণা দশমী; বলতে পারব না, আর কটা কচি বাচ্চা বাঁশ অবশিষ্ট আছে। দিনের আলোতে গুনতে দেড় আঙ্গুলের বেশি লাগবে না।... লোকে

www.pathagar.com

বলে, 'যাক্ না কেন জোয়ার জলে। খাক্ না কেন বাঘে। কোন অভাগা জাগে।' আমার তাতে কী! ভাঙবে ব্যাটা পাঁচিলটা।

ছাত্ররা বলেন, "পেশাদারি পলিটিশিয়ান দেশের কথা যত না ভাবে, নিজের স্বার্থের কথা ভাবে ঢের ঢের বেশি (নিউগেটের পর কে অস্বীকার করবে এ তত্ত্বটা?)। আমরা এখনও সংসারে জড়িয়ে পড়িনি। আমরা করাপট হব না, চট করে। পারলে দু চার জন করাপট প্রফেশনালদের ঠ্যাঙ্গাতেও আমাদের বাধবে না।" কথাটার মধ্যে ও বাইরে গভীর জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস স্বপ্রকাশ। প্রাচ্যের পলিটিকসে করাপশন বেশি বলেই এ ভূখণ্ডে প্রথম ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। কাবুল পর্যন্ত পৌঁছতে একটুখানি সময় লেগেছে। বছর দশেক পূর্বে কাবুল পার্লামেন্টে বোর্কাহীন, অনবগুণ্ঠিতা একজন মহিলা সদস্যা লেকচার দিতে উঠলে, প্রাচীন-পন্থি কট্টর আরেক সদস্য ছুটে গিয়ে, তাঁকে আক্রমণ করে, তাঁর জামা-কাপড় ছিঁড়তে আরম্ভ করে। নিরুপায় হয়ে তিনি পার্লামেন্টগৃহ ত্যাগ করে প্রাণপণে ছুটে গিয়ে একটা হোস্টেলে ঢোকেন।

ছাত্ররা তাঁকে আশ্রয় দেয়। খবর পেলুম এবারে তারা খোলা ময়দানে নেমেছে। তাদের ভিতর মাও, মস্কো, র‍্যাডিকাল তিন দলই আছে। ভাবছি, সিরিজের শিরোনামটা পাল্টাব কি না।।

* * *

মোন-জো দড়োর বংশধর দড় বেলুচ

'মৃত', ইংরেজি 'মর্টেল' 'মার্ডার', ফরাসি 'মর', জর্মন 'মর্ড', ফারসি 'মুর (দন)', গ্রিক 'ব্রতস'— ইন্ডো-ইউরোপিয়ান সর্ব ভাষাতেই 'মরা' অর্থে সংস্কৃত 'মৃ' = 'মরা' পাওয়া যায়। বর্তমান দিনে উত্তর ভারতের সব ভাষাতেই ওই 'মৃ' পাওয়া যায়, বাংলায় 'মরা', হিন্দিতে 'মরণা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিন্ধিতেও ওই 'মো' দিয়েই 'মর' মানুষের সর্বশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত কর্মটি প্রকাশ করা হয়। এই 'মো'-এর সঙ্গে 'ন' যোগ দিয়ে 'মৃত' শব্দের বহুবচন নির্মাণ করা হয় : ফলে সিন্ধিতে 'মোন' শব্দের অর্থ 'মৃতরা'। উচ্চারণ করার সময় সিন্ধিরা আমাদের মতো 'মোন' বা 'মন'-এর মতো করেন না। আমরা, পূর্ব বাংলায় যে রকম মেঠাই 'মোহনভোগ' উচ্চারণ করার সময় 'মোহন' শব্দের 'হ'টি 'অ'-এ পরিণত করে 'মো'টা আরেকটু লম্বা করে দিই, সিন্ধিরাও ঠিক তেমনি উচ্চারণ করেন, যেন শব্দটা 'মোঅন'। বাংলায় আমরা যে রকম 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' বাক্যটিতে বড়লোকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পীরিতির সম্পর্ক বোঝাবার জন্য 'র' অক্ষর যোগ দিই, কিংবা ইংরেজিতে 'ফুলস প্যারাডাইজ'— 'আহাম্মুকের স্বর্গ', 'ডগস টেল'— কুকুরের ল্যাজ বাক্যে এপসট্রফি এবং 'এস' অক্ষর যোগ করি, হিন্দুস্তানিতে 'রহমতকা বেটা'— রহমতের ছেলে বাক্যে 'কা' জুড়ি, সিন্ধিরা তেমনি 'মৃতদের টিলা' আপন ভাষাতে লেখেন 'মোন-জো দড়ো', উচ্চারণ করেন প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে— 'মোঅন' (কিন্তু 'মো' আর 'অ'-এর মাঝখানে আরবির হামজার মতো সামান্য আমরা একটুখানি থেমে যাই, সেটা করা হবে না, 'মো'-র ও-কারটা শুধু দীর্ঘতর করতে হবে) 'জো দড়ো'।

www.pathagar.com

প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার ভগ্নস্তূপ স্থলে আছে, তার আশপাশের আধুনিক জনগণের মধ্যে একটা বহুদিনকার কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল, ওই টিলার নিচে বিস্তর মৃতজন রয়েছে। সঠিক কিন্তু তড়িঘড়ি অনুমান করে বসবেন না যে ওই (লারকানা) অঞ্চলের জনপদবাসী— সিন্ধুর চার-পাঁচ হাজার বৎসরের মৃত, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার স্মরণে টিলা অঞ্চলের নাম দিয়েছিল মোন-জো দড়ো। বস্তুত তাদের ধারণা ছিল, একদা ওখানে প্রাচীন বৌদ্ধদের বিহার-ভূমি ছিল।

আমি লোকমুখে যা শুনেছি সে অনুযায়ী পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই টিলাটি প্রথম দেখেন, তখন এটাকে কোনও বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কারণ হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়ে সিন্ধু দেশের রাজা যদিও হিন্দু ছিলেন, তবু সে দেশে যথেষ্ট বৌদ্ধবিহার সঙ্ঘারাম আছে। যতদূর মনে পড়ে, রাখালদাস টিলা খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পান বৌদ্ধ-নিদর্শন, আরও গভীরে যাওয়ার পর বেরুল এমন সব বস্তু, যা রাখালদাসের মতো সুপণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক পৃথিবীর কোনও যাদুঘরে বা তার দর্শনীয় বস্তুর ছবিতে দেখেননি। অর্বাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক হলে হয়তো এগুলো অবহেলা করত, এবং চিরতরে না হলেও বিশ্বজন হয়তো বহু শতাব্দী অপেক্ষা করার পর এ সভ্যতার সন্ধান পেত। রাখালদাস প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন এর অনন্যতা ও নিশ্চয়ই 'ইউরেকা' হুঙ্কার রব ছেড়েছিলেন।

গোড়াতে বহু পণ্ডিতই ধারণা করেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতা উত্তর সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব (হারাপ্পা) অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে দেখা গেল, সুদূর প্রসারিত ছিল এ সভ্যতা। তা হলে সমস্যা দাঁড়ায়, এত বড় বৃহৎ সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করাটা তো খুব একটা সম্ভাব্য সাধারণ ব্যাপার নয়। আমি কোনও সদুত্তর পাইনি, এটা না বললেও চলবে।

এ সভ্যতা অন্তত বেলুচিস্তান অবধি যে সম্প্রসারিত ছিল সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যকার মোন-জো দড়ো অঞ্চলের সিন্ধিদের কোনও-কিছুতেই যে-রকম প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না (ওই লারকানা অঞ্চলের অধিবাসী মি. ভুট্টো আজ সেই বিদগ্ধ অতিপ্রাচীন সভ্যতার বংশধররূপে বড়ফাট্টাই করেন কি না, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা বলতে পারবেন না) ঠিক তেমনি অদ্যকার বেলুচদের কি চিন্তা, কি জীবনধারায় সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নমাত্র নেই। বস্তুত (ভবিষ্যতের) পখতুনিস্তান, বর্তমান আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কমানিস্তান প্রভৃতি ভূখণ্ডে যেখানে পর পর বৌদ্ধ সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা, সর্বশেষে হিন্দু-বৌদ্ধ মিলিত সভ্যতা প্রচলিত ছিল সেখানে এগুলোর সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এদের জীবনের উপর ওরা কোনও প্রভাবই রেখে যায়নি। এমনকি ইউরোপের শিক্ষিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হিদেন গ্রিক, রোমান এমনকি বর্বর টিউটন যে গভীর দাগ কেটে গেছে তার শতাংশের একাংশও না। পরবর্তীকালে এই বাংলাদেশ যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দেশের চাষা-জেলে যতখানি ইসলাম মেনে চলে, পাঠান বেলুচ উজবেক, কিজিলবাশ (ইয়েহিয়ার কওম) তার দু আনা পরিমাণও না। এবং আমার পক্ষে অট্টহাস্য সংবরণ করা বড়ই মুশকিল মালুম হয়, যখন পাঞ্জাবি সেপাই, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত পাঞ্জাবি মুসলমান আপন ইসলাম নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করে,— ডান হাতে গেলাস বাঁ হাত সাদরে সম-রতি-সখার কাঁধে রেখে। ব্যত্যয় অবশ্যই আছে; উপস্থিত সে আলোচনা থাক।

www.pathagar.com

বেলুচ-পাঠানদের মনোবৃত্তি বুঝতে হলে উজান গাঙে আমাদের চলে যেতে হবে হাজার চারেক বছর পূর্বে। পণ্ডিতরা বলেন, মোটামুটি ওই সময়েই আর্যেরা ইরান হয়ে এ-দেশে আসে। এদের এক অংশ ইরানে বসতি স্থাপন করে। গোড়ার দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য এদের প্রধান পন্থা ছিল, গবাদি পশুপালন এবং পরসম্পদ লুণ্ঠন। এবং আর্যদের দেশ-দেশান্তরে অভিযানের সময় যারা যে অঞ্চলে রয়ে গেল তারা স্থায়ী বসবাস নির্মাণ না করে যাযাবর বৃত্তিই প্রচলিত রাখল।...এ স্থলে স্মরণে রাখা উচিত, যৎসামান্য কৃষিকর্ম দ্বারা মানুষ জীবনধারণ করতে পারে না। উন্নত কৃষিকর্ম শিখতে মানুষের হাজার হাজার বৎসর সময় লেগেছে।

খ্রিস্টপূর্ব ছয়শত বৎসর পূর্বে ইরানের কিছু লোক কৃষিকর্ম ও কৃষির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরে গিয়েছে। এদের নেতা ছিলেন জরথুস্ত্র (ইংরেজিতে জেরোআস্তর, চলতি ফারসিতে জরতুস জরখুস— জর্মন দার্শনিক নিৎশে কিন্তু জর্মন জরথুস্ত্রই লিখেছেন)। ইনি ইরানের বল্খ অঞ্চলের রাজা গুশতাসপকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন— ভারতের পারসি সম্প্রদায় এই জরথুস্ত্রী ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রত্যেক ধর্মের একটা নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকে। জরথুস্ত্র রাজা গুশতাসপকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, যাযাবরবৃত্তি লুণ্ঠন ও শুধুমাত্র গো-পালন দ্বারা কোনও সমাজ চিরতরে আপন খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে পারে না, এবং যারা প্রতি বৎসর পালিত পশুর খাদ্য ঘাস-পাতা-ভরা উর্বরা জমির সন্ধানে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে বাধ্য, অর্থাৎ যারা চিরদিনের যাযাবর, তাদের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতেই কোনও সভ্য-সমাজ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন আরম্ভ হল সংগ্রাম দু দলে— যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উন্নতমানের কৃষিকার্যে সক্ষম হয়ে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করে সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ জরথুস্ত্র-গুশতাসপের অর্থনীতিতে বিশ্বাসী— এবং যাদের রক্তে নিত্য নিত্য স্থান পরিবর্তনের, ঘুরে ঘুরে মরার নেশা, যে নেশা পরিপূর্ণ সভ্য মানুষের শরীর থেকেও কখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় না, যে নেশার আবেশে বিদগ্ধ নাগরিক কবি গেয়ে ওঠে,

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
  আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু
  দিগন্তে বিলীন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে
  সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
  সকল বাধাহীন ॥"

গৃহী এবং যাযাবরে এ দ্বন্দ্ব চিরপুরাতন তথা অতি সনাতন, নিত্য পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়। কথিত আছে চেঙ্গিসের মঙ্গোলরা বিস্তর রাজ্য জয় করার পরও যখন যাযাবর বৃত্তি ছাড়তে বিমুখ, তাঁবু ছেড়ে প্রাসাদে থাকতে নারাজ তখন চেঙ্গিসের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে রাজত্ব করা যায় না।' (অত্যল্প ভিন্নার্থে বলা চলে 'ইয়াহিয়া ট্যাংকে চড়ে বঙ্গরাজ্য জয় করতে পারেন, কিন্তু ট্যাংকে চড়ে রাজত্ব করতে পারবেন না)।' ইউরোপে এখনও বিস্তর বেদে ঘুরে বেড়ায়— হিপি তাদেরই ভেজাল

www.pathagar.com

সয়াবিন তেল— কোনও সরকারই বিস্তর প্রলোভন দেখিয়েও ওদের কোথাও বসাতে পারেননি। ... কথিত আছে জরথুস্ত্র যখন যাযাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত গৃহীদের জন্য পরম প্রভু আহুরমজদার পূজা করছেন (জরথুস্ত্রিরা অগ্নির উপাসনা করে না, অগ্নিকে সর্বাধিক পাক সৃষ্টিরূপে গভীর শ্রদ্ধা জানায়।) তখন শত্রুপক্ষ কর্তৃক নিহত হন।

বেলুচি ভাষা ও পাঠানের পশতো ভাষা দুই-ই প্রাচীন জেন্দে (জরথুস্ত্রীয় ইরানি ভাষা; এই ভাষায় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা রচিত বলে একে আবেস্তান বা আবেস্তাও বলা হয়) থেকে উৎপন্ন, বা বিবর্তিত, বলা যেতে পারে। প্রাগুক্ত সংগ্রামে বেলুচ ও পাঠান হেরে গিয়েও সম্পূর্ণ হারেনি। আড়াই হাজার বছর পরও তারা গৃহী বটে, যাযাবরও বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর তাদের বৃহৎ অংশ উর্বর চারণভূমির সন্ধানে জরু-গরু, ভেড়া-খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, চীন কোনও দেশের কোনও সীমান্তের রত্তিভর পরোয়া তারা করে না। কারও ধড়ে দুটো মুণ্ডু নেই,— দাউদ, ভুট্টো, শাহ্‌, কারওরই— যে, ওদের কাছ থেকে পাসপোর্ট চাইবার হিম্মৎ-হেকমতি দেখাবেন। ওই অতি পুরাতন যাযাবর বৃত্তির সঙ্গে অতি অবশ্যই তারা বহু সনাতন লুণ্ঠন-ধর্মটি ন সিকে তোয়াজ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বস্তুত ওইটেই তাদের প্রফেশন, চাষবাস নিতান্তই একটা নগণ্য 'হবি'— স্ট্যাম্প কালেক্ট করার মতো। পাকিস্তানের শহুরে পাঠান-বেলুচ অটোনমি চায়— না স্বাধীন হতে চায়— অতটা খবর নেবার মতো ফুরসত আমার নেই, অত এলেম আমার পেটেও ধরে না। কিন্তু প্রশ্ন, শহরের বাইরে যারা থাকে তারা কবে কোন রাজাকে খাজনা-ট্যাকসো দিয়েছে, শুনি। উল্টো তারা সাবসিডি পায়। খাইবারপাসের দু-পাশের পাঠানদের কারও বাচ্চা হলে প্রথম ছুট দেয় পেশাওয়ারবাগে। সেখানে নামটা 'পত্রপাঠ' রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়ে তবে যায় ধীরে-সুস্থে মোল্লার বাড়িতে। তিনি ততোধিক আস্তে-ব্যস্তে একটা তোলা নাম ঠিক করে দেন— কী যেন একখানা কেতাব থেকে, যদিও সুবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঠানিস্তান জানে, তিনি একবর্ণও পড়তে পারেন না, আলিফের নামে ঠ্যাঙা!

এরা আরও স্বাধীন হবে কী করে? গোল মার্বেল কি গোলতর করা যায়? স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট বলেননি, লিলি ফুলটিকে রঙ মাখিয়ে আরও রঙিন করতে যায় কে?

আর যদি নিতান্তই কোনও পাঠানকে শুধোন, 'হে ইয়ার! পাকিস্তান-হিন্দুস্তান যদি তোমাদের নিয়ে লড়াই লাগায়, তবে তোমরা কোন পক্ষ নিয়ে লড়বে?' তবে সে-পাঠান অনেকক্ষণ ধরে তার পাগড়ির ন্যাজটা দড়ি দলার মতো পাকাতে পাকাতে বলবে, 'আগা জান! দুটো কুকুর যদি একটা হাড্ডি নিয়ে লড়ালড়ি লাগায়, হাড্ডিটা কি কোনও পক্ষ নিয়ে লড়ে?'

ওয়াটারগেটের পানি সিন্ধুজল

ফারসিতে বলে, 'দের আয়েদ, দুরুস্ত আয়েদ' 'দেরিতে যা আসে, দুরস্ত হয়ে আসে।' 'দের'— তেহরানের ফারসিতে 'দীর'— শব্দটা, 'ধীরে ধীরে' অর্থও ধরে। ওয়াটারগেটের নোনাজল পিণ্ডিতে পৌঁছেছে ধীরে ধীরে। এমনিতেই বাংলায় বলে 'দেখি না, শ্রাদ্ধের জল কদ্দুর অবধি গড়ায়'— তাতে এসে জুটল গেট ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ওয়াটারগেটের পানি, ওদিকে সিন্ধুতে বান জেগেছে। এক্কেবারে খাজা তেরোস্পশ্‌শ (ত্র্যহস্পর্শ), মাইরি! বলবে

'সামবাজারি' খাস কলকাত্তাই। সিন্ধুর এই বান বার বার সাত বার মোন-জো দড়োকে নাকানি-চুবানি খাওয়ালে পর ওখানকার লোক তিতিবিরক্ত হয়ে জরু-গরু নিয়ে কেটে পড়ল, কিংবা হয়তো সাত বারের বার সাত হাত পানিমেঁ ঘায়েল হল। কিন্তু এ আন্দাজটা বোধহয় ধোপের পানিতে টেকে না। চল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর আগে মার্শাল সাহেব যখন বিরাট ডবল ইটের থান মার্কা ঢাউস তিন-ভলুমি মোন-জো দড়ো প্রকাশ করলেন তখন আর পাঁচজনের মতো আমিও পাণ্ডিত্য ফলাবার তরে তার উপর হদ্দমুদ্দ হয়ে আছড়ে পড়েছিলুম। মোন-জো আখেরে বানের জলে খতম হয়েছিল কি না, এ প্রশ্নটা তখন শুধোলে ভালোমন্দ, অন্তত এ-বাবদে লেটেসট্ থিয়োরি কী সেটা বলতে পারতুম; লেটেসট্ বললুম এই কারণে যে, কেতাব বেরুবার আগে পত্র-পত্রিকায় সিন্ধুসভ্যতা নিয়ে এন্তের আলোচনা বাদ-প্রতিবাদ তো হয়েই ছিল, বেরোবার পর দুনিয়ার কুল্লে গুণী-জ্ঞানী তত্ত্ববিদ মাথায় গামছা বেঁধে লেগে গেলেন, হয় মার্শালকে ঘায়েল করতে, নয় তাঁকে আসমানে চড়াতে। সুচতুর পাঠককে বলে দেবার কোনও দরকার নেই, দুসরা দলেই বেশিরভাগ ছিলেন ইংরেজ। সে সময় আমার এক আইরিশ গুরু বলেছিলেন, সিলগুলোর উপর যে লিপি খোদাই করা আছে সেটা পড়তে না পারা পর্যন্ত চিত্তিরবিচিত্তির থিয়োরি গড়া বিলকুল বেকার— হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতো। এর পর বৃদ্ধ গুরু তাঁর জীবনের শেষ দশ বৎসর কাটান লিপি পাঠের নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে। সে কাহিনী আর কোনও সুবাদে না হয় বলব। কিন্তু সিন্ধুলিপির চেয়ে ঢের রগরগে লিপি ওয়াটারগেট মামলা নিয়ে— মি. নিক্সন যে টেপ-লিপি যখের ধনের মতো জাবড়ে ধরে বসে আছেন। প্রকাশ পেলে সে লিপি কিন্তু অনায়াসে পড়তে পারবে, মার্কিন স্কুলবয় তক্। উহুঁ, হল না। সন্দেহ-পিচেশ মার্কিন-অমার্কিন দুশমনজন বলছে, পড়তে পারবে বটে, কিন্তু কত লিপি কত পাষণ্ডই না ভেজাল ঢুকিয়ে মূল লিপি পয়মাল করেছে— যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়, প্রক্ষিপ্ত, ইন্টারপলেশন। নিক্সনই লিপিটি নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলবেন না, এমনতরো সাধু মহাশয় তো তিনি না-ও হতে পারেন। বস্তুত আখেরে যখন নিঃসন্দেহে ধরা পড়ল নিক্সনের সাঙ্গোপাঙ্গর প্রায় সব কটাই ফোর টুয়েনটি ফেরেব্বাজ, তথাপি, তখনও যারা তাঁর ব্যক্তিগত সততার কেত্তন গেয়েই চলেছে তাদের উদ্দেশে এক বিদগ্ধ ঠোঁটকাটা মার্কিন নাগরী বলেন, 'একটা ঘাপটি মারা ব্রথেল-বাড়ি কাল যদি ধরা পড়ে, তবে বাড়িউলী অক্ষতযোনি কুমারী কন্যা হবে— এহেন দুরাশা কর না।' তাই আফসোস, হে মুশকিলপানা মাসুদ রানা, এ গজব-মুসিবতের ওক্তে তুমি কোথায় ছিলিমে দম মেরে শিবনেত্র হয়ে হুরীপরীর খোওয়াব দেখছ?

সে অদেখা লিপির অজানা বাণী কিন্তু সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে বিশেষ করে ইরান আর তার সাকি পাকিস্তানে। নইলে মিস্টার আজিজ আহম্মদ অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব নীতি ত্যাগ করে বঙ্গ-প্রীতি দেখাতে আরম্ভ করলেন কেন? আমি তো শুনেছি, দুই পাকিস্তানে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তার জন্য কার্যত মি. আহমদই দায়ী। করাচি-পিণ্ডির নেতারা গোড়ার দিকে মরহুম পুব-পাকে কী পলিসি নেবেন স্বভাবতই সে সম্বন্ধে পাকাপাকি মন-স্থির করতে পারছিলেন না। তাই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্বাধিকারী আজিজই অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে নীতি বাবদেও সদুপদেশ দিতেন— সে নীতি লৌহ-গোলক-নীতি। অবশ্য বর্তমান মি. আজিজ যদি প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি সেই আজিজই হন?— তবু ভালো, যার মারফতই

www.pathagar.com

একটা সমঝোতা হোক না কেন। দিল্লির এক বাদশাহ্ নাকি খারাপ জায়গা থেকে একটি সুন্দরী আনালে পর, উজির বিরক্তি প্রকাশ করেন। বাদশাহ্ বললেন, 'হালুয়া ভালো জিনিস, তা সে যে দোকান থেকেই আসুক না কেন— হালওয়া নিকু অস্ত্, কে আজ হর দুকান বাশদ।' এ স্থলে বলতে হবে, যেই নিয়ে আসুক না কেন।

লাইন অব রিট্রিট খোলা রাখো

তাই বলছিলুম 'সেই ভালো, সেই ভালো।' আমরা চিরকালই শান্তি কামনা করেছি। তদুপরি ডানা-কাটা পরী কে না ভালোবাসে? ডানা-কাটা পরী পাকিস্তানকে কিয়ামতক দুশমনের নজরে দেখব, লায়লীকে মজনুর চোখে দেখব না, এমন কিরে কসম আমি কখনও গিলিনি— সাক্ষী এন্টালির মৌলা আলী। তবে কি না, অতীতের জাবর কেটে মনে ধোঁকা লেগে রয়, 'মুসলিম বেঙ্গল' বুলি কপচানো আগাপাশতলা পালটে 'বাংলাদেশ' নামক ঢেঁকি গিলতে পিণ্ডির ইয়ার-আজিজানের কতখানি সময় লাগবে? আপনারা যা ভাবতে চান, ভাবুন, আমার সন্দেহ-পিচেশ্ মন জানে, পিণ্ডির ইয়াররা অবশ্যই আরও বিস্তর ন্যাজ খেলাবেন। এতক্ষণে আলবৎ তেনাদের এডভোকেট জেনারেল, লীগের একসপারটগুষ্টি বসে গেছেন, চুক্তিটির ফস্কে গেরো, লুপ হোল, কোন শব্দে, কোন ফুলস্টপ সেমিকলোনে আছে, চুক্তিটায় সাদা কালিতে এমন কী সব লেখা আছে যাদের বদৌলতে তেনারা চটসে বেরিয়ে যাবেন খোলামাঠে, আর আমাদের বেলা দেখব, ফস্কে গেরো বজ্র-বাঁধন, ফাঁসির গিঁটে টাইট হতে হতে কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। (এবং আমাদের উচিত, এই একই কর্মে লিপ্ত হওয়া। কোনও কোনও দেশ গোপনে বিদেশেও পাঠায়) তুলনায় এনে স্মরণ করাই, ইতোমধ্যে নিক্সন ক বার দিব্যি দিয়েছেন, আমার মনে নেই, সুপ্রিম কোর্ট 'ডেফিনিট' রায় না দেওয়া পর্যন্ত তিনি টেপ-এর দলিল হাতছাড়া করবেন না, না, না। কিন্তু কুল্লে দুনিয়ার চেল্লাচেল্লি সত্ত্বেও 'ডেফিনিট' বলতে তিনি কী বোঝেন, সে প্রশ্নটা সাফ ইনকার করে তিনি খামুশ! অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওই 'ডেফিনিট' কথাটা এ-প্রসঙ্গে বিলকুল ফজুল, বেকার। সুপ্রিম কোর্ট কেন, আমাদের মহল্লার বেকুব ছোঁড়াটা ওই যে সেদিন তৃতীয় শ্রেণির শক্তিসম্পন্ন হাকিম হল, সেও তো কখনও 'ইনডেফিনিট' এমন কোনও রায় দেয়নি, যার তেত্রিশটা অর্থ করা যায়। হয় জেলে যাও, নয় বাড়ি যাও— মাত্র দুটো অর্থওয়ালা ইনডেফিনিট রায়ও সে কখনও দেয়নি। ছোকরাকে শুধান গিয়ে, সে যখন ট্রেনিঙে ছিল, তখন তার গুরু তাদের বলেছেন কি, "রায় দেবে ডেফিনিট, সে রায়ের বিসমিল্লাতে লাল কালি দিয়ে লিখবে, 'ডেফিনিট' জাজমেন্ট অব হাকিম অমুক।" সেটা হবে 'ভেজা জল' বলার মতো। শুকনো জল আমি কখনও দেখিনি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নিষ্কর্মা 'ডেফিনিট' শব্দটা এস্তেমাল করা হয়েছে, রায়টা আখেরে বিপক্ষে গেলে 'নিষ্কর্মাটা' কর্মে লাগাবার জন্য। একেই বলে আইনের ফাঁক, ল'-এর লুপ-হোল। গুরু নিক্সন যে ভেল্কি দেখালেন, পিণ্ডির চেলারা কি গুরুমারা বিদ্যে দেখাতে কম যাবেন? এবং আমাদেরও এটা রপ্ত করা অতিশয় উচিত। চুক্তি ভাঙাবার জন্য নয়, যে ভাঙাতে চায়, তার মোকাবিলা করার তরে।

www.pathagar.com

কিন্তু সরল পাঠক, এই পোড়াগুরুর ভ্যাঁ-ভ্যাঁতে কান দিয়ো না। বরঞ্চ গান ধরো,

"নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।"

পৌষ মাস কেবা কার
পাঠানের হাহাকার

অবতরণিকাটি হয়তো মেকদারমাফিক হল না।

কারণ, চিন্তাশীল পাঠক হয়তো ভাবছেন, নিরক্ষর পাঠান-বেলুচে এ-সব কথার মারপ্যাঁচ আইনের ফাঁকি ফক্কিকারির কী আর বোঝে? এমনতরো মারাত্মক ভুল করবেন না। পাঠানের বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পায়, 'করারনামা, করারদাদ।' ওদের কওমে কওমে হর-হামেশা লড়াইফসাদ এবং নিত্যি নিত্যে সলা-সুলেহ লেগেই আছে— করার-নামা, করার-দাদ দিয়ে হয় তার অতিশয় সাময়িক তৎকালীন এবং ক্ষণভঙ্গুর অস্ত্রসংবরণ, আর্মিস্টিস। পিস ট্রিটি চিরন্তনী শান্তি এহেন আজগবি সমাস তারা কখনও শোনেনি। করার ভাঙতে চ্যাম্পিয়ন হিটলার রিবেনট্রপ পাঠানের কাছে হেসে-খেলে দু দশ বছর তালিম নিতে পারেন— করার-দাদে দফে দফে চুক্তি নির্মাণ, লুপহোল রক্ষণ, এবং তার বদৌলত চুক্তিপত্র থেকে মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে, সসম্ভ্রমে, একতরফা নিষ্ক্রমণ, এ-সব বাবদে যাবতীয় ফন্দি-ফিকির, সন্ধি-সুড়ুকের সম্রাট পাঠান। খাস কাবুলে কেউ কখনও এপয়েন্টমেন্ট লেটার পায় না। পায়, চুক্তিপত্র (করার-দাদ)। বেশুমার কপি সবই করতে হবে আপনাকে— আপনি পাবেন কুল্লে একখানা। সরকার চাপ দিতে চাইলে দশ খানা কপি বেরিয়ে আসবে এক লহমায়। আপনি চাপ দিতে চাইলে সরকারের তাবৎ কপি গায়েব— গম্ভীর কণ্ঠে বলবে 'গুমা শুদ', গুম হয়ে গিয়েছে। তারও বড়ো, হয়তো বলবে কোনও করার-দাদ 'নেই, ছিলও না' 'নিস্ত-ন-বুদ'— যার থেকে বাংলা 'নাস্তা-নাবুদ' কথাটা এসেছে। বিশ্বেস না হয় চলন্তিকা খুলে দেখুন।

পাঠান-বেলুচ নিরক্ষর। কিন্তু প্রত্যেকটি করার-নামা তারা জের-জবরতক মনে গেঁথে রাখে। কিন্তু এহ বাহ্য।

বললে পেত্যয় যাবেন না, শতাধিক বৎসর ধরে ব্রিটিশ, শিখ, রুশ, আফগান, ইরান, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান— এঁদের ভিতর আপসে কী সব চুক্তিনামা তৈরি হল, কালি শুকোবার আগেই সেগুলোকে এক পক্ষ টুকরো টুকরো করল ('তিক্কা তিক্কা করদনদা'), এ সব সাকুল্যে সংবাদ তাদের নখের ডগায়। এরই ওপর নির্ভর করছে তাঁর প্রধান আমদানি— লুটতরাজ। পূর্বেই বলেছি, চাষ-আবাদ তার কাছে অনেকটা আমরা যে-রকম পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করে এক খেপ রিকশাভাড়া তুলি-কি-না-তুলি গোছ। বিশেষ করে তার শ্যেনদৃষ্টি পূর্বে ছিল ব্রিটিশের প্রতি, এখন 'নেকনজর' ফেলে পাক-সরকারের দিকে। যখনই যে-সরকার, কি আফগান, কি পাকসরকার দুশমনের হামলা বা সে-ভয়ে বেকাবু, তখনই পাঠান-বেলুচের মোকা। আর আল্লার কুদরতে আজকাল পাঠানের বারোয়ারি ড্রইংরুম, ছোটাসে ছোটা চায়ের দোকানেও বেতার। এখন হাওয়ায় যায় তাজাসে তাজা খবর। অন্তত

www.pathagar.com

পাঁচটা দেশ পশতু জবানে পরস্পরবিরোধী খবর দেয় প্রতিদিন। আর আফগানচালিত কাবুল-বেতার এবং পাঞ্জাবি চালিত পাক-বেতারে বাক-যুদ্ধ— জংগে জবান— লেগে যায় তখন সে বেহদ আরাম বোধ করে— তার দিল খুশ, জান-ত-র-র-র!

এই যে পাক, হিন্দ, বাঙ্গালায় ত্রিভুজাকৃতি করার-দাদ হতে চলল এই বে-মুবারক আখবার সুবে পাঠানিস্তানের দিল-জান কলিজা-গুর্দা 'তিক্কা তিক্কা' করে দেবে। এতে করে পাক তার পূর্ব সীমান্ত সামলে নিল। সান্ত্বনা এইটুকু, পাক সরকারের প্রতি অপ্রসন্ন কয়েক হাজার জাতভাই পাঠান সেপাই দেশে ফিরে এলে তাদের তাড়িয়ে যদি কিছু-একটা করা যায়। সদর দাউদও সেটা হিসাবে নিচ্ছেন। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, আপন খুশিতে দাউদের হুংকারে বিব্রত পিন্ডি সরকার যুদ্ধ-বন্দিদের ফেরত নিচ্ছেন এই দুর্দিনে, বিশেষ করে নিক্সনের দুর্দিন যাদের আপন দুর্দিন— এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

পাক-পক্ষ দিল্লিতে প্রায় এক পক্ষ ধরে কেন গাঁইগুঁই, টালবাহানা করলেন, সেটা এখানে বসে আমি বলতে পারি, পাঠান জানে, তার প্রতিবেশী আফগান জানে, বেলুচ অবশ্য অতখানি ওয়াকিফ-হাল নয়। সে কাহিনী দীর্ঘ। বারান্তরে।

সেকাল একাল

ছেলেটা ডান হাত পেতে দিচ্ছে আর তার উপর পড়ছে সপাং করে লম্বা লিকলিকে কাঁটাওলা চাবুকের বাড়ি। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলছে, 'বরায়ে খুদা' আর এগিয়ে দিচ্ছে বাঁ হাত। ফের চাবুকের ঘা। এবারে ছেলেটা বললে 'বরায়ে রসুল', এগিয়ে দিচ্ছে ডান হাত। করে করে চলত স্কুলবয়কে চাবুক মারা— খাস কাবুল শহরে— একদা। ছেলেটা তসবি জপার মতো একবার বলে 'বরায়ে খুদা।' পরের বার বলে 'বরায়ে রসুল' 'বরায়ে খুদা' 'বরায়ে রসুল' 'বরায়ে—।' অর্থাৎ 'আল্লার ওয়াস্তে (মাফ করে দিন)' 'রসুলের ওয়াস্তে (মাফ করে দিন)।' কিন্তু আমাদের মতো 'আর করব না, পণ্ডিতমশাই কিংবা কসম খাচ্ছি মৌলবি সাহেব, আমি তামাক খাইনি। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, কে জানিনে হুজুর আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গিয়েছে' এসব চেল্লাচেল্লি, বেকসুরির ফরিয়াদ, রেহাই পাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় আমাদের মতো, আমাদের বাপ-দাদার মতো কাবুলি ছাত্র করে না। আমাদের বেকসুরির ফরিয়াদ আমরা করেছি আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী— ছেলেবেলায়। কাবুলের স্কুলবয় তিফল-ই-মকতব করে তার ঐতিহ্যানুযায়ী। 'বরায়ে খুদা, বরায়ে রসুল' ভিন্ন অন্য রা-টি কেড়েছ কি মরেছ। বেতের রেশন আরও দশ ঘা বেড়ে যাবে তৎক্ষণাতের দু লহমা আগেই— আজ ফৌরন দো লহমা পেশতার। কিন্তু হায়, ইতোমধ্যে 'ব্যাকরণে' ভুল করে ফেলেছি, ধরতে পারেননি তো? তাইতেই তো আগা-ই-আগা সম্পাদক-চক্রের চক্রবর্তী আমার বেশুমার ভুলে ভর্তি লেখা বেদম ছাপিয়ে দিয়ে আমাকে নাচান, আপনাদেরও নাচান। বলুন, বুকে হাত রেখে বলুন, আপনারা কজন সম্পাদক সাবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমার অগুনতি গলৎ দেখিয়ে খাট্টা জবানে শাসিয়েছেন, আমার ধারাবাহিকের ধারা বন্ধ করতে? তা সে যাক গে। না করে ভালোই করেছেন।... হ্যাঁ, ভুলটা কী করলুম, সেই কথাই হচ্ছিল। বলে ফেলেছি "রেশন বেড়ে যাবে"। তা কখনও হয়? কি হিন্দুস্থান, কি পাকিস্তান, কি এই সোনার বাংলা— কবে মশাই, কোন মুল্লুকে রেশন বাড়ে?

www.pathagar.com

রেশন কমতে দেখেছি, বাড়তে দেখেছে কে, কবে কোন রাঙ্গা শুক্কুরবারে, কোন হীরের বাংলায়? সে তা হলে সাপের ঠ্যাং দেখেছে, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র দেখেছে।

বাস্তিনাদো

কিন্তু এ ধরনের বেত্রাঘাত কাবুলে ডাল-ভাত। দেখতেই যদি হয়, তবে দেখে নেবেন, বাস্তিনাদো। আমি কখনও দেখিনি, তবে হতভাগার গোংরানোটা শুনেছি, অতি অনিচ্ছায়।

আমাদের হোস্টেলে একজন আরেকজনের তলপেটের এক পাশে মাঝারি সাইজের একটা ছোরা ফাঁসিয়ে দেয়। প্রিন্সিপাল গয়রহ্ কোয়ার্টারে ছিলেন না। আমাকেই যেতে হল। যতদূর মনে পড়ছে, চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই হয়নি। বাগানে গাছতলায় ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন। তার মুখ হুবহু পচা মাছের পেটের মতো ঘিনঘিনে পাঙ্গাশ। একটা ছেলে কামিজ তুলে দেখল পেটপিঠ পেঁচিয়ে লালে লাল চওড়া ব্যান্ডেজ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না, কী জঘন্য নোংরা কাপড় ছিঁড়ে পট্টি বাঁধা হয়েছে। আরেকটা ছেলে বললে, নাড়িভুঁড়ি হড়হড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে আর তার দোস্ত দু জনাতে চেপেচুপে কোনও-গতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পট্টি বেঁধেছে— বুঝলুম, এক গাদা মাল যেরকম ছোট সুটকেসে যেখানে যা খুশি ঢুকিয়ে ডালার উপর দাঁড়িয়ে একজন লাফায়, অন্যজন কব্জা বন্ধ করার চেষ্টা দেয়, তারই অনুকরণে কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পট্টির উপর-নিচ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বেরুচ্ছে। আততায়ীকে একটা গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ছেলেটা ভিরমি যায়নি, তবুও। বিড় বিড় করে কী যেন বলছে। ভাবলুম, ভুল বকছে। না, একটা ছেলে বললে, আমাকে সে কী যেন বলতে চায়, আমি যেন কাছে গিয়ে কান পেতে শুনি। কাছে যেতে আধ-মরা গলায় বললে, আমি যেন তার সব অপরাধ মাফ করে দিই। আমি বললুম, 'তুমি আবার কী অপরাধ করলে? সেরে ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ছেলেটা 'আহ' বলে চোখ বন্ধ করল।

এর পরের কাহিনী দীর্ঘ। উপস্থিত সুখবরটা জানাই। দেড় মাস পর সে হাসপাতাল ছেড়ে ফের ক্লাসে ফিরে এল। কিন্তু এহ বাহ্য।

আমাদের ফরাসি অধ্যক্ষটি ছিলেন চৌকস লোক, পুলিশকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দিয়ে, দফতরের কাবুলি হেড ক্লার্ক, খাজাঞ্চি, অনুবাদককে বললেন এ-দেশের প্রথানুযায়ী বিচার করে আততায়ীকে যেন সাজা দেওয়া হয়।

তাঁরা স্থির করলেন পূর্ব কথিত বাস্তিনাদো। আমার কিন্তু শোনা কথা। ছেলেটাকে মাটিতে বুক রেখে টান টান করে শোয়ানো হল। হাতদুটো সামনের দিকে প্রসারিত। দু হাতের উপর মাটির সঙ্গে জোরসে চেপে ধরে দাঁড়াল মিলিটারি বুট পড়া দুই চাপরাসি, দু পায়ের গোছা সবুট চেপে দাঁড়াল আরও দু জন চাপরাসি। আরও জনা চারেক বুট দিয়ে পিঠ-কাঁধ সর্বাঙ্গ চেপে ধরে দাঁড়াল চতুর্দিকে। তার পর পায়ের তলাতে— জানিনে কী ধরনের— চাবুক দিয়ে বেতের পর বেতের বেদম গুনে গুনে মার। বার দশের পর পায়ের তলা দুটোতে আর এক রত্তি চামড়া অবশিষ্ট রইল না। লাল লাল ক্ষতবিক্ষত জখমের উপর আরও কত ঘা মারা হয়েছিল সেটা আমি আর শুনতে চাইনি।... দিন দশেক পরে একদিন দেখি, কুষ্ঠরোগীর

www.pathagar.com

মতো পট্টি দিয়ে পা দুটো সর্বাঙ্গে মোড়া অবস্থায় দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে পা দুটো মাটি ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় অবস্থায় প্রাতকৃত্য সারতে যাচ্ছে। মাস দুই পরে ফের ক্লাসে এল।

আর সব সহপাঠীরা মন্তব্য করেছিল, 'ছেলেটার দারুণ বরাত-জোর। বিদেশি অধ্যক্ষ মধ্যস্থ না হলে, নির্ঘাত জেলে পাথর ভাঙতে হত নিদেন পাঁচটি বৎসর।' অন্য অত্যাচারের কথাটা সবাই জানত— আসলে যে কারণে অধ্যক্ষ মধ্যস্থ হয়েছিলেন। জেলের সম-রতি-প্রবণ গার্ড-সেপাইদের হাত থেকে ছোকরার নিস্তার থাকত না।... এতদিনে এ সব পাশবিক দণ্ডদান মকুব হয়ে যাওয়ারই কথা।

রণাঙ্গনে নব-নায়ক ছাত্রসমাজ

আফগানিস্তানে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব যে একটা আদ্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে এমত বিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে একটা সত্য স্বীকার করতেই হবে। প্রাচ্যপ্রতীচ্যের আর-পাঁচটা দেশের মতো দু তিনটে নগরে, বিশেষ করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এদানি নানা বিষয়ে সচেতন হয়ে গিয়েছে। এটা অতিশয় স্বাভাবিক যুগধর্ম। বছরের পর বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নানা পাঠ্যপুস্তক মারফত বিশ্বসংবাদ পড়ানো হবে, আর ছাত্রেরা সেই প্রাচীন সর্বাধিকারী রাজশক্তি তখনও মেনে নেবে— তা রাজা যতই মেহেরবান হন না কেন— ফল ভালো হোক, মন্দ হোক— সে-বিদ্যা প্রয়োগ করার প্রলোভন তার অতি অবশ্যই হবে। যেমন, দশ-বিশ বছর ধরে সেপাই-অফিসারকে কুচকাওয়াজ, সমরবিদ্যা শেখানো হবে, আর তারা জল-জ্যান্ত লড়াইয়ে নেমে সেটা কখনও কাজে লাগিয়ে পরখ করে দেখতে চাইবে না, এটা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ্ জহির যে যৌবনের সাম্য ঐক্য স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে রাজশক্তিকে দৃঢ়তর এবং ব্যাপকতর করতে চেয়েছিলেন সেটা ন্যায়সঙ্গত না হলেও স্বাভাবিক, এমনকি আংশিক গণতন্ত্রমূলক সংবিধান মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলিটিকসে একটা 'রাজার দল' 'কিংস পার্টি' স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন, হুবহু যে-কাজটি সিংহাসন ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ড্যুক অব উইনজর করতে রাজি হননি। পক্ষান্তরে ছাত্ররাও সেকুলার শিক্ষার ফলস্বরূপ এবং মক্তবের ভিতরে-বাইরে মোল্লাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার দরুন রাজনীতিতে ঢলে পড়ল পেন্ডুলামের অন্য প্রান্তে : বাইরের থেকে সাহায্য পেয়ে তারা হয়ে দাঁড়াল মার্কস, মাও এবং এককাট্টা চরমপন্থিতে। তারই ফলে ১৯৬৯ সালে তাদের বিক্ষোভ, দাবি, স্ট্রাইক— গোটা আন্দোলনটা সর্বাংশে রাজনৈতিক ছিল না, ছাত্রসমাজের নিছক সুখ-সুবিধা কল্যাণকল্পে একাধিক স্ট্রাইকের আয়োজনও হয়েছিল— পুলিশের সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষে আন্দোলন এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করল যে, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে ছয় মাস কাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হল।

এর ফলে কিন্তু একটা তত্ত্ব জনসাধারণ, বিশেষ করে মোল্লাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল : সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান শক্তিমান ছাত্ররাই। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, জনপদ অঞ্চলে কওমদের ভিতর যেমন অশিক্ষিতের সংখ্যা অধিকতর ঠিক তারই সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের ধর্মোন্মাদনা মারাত্মক এবং সর্ব প্রগতিশীল সংস্কার তারা ঘৃণা করে।

www.pathagar.com

তৎসত্ত্বেও ছাত্রসমাজ তাদের মাও-মার্কস আন্দোলন আরও জোরদার করে তুলতে লাগল এবং তার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ১৯৭০-এ। লেনিনের বাৎসরিক জন্মদিনে একখানি কম্যুনিস্ট পত্রিকা তাঁর স্মরণে রচিত একটি কবিতাতে এমনসব প্রশস্তিসূচক হামদ ও নাৎ দোওয়াদরুদের শব্দ ব্যবহার করল, যেগুলো সচরাচর আল্লা-রসুলের স্মরণেই উচ্চারিত হয়।

তীব্র প্রতিবাদ, বিস্তীর্ণ জনপদব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করলেন মোল্লারা। যেসব কওম তাঁদের সহায়তা করল তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং সেই কুখ্যাত শিনওয়ারি কওম, যারা সর্বপ্রথম বাদশাহ আমানউল্লাহর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবারেও তারা এমনই খাণ্ডারের মতো রুদ্ররূপ ধারণ করল যে অবশেষে ট্যাংকসহ শাহি ফৌজ তাদের আক্রমণ করে ওই অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনল।

লেনিনের প্রতি এইসব উচ্ছ্বাসময়ী প্রশস্তি এবং মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিক্রিয়ার শেষ ফল এই দাঁড়াল যে, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ম সম্বন্ধীয়' একটা নতুন শাখা প্রবর্তন করা হল। এ-শাখার চালকগণ অহরহ সজাগ দৃষ্টি রাখেন, 'ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে' অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রসমাজের সামান্যতম মতবাদ, কার্যকলাপ তাঁদের মনঃপূত না হলে 'কুফর' বিদা'ৎ হুঙ্কাররবসহ তীব্র প্রতিবাদ তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।

দাউদ খান নাকি প্রথম দিন থেকেই ছাত্রসমাজের সমর্থন পেয়েছেন। তা হলে স্বতই স্বীকার করতে হয়, ছাত্রকুলবৈরী মোল্লা সম্প্রদায় তাঁরও বৈরী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, দাউদ মোল্লাদের এক বৃহৎ অংশের স্বীকৃতি পেয়েছেন। দাউদ দিবান্ধ নন। তিনি জানেন, মোল্লা ও তাঁদের চেলা কওমরা ছাত্রদের চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশি।

ছাত্ররূপ একটা ঝুড়িতে দাউদ তাঁর কুল্লে আণ্ডা রেখে আরব্যরজনীর অননশশারের খোওয়াব দেখবেন না।

নামে কী করে!
গোলাপে যে নামে ডাকো, গন্ধ বিতরে

এক নিক্সন-বৈরী মার্কিনই হতাশ সুরে বলছিল, 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ভালো করে বুঝতে হলে সক্কলের পয়লা এক ঝুড়ি নাম সড়গড় মুখস্ত করতে হয়। কটা লোকের সে সময়, সে উৎসাহ আছে? তার পর মুখস্থ করতে হবে তাঁদের পূর্বকীর্তি কেরামতির ইতিহাস। কে রিপাবলিকান, কে ডেমোক্রেট; কে রিপাবলিকান বটেন কিন্তু ওয়াটারগেটের কেলেঙ্কারির ঘেন্নাতে হয়ে গেছেন রিপাবলিকান দলের চাঁই নিক্সন-বিরোধী, কারা পয়লা নম্বরি রিপাবলিকান এবং নিক্সনের অকারণ মেহেরবানিতে কনট্রাক্ট-পারমিট গয়রহ পেয়ে তাঁর প্রতি এখনও নেমক-হালাল, বিপদে পড়ে নিক্সন কাকে কাকে জল্লাদের হাতে না-হক সঁপে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি দফে দফে নাম-কাম মুখস্থ করতে পারেন— খুদ মার্কিন-ইয়াংকি পাঠকই কজন? তবু যারা টি-ভিতে ওয়াটারগেট তদন্তের জলসা আণ্ডাবাচ্চাসহ গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে নিত্যি নিত্যি দেখেছেন তাঁদের পক্ষে মামলাটার গভীরে ঢোকা খানিকটে সহজ হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যে এত-সব বায়নাক্কা-আবদার বরদাস্ত করে আপন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে শেষ রায় দিতে পারেন কজন স্পেশালিস্ট?'

www.pathagar.com

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'আমরা বরঞ্চ ব্রিটিশের তরো-বেতরো নামের কিছুটা হদিস পাই, কিন্তু তোমাদের মার্কিন জাতটা ইংরেজ, জর্মন, ডাচ, ফরাসি, আরও কত বেশুমার জাত-উপজাত দিয়ে গড়া আস্ত একটা জগাখিচুড়ির লাবড়া-ঘ্যাঁট। ওই ধরো মামলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-আলিঙ্গনে বিজড়িত, নিক্সনের ঘরোয়া, হোয়াইট হাউসের চাঁই চাঁই সচিব, কর্মকর্তাদের ইসমে মোবারকের ফিরিস্তি : সক্কলের পয়লা যে দুই মহাপ্রভু এ-ফিরিস্তি ধন্য করেন, তাঁদের নাম খাঁটি জর্মন এরলিষমান, হালডেমান। অবশ্যই সাদামাটা মার্কিন নাগরিক কুল্লে ভিনজাতের নাম উচ্চারণ করে মাতৃভাষা ইংরেজি কায়দায়। এই সোনার বাংলাতেই উন্নাসিক পণ্ডিতমশাই মুকুলেশ্বর রহমান লেখেন মুখলেসুর রহমান-এর পরিবর্তে। তার পর ধরুন, ব্লুমসফেলট, ক্লাইন, কের্লি, ৎসিগলার এগুলো নিঃসন্দেহে জর্মন নাম। ফরাসি নাম অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু জাতে ভারী। খুদ ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম অ্যাগনো ফরাসি উচ্চারণ আইন্নো। এনার বিরুদ্ধেও ফৌজদারি তদন্ত চলছে, নানাবিধ 'নজরানা' নিয়ে। এবং হাসি পায়, যখন 'আইন্নোর' মূল অর্থ স্মরণে আসে। প্রথম অর্থ মেষশাবক, পরের অর্থ সাধু-সরল-পবিত্র! হুবহু ওই অর্থ ধরেন এরলিষমান। এ-নামের সরল অর্থ 'সরল'! 'সাধু, অনারেবল!' অধিকাংশ ঘড়েল জনের বিশ্বাস, ইনি ওয়াটারগেট তদন্ত কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন তার চোদ্দ আনা ঝুট। ওই সময় জর্মনিবাসী এক জর্মন, সুদূর স্বদেশ থেকে, বিখ্যাত এক মার্কিন সাপ্তাহিকে এরলিষমানের 'সরলার্থের' প্রতি সাদা-মাটা মার্কিন নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের তরে ব্যঙ্গ-রসের খোরাক যোগান।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রেসিডেন্ট; না দেশের মঙ্গল?

ভুট্টো সাহেবের যে রকম আজিজ, হিটলারের বরমান, হুবহু ঠিক তেমনি মি. নিক্সনের মহামান্য মি. হেনরি এ কিসিংগার। আমি জানি, একমাত্র খাস জর্মন ভিন্ন তামাম দুনিয়া উচ্চারণ করে কিসিঞ্জার। এস্তেক বিবিসি। পাঠক একটু ধৈর্য ধরুন, পরে তাবৎ গুহ্য তথ্যতত্ত্ব স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে। এস্থলে বলা প্রয়োজনীয় যে আজিজ বরমান কিসিংগার চরিত্রে অতি অবশ্যই তফাৎ আছে; মি. ভুট্টোর দোষগুণ যাই থাক, তিনি কখনও আজিজের ম্যাড়া বনবেন না। বাকিদের কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু এস্থলে সাতিশয় প্রয়োজনীয়, পাঠক যেন এই কিসিংগার প্রভুর প্রতি একটু নজর রাখেন। কিন্তু এঁর প্রেম বাংলাদেশ কখনওই পাবে না। কারণ ইনি ধর্মে, কর্মে সর্ববিষয়ে কট্টর ইহুদি। ইহুদিজনসুলভ তাঁর বিরাট নাসাযন্ত্র, তথা ঘন-কুঞ্চিত প্রায় নিগ্রোসম কেশ যেন পাঠক তার ফটোতে লক্ষ করেন। বিস্তর নৃতত্ত্ববিদের অভিমত, ফেরাউনের দাসত্বকালে মিসরস্থ নিগ্রোদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ইহুদিদের মস্তকে এই কুঞ্চিত কেশের উদ্ভব।... স্বভাবতই ইহুদি কিসিংগার তথাকথিত ইজরায়েলকে জানপ্রাণ দিয়ে মহব্বৎ করেন; পক্ষান্তরে আমরা ফলস্তিনের গৃহহারা আরবদের মঙ্গল কামনা করি। তাঁরা যেন একদিন স্বদেশে সসম্মানে ফিরে যেতে পারে আমরা সেই প্রার্থনা করি— শরণার্থী হয়ে ভিন দেশে বাস করার পীড়া আমরা জানিনে, তো জানেন নিক্সন? তিন দিন আগে তিনি এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, 'আরব-ইজরায়েলের মোকাবেলায় আমি নিরপেক্ষ (পাঠক

www.pathagar.com

বিশ্বাস করতে চান, তো করুন, সেটা আপনার মর্জি)। আমি চাই শান্তি।' পাঠক লক্ষ করবেন, 'আমি চাই বিচার, আমি চাই জাস্টিস, ইনসাফ'— এ কথা হুজুর বলেননি, কস্মিনকালেও তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। কিন্তু শান্তি তো অতি সহজেই হয়। মিশর, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়াকে অন্তত একশো বছরের তরে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট এটম বোম নিক্সনের ভাণ্ডারে আছে। শান্তিভঙ্গ তো এই 'পাষণ্ডরাই' করছে। ইজরায়েল তো শব্দার্থে নিষ্পাপ— এরলিষমান অ্যাগনোর মতো! নিক্সন তো এই মতই পোষণ করেন। তাঁর পিছনের ছায়াটি— কিসিংগার— তিনি তো টুইয়ে দেবার তাতিয়ে দেবার তরে আছেনই। তবে কি না, সে শান্তিটা হবে গোরস্তানের শান্তি।

এই সুবাদে আরেকটি তত্ত্ব-কথার উল্লেখ করি। কিছুদিন পূর্বে আমি চিন্তাশীল পাঠককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলুম, তাঁরা যেন নিক্সনের চেলা ইরানের বাদশাহর প্রতি একটু নজর রাখেন। উপস্থিত সে-নজরটাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দিতে পারেন। কারণ শাহ্ ইতোমধ্যে বিকল-ইঞ্জিনওয়ালা নিক্সন-জাহাজটি ত্যাগ করে আরেকটা উত্তম জাহাজে চড়েছেন। তিনি দেখলেন নিক্সনের ইঞ্জিন বিকল করে দিয়েছে ওয়াটারগেটের বেনো-পানি হুড়হুড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করে। ওদিকে সরদার দাউদ গদিতে বসতে না বসতেই রুশ তাঁকে ঈদের (আনন্দের) আলিঙ্গন জানিয়েছে। এদিকে শুধু ওয়াটারগেট না, কুচক্রীরা নিক্সন আধা-আইনি বে-আইনিভাবে তাঁর প্রাইভেট বাড়িদুটো কতখানি সরকারি পয়সায় খাড়া করেছেন সেটা ক্রমশ উপন্যাসের মতো প্রকাশ করছে। এবং কিছু কিছু অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, ভিয়েতনাম গয়রহ ছাড়াও তিনি কারণে-অকারণে পরিপূর্ণ শান্তিময় দেশেও গোপনে টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ঢেলেছেন কী পরিমাণ? শাহ্ স্পষ্ট দেখতে পেলেন, শ্রাদ্ধ আখেরে যতদূরই গড়াক, না-গড়াক— প্রভু নিক্সন দুম করে আর কোম্পানির মাল বেশ কিছুকাল ধরে ইরানের দরিয়াতে ঢালবার হিম্মৎ পাবেন না। অর্থাৎ কি না, কিসিংগার মুনিব নিক্সনকে সে 'পরামিশ' দেবেন না। মার্কিনিরা বলছে, দেশের স্বার্থের তরে তুমি যত চাও টাকা ঢালো, কিন্তু আপন প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য না।

ইতোমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটল। মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, নিক্সনের দ্বিতীয় ইলেকশনের সুপ্রিম কর্ণধার মি. মিচেলকে বাধ্য হয়ে সাক্ষ্য দিতে হয় ওয়াটারগেট তদন্তে। এক সিনেটর কিংবা ফরিয়াদি উকিল প্রশ্ন করেন, 'তা হলে বলুন, আপনি দেশের স্বার্থকে নিক্সনের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেন কি না?' উত্তরে তিনি সগর্বে বলেন, 'নিক্সনের প্রেসিডেন্টরূপে জয়লাভকে আমি বৃহত্তর বলে মনে করি।' (!!) এই পরশু-দিন তক বিবিসি'র বিশ্বালোচনার সদস্যগণ এই বিকট নীতির উল্লেখ করে বেকুবের মতো বার বার তাজ্জব মেনেছেন। অতএব যদিস্যাৎ সকল পথচারী মার্কিন প্রশ্ন শুধোয়, 'হুজুর তা হলে ইরানে এবং ১৯৭১-এ ইরানের মারফত (তৎকালীন) পশ্চিম পাকিস্তানে যে টাকা বন্দুক কামানটা ঢাললেন সেটা কি আপন লেজ মোটা করার জন্যে, না মার্কিন মুল্লুকের স্বার্থে?'— এ-প্রশ্নটা তো ছিদ্রান্বেষীর না-হক প্রশ্ন নয়। অতএব শাহ্ও তড়িঘড়ি তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে পাঠালেন মস্কোবাগে— দাউদের গদি দখলের তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে। খুদায় মালুম, দফে দফে কত দফেই না নয়া জাহাজে চড়ে প্রধানমন্ত্রী করার-দাদ করার-নামা সই করলেন। শাহ ওদিকে পিণ্ডিকে পরামর্শ দিলেন, উপস্থিত জো-সো প্রকারের একটা সমঝোতা ইন্ডিয়া-বাংলাদেশের সঙ্গে করে নাও। আমাদের রাশি এখন বেহদ বদ-বখৎ

www.pathagar.com

কম-বখৎ! আর পারো যদি, ঝটপট রুশ্-কিশ্তিতে সওয়ার হও— না হয়, গলুইটাতেই দু দিকে পা ঝুলিয়ে খোওয়াব দেখ, 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল' হাঁকিয়া নয়, হাঁটিয়া। কিন্তু পিণ্ডি যে চীনা-কানুর সঙ্গে বড্ড বেশি পীরিতির লেটপেট করে বসে আছেন! এখন শ্যাম না কুল? তবে— আজিজ যার নাম, রুশের সঙ্গে আজিজি করতে কতক্ষণ! কুল্লে দুনিয়া তাঁর খেশ-কুটুম '— বসুধৈব কুটুম্বকং'— বলেছেন স্বয়ং চাণক্য! তবে কি না চন্দ্রাবতী কুঞ্জে যেতে হবে চীনা বঁধুয়ার আঙ্গিনা দিয়া।

সংক্ষিপ্ত কিসিংগার কাহিনী

বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকের স্মরণে থাকার কথা শ্রীযুক্ত কিসিংগারের (ডাকনাম 'কিস্!') মূর্তিটি। ইনি খাঁটি ইহুদি। জন্ম জর্মনির ফুর্ট শহরে। নাৎসিরা তাঁর কোনও ক্ষয়ক্ষতি করার পূর্বেই পিতা-মাতা তাঁর পনেরো বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কী করে তিনি শেষটায় নিক্সনের একমাত্র উপদেষ্টার আসন পেলেন সে কাহিনী দীর্ঘ, অতএব বারান্তরে।... '৭১ ডিসেম্বরের যুদ্ধ লাগার আগে এবং পরে এবং এখনও (যদিও ঠিক এখ্খুনি বড়ই বেকায়দায়) ইনি পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টাকে যে কোনও উপায়েই হোক, খোদার খাসির মতো পোস্টাই খোরাক দিয়ে দিয়ে তাগড়া করে রাখতে চান। কেন? এইটে তাঁর সর্ববিশ্ব সম্বন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ দর্শন তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ— ইরান-আফগান পাক-ভারত-বাংলাদেশ নিয়ে তার বড় একটা অধ্যায়। নিক্সনকে তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ধীরে ধীরে। সে-কাহিনীও দীর্ঘ, আলোচনা বারান্তরে। এই দর্শনানুযায়ী ন মাস ধরে নিক্সন বাইরে নিরপেক্ষতার ভড়ং করতেন— যদিও সেটা এতই ঠুনকো ছিল যে, সামান্য ঠোনা মারতেই চৌচির হয়েছে একাধিকবার। অন্দরমহলে কিসিংগারের নেতৃত্ব আখেরি 'ত্রাহি ত্রাহি' যে গোপনস্য গোপন সভা ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ডিসেম্বরে '৭১-এ হয়েছিল, সেগুলোর চিচিং ফাঁক করে দেন প্রাতঃস্মরণীয় প্রখ্যাত কলাম-লেখক জ্যাক এন্ডারসন মার্কিন সংবাদপত্রে, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২-এ। কী নিদারুণ বেহায়া ভণ্ডামি চালিয়েছিলেন মুনিব-চাকর দু জনাতে। হন্যে হয়ে কিসিংগার সব্বাইকে শুধোচ্ছেন, কী কৌশলে গোপনে পাক-সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা যায়? বিশেষজ্ঞরা মাথা নেড়ে বলছেন, ইরান, তুর্কির মারফত ও হয় না। (পাঠানো হয়েছিল, আমরা জানি— লেখক)। শেষটায় কিসিংগার অতিষ্ঠ হয়ে বলছেন, 'আমরা একটা স্টেটমেন্ট দেব বই কি। আমরা, এই যেন অনেকটা সাধারণভাবে (ইন জেনরেল টার্মস)— অর্থাৎ ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের বলব, পুব-পাকে একটা পলিটিকাল গুনজাইশ "একোমডেশন"— অর্থাৎ সন্ধি না, চুক্তি না, (ছয় পয়েন্ট মাথায় থাকুন।— লেখক) করে নেওয়ার পক্ষপাতী— আমরা। কিন্তু কোনও ধরা-বাঁধার মতো (স্পেসিফিকস) অবশ্যই কিছু বলব না, ইঙ্গিতও দেব না— যেমন ধরো মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার মত।' এটা অন্দরমহলে।

বৈঠকখানায় নিক্সনের পরিত্রাহি চিৎকার 'অস্ত্র সম্বরণ করো, অস্ত্র সম্বরণ করো।"

ধন্য, সেই সিলেটি কবি, যিনি নিচের অমূল্য সুভাষিতটি রচেছিলেন। আমি শুধু 'হতীন মা-র' (সৎমা-র) বদলে 'কিসিংগার' ব্যবহার করেছি :—

www.pathagar.com

"কিসিংগারের কথাগুলিন
মধু-রসর বাণী
তলা দিয়া গুড়ি কাটইন
উপরে ঢালইন পানী ॥"

ছায়ার কায়ারূপ

বহু দিন ধরে হের হাইনরিষ এ. কিসিংগার কলকাঠি নেড়েছেন। কোনও রকমের সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ না করে মি. নিক্সনের হয়ে ভিয়েতনাম বাবদ আলোচনা সভায় নেতৃত্ব করেছেন, বার বার। কূটনৈতিক 'অসুস্থতায়' তিনি ভুগেছেন অর্থাৎ যেখানে কোনও অসুস্থতা প্রকৃতপক্ষে নেই, অথচ ডিপ্লোমেটকে যে কোনও কারণেই হোক কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হবে, তখন তিনি যে ব্যামোর ভান বা ভণ্ডামি করেন সেটাকে বছর পঞ্চাশ ধরে ডিপ্লোমেটিক ইলনেস বলা হয়। ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই 'ক্লাসিক ইলনেসে' ভুগেছি, অর্থাৎ ক্লাসে না যাবার জন্য 'পেট-কামড়ানো', 'দাস্ত' ইত্যাদির শরণ নিয়েছি এবং দ্বিতীয়টার উভয়ার্থে বাহ্যিক প্রমাণস্বরূপ বদনা-হস্তে ঘন ঘন, কখনও-বা দ্রুতপদে, কখনও কাৎরাতে কাৎরাতে, বিশেষস্থলে গমনাগমন করেছি। হের কিসিংগার কূটনৈতিক অসুস্থতায় অকস্মাৎ ইসলামাবাদে কাতর হয়ে মারী পাহাড়ে যান, এবং তার পর তেমনি অকস্মাৎ উদয় হলেন চীন দেশে, যেন ডুব-সাঁতার কেটে, বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে হুশ করে কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ মাথা তুলে বিশ্বজনের বিস্ময় লাগালেন। দুনিয়ার লোক তাঁকে চিনে ফেলার পরও তিনি যতদূর সম্ভব পর্দার আড়ালে থাকাটা দানিশমন্দের সর্বোত্তম সিফৎ বলে মনে করেন। এ কর্মে তাঁর গুরু বরমান— হিটলারের ছায়া। ইহুদিজ কিসিংগার নাৎসি-বৈরী জর্মনরূপে জন্ম নিয়েছিলেন ফ্যুর্ট শহরে। কুখ্যাত ন্যুরনবের্গ শহরের গা-ঘেঁষে এ শহর। নাৎসিবৈরী কিসিংগার পাঁড় নাৎসি বরমানের ঠিক উল্টোটা করবেন এই তো আমরা প্রত্যাশা করব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। ইংরেজ ফৌজি আপিসাররা নেটিভ পাঞ্জাবি আপিসারদের ওপর যে চোটপাট করত, তাই নিয়ে পাঞ্জাবিদের মনস্তাপের অন্ত ছিল না— যদিও তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তারা বড় একটা করত না। তার কারণ অন্যত্র সবিস্তার বলেছি, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার এই পাঞ্জাবিরাই যখন একদিন ব্রিটিশ-রাহুমুক্ত হল তখন তারা এদেশে যা করল সে তো ব্রিটিশকে সব দিক দিয়ে লজ্জা দিতে পারে।

আমার মনে তাই নিত্য একটা আশঙ্কা জেগে আছে, পাঞ্জাবি ফৌজ এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডারা যেসব নিষ্ঠুরতা এ দেশে করেছে আমরা যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে না বসি। আমাদের মধ্যে যাদের চিত্ত দুর্বল, যারা একমাত্র অনুকরণ ছাড়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আপন কর্মপন্থা বেছে নিতে পারে না, তাদের কিছু লোক কিছুটা নিষ্ঠুরতা করবেই, কিন্তু আল্লার কাছে বার বার করুণ আবেদন জানাই, ওটা যেন আমাদের রক্তমাংসে প্রবেশ না করতে পারে, আমাদের ঈমান যেন আচ্ছন্ন না করে তোলে। এইটেই আমার এ জীবনে আমি সবচেয়ে বেশি ডরিয়েছি। অকারণে নয়। যুগে যুগে গুণীজ্ঞানীরা সাবধানবাণী শুনিয়েছেন, "পাপাচার নির্মূল করো, কিন্তু সে পাপের কালিমা যেন তোমার গাত্র স্পর্শ না করতে পারে।

www.pathagar.com

তার চেয়ে পাপাচারীর হাতে শহিদ হওয়া ঢের ঢের ভালো।"... আমি জানি, এ প্রস্তাবনাটি এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর না হলেও এতখানি সবিস্তর বলাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু যে ভয় আমাকে আজীবন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি শঙ্কাতুর করে রেখেছে সেটা এ-জীবনে অন্তত একবার সংক্ষেপে উল্লেখ না করে থাকতে পারলুম না। বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও যুগ-যুগ ধাবিত নিষ্ঠুরতা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে— এই তো সর্বনাশ!

কিসিংগার দেশত্যাগী হন পনেরো বৎসর বয়সে। নাৎসিরা ক্ষমতা লাভের প্রায় চার বৎসর আগের থেকে, দেশময় না হলেও ফ্যুর্ট-ন্যুরনবের্গ অঞ্চলে যে নিষ্ঠুরতা দিয়ে জনগণের— বিশেষ করে ইহুদিদের— মনে ত্রাসের সঞ্চার করে, তার লক্ষণ যেন আমি কিসিংগারের কার্যকলাপে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। খাঁটি নিষ্ঠুরতাটার কথা হচ্ছে না। মানুষ যে নিষ্ঠুর হয় সেটা সর্বাগ্রে বোঝাবার জন্য যে তার শক্তি অসীম, তোমার একমাত্র কাজ তার বশ্যতা স্বীকার করা। কবির ভাষায়—

"পালোয়ানের চেলারা সব
ওঠে সেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প— হিংসা-দর্প
সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায়
জাগে দানব ভায়া
গর্জি বলে 'আমিই সত্য,
দেবতা মিথ্যা মায়া'।"

ব্রাউন-শার্ট, এস এস, হিমলার হিটলারের গর্জন— তারাই সত্য। তাদের পশুবলেই সত্য শেষটায় একদিন লোপ পেল। কিন্তু হায়, এখনও আজও তাদের দর্প দম্ভ শুনতে পাই বহু জর্মন পলিটিশিয়ানের জলজ্যান্ত কণ্ঠে, কন্টিনেন্ট, মার্কিন মুল্লুকে। হ্যাঁ, দেশকালপাত্র-ভেদে অবশ্যই কখনও নিষ্ঠুররূপে, কখনও-বা মৃদু কণ্ঠে সে স্বৈরতন্ত্র— ডিক্‌টেটরি— আত্মপ্রকাশ করে। তার ক্রুরতম নীতিধর্মহীন স্বপ্রকাশ ইজরায়েলের গোড়াপত্তনের দিন থেকে। এই ইহুদিরাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছিল হিটলারের হাতে। হিটলার অবশেষে আইন পাস করলেন ইহুদিদের কোনও রাষ্ট্রাধিকার নেই, জর্মনি তাদের মাতৃভূমি নয়। এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়, রূঢ়তম ট্র্যাজেডি— এইসব বাস্তুহারা ইহুদিরাই ফলস্তিনে গিয়ে লেগে গেলে সঙ্গিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-শিশুকে আরবদের আপন মাতৃভূমি থেকে বাস্তুহারা করতে। কিসিংগার পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পেয়ে গেলেন, বিপুলতর রাষ্ট্র আমেরিকা— যেন বিশ্বভুবন দু বিঘার পরিবর্তে।

ভিন দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর কট্টর আত্মাভিমানী জন তার ঐতিহ্যগত আচার-ব্যবহার জোরসে পাকড়ে ধরে থাকে, সাধারণ জন সে দেশের জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, আর ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদী জন সর্ব ঐতিহ্য, সর্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় সুদ্দুমাত্র সাফল্য লাভের তরে। পিতা কিসিংগার কোন পন্থি ছিলেন, বলা কঠিন। পুত্র ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চান না, তিনি যে নিজকে এক্কেবারে আগাপাশতলা খাঁটির খাঁটি বনেদি খান্দানি মার্কিন রূপে পরিচিত করতে চান সে বিষয়ে মার্কিন-অমার্কিন সবাই নিঃসন্দেহ।

www.pathagar.com

নামটা নিয়েই শুরু করি। প্রথম নাম, হেনরি। জর্মনে বলে হাইনরিষ, ফরাসিতে বলে, আঁরি। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তাঁকে সব্বাই হাইনরিষ নামে ডেকেছে, তিনিও তাই লিখেছেন। ইহুদি কবি হাইনরিষ হাইনে অধিকাংশ জীবন কাটান প্যারিসে নির্বাসনে। কিন্তু তাঁর ছিল গভীর দেশপ্রীতি তথা আত্মাভিমান। তিনি হাইনরিষকে পাল্টে তার ফরাসিরূপ 'আঁরি' লেখার প্রয়োজন কখনও বোধ করেননি। রোজোভেল্ট পরিবার গোড়ার থেকেই সব্বাইকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা জাতে ডাচ এবং ইংরেজি কায়দায় রুজভেল্ট উচ্চারণ তাঁরা পছন্দ করেন না। কিসিংগার উচ্চারণের বেলাও তাই। প্রাক্তন জর্মন প্রধানমন্ত্রী কিসিংগারের শেষাংশের উচ্চারণ যে '— গার', এবং 'জার' নয় সে তথ্য সবাই জানে। বক্ষ্যমাণ হাইনরিষ কিসিংগার ইচ্ছে করলেই পাঁচজনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে নির্দেশ দিতে পারেন, 'জার' না করে যেন 'গার' উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু তিনি আমাদের পাড়ার হরিশচন্দ্র সান্ন্যালের লিখিত হরস সি স্যান্ডল এবং কালিপদ মিত্রের পরিবর্তে ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেন্ডই পছন্দ করেছেন। এনারা খাস সায়েব হতে চেয়েছিলেন, উনি চেয়েছিলেন নির্ভেজাল মার্কিন হতে। হেনরি আর কিসিংগারের মাঝখানে একটা ইংরেজি অক্ষর 'এ' আছে। অক্ষরটা কোন নামের আদ্যক্ষর সেটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি। বিবেচনা করি, খুনিয়া লোকটা বদবোওয়ালা টিপিকাল ইহুদি নামই হবে, যার অস্নাত, অধৌত ইহুদি খুসবাইটি দূর-দরাজতক ভরপুর ম ম করে। অতএব ও নামটা চেপে যাও বিচক্ষণ ঘড়িয়ালের মতো, শুদ্ধমাত্র 'এ' দিয়ে বাকিটা রাখো।

এতখানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবলমাত্র কিসিংগারের নামটি নিয়ে লোফালুফি করার মাধ্যমে আমি শুধু মাফ চেয়ে বলতে চাই, তুমি যে ইহুদি, তুমি যে জাত-মার্কিন নও, সেটা চেপে গিয়ে মার্কিনদের হনুকরণ করা কেন? (টু ইমিটেট-এর অনুবাদ 'অনুকরণ'; টু এপ-এর অনুবাদ 'হনুকরণ')। ইহুদিদের ভিতর বেশুমার সজ্জন আছেন, মার্কিনদের চেয়ে অমার্কিনদের ভিতর ভদ্রজন বে-এন্তেহা বেশি।

এসব স্নবারি অতিশয় সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ নাকি কিসিংগারের প্রতিভা এবং মানবিক গুণরাজির সংমিশ্রণ। — এ সত্য মার্কিন মুলুকে উত্তম উত্তম রাজনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন। রবার্ট মেকনামারার মতামতের মূল্য নিশ্চয়ই বহুগুণ-গ্রাহ্য। তিনি বলেন, কিসিংগারের ভিতর তিনটি অসাধারণ গুণের সমন্বয় হয়েছে; জর্মনদের কর্ম করার সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি (সিসটেমাটিক রীতিবদ্ধতা), ফরাসিদের স্পর্শকাতরতা এবং মার্কিনদের উদ্যম (কাজকর্মে অফুরন্ত উৎসাহ, অদম্য নিষ্ঠা)। তাঁর ডক্টরেট থিসিস ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, নাম 'এটম বোম এবং পররাষ্ট্র নীতি'— 'কের্নাফেন উনট আউস-ভের্টিগে অলিটিক।' এই পুস্তক ওই বৎসরই পরিবর্ধিত আকারে 'এ ওয়ার্লড রিস্টোর্ড' নামে প্রকাশিত হয়।

ইউনিভার্সিটিতে কিসিংগার অতি সহজেই অধ্যাপক পদ পান। পরবর্তীকালে তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হলে এক সুরসিক গুণী তাঁকে 'প্রফেসর' এবং 'প্রেসিডেন্ট' দুই শব্দের সমন্বয় করে সম্বোধন করেন' 'মি. প্রফাসিডেন্ট' বলে। নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও কিসিংগারের কেমন যেন জন-সমাজে নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি অযথা দৃঢ়তাসহ প্রকাশ করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা লেগে থাকে এবং আপন বুদ্ধিবৃত্তি (ইনটেলেকট) সম্বন্ধে প্রকাশ পায় তাঁর সীমাহীন ঔদ্ধত্য। এ মন্তব্যটা আমার কাছে বড়

www.pathagar.com

অদ্ভুত ঠেকে। নাৎসিরা যখন ইহুদিদের ওপর চোটপাট করছে সে সময়টা কিসিংগারের বারো থেকে পনেরো আয়ুষ্কাল— আমি ঠিক সেই ক' বৎসরেই বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার সহপাঠী ইহুদিরা যে তখন কতখানি মানসিক দুশ্চিন্তায় পীড়িত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত ছিলেন সে স্মৃতি আমার কখনও ম্লান হবে না। এঁরা যে হীনমন্যতার (ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেকসের) সহজ শিকার হবেন, সেটা অনায়াসেই বোঝা যায়। তাই মনে আসে আবার সেই নীতিবাক্য : জালিম তার জুলুমের অনেকখানি রেখে যায় তার শিকারের (মজলুমের) চরিত্রসত্তায়। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা যায়, তার চিন্তাধারা কার্যকলাপে অহেতুক দম্ভ, অকারণ অপমানজনক আচরণ।

নিক্সনের কর্ণধার, 'প্রাইভেট নয় নম্বর' ডিটেকটিভ উপন্যাসের হি-ম্যান হিরো 'ওয়াশিংটন ০০৯'; এবং সর্বশেষে 'প্রভুর বিবেক স্পন্দন' এই হর-ফন-মৌলা কিসিংগার। ইনি নিজের কার্যভার কমাবার তরে কখনও কোনও ডেপুটি রাখেননি — বরমানও রাখতেন না— অধঃস্তন কর্মচারীদের কড়া মানা, তাঁরা যেন কখনও সরাসরি নিক্সনের সম্মুখীন না হয়। তদুপরি তিনি কংগ্রেস, ব্যুরোক্রাটি এমনকি গণশক্তির আধার ভোটারদের অতিশয় তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তাঁর মতে, সুষ্ঠু পররাষ্ট্রনীতি চালাবার পথে এরা নুইসেনস, বেকার ঝামেলাময় বাধা মাত্র।

ইনি হতে চলেছেন, কিংবা ইতোমধ্যে হয়ে গেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এবারে লাগবে ভানুমতির খেল— অবশ্য ওয়াটারগেট-ফাঁড়াটা কাটাতে পারলে। পাঠক সেদিকে নজর রাখবেন। নইলে আমি এতখানি লিখতে যাব কেন, অথচ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয়নি। হবে। ধীরে রজনী, ধীরে।

সাধু সাবধান!

প্রথম লেখাতেই যদি লেখক লম্বা-চৌড়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, তবে পাঠকমাত্রই বিরক্ত হয়। সে-পরিচয় দিতে হয় ধীরে ধীরে, টাপেটোপে, মোকামাফিক। এই বেলা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ নিতান্তই বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে।

অস্বীকার করব না, একদা টুকলি করেই হোক, এগজামিনারকে প্রলোভন দেখিয়েই হোক, দু একটা আজেবাজে পরীক্ষা পাস করেছিলুম। তার পর মাঝে-মধ্যে দু একখানা বই, পত্র-পত্রিকাও পড়েছি। কিন্তু স্বরাজ পাওয়ার বছর দশেক পর থেকে দেখতে পেলুম, কি ভারত, কি (মরহুম) পূর্ব-পাক সরকার উঠেপড়ে লেগে গেছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করতে এবং যেটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,— শিক্ষিতকে অশিক্ষিত করতে। খবর এল, সরকার হার্ড-কারেনসি বাঁচাতে চান। ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতার গোড়ার দিকে থ্যাকার দাশগুপ্ত কোম্পানিকে নেটিভ-টাকা মেড়ে দিলেই তারা ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন যে-ভাষার যে-বই চান, আনিয়ে দিত। এখন আর সেটি চলবে না। সরকার বাছাই বাছাই কোম্পানিকে বিদেশি মুদ্রার 'কোটা' দেবেন। আপনি কী বই চান, তাদের জানাবেন। তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। সরল পাঠক, উল্লাসে নৃত্য জুড়েছেন তো? আমারও চিত্ত জুড়ালো! উল্লাসভরে বইয়ের অর্ডার দিই। নো রিপ্লাই। কেন? খবর নিয়ে জানলুম, পুস্তক বিক্রেতারা যে 'কোটা' পান তাই দিয়ে জাহাজ জাহাজ টিকটিকি নভেল আর খাবসুরৎ সেক্সের বই

আনান ৪০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট কমিশন! আর আমি চেয়েছি, হের ডক্টর কিসিংগারের জর্মন ভাষায় লেখা কেতাব,— 'এটম বমের ভয় দেখিয়ে কী প্রকারে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যায়', মোটামুটি কেতাবের নাম ওই। সে-বই একখানা আনালে পুস্তকবিক্রেতা কোনও কমিশনই পাবেন না, কিংবা পাঁচ পার্সেন্ট! আমার এক ক্যাপিটালিস্টি পয়সাদার কম্যুনিস্টি ইয়ার অনেক ঝুলোঝুলি করার পর পুস্তকবিক্রেতা, সত্য সত্যই মোটা কমিশনের লোভ কাটিয়ে তাঁকে বললেন, আমি যদি একই কেতাবের— আবার বলছি একই কেতাব, পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়— একই কেতাবের পাঁচ কপি এক অর্ডারেই কিনি, তবে তাঁরা বিষয়টি মেহেরবানিসহ বিবেচনা করে দেখবেন। শুনুন পাঠক, একই বইয়ের পাঁচ কপি! আচ্ছা বলুন তো, খুদ দ্রৌপদীকে যদি একই রঙ-চঙের, হুবহু একই ধরনের, পাঁচখানা কার্বন-কপির মতো পাঁচটা স্বামী দেওয়া হত তা হলে তিনি কি চাঁদ-পানা মুখ করে পাঁচ দফে কবুল পড়তেন?... এবং ভুলবেন না, তাঁকে রোক্কা টাকা ঢালতে হয়নি। তা সে যাক গে। কিন্তু এস্থলে বলে রাখি, আমি সরকারের সমালোচনা কস্মিনকালেও করিনে। বরঞ্চ না খেয়ে মরব, তবু হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতে আমি রাজি নই। সরকার বইয়ের বদলে গোবর কিনে যদি দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে নিরন্নকে অন্ন দিতে পারেন, তবে আপত্তি করার মতো অত বড় পাষণ্ড আমি নই। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার কীই-বা লাভ-লোকসান? আমি ছিলুম অশিক্ষিত, থাকব অশিক্ষিত। পূর্বোক্ত জর্মন বই পেলে আমি কি রাতারাতি শহীদুল্লাহ হয়ে যেতুম? লাইব্রেরির চাপরাসি দিন-ভর হাজার হাজার বইয়ের মধ্যিখানে বাস করে শেষটায় কি শিক্ষামন্ত্রীর পদে প্রমোশন পায়? তবে প্রসঙ্গটা তুললুম কেন? বলেই ফেলি। আজ আবার শব-ই-বরাৎ! মাঝে মাঝে এই-বই সে-বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে সরল পাঠককে তাক লাগাবার কুমতলব আমার হয়। তখন যেন আমার কথা বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দেবেন না।

শক্তির ভারসাম্য

হের ডক্টর ফিল হাইনরিষ কিসিংগারের চিত্তজগতের গুরু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, তৎকালীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ফরেন মিনিস্টার (১৮০৯-১৮২১) ক্রেমেনসে মেটারনিষ। নেপোলিয়নের পতনের পর লণ্ডভণ্ড ইয়োরোপে যখন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সুবো-শ্যাম কামড়াকামড়ি চলছে, তখন মেটারনিষ প্রধান রাষ্ট্রগুলোকে ভিয়েনাতে নিমন্ত্রণ করে একত্র করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তাঁরই যুক্তিতর্ক অসাধারণ মেলামেশা করার ক্ষমতা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমা-নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। আজকের দিনে যারা ইউনাইটেড নেশনসের কার্যকলাপ চোখ মেলে দেখেন তারা এ কর্মটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে করবেন। মেটারনিষ ভাগ-বাঁটোয়ারা করার সময় যে নীতি অবলম্বন করেন সেটা আজও 'মেটারনিষ সিসটেম' নামে প্রখ্যাত। এ নীতির মূলে ছিল ভারসাম্য। অর্থাৎ ইউরোপকে এমনভাবে বিভক্ত করতে হবে, যাতে করে কোনও রাষ্ট্রই যেন বড্ড বেশি বলবান না হতে পারে, এবং শেষটায় গুণ্ডার মতো দুবলা রাষ্ট্রের কানপাকড়ে আপন স্বার্থ গুছিয়ে না নিতে পারে। অপকর্মের ভিতর ওই ভিয়েনা কংগ্রেসে সিংহলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই— পাঠক, ঠিক ধরেছ— ইংরেজই সক্কলের পয়লা কংগ্রেসের পরবর্তী

www.pathagar.com

অধিবেশনের ডাঙ্গা ত্যাগ করে আপন চর-এ ঘাপটি মেরে বসে রইল। নীতিটার কিস্মৎ কিন্তু ইংরেজই মালুম করতে পেরেছিল সবচেয়ে বেশি। এসব দলাদলির একশো বছর পরও প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ইউরোপের ভারসাম্য রাখবার জন্য হিটলারকে খাইয়ে-দাইয়ে পোস্টাই করেছিলেন স্তালিনের সঙ্গে আখেরে লড়বে বলে।

বাংলাদেশ পাকিস্তান
...গুলি খান— খান খান

পাঠক অধৈর্য হবেন না। কারণ এ ছাড়া অন্য গতি নেই। কে বিশ্বাস করবে বলুন, সুদূর মার্কিন মুল্লুকের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সঙ্গে এই গরিব বেচারি বাংলাদেশের— বাংলাদেশ কেন, কুল্লে বিশ্বের বরাৎ বিজড়িত। 'বরাৎ' শব্দটি ইচ্ছে করেই বললুম। কারণ শবেবরাতের রাত্রেই বেতারে শুনতে পেলুম, (পরের দিন খবরের কাগজ ছুটিতে ছিলেন বলে সে খবর পাকাপাকিভাবে জানতে পারলুম না, পাঠক আমার তরে আধেক ইঞ্চি মার্জিন বা গুঞ্জাইশ রাখবেন) যে-হের ডক্টর কিসিংগার তাঁর মিত্র, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে ঠেলা মেরে সরিয়ে, আপন ছায়ারূপ পরিত্যাগ করে কায়ারূপ ধারণ করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর গদিতে বসবেন, তিনি সিনেট সদস্যদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'নাটকীয় তেমন কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেনি, তবে গত ছ মাস ধরে ভারত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নতি লাভ করছে।" কাষ্ঠরসিক ফোড়ন দেবে, ওয়ার্স থেকে ব্যাড-এ এসেছে, নিকৃষ্টতর থেকে নিকৃষ্টে পৌঁছেছে। এর পরমুহূর্তেই বলবেন, 'কিন্তু পাকিস্তানের বড্ড বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তাকে সাহায্য করতে হবে।' আহা, বাছা রে, পুব-পাককে পেঁদিয়ে পেঁদিয়ে তোমার হাতে বড্ড ব্যথা ধরেছে। এসো, যাদু, একটা গোল্ড ইনজেকশন দিই। পরে, চাই কি, এক খালুই এটম-আণ্ডা পাঠিয়ে দেব'খন।

স্মরণে আসছে না, বলেছি কি না, কিসিংগার-নিক্সন গলাডা কাড্যা ফালা-ই-লেও মি. ভুট্টোকে ফৌজি জুন্তার 'ফি নারি—' পড়তে দেবেন না। হ্যাঁ, জুন্তার খুঁটি এ-দিক ও-দিক সরাও, দু-চারটেকে রাজসিক পেনশন দাও— কিন্তু হাঁক দিলে যেন পুকুরের ওপার থেকে লাঠি হাতে তড়িঘড়ি অকুস্থলে হাজির হয়। আর ওই বস্তা-পচা সিস্টেমে জুন্তার বেশি লোককে ইলচির পাগড়ি পরিয়ে ভিনদেশ পাঠিয়ো না। কে জানে, কবে লেগে যাবে ভারত, আফগান, রুশ-চীন কার সঙ্গে। এস্তেক বেলুচ পাঠানকে ঠ্যাঙ্গাবার তরে টিক্কা খানের তো কুইনটুপ্লেট ভাই নেই! জুন্তা ভাঙলে ওদের ঠেকাবে কে?

হঠাৎ কিসিংগার এ-হিম্মৎ জোগাড় করলেন কোথা থেকে? এ্যাদ্দিন তো প্রভু-ভৃত্য— অথবা ভৃত্যের বেশে প্রভু— দু জনাই তো গোরস্তানি খামুশি এখতেয়ার করেছিলেন। ঝপাঝপ স্টেটমেন্ট, দেমাতি, এস্তেক প্রেস-কনফারেন্স দিতে শুরু করেছেন হুজুর, আর ইয়ার বুক ফুলিয়ে সিনেটের সামনে বলছেন, 'পাকিস্তানকে মদত দিয়েছিলুম— বেশ করেছিলুম। ফের দেব'। ছুঁচো জ্যাক এন্ডারসনকো মারো গুলি— সেটা বলেছেন মনে মনে। আর স্বয়ং নিক্সন ওয়াটারগেট তদন্তের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সিনেটরদের খেতাব দিয়েছেন, কিচিরমিচির করনেওলা সব কথাতেই 'না-মনজুর! না-মনজুর!' 'চিল্লি মারার নবাব সায়েবের

www.pathagar.com

পাল'— ইংরেজিতে 'ন্যাটারিং নবাবস অব নিগেটিভজম'। কবি নিক্সনের তা হলে এই ন অক্ষরের অনুপ্রাসের প্রতি বিলক্ষণ দিল-চসপি আছে। আমার বাংলা তর্জমাটা বড্ড কুশাদা হয়ে গেল, কিন্তু পাঠক লক্ষ করবেন, মুল ইংরেজিতে 'নবাব' শব্দটি আছে। সায়েবি উচ্চারণ 'নইবব'। নিক্সন এখানেই ক্ষান্ত দেননি। স্বয়ং কটুবাক্যের জহাঁবাজ 'নইবব' নিক্সন মেহমান জাপানি প্রধানমন্ত্রীর 'স্বাস্থ্য পান' করার সময় বলেছেন, 'ওরা সব সামলাক তাদের গম-পেরেশানি, ফালতো হাবি-জাবির আক্রোশ'— ভাবখানা এই, 'আমি এগিয়ে যাব ড্যাং ড্যাং করে'। ইংরেজ সচরাচর এ ধরনের বিদেশীয় বড়ফাট্টাইয়ে ভর্তি বগল-বাজানোর ওপর নজর দেয় না। কিন্তু এস্থলে তাঁদেরই এক পয়লা নম্বরি সম্পাদক বলেছেন, 'উহু! এবার থেকে হুজুরকেই ওই গম-পেরেশানি দিয়ে নিত্যি নিত্যি লাঞ্চ ডিনার খেতে হবে।' হয়তো হবে, কিন্তু আমার মনে হয়, হাওয়া যেন হঠাৎ করে উল্টো দিকে ভর করেছে।

রতি-বল-বর্ধক কিসিংগারি সালসা

মেটারনিষ নীতিতে— শক্তির ভারসাম্যে— কিসিংগারের অচল বিশ্বাস। কিন্তু এই নীতিটা হালফিল কাজে খাটাতে হবে অন্য পন্থায়। মার্কিনের হাতে আছে এটম বোমের ডাণ্ডা। সেই ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে দুনিয়ার কুল্লে রাষ্ট্রকে বলে দেব, কে কতখানি শক্তিবান হবার অনুমতি পেল। এইটেই ছিল ড. কিসিংগার-থিসিসের মূল বক্তব্য। বইখানা পড়ে নিক্সন তদ্দণ্ডেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর নিক্সন ডেকে পাঠালেন কিসিংগারকে ওই 'শক্তির ভারসাম্য' কাজে লাগাতে। এখানে দুটি তথ্য বলে নেওয়া ভালো। কিসিংগারের মতে, 'শক্তির ভারসাম্য' তো বটেই, কিন্তু সেটা এখন আসবে এটম বোমের 'ভীতির ভারসাম্য' রূপে, কিন্তু নিজেকে থাকতে হবে শক্তিমান। এবং তাঁর আপন মাতৃভাষা জর্মনে কিসিংগার ঝেড়েছেন একটি লাখ কথার এক কথা : 'মাখট ইসট ডের গ্র্যোসটে আফ্রডিসিয়াকুম'— অর্থাৎ 'পলিটিকাল শক্তিই ('মাখট' ইংরেজি 'মাইট') সর্বোৎকৃষ্ট আফ্রডিসিয়াক'— যে ওষুধ রতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়, পঞ্জিকার যে সব মলম-বড়ির চটকদার বিজ্ঞাপন অন্ধেরও চোখ এড়াতে পারে না, তার ভদ্র নাম আফ্রডিসিয়াক। দ্বিতীয় তথ্য— দুশমন পরাজিত হলেও মজলুমের ওপর তার প্রভাব রেখে যায়— এটা পূর্বেই বলেছি। শক্তির উপাসক হিটলার দেখিয়েছেন, শক্তিতে ভাটার টান লাগার সম্ভাবনা দেখলেই শক্তির ভড়ং দেখাবে মাসল ফুলিয়ে, উরু থাবড়ে। এটা তো ভালো করে রপ্ত করেছেনই কিসিংগার, তদুপরি হিটলারের গুরু শক্তির মূর্তিমান প্রতীক বিসমার্ক (ইনি মেটারনিষের সদুপদেশ নিতেন আখছারই) সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখে তাঁরই পন্থায় শক্তি সাধনায় নিজেকে বহু পূর্বে চালিত করেছেন।

আকস্মিক না প্ল্যান-মাফিক

এইবার কিসিংগার নেমেছেন মল্লভূমিতে। তাঁর অন্তরঙ্গ সখা পররাষ্ট্র সচিব রজার্স, যাঁর সাহায্য তিনি নিয়েছেন রাজনীতিতে ছায়ারূপে পদার্পণ-কালে, অকৃপণভাবে, তাঁকে সরিয়ে

www.pathagar.com

তিনি সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রখর দিবালোকে। ভিয়েনা কংগ্রেসের শক্তিসাম্য নির্মাণকালে তাঁর মানস-গুরু মেটারনিষও ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিমান অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। রণাঙ্গনে নেমে কিসিংগার কোন ইন্দ্রিয়াতীত শঙ্খধ্বনি বাজিয়েছেন, জানিনে, কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝিনি কিন্তু ফলস্বরূপ এ ক দিনে কী কী ঘটল লক্ষ করুন। সব কটাই কিসিংগার-নীতি অনুযায়ী।

১। ইজরায়েল অকস্মাৎ আক্রমণ দ্বারা সিরিয়ার বিমানবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ পঙ্গু করেছে পরশুদিন। সিরিয়া রীতিমতো ধরাশায়ী।

২। জনাব আজিজ আহমদ অকুণ্ঠ তর্কাতীত ভাষায় বলেছেন, সর্বশেষ যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে পাঠাও। তাদের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা চালাতে পারবে না। ইউনাইটেড নেশনে ঢোকার প্রস্তাব তার পর। চীন আছে সেখানে পুরো মদত দিতে— আমাকে। কোথায় গেল উভয়পক্ষের সমাসনে বসে আলোচনা-সমঝোতাটা? এই সুর-পরিবর্তন বিশ্বরাজনীতিতে ভয়ঙ্কর কিছু নয়, কিন্তু বাংলাদেশ এবং পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানের পক্ষে জব্বর গুরুত্ব ধরে।

৩। সদর দাউদ মার্কিনের চেলা না হয়েও কিসিংগারের অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছেন আগা মুহম্মদ নঈমকে কমরেড ব্রেজনেভের কাছে। বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায়নি। দাউদ যে আজিজের কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন লক্ষ করেছেন তাই নয়, কিসিংগার যে পাকিস্তানকে সাহায্য করবেন (দাউদ জানেন, সে সাহায্য গোপনে সেরা সেরা অস্ত্রশস্ত্রের রূপ নেবে) সেটা কিসিংগার সিনেটের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। নিক্সনাদির দৃঢ় বিশ্বাস রুশের সাহায্য নিয়ে দাউদ 'ক্যু', সমাপন করেছেন, ব্রিটিশ বলে অসম্ভব নয়, তবে রুশ যে আগের থেকেই ক্যু-র খবর জানত সেটা সন্দেহাতীত।

৪। সবচেয়ে মারাত্মক চিলি রাষ্ট্রের ক্যু। নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, চিলির ক্যু-র আগের দিনই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাটির খবর জানত। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটের সামনে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ঝটপট তার দেমাঁতি (প্রতিবাদ) প্রকাশ করেছেন ও মৃতের স্মরণে সরকারি ব্লটিং পেপার দিয়ে আড়াই ফোঁটা কুম্ভীরাশ্রু শুষিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ংক্রিয় গোপন টেপ-রেকর্ডের জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে থাকলে সে টেপ মহাফিজখানায় সযত্নে রাখা হয়েছে কি না, সুপ্রিম কোর্ট গোঁ ধরে সেটা চেয়ে বসলে সদর নিক্সন সেটা দেবেন কি না, তা এখনও প্রকাশ পায়নি।

এতগুলো দিগ্বিজয় কি দৈবযোগে, গ্রহ-নক্ষত্রের কেরামতিতে ঘটল? এর সঙ্গে বিজড়িত আছে আরও তিনটি ঘটনা। (১) যে আদালতে ওয়াটার-গেট কমিটির পক্ষ থেকে নিক্সনের ওপর হুকুমজারি চাইছে, তিনি যেন তদন্ত সম্পর্কিত টেপগুলো কমিটিকে দিয়ে দেন, সে আদালত সরাসরি রায় না দিয়ে একটি সুলেহ্ প্রস্তাব করেছেন। অনেকে মনে করেন, নিক্সন-বৈরী ভাব যেভাবে দ্রুত কমে যাচ্ছে তাতে করে আদালত দেশের বিরাটতর স্বার্থের খাতিরে এটা করেছেন। কিন্তু নিক্সন গরম। পূর্বেই একাধিকবার শুধিয়েছি, কী কেরামতির বদৌলত এসব ঘটছে? এখন শুধোই হুজুরের আকস্মিক এ গরমাইয়ের অর্থটা কী? তিনি আদালতকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু এতে করে আমার "প্রশাসনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধিকার"— খুদ-মুখতারি— ক্ষুণ্ন হবে না তো? অর্থাৎ ভবিষ্যতে ফের অন্য কিছু চেয়ে বসলে

www.pathagar.com

আমাকে বিনা ওজর-আপত্যে সুড় সুড় করে কুল্লে চিজ ঢেলে দিতে হবে না তো? আদালত সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছেন, 'আরে না, না, না।' এসব প্রশ্ন, হঠাৎ এই মধুর মধুর মোলায়েমিটা আদালতের খাসলতে এল কোত্থেকে। আদালতের এহেন গুঞ্জাইশ প্রচেষ্টা যে বড্ডই অভিনব ঠেকছে! আমরাও সুলেহ চাই, কিন্তু এতখানি আক্রা দরে?

(২) আরভিন তদন্ত কমিটি নিয়েছিলেন ছুটি— ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। হঠাৎ খবর এল, আরভিন মেম্বারদের জানিয়েছেন, ছুটি বাতিল, কমিটি বসবে ২৪ সেপ্টেম্বর। কেন? অনেকেই বলছেন, যেভাবে ঝড়ের বেগে হাওয়া পাল্টাচ্ছে, তার থেকে অনুমান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, যে মোতাবেক ১৫ অক্টোবরতক আরভিন কমিটি ছুটি উপভোগ করে ওইদিন কমিটি ঘরে এলে হয়তো দেখবেন দরওয়াজা বন্ধ,পাইক-বরকন্দাজ হাওয়া, আসামি-ফরিয়াদি গায়েব।

(৩) অবস্থার অধঃপতন দেখে স্বয়ং কেনেডি আসরে নেমেছেন।

মানতেই হবে, বাবাজীবন কিসিংগারের পেটে এন্তের এলেম গিজগিজ করছে।

কী ভয় দেখালেন তিনি? তার সারাংশ এইমাত্র শুনলুম, বেতারে। অবশ্য তিনি জিভ কেটে বলবেন, তওবা তওবা। খাকসার ইহুদির পোলাডা দেখাবে ভয়— মহাপরাক্রান্ত আরভিন কমিটি, কংগ্রেস সিনেটকে! তওবা, তওবা!... অতএব বারান্তরে।

প্রেমালাপ বনাম বৈদ্য-বিমান

পাড়া-পড়শি কারও কাছ থেকে একখণ্ড মার্কিন সংবিধান লিপি জোগাড় করতে পারব এমনতরো বাতুলাশা আমরা করি না। আর, জোগাড় হলে লাভটাই-বা কী? ওয়াটারগেটের টেপরেকর্ড প্রেসিডেন্ট নিক্সন আদালতের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য কি না, সংবিধান অ-সমস্যায় কী নির্দেশ দেয়, এই নিয়েই তো যত মাথা ফাটাফাটি। তদন্ত কমিটি বলছেন, দিতে বাধ্য। নিক্সন বলছেন, না। তুলনামূলক যুক্তি দিয়ে বলছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সঙ্গে যে সলা-পরামর্শ করেন সেগুলো পূতপবিত্র মুকদ্দস। যেমন মক্কেল এবং উকিলে যেসব অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, স্বামী-স্ত্রীতে নিভৃতে যে গুফতো-গো হয় সেগুলো পবিত্র। অর্থাৎ কোনও আদালতই সেগুলো মোক্ষম হুকুম দ্বারা সংগ্রহ করতে পারেন না, জজ এগুলো একা একা গোপনে পড়তেও পারেন না, প্রকাশ্য আদালতে সর্বজনসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়ার তো কথাই ওঠে না। জনৈক টীকাকার উত্তরে বলেন, যে-দুটো উদাহরণ নিক্সন পেশ করলেন সে-দুটো যদি আইনত মেনে নেওয়া হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উদাহরণ অতি অবশ্যই মানতে হবে, এবং ঘড়িয়াল নিক্সন সে উদাহরণটা চেপে গেলেন কেন?— ডাক্তারে-রোগীতে যে গোপন আলাপ হয় সেটাও সেক্রেড। প্লাতোর চেয়ে বয়সে বড়, ইউরোপে যিনি 'চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনকরূপে পরিচিত সেই গ্রিক বৈদ্যরাজ হিপপো-ক্রাতেস তাঁর শিষ্যদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিতেন "আমি যা কিছু সর্বাপেক্ষা পূত-পবিত্র (সেক্রেড) বলে স্বীকার করি, তাদের নামে শ্রদ্ধাভক্তিসহ (সলেমলি) শপথ করছি, আমি চিকিৎসাকর্ম নিষ্ঠাসহ সমাপন করব, ইত্যাদি ইত্যাদি"... এস্থলে একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে শপথ নেওয়ার পর সর্বশেষে শপথ করতে হত— "রোগী এবং তার সংশ্লিষ্ট জন সম্বন্ধে আমি যা-কিছু দেখতে পাব, শুনতে পাব, যেগুলো সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা অনুচিত সেগুলো আমি

www.pathagar.com

অলঙ্ঘ্য গোপনরূপে রক্ষা করব (ইনভায়োলেবলি সিক্রেট)।" ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের উপমহাদেশেও ডাক্তারদের সনদ নেওয়ার সময় এই কসম নিতে হত। এখনও কোনও কোনও বৃদ্ধ চিকিৎসকের চেম্বারে এই শপথলিপি ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় দেখা যায়। আজকের দিনে... যাক, অপ্রিয় কথা।

নিক্সনের উত্তরে যে টীকাকার রোগীর গোপন কথার পবিত্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তিনি খুব সম্ভব আড়াই হাজার বছরের পুরনো সর্ববিশ্ব-সম্মানিত এ শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার দোহাই দেবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেননি। আসল কথা, নিক্সনের দুশমন জনৈক সিনেটরকে ঘায়েল করার জন্য হোয়াইট হাউস কর্তৃক সেই সিনেটরের চিকিৎসকের দফতর থেকে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের গোপন আলাপচারীর রেকর্ড চুরি করানো হয়— হুবহু যে-কায়দায় ওয়াটারগেট থেকে দলিল-দস্তাবেজ পেশাদারি চোর মারফত চুরি করানো হয়।

নিক্সনের বিবৃতি যিনি তৈরি করে দেন তিনি নিশ্চয়ই আস্ত একটি গর্দভ। উকিল-মক্কেল, স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তার পবিত্রতা নিয়ে উদাহরণ দেবার কীই-বা ছিল প্রয়োজন? করলেই যে রোগী-বৈদ্যের পবিত্রতর কথোপকথন উদাহরণ আপনার থেকেই এসে যাবে, সেটা এক লহমার তরেও তার মাথায় খেলেনি? তাজ্জব! এবং সেই পবিত্রতা ভঙ্গ করেছেন নিক্সনের আপন খাস কর্মচারীগণ।

স্কুল-বয় কিসিংগারের ভাইভা

আমি কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন সংবিধান-লিপির তালাশ করছিলুম। কয়েকদিন ধরে ড. কিসিংগারকে মার্কিন সিনেটের একটা বিশেষ কমিটির সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মার্কিন ফরেন-পলিসি নিয়ে হরেক রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেন ভাইভা পরীক্ষা। ইতোমধ্যে এক মার্কিন বেতারকেন্দ্র বললে, দু জন মেম্বর নাকি বলেছেন, তাঁরা কিসিংগারকে ফরেন মিনিস্টারের নোকরিটা দিতে চান না। ব্যাপারটা তবে কী? আমরা তো জানতুম, গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বা সক্রিয় প্রেসিডেন্ট তাঁর পছন্দসই মন্ত্রী নিয়োগ করেন, খুশিমতো ডিসমিস করেন গণ-পরিষদ, এমনকি আপন মন্ত্রীমণ্ডলী-কেবিনেটের কোনও তোয়াক্কা না করে। তাই ধরে নিচ্ছি, প্রাগুক্ত কমিটি যদি কিসিংগারকে গোল্লা দিয়ে না পাস করে দেন, তবে নিক্সন ভেটো মেরে না-পাসিটা বাতিল করে দিতে পারেন। কিংবা এটাও সম্ভব যে, কিসিংগার যেহেতু জাত-মার্কিন (এমেরিকান সিটিজেন বাই বার্থ) নন, ষোল বছর বয়সে স্টেট্সে এসে ডমিসাইল্ড নাগরিকত্ব পান, তাই সুদ্ধমাত্র এ ধরনের উমেদারকেই হয়তো তাদের নির্ভেজাল 'মার্কিনত্ব' প্রমাণ করতে হয়। শুনেছি, জাত-ইতালিয়ান ভিন্ন অন্য কেউ হোলি পোপ হতে পারেন না, তথা ভিন্ন-ধর্ম থেকে দীক্ষিত খ্রিস্টান পাদ্রি সমাজে বিশেষ একটা পদের (যেমন বিশপের) উপরে যেতে পারেন না। আমার এ-খবর যদি ভুল হয়, ক্যাথলিক সমাজ দয়া করে অপরাধ নেবেন না। তা সে যাই হোক, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত দেশের মুরুব্বিস্থানীয় ফরেন মিনিস্টার একটা স্কুল-বয়ের মতো ভাইভা দিচ্ছেন— এ তসবিরটা আমার কাছে কেমন যেন খাপছাড়া বদখৎ মনে হয়।

www.pathagar.com

তাজহীন আগ্রা?

এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটা খবর আমাকে আরও বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মি. ভুট্টো স্টেটসে মি. নিক্সনের সঙ্গে দু বার দেখা করবেন, উনোতে বক্তৃতা দেবেন, ন্যাশনাল প্রেসক্লাবেও তাই— এবং অবশ্যই সেখানে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেবেন, এমনকি নিক্সনের বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ যথা হামফ্রি, ফুলব্রাইট এবং কেনেডির সঙ্গে মোলাকাত করবেন।

সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির মেম্বর এঁদের দু জন। কিন্তু হবু ফরেন মিনিস্টার, কার্যত সে পদে বহাল— ড. কিসিংগারের নাম কই? মি. ভুট্টো নিশ্চয়ই তাঁর ন মাস ধরে কপচানো বুলি ভুলে গিয়ে ওয়াটারগেটের মতো ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে নিক্সনের সঙ্গে দু দিন ধরে রসালাপ করবেন না। এস্তেক সিনেটের ফরেন কমিটির সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু খুদে ফরেন মিনিস্টার কিসিংগারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কোনও উল্লেখ নেই, এটা কী করে সম্ভবপর হয়? ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইয়েহিয়াকে মদত দেবার জন্য প্রতিদিন জরুরি মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছেন যে কিসিংগার! চীনে যে লোমহর্ষক মুলাকাত হল মাও এবং নিক্সনে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান আলোচনার সময় আর দু জন মাত্র লোক— চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এবং কিসিংগার। মার্কিন ফরেন মিনিস্টার রজার্স নিতান্তই বাহাররূপে দলের সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু সে সভায় তাঁকে ডাকা হয়নি। মাও যখন নিক্সনকে তাঁর আপন বাড়িতে দাওয়াত করলেন তখন দাওয়াত পেলেন কিসিংগার— কোথায় রজার্স? চীনের প্রাচীর দেখবার জন্য নিক্সন গেলেন সদলবলে; পিকিং-এ রয়ে গেলেন কিসিংগার, চু'র সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তায় (হয়তো গোপন চুক্তির!) রূপ-রেখা দেবার জন্য! চু বলেছেন, 'ওই একটা লোক যার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা যায়।' সর্বপ্রথম মোলাকাতের সময় পাছে কোনও ফজুল প্রটোকলবশত কিসিংগার উপস্থিত না থাকেন, তাই মাও আগে-ভাগেই নিক্সনকে জানিয়ে রেখেছিলেন কিসিংগার অতি অবশ্যই যেন সে মোলাকাতে হাজির থাকেন। বিশ্বজন সে সময়েই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, চীন-মার্কিন আঁতাতের একমাত্র ঘটক শ্রীযুক্ত কিসিংগার। অনেকেরই বিশ্বাস, তাঁর সম্মতি ছাড়া নিক্সন নিশ্চয়ই ভুট্টোকে গদিতে বসাতেন না। এবং একটা তেতো হক বাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ইয়েহিয়াকে ব্যাক করে নিক্সন মার খাননি, কিল হজম করেছেন কিসিংগার, তবে এটাও খুবই স্বাভাবিক যে, কিসিংগার পুরো মদত দেবেন মি. ভুট্টোকে, সে পরাজয়ের কালিমা যতখানি পারেন তাঁকে দিয়ে মোছাবার জন্য। একটু শঙ্কাও যে নেই, বলবে কে?— ইহুদিসন্তান কিসিংগার দাদ নেবার তালে থাকবে না, এ ভরসাই-বা দেবে কে?.... সেই কিসিংগারের নাম নেই, ভুট্টো যাঁদের দর্শন করতে যাচ্ছেন ওয়াশিংটনে, তার ফিরিস্তিতে তার চেয়ে পাঠক বললেই পারেন, 'আগ্রা যাব নামজাদা সব এমারত দেখতে'— ফিরিস্তিতে? দেখি, তাজমহলের নাম নেই। হল না। বরঞ্চ বলি, সর্ব ফিল্ম বাবদে জউরি গুণীন 'ঘটি' বললে, 'চললুম ঢাকা, দেখব সরেস সরেস ফিল্ম।' তার নোটবুকে তাকিয়ে দেখি, চিত্তহারিণী 'তারকা' কবরী দেবী যেসব ফিল্ম ধন্য করেছেন তার একটারও নাম নেই বেকুবের ফিরিস্তিতে!... ভুট্টো-কিসিংগারে দেখা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, কেন? তবে কি কিসিংগারের এখন কোনও ধরনের রাজনৈতিক ইদ্দত পিরিয়ড যাচ্ছে?

www.pathagar.com

অসাধারণ মেটারনিষ বিরাট কংগ্রেসে যেরকম আপন ব্যক্তিত্বের ম্যাজিক বাঁশি বাজিয়ে দশটা নেশনকে নাচাতে পারতেন, ঠিক তেমনি বল-রুমে নিজে নাচতে পারতেন অপূর্ব লাস্য-লালিত্যসহ সমস্ত রাত। তাঁর স্মরণে গদগদ কণ্ঠে কিসিংগার বলেছেন, 'কি কেবিনেটে, কি লেডিজদের অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা কক্ষে— সাঁলোতে— তাঁর চলন-বৈঠন, অনায়াস আচরণ ছিল প্রকৃত রোমান্টিকের মতো। কেবিনেট সাঁলোর সম্মেলন করতে পেরেছিলেন তিনিই।' অধ্যাপক কিসিংগার আজকের দিনে গুমড়োমুখো পলিটিশিয়ানদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতেন, কত না দূরে অন্তহীন সুদূরে চলে এসেছে এরা, সেই গৌরব এবং মাধুর্যময় যুগ থেকে— রাজনীতিকলা আর জীবন-চালনা-কলা দুটোর সমন্বয় করতে জানে না এরা। আজ সবাই বলছে কিসিংগার এ সমন্বয় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। আবার মেটারনিষের মতোই কিসিংগার বিশ্বাস করেন, রাজনীতি একটা আর্ট— কলা-বিশেষ। সে আর্ট জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর নির্মিত হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু আদর্শবাদের সঙ্গে তার কানাকড়িরও সম্পর্ক নেই। পৃথিবী দূরে থাক, মানুষের ভিতরও কোনও পরিবর্তন আনার সংকল্প কিসিংগারের পরিকল্পনাতে নেই। তাঁর কাছে ন্যায়-অন্যায় বলেও কিছুই নেই। তিনি চান, উপস্থিত পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্রবল আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন একটা সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা (সে নিয়ন্ত্রণ করার সময় কোনও আদর্শবাদেরই প্রশ্ন ওঠে না; নিয়ন্ত্রণটা সাধু নেবে, না অসাধু সে নির্বাচনে সম্পূর্ণ সে নিরপেক্ষ) যাতে করে রাষ্ট্রবলগুলো এমনভাবে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয় যে যুদ্ধজনিত অশান্তির সৃষ্টি না হতে পারে।

কে জানে, তবে কিসিংগার কখনও মুখ ফুটে বলেননি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি হয়তো আখেরি বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধকরূপে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেটাকে ইয়েহিয়ার দমনপ্রচেষ্টা বলে তিনি নেকনজরে দেখেছিলেন। ঠিক ওই কারণেই, বিশ্বের ছোট-বড় সব শক্তিকে গ্রুপে গ্রুপে ফেলার জন্য বেলুচ-পাঠানের অটোনমি তিনি পছন্দ করবেন না। তাঁর শখের ভারসাম্যের জন্য তাঁর হাতে মেলা অস্ত্রশস্ত্র আছে।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রই কি শেষ সত্য?

গুজোরব তথা তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব

গুজোরব প্রতিষ্ঠানটির রাজধানী কোথায়? ওইয্— যা! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, বিশাধিক বৎসর ধরে দুই বাংলায় পুস্তক পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুই বাংলার লেখার ধরন, বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ, বাংলাতে একদা সুপ্রচলিত কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অব্যবহৃত 'যাবনিক' শব্দের পুনর্জীবন লাভ, নতুন নতুন শব্দনির্মাণ ইত্যাদি দুই বাংলায়, স্বভাবতই, এক পথ ধরে চলেনি। যে গুজোরব শব্দ দিয়ে লেখাটি আরম্ভ করেছি সেটা খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। গুজোব-এর 'গুজো' আর জনরবের 'রব'— একুনে গুজোরব।... ইংরেজিতেও এ ধরনের বেশকিছু শব্দ ইদানীং তৈরি হয়েছে। স্মগ শব্দটি এক্কেবারে চ্যাংড়া না হলেও খানদানিত্ব পেতে অর্থাৎ মোলায়েম প্রেমের কবিতায়, ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনায়, আসন পেতে এখনও তার সময় লাগবে। লন্ডনের কুয়াশায় পথহারা খাস

www.pathagar.com

লন্ডনবাসীই ল্যাম্প-পোস্টটাকে পুলিশম্যান ভেবে তার কাছে পথের সন্ধান নেয়, খুদ পুলিশম্যান আপন বিট-এ পথ হারিয়ে কারও বাড়ির ঘন্টা বাজিয়ে গৃহস্থকে শুধোয়, সুমুখের রাস্তাটার নাম কী? কোনওদিন যদি বেলা তিনটে থেকে প্রায় সাতটা-আটটা অবধি কুয়াশা না কাটে তবে ষাট হাজারের কাছাকাছি ডেলি-প্যাসেঞ্জার ইয়ার-দোস্তের (যদি বরাতজোরে তাদের বাড়ি খুঁজে পায়) বাড়িতে রাত কাটায়, বেশিরভাগ হোটেলে আশ্রয় নেয়।.... তদুপরি লক্ষ লক্ষ চিমনি থেকে যে ধুঁয়ো ওঠে সেটা কুয়াশা ফুটো করে উপরের দিকে উধাও হতে পারে না বলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তৈরি হয় স্মগ। 'স্মোকের' স্ম আর 'ফগের' গ নিয়ে তৈরি হয় স্মগ। কলকাতায়ও স্মগ হয়, কিন্তু লন্ডনের তুলনায় একদম রদ্দি-পানসে। ঢাকার ভেজাল বে-আইনি বিয়ারের মতো। নির্জলা জল। তা সে যাকগে। কলকাতার স্মগকে বলে ধুঁয়াশা— ধুঁয়া প্লাস কুয়াশার শা মতান্তরে ধুঁয়ার ধুঁ প্লাস কুয়াশার য়াশা। হরেদরে হাঁটু পানি। এককালে মডার্ন কবিতায় দারুণ চালু ছিল ধূসর কথাটা— জীবনটা ধূসর, প্রেমটা ধূসর, ডাস্টবিনের পচা ইঁদুরটা ধূসর, রিকশায় চীনা গণিকাটা ধূসর, মডার্ন কবিতার বিক্রিটা ধূসর— গয়রহ। এখন ধূসর শব্দটাই ধূসর হয়ে উবে গিয়েছে। এদানির জোর কাটতি ধুঁয়াশা'র। মন্ত্রীর চাকরি দেবার ওয়াদাটা ধুঁয়াশা, মিলির প্রেম-নিবেদনটা ধুঁয়াশা, তার জিল্‌টিংটাও ধুঁয়াশা, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও ধুঁয়াশা— কারণ জিঞ্জিরায় তৈরি বিষটা ছিল ভেজালের ধুঁয়াশায় ভর্তি।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় গুজোরব

গুজোরব জিনিসটা ধুঁয়াশা, তা সে 'মার্কিন টাইম' বা 'নিউজ উইক' পত্রিকায় ধোপদুরুস্ত কেতা-মাফিকই বেরুক, কিংবা কাবুলের বাজারে, চা-খানাতে 'গপ' রূপে দুই পাগড়ি পাশাপাশি এসে ফিসফিসিয়েই বেরুক। এই দেখুন না, নিদেন দিন পাঁচ হবে, সম্ভ্রান্ত মার্কিনি একখানা দৈনিক একটা চিড়িয়া উড়িয়ে দিল, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাগনো হপ্তা খানেকের ভিতর নোকরি ইস্তফা দেবেন; তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ -রিশওয়াদ খাওয়ার মোকদ্দমা উঠবে বলে তিনি খবর পেয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেল ধুন্দুমার। দক্ষিণ আমেরিকার কুইটো বেতার থেকে শুরু করে দুনিয়ার হেন কেন্দ্র নেই যে সেটা নিয়ে লুফোলুফি করছে না। রাত দু টার সময় স্টকহলম (মাফ করবেন, আমি কিসিংগারি কায়দায় ইংরেজের অনুকরণে স্টকহোম লিখতে পারব না!) খুললাম, তাদের ইলেকশনের শেষ ফলাফল জানবার তরে,— তারাও গেণ্ডেরি খেলছে ওই অ্যাগনোকে নিয়ে। বৃন্দাবনে গোপীরা একদা যেরকম বলতেন, 'কানু বিনে গীত নেই!' ওদিকে খুদ অ্যাগনো চুপ, নিস্কন খামুশ। যেন 'পাড়াপড়শির ঘুম নেই, বরের খোঁজ নেই।'

কাবুলি কায়দা

কাবুল-বাজার যে 'গপ'-এর চিড়িয়া ছাড়ে সেটা পাকড়ানো সহজ কর্ম না। কারণ, সেটা সরকারের কানে পৌঁছলে তার ডিরেক্টর চিড়িয়া ওড়ানেওলার সন্ধানে চর লাগান। অতএব কাবুলের 'বাজার-গপ' শোনাবার তরে শাস্ত্রাধিকার চাই। মার্কিন তো পাত্তাই পাবে না, আর

www.pathagar.com

আজকের দিনের ইংরেজ সাংবাদিক অর্থাভাবে ডকে উঠি উঠি করছেন! রুশ পায় সরকারি সংবাদ, খাস প্যারা দোস্তই আউওয়াল হিসেবে সক্কলের পয়লা। তাই বাজার-গপের হিস্যেও সে খানিকটে পায়। তদুপরি তার আরেকটা দোসরা জরিয়াও আছে। সরদার দাউদের যে একটা গোপন মন্ত্রণাসভা থাকবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সভার সভ্য, ষোল থেকে আঠাশ, ক জন— সে বাবদে কাবুল বাজারও দাড়ি চুলকোয়, পাগড়ির ন্যাজ নিয়ে দড়ি পাকায়, কিন্তু মুখে রা-টি কাড়ে না। তবে কি না, একটা সত্য কেউ বড়-একটা অস্বীকার করে না। দাউদ ক্যু'টা যে করতে সক্ষম হয়েছেন, তার পিছনে ছিলেন বেশ একপাল মস্কোতে ফৌজি তালিমপ্রাপ্ত আফগান অফিসার।

তাঁদের যে ক জন মন্ত্রণাসভায় হক্কত আসন পেয়েছেন, তাঁরা যে আফগানিস্তানকে আখেরে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্ররূপে তৈরি হবার জন্য সংস্কার বিধিবিধান প্রবর্তন করতে চাইবেন সেটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ছাত্র বনাম মোল্লা

প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোতে ছাত্র-সমাজ আজ অশেষ শক্তি ধারণ করে। ছুটিতে তারা যখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে যায় তখন সেখানে সর্বত্র চালায় পলিটিক্স্। মোল্লাদের মল্লভূমি প্রধানত মসজিদের মক্তবে। তাদের সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন-দর্শন। দাউদ দেশের কুল্লে মক্তব এবং যে দু-পাঁচটা বে-সরকারি নিতান্তই জুনিয়র মাদ্রাসা আছে সেগুলো সরকারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাবুল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাবিদরা বেরিয়েছেন ক্ষুদ্র শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সেসব মক্তব-মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে ও তত্ত্ব-তথ্য সংগ্রহ করতে।

দাউদ যদি সত্যসত্যই তাঁর প্ল্যান পুরোদমে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চান, তবে যেসব মোল্লা এখনও তার বিরোধিতা করেননি তারাও যে বিগড়ে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। তথ্যান্বেষী যেসব শিক্ষাবিদ সফরে বেরিয়েছেন তাঁরা সৃষ্টিছাড়া কোনও নয়া তথ্য আবিষ্কার করবেন কি? মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক নিসাব তো কাবুল শহরে বসে বসেই জোগাড় করা যায়। সেগুলোতে আছে কী? ফারসি ভাষা শেখার কায়দা-কেতা, কুরান শরীফ পাঠ, শেখ সাদির অতুলনীয় কবিতা এবং নামাজ শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য দোওয়াদরুদ। আর মাদ্রাসায় এ সবেরই অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক এবং সুকঠিন আরবি শেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। ইমাম আবু হানিফা সাহেবের ফিকাহ্— অতি সংক্ষিপ্তরূপে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় ইমামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ বুদ্ধিসম্মত (রেশনাল) যুক্তিতর্ক বোঝবার মতো শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন কজন আফগান মোল্লা-মুদররিস? পড়াবার তো কোনও প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে শিক্ষাবিদরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন, ওসব কেতাবে রাষ্ট্রদ্রোহ শেখায় এমন আছে কী সব শিক্ষা, আদেশ, ফতওয়া। এবং হবেন ন সিকে নিরাশ। ইমাম সাহেবের আমল ছিল ইসলামের সুবর্ণ যুগ। সে আমলে কোন্ ফকিহ্ বেকার মাথা ঘামিয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহের ফতওয়া নির্মাণ করার তরে?

বস্তুত মোল্লারা যখন কোনও কওমকে কাবুলের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন তখন তাঁরা আটঘাট বেঁধে আট গজি ফতওয়া লিখে সেইটে তাদের সামনে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে

www.pathagar.com

ফজুল ওয়াক্ত খর্চা করেন না। মক্তব-মাদ্রাসায় এমনিতেই খামোখা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা বিদ্রোহ কোনওটাই শেখান না। লুটতরাজের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনও 'কারণেই' হোক, মোল্লারা যখন আফগানকে কাবুলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন তখন তারা নিতান্ত ফাউস্বরূপ মক্তবের বাচ্চাদের সামনে হয়তো-বা গরম গরম দু একটি ওয়াজ ঝাড়েন। সেগুলো সম্পূর্ণ অরিজিনাল, তাঁদের আপন মস্তিষ্কপ্রসূত; পাঠ্যপুস্তক বা নিসাবের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই— আজকের দিনের শহুরে ভাষায় এগুলো কমপ্লিটলি একস্ট্রা-কারিকুলার।

মোল্লাদের ঘরে বন্দুক-কামান কিছুই নেই। তৎসত্ত্বেও প্রায় দেড়শো বছর ধরে তারা ইংরেজের পুরো-পাক্কা ফৌজকে কয়েকবার খেদিয়ে ঝেঁটিয়ে পেঁদিয়ে বের করে দিয়েছে আফগানিস্তান থেকে। আমানউল্লাহর মতো একাধিক বাদশাহকেও তারা ঘায়েল করেছে অশিক্ষিত পাঠানকে উস্কে দিয়ে।

সরদার দাউদের পক্ষে আছে ছাত্ররা। কিন্তু দাউদের দেশ বাংলাদেশের মতো নয়। কোথায় সন্দ্বীপ, কোথায় বরিশালের অজ পাড়াগাঁ— ওসব জায়গা থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসে সদরে, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকায়। তারাই একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল আপন আপন গ্রামে গ্রামে মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান। ধন্য তারা, জয় হোক তাদের।

কিন্তু সদর দাউদের ছাত্রসমাজ তো এখনও কাবুল, জালালাবাদ ইত্যাদি কয়েকটি নগরের খাঁটি বাসিন্দা। জনপদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নেই। সেখানে—?

আমাদের মনে শংকা জেগেছে। কারণ আমরা গরিব। গরিব আফগানিস্তানের তরে আমাদের দরদ আছে। সরদার দাউদের সংস্কারপ্রচেষ্টা সফল হোক, এই আমাদের কামনা। কিন্তু এই কি তার পন্থা?.... অবশ্য তিনি যদি রাজ্যের 'রাজ্যির' মোল্লাগণকে তনখা দিয়ে সরকারি শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন তবে অন্য কথা। কিন্তু তার তরে অত কড়ি কই?

ক্যু দে তার দুস্‌রা জুতা

দুস্‌রা বুট দড়াম করে পড়েনি। বিলকুল ঠাহর করতে পারিনি। আবার গোবলেট করে ফেলেছি। ফিনসে শুরু করি।

জার আমলের খানদানি ঘরের ছেলেরা কলেজ, মিলিটারি আকাদেমির ছোকরারা শেষ পাস দিয়ে, কিংবা ফেল মারার পর কন্টিনেন্ট যেত আপন শিক্ষা-অশিক্ষার ওপর পালিশের জেল্লাই লাগাতে। আন্দ্রেই প্যাদ্রোভিচ জমিতফ যথারীতি বার্লিন-ভিয়েনা সমাপনান্তে পৌঁচেছে ফ্লোরেনসে। সেখানে চতুর্দিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ, কিয়ান্তি প্রভৃতি মদ্যাদি বেজায় সস্তা আর ছুঁড়িগুলোর এ্যাসন মাইরি-মাইরি চেহারা যে জানটা তর্-র-র তাজা হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে পান করবে, নাচবে, কত গোপন গানে গানে বলবে তোমায় কানে কানে, 'সিন্নোর, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরকাল তোমার হয়েই থাকব' কিন্তু মুশকিল, একমাত্র তোমাকেই না, আরও পাঁচজনকে ওই একই দিব্যি দেয়। ওদের বিপদ, ওরা কাউকে কখনও 'না' বলতে শেখেনি— পাড়াতে কারও কারও প্যারা নাম 'বিশ্ব-তোষক'। আমাদের আন্দ্রেইকে পায় কে? প্রতি রাত্রিই বাসররাত্রি— বিনা পাত্রী। এক রাতে তিনটেয় হোটেলে ফিরে দুমদাম করে নেচে নেচে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে দ্রাম করে একখানা বুট ছুড়ে মেরেছে

www.pathagar.com

কাঠের পার্টিশনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে হুঙ্কার, 'হেই জংলি, অত গোলমাল করিস কেন? ঘুমুতে দিবি না?' আন্দ্রেই বড্ড লজ্জা পেল। চুপসে খাটের উপর বসে, বিলকুল আওয়াজ মাত্র না করে দুসরা বুটটি আস্তে আ-স-তে রেখে দিল খাটেরই উপর। তার পর অঘোরে নিদ্রা। ঘণ্টা তিনেক পর তার বেঘোর নিদ্রা ভেঙে গেল, পার্টিশনের উপর জোর খটখটানি শুনে। পাশের কামরার লোকটা চেঁচাচ্ছে, 'ওরে মাতাল, দুসরা বুটটা ছুড়ে মারবি কখন? আমি অপেক্ষা করছি যে। তার পর ঘুমুতে যাব।'

আমার হয়েছে তাই। এই, মাত্র গেল রোববার দিন, লিখছিলুম, দাউদ যেসব রিফর্ম শুরু করেছেন তাই নিয়ে আমার ডর-ডর করছে। দুসরা বুটটা যে কখন দড়াম করে পড়বে তারই পিতিক্ষেয় ছিলুম। হঠাৎ কাগজে দেখি, ওমা! দুসরা ক্যু দে-তা কবে ইতোমধ্যে চুপসে হয়ে গেছে, আমি টেরটি পর্যন্ত পাইনি। রোববার দিনভর-রাত দুনিয়ার কুল্লে বেতার ম ম করছিল, কাবুলে দ্বিতীয় ক্যু-র বাচ্চাটিকে প্রসবালয় থেকে সরাসরি গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিংবা বলতে পারেন, কাবুলি বউয়ের গর্ভপাত হয়েছে। কাবুল প্রচার করছে, সরদার দাউদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কিছু ফৌজি অফিসার এবং কিছু সাধারণ নাগরিক চক্রান্ত করার সময় ধরা পড়ে যান। তাঁদের ফৌজি বিচার হবে।

এ বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে 'দুসরা বুটের' চুটকিলাটিতে ক্ষণতরে ফিরে যাই। গল্পটি আকছারই কাছে আসে। দোস্ত শুধোলেন, 'কী হে, চাকরিটা পেলে?'

'দুসরা বুটের তরে অপেক্ষা করছি।'

'বুঝলে না? চাকরিটা কে পাবে তার ডিসিশন হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়। এনাউন্স্মেন্ট হবে আজ সন্ধ্যায়। দুসরা বুট ছোড়া হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়— আমি খবরটা পাব আজ সন্ধ্যায়।' এ ধরনের কারবার আমাদের জীবনে নিত্যিকার।

খাঁটি ক্যু, না জিঞ্জিরা মার্কা?

এ জীবনে একটা তথাকথিত ক্যু-কে আমি যেন অকুস্থলে, যেন বকসিঙের রিংসাইডে বসে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সে ক্যু সত্য না ডাহা জোচ্চুরি এ নিয়ে এখনও তর্কাতর্কির অবসান হয়নি। ২০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলারের হুকুমে কয়েকশো লোককে বিনা বিচারে গুলি করে মারা হয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন র‍্যোম। হিটলার যে একদিন জর্মনির নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব লাভ করে তার জন্যই এই র‍্যোমের আপ্রাণ পরিশ্রমকে ক্রেডিট দিতে হয় চৌদ্দ আনা। হিটলারকে যে দু তিনটি লোক 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, র‍্যোম ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই র‍্যোম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী সব ক জনাকেই খতম করা হয় ২০ জুন, হিটলার সর্বনায়কত্ব পাওয়ার ঠিক দেড় বছর পর। অজুহাত হিসেবে হিটলার ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে দেশের লোককে জানালেন, এসব পিশাচরা ক্যু দ্বারা তাঁকে ও নাৎসি পার্টিকে সমূলে বিনাশ করতে চেয়েছিল; তিনি পূর্বাহ্ণেই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে আপন দায়িত্বে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

র‍্যোম যে কোনও প্রকারের ক্যু-র ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেটা প্রচুর প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও সে সময়ে স-প্রমাণ করা যায়নি; আজ দোষটা চৌদ্দ আনা পড়ে হিটলার, গ্যোরিঙ্গ ও হিমলারের ঘাড়ে।

www.pathagar.com

এটাকে বলা হয় পার্জ— জোলাপ। আকস্মিক আগাপাশতলা পাল্‌টে দিয়ে যখন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী একদল ক্ষমতা লাভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে লাগে সংঘাত এবং কত যে হীনতা নীচতা তখন দলের ভিতরে-বাইরে বেরিয়ে পড়ে সে বাবদে আমার মতো অগা আর নতুন করে বলবে কী? বিশেষত আমার লেখা পড়েন ক জন প্রাণী! এবং একমাত্র আমার মহামূল্যবান তত্ত্বকথা ছাড়া তাঁরা অন্য কারও লেখা— এস্তেক গোপালভাঁড় তক— পড়েন না, এ হেন মিথ্যা স্বীকৃত হলে আমি এই লহমায় আমার সাদা কলমটি কালোবাজারে বিক্রি করে দেব।

চক্রান্তে চক্রান্তে যখন দলপতিকে বাধ্য হয়ে এক পক্ষ নিতে হয়, তখন বহু ক্ষেত্রেই অপর পক্ষকে খতম করা ভিন্ন ফ্যুরারের গত্যন্তর থাকে না। এ তত্ত্বকথাটা আমার নয়। যাঁরা শক্তির উপাসনা করেন, তাঁদের অনেকেই এ নীতিতে বিশ্বাসী। সর্ব ফ্যুরারকেই তখন স্বভাবতই বলতে হয়, ওরা দেশের দুশমন, ওদের মতলব ছিল নয়া একটা ক্যু করে দেশের সর্বনাশ করা। ...এটা বহু বৎসর ধরে একটা প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে। স্তালিন, মুসসোলিনি সব্বাই এটার এস্তেমাল করেছেন। কেউ বেশি কেউ কম।

তাই প্রথম প্রশ্ন, সত্যই আফগান জঙ্গি বিমানবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল আবদুর রাজ্জাক, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেইওয়ান্দওয়ালা, গবর্নর খান মুহম্মদ একটা বিপ্লব ঘটাবার তালে ছিলেন, না দাউদ তাঁর নবপ্রবর্তিত মোল্লা-বিরোধী আইন প্রবর্তন করার ফলে নিজেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে, এবং এই তিন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ/মোল্লাগণ/ 'ইসলামি রাষ্ট্র' পাকিস্তান-প্রেমীগণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। অতএব বেলা থাকতেই এদের জেলে পুরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে কিংবা অল্প খর্চায় গোটা কয়েক বুলেট দিয়ে।

আসলের চেয়ে ভালো কিসিংগারি ভেজাল

পাঠক, আমার পাক্কা ইরাদা ছিল, কাবুলি ক্যু— মনগড়া হোক আর জলজ্যান্তই হোক— তার পিছনে কল-কাঠি নাড়াবার তরে পাকিস্তান, রাশা, শাহের মারফত আমেরিকা, কে কতখানি উৎসুক সেই নিয়ে এ লেখাটি শেষ করব। উপরের অনুচ্ছেদ সম্প্রসারিত করতে যাওয়ার এক ফাঁকে বেতারটির কর্ণমর্দন করতেই শুনি, 'মার্কিন কণ্ঠ' মার্কিনি উচ্চারণে বলছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীযুক্ত হেনরি কিসিংজারের বক্তৃতা শুনতে পাবেন। ফরেন মিনিস্টার হওয়ার পর এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। আমি আশা করেছিলুম, আজ সোমবার, আমাদের সময়ানুযায়ী রাত দশটায় ওয়াটারগেটের মুলতুবি যে মোকদ্দমাটা ফের শুরু হওয়ার কথা, শুনব সেটা। এ মোকদ্দমাটা যে কেন ছ সপ্তাহের ছুটি না-মঞ্জুর করে তিন সপ্তাহ এগিয়ে আনা হচ্ছে তার অল্প-বিস্তর আলোচনা আমি পূর্ববর্তী সংখ্যায় করেছিলুম। আমার আশা ছিল, সেই মোকদ্দমাটা হয়তো-বা 'মার্কিন কণ্ঠ' সরাসরি আদালত থেকে বেতারিত করবে, নইলে নিদেন একটা ধারাকাহিনী তো বটেই। পাঠক, বিবেচনা করুন, কোনটা বেশি রগরগে হত!

তবু মন্দের ভালো। আমি এ তাবৎ কিসিংগারি 'বক্তিমে' কখনও শুনিনি। আমার প্রধান কৌতূহল : কিসিংগার জীবনের প্রথম পনেরো বছর কাটিয়েছে জর্মনির ক্ষুদে ফ্যুর্ট শহরে।

www.pathagar.com

মাতৃভাষা তাঁর জর্মন এবং ওই ক্ষুদে শহরে নিত্যি নিত্যি ইংরেজি বলার সুযোগ-সুবিধে নিতান্তই নগণ্য— বস্তুত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর ডক্টরেট থিসিস লেখেন জর্মনে।

খলিফে ছেলে মশাই, খলিফে ব্যক্তি। যা ইংরেজি ছাড়ল— কার সাধ্যি বলে তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। শুধু কি তাই, যদিও এই চৌকস ঘড়িয়ালটি মার্কিনত্বে খাস জাত-মার্কিনকেও টিট দিতে চান ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, তবু ইংরেজি উচ্চারণের বেলা নাকি-সুরে, 'র' অক্ষরকে 'ড়' করে চিবিয়ে চিবিয়ে, টেনে টেনে 'বেটাড় অ্যান্ড বিগাড়' মার্কিনি ইংরেজি বললেন না। রপ্ত করেছেন মার্কিন আর খাস ইংরেজির মধ্যিখানের এমন একটি উচ্চারণ যেটা দুই দেশেই কদর পাবে। শুধু লক্ষ করলুম তাঁর 'চ' উচ্চারণে কিঞ্চিৎ জর্মন আড় রয়ে গেছে। কারণ জর্মন ভাষায় 'চ' ধ্বনিটি আদৌ নেই। কিন্তু আমার এই মিহিন নুখতাচুনিতে পাঠক কান দেবেন না। মোদ্দা কথা : আমি অন্য কোনও জর্মনকে এ হেন উৎকৃষ্ট ইংরেজি বলতে শুনিনি।

আর বক্তৃতার বিষয়বস্তু? সেটা বারান্তরে হবে। উপস্থিত তাঁর একটি আজব বাৎ শোনাই। তিনি বললেন, ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নতির দিকে। খাস ঢাকায় যদি এই বচনামৃতটি ঝাড়া হত তা হলে ডাইনে বাঁয়ে চটসে তাকিয়ে নিয়ে বলতুম, 'আস্তে কয়েন কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো।'

পরলোকগত বাদাম প্যাঁচ

বহুকাল গেছে কেটে। প্যাঁচটাও গেছে উঠে। অতএব সে প্যাঁচের টেকনিক্যাল নামটাও যে ঘুড়িয়ালারা ভুলে যাবে তাতে আর তাজ্জব মানার কী আছে? সে আমলে কলকাতায় বসন্তের আকাশ ছেয়ে যেত কত না চিত্র-বিচিত্র ঘুড়িতে। কিন্তু বাচ্চাদের মাঞ্জাহীন গুড্ডির সঙ্গে প্যাঁচ লাগানোটা আমরা রীতিমতো ইতরতা বলে মনে করতুম। উপরের আকাশে চলত এ-পাড়া ও-পাড়ার ঝানুদের ভিতর উপর-প্যাঁচ, নিচের প্যাঁচ, ঢিলের প্যাঁচ, সুতো ফুরিয়ে গেল টানের প্যাঁচ, এ প্যাঁচটা কিন্তু অনেকেই 'ফাউল' বলে বিবেচনা করতেন— চলত অনেক রকমের বিমান-যুদ্ধ। এমন সময় অতিশয় কালে-কস্মিনে ঝানুদের গুরুকুলের কোনও এক ঝাণ্ডু চড় চড় করে চড়াতেন, এপাড়া ও-পাড়ার কুল্লে ঘুড়ির উপরের স্তরে, তাঁর অতি গরিবি চেহারার সাদামাটা ঘুড়িখানা। সেখানে খাওয়াতেন ঘুড়িটাকে একটা গুত্তা বা মুণ্ডা। সমুচা দখিনা আসমান ঝেঁটিয়ে তাঁর ঘুড়িটা প্যাঁচে জোড়া ডবল ঘুড়ি, সিঙ্গিল ঘুড়ি সব কটার সুতো জড়িয়ে নিয়ে, দোতলার ছাত ছুঁই ছুঁই করে সোঁ সোঁ করে উঠত ফের স্বর্গপানে "হাগ'র দিকে"। ওঠার সময় একটা একটা করে কুল্লে ঘুড়ি যেত কেটে— যেসব ঘুড়ি আপসে প্যাঁচ খেলছিল তারাও জোড়ায় জোড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেতে খেতে হয়ে যেত হাওয়া। যদ্দুর মনে পড়ে, এটাকে বলত 'বাদাম প্যাঁচ'— নৌকোর বাদাম পালের সঙ্গে হয়তো কোনও মিল আছে।

আজ কোথায় সে গুনিন, যিনি ভিন্ন বাদাম-এর খেল দেখাবেন? আকাশ বাগে তাকিয়ে দেখুন, বেশুমার কত না চিড়িয়া।

দিশি ঘুড়ি

আমরা 'নিকট প্রাচ্যের' নিরীহ প্রাণী। আমাদের কারবার ইরান, আফগান, পাক-ভারত নিয়ে। (১) রাজা দাউদ আপন দেশের জনগণের মন কতখানি পেয়েছেন সেটা বাতলাবে কে? দুসরা ক্যু' আসছে না কি? ওদিকে বিদ্রোহী পাক-বেলুচ-পাঠান তাঁর দিকে তাকিয়ে অছে। (২) ভুট্টো গেলেন, অগম অভিসারে— ইয়াংকি সাগর পারে, লাঠি-সড়কি, রামদা-ঝাঁটার সন্ধানে, (৩) শাহ যেন পস্তাচ্ছেন, ভাবছেন— মার্কিন না রুশ, রুশ না মার্কিন শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী, কারে রাখি কারে ফেলি। (৪) মেঘমল্লারে সারা দিন-মান, শুনি ঝরনার গান, মাফ করবেন, লারকানা-গান— বেচারি গুরুজি (কলকাতা-গামীদের বলে রাখি, হোথায় শিখ মাত্রকেই 'সরদারজি' না বলে 'গুরুজি' সম্বোধন করলে তাদের মেহেরবানি পাবে বেশি) স্বরণ সিং মি. ভুট্টোর লাগাতার ভারতের শিকায়েৎ-জারি-মসিয়ার গান সুবো-শ্যাম শোনেন আর উত্তর প্রতিবাদ দেমাঁতি লিখতে লিখতে তাঁর জানটা পানি। বস্তুত আমি ২১/১২/৭১-এর ডিসেম্বরেই গুরুগম্ভীর প্রস্তাব করেছিলুম যে, শুধুমাত্র ভারত নিয়ে মি. ভুট্টোর কটু-কাটব্য তেরি-মেরির উত্তর দেবার তরে দিল্লির ফরেন আপিস যেন একটা আলাদা দফতর খোলে। নইলে বেচারি স্বরণ সিং ফুর্সৎ পাবেন কোথায়, তিনি যে ফরেন মিনিস্টার, কটুকাটব্য, মিথ্যা ভাষণের দেমাঁতি প্রদান ভিন্ন দু একটা গঠনমূলক কাজও তিনি করে থাকেন, সেটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবার? এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুরু স্বরণ সিং— ঢাকায় তিনি এসেছেন কবার? তাঁর সম্মানিত ধর্মের একটি মহৎ শিখ-তীর্থও তো এখানে। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমত, তিনি তাঁর তীর্থদর্শনে ঢাকায় আরও ঘন ঘন এলে উভয় দেশেরই মঙ্গল হত, ভুল বোঝাবুঝি কমত। পাঠক, তাই কিন্তু ঠাউরাবেন না, জনাব হাকসর চেষ্টার কোনও ক্রটি করছেন। সম্ভ্রান্ত হাকসর গোষ্ঠীকে দিল্লি-ইলাহাবাদে কে না চেনে— আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিও সে পরিবারে মোগলাই বহ্বান্ন ভক্ষণকালে বিস্তর ফারসি, উর্দু কাব্যরস উপভোগ করেছে। মাননীয় সম্পাদক, পাঠকমণ্ডলী যদি অপরাধ না নেন, তবে বলি, আমার মনে হয়, জনাব হাকসরের মতো সর্বার্থে ভদ্রলোকের পলিটিকস ত্যাগ করাই ভালো। তা সে যাকগে; ভারত, বাংলাদেশ, গুরুজি, জনাব হাকসরকে 'রিফর্ম' করার ভার আল্লাহতায়ালা আমার স্কন্ধে সমর্পণ করেননি— শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

তিন না চার

এই যে চার দফে ইরান থেকে বাংলাদেশের নিত্যদিনের পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ঘটনার ফিরিস্তি দিলুম, তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়, তিন মহাশক্তির বহুরূপী কার্যকলাপ— চীন, রুশ আর মার্কিন দেশের নয়া নয়া খেল। বিশেষ করে তৃতীয়টির। কারণ বহু বৎসর ধরে মার্কিনরা জাপানকে বার বার বলেছে, "আমরা প্রাচ্যের পুলিশম্যান, আর তোমরা স্বভাবতই, অর্থাৎ নৈসর্গিক পদ্ধতিতেই আমাদের পয়লা নম্বরি দোস্ত।' অবশ্য এই মার্কিনি পুলিশম্যানের টহল মারার কায়দা বড়ই আজব। আর পাঁচটা দেশে গেরস্তজন ট্যাকসো দেয়, সে টাকায় লাঠি-সড়কি, দরকার হলে বন্দুক, পিস্তল কিনে পুলিশকে দেওয়া হয়। মার্কিন পুলিশ কিন্তু

www.pathagar.com

উল্টো গেরস্ত ইরান, পাকিস্তান গয়রহতে হুদো হুদো বন্দুক-কামান দেয়, 'বেয়াড়া' পাড়া-পড়শিকে ঠ্যাঙাবার জন্য। নিজের শরীরটা যতখানি পারে বাঁচিয়ে রাখে। তাই-না মৌলানা সা'দির পূর্ববঙ্গীয় ভ্রাতা গেয়েছেন :

কত কেরামতি জানোরে বান্দা
কত কেরামতি জানো,
শুকনায় বইস্যারে বান্দা
পানির মাছ টানো

'সব ইহুদি হো জায়গা'

এই তিন শক্তির বাইরে আরেকটি শক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে বহু বহু বৎসর ধরে সরাসরি এবং প্রয়োজন হলে মার্কিন সরকারকে দিয়ে আপন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে এবং— জানেন জিহোভা— আরও কত যুগ ধরে তাদের বিচরণভূমিতে দাবড়ে বেড়াবে তারা, কিন্তু অতিশয় সঙ্গোপনে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, ১৯৭১ বসন্তে যখন শেখ (ইয়েহিয়া)-ভুট্টোতে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল তখন মি. ভুট্টো ম্যাজিশিয়ানের মতো আচানক তার হ্যাট থেকে একটি তিসরা চিড়িয়া বের করেছিলেন। তার পূর্বে তিনি সুবো-শ্যাম জপতেন 'আমি আছি ভুট্টো, আর তুমি আছ শেখ।' হঠাৎ বলে বসলেন, 'আর আছে ওই তিরসা চিড়িয়া, দি আর্মি।' যারা জুন্তার কেচ্ছা জানত না, তারা পড়ল আসমান থেকে। ... আমার বক্তব্য— অকস্মাৎ এই যে চতুর্থ শক্তি আমদানি করলুম সেটা কিন্তু ওই আপস্টার্ট অপদার্থ গুলাম মুহম্মদ ইসকান্দার মির্জার গাফিলির ছাওয়াল মিলিটারি জুন্টা নয়। এর ইতিহাস অতি দীর্ঘ, ইনি বিশ্ব-ইহুদি শক্তি, কিন্তু আসলে এনার তাগদ বাড়ল যেমন যেমন নিগ্রো দাসদের রক্ত শুষে, রেড-ইন্ডিয়ানদের কতল করে, মার্কিন-ইয়াংকির ন্যাজ মোটা হতে লাগল, ব্লাংকো খুলিটা বদবো-দার গ্যাসে ভর্তি হতে লাগল। মার্কিনি-ইহুদিদের লুক্কায়িত শক্তির বয়ান দেবার মতো শক্তি ইহ-সংসারে কারও নেই। ইজরায়েল রাষ্ট্র নির্মাণের সময় থেকে দু পাঁচজন লোক এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত নাম-করার মতো কোনও আমেরিকান তাদের গোপন বিষ নিয়ে কথা পেড়ে সেটা ফাঁস করে দেবার মতো হিম্মত দেখাতে পারেননি। সত্যি-মিথ্যে জানিনে, আমাকে এক মার্কিনই বলেন, এ শতাব্দীতে কোনও মহাপ্রভুই ইহুদিদের চটিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। কিন্তু এ সত্যটা জানি, ক্ষুদ্র মাইনরিটি ইহুদিদের দাপটে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কোনও রাষ্ট্রে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ করলে সেটা বে-আইনি কর্ম, ফলং— শ্রীঘরবাস! অবশ্য ইহুদি শাইলক চরিত্র বাদ দিয়ে নাটকটি অভিনয় করলে হয়তো-বা আপনি ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সুপপ্লেট সাইজের একটি সোনার মেডেল পেয়ে যেতে পারেন। তবে কি না, সেটা পাকা স্যাকরাকে দিয়ে যাচাই করে নিতে ভুলবেন না।

ইহুদি কিসিংগার এখন পারলোয়ান যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার। তিনি কর্মভার গ্রহণ করে সর্বপ্রথমে যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, সেটি ইহুদি ও আরবদের মধ্যে দোস্তি স্থাপন করার। ওয়াহ! ওয়াহ!! তবে কি না, আরবরা হয়তো তাদের পক্ষ থেকে আইষমানের

www.pathagar.com

যমজ ভাই থাকলে তাকে পাঠাতে পারে! অবশ্য তিনিও কিসিংগারের মতো নিরপেক্ষ 'মধ্যস্থতা' করবেন মাত্র! তাজ্জব ইহুদি মিনিস্টারের তর সইল না, গদিতে বসতে না বসতেই দেলেন ছুট ইজরায়েলে জাতভাইয়ের কটা এটম বোম দরকার তার তত্ত্বতাবাশ করতে। ইয়া, মালিক!

রুশদেশ কবে কোন্ আদিমযুগে ১৯১৭-এ কমুনিস্ট হয়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সাতিশয় কালে-ভদ্রে কানে এসেছে, কিছুসংখ্যক রুশদেশীয় ইহুদি প্যালেস্টাইন, পরবর্তীকালে ইজরায়েলে, চিরতরে যেতে চায়, আর জেদি বলশিরা তাদের যেতে দিচ্ছে না। তার পর বছর পাঁচ সাত আর কেউ রা কাড়ত না।

ওমা! হঠাৎ দেখি, মার্কিন কংগ্রেস, না সিনেট, না কী যেন, গোঁ ধরেছেন, রুশ যদি ইহুদিদের ছেড়ে না দেয় তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারে পয়লা সুযোগ পাবে না। এই ব্ল্যাকমেলের হুমকির পিছনে কে? মার্কিন ইহুদিরা যে অষ্টপ্রহর তওরিত তিলাওৎ করে এ দুনিয়ার মুসাফিরি খতম করে, এ সব নশ্বর ফানি বখেড়া নিয়ে দাড়ি ঘামায় না, এই নবীন তত্ত্বটি আয়ত্ত করে বড়ই উল্লাস বোধ করলুম। কিন্তু হায়, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা খবর মনে পড়ে যাওয়াতে আমার উল্লাসটা বরবাদ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার যে এখন এক ইহুদি মহারাজ। যার কাছে একদা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার, আজ রুশদেশের কোথায় কোন গোপন কোণে ক গণ্ডা ইহুদি বাস করে, তাদের "খাহিস" হয়ে গেল 'অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক গুরুতর সমস্যা।'

বিশালতর ইজরায়েল?

এদের বের করে আনতে পারলে আরব-ইজরায়েল ব্যাপারে নিরঙ্কুশ 'নিরপেক্ষ' ইহুদিকুলগৌরব কিসিংগার এদের জমিজমা ঘরবাড়ি দেবেন কোথায়? নিশ্চয়ই মারাত্মক রকমের 'ওভার-পপুলেটেড্' আমেরিকায় নয়। সে কী করে হয়, পাগল নাকি?

ভাবছি, ক হাজার আরব মুসলমানকে খেদিয়ে এদের জন্যে স্থান করবেন নিরপেক্ষ কিসিংগার কোথায়?— ফলস্তিনে, সিরিয়া-লেবানন জয় করে?

গোড়াতেই তাই নিবেদন করেছিলুম, নিকট-প্রাচ্যের গোটা চারেক ঘুড়ি, বিশ্বের গোটা চারেক শক্তির ঘুড়ি, কোথায় রুশের ইহুদি ঘুড়ি আর কোথায় মার্কিন ইহুদি ঘুড়ি, তার কাপ্তেন কিসিংগারের রাম-মাঞ্জাওলা অতগুলো ঘুড়ি ঝেঁটিয়ে, একজোট করে, বাদাম প্যাঁচে সব-কটাকে কাটব, হেন এলেম আল্লা দেননি।

'দূরকে করিলে নিকট বৈরী'

আমাদের বিখ্যাত সাধক কবি লালন ফকির গেয়েছেন,

> হাতের কাছে পাইনে খবর
> খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর

www.pathagar.com

জার্মান কবি গ্যোটেও বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
সুখ সে তো সদা হেথায় আছে
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
সুখ সে রয়েছে হাতের কাছে।

সুখের বেলা হবেও-বা। কিন্তু দুঃখটা খুব সম্ভব আসে দূরের থেকে। দুঃখটার উৎপত্তি যদি 'হাতের কাছেই' হত তবে তাকে ধরবার কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে টুঁটিটা চেপে ধরে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতুম না?

'নিকট প্রাচ্যের' সর্বনাশ তো তৈরি হয় দূর বিদেশে, আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। বাংলাদেশ ভারত আফগানিস্তানের দম বন্ধ করার জন্য দড়ি পাকানো হয় দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে, থুড়ি, দজ্জালিনীপুরে। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত অতি গভীর বিশ্বাস সে দুঃখ নিবারণার্থে ভিন দেশের দিকে তাকিয়ে থাকাটার মতো আকাট আহাম্মুকি আর কিছুই হতে পারে না। আপনার-আমার আপন দেশের লোক আপন ধর্মের ভাই যেভাবে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনাকে-আমাকে দুঃখ-বেদনা দিল, তার পরও ভরসা রাখব বিদেশির ওপর? কার্ল মার্কসের ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বিশ্বপ্রলেতারিয়ার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হতে যে আদেশ দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের সর্বজনের ওপর খাটে। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে শোচনীয় জীবন ধারণ করে তার চেয়ে বিলেতের তথাকথিত প্রলেতারিয়ার জীবন শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর এদেশে সত্যকার ধনী যাঁরা, ফুলে উঠেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাবার রত্তিভর প্রয়োজন নেই। তাঁরা বাস্তুঘুঘুর পাল। সময় থাকতেই এক লম্ফে আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোলে হরিবোল দেবেন। আমার শুধু আশঙ্কা আখেরে নেতৃত্বটা না তাঁদের হাতেই চলে যায়। যা হয়েছে শত বার হয়েছে, এদেশে, ভিন দেশে, সর্ব দেশে— অতীতে। তাই থাক এ প্রসঙ্গ উপস্থিত ধামা-চাপা।

বিশ্ব ইহুদি

বলছিলুম, আসমানে বিস্তর চিড়িয়া 'বাদাম প্যাঁচের' করকরে মাঞ্জা লাটাইয়ে তো নেই-ই, তার ওপর একটা বিরাট বাজপাখি আসমানি রঙের সঙ্গে তার আগাপাশতলা এমনই মিলিয়ে দিয়ে আচানক ছোঁ মারে যে তার কোনওকিছুই ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে আসে না। নেই নেই করে তবু দু পাঁচজন মার্কিন আছেন যারা বাজটাকে চেনেন— কিন্তু ওর সম্বন্ধে মুখটি খুলেছেন কি তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের ইন্না লিল্লাহি—

বিশ্ব ইহুদি, ইহুদিতন্ত্র জায়োনিজমের কেন্দ্রভূমি এখন আমেরিকায়। একদা ছিল অস্ট্রিয়া ও জর্মনিতে। মেটারনিষের যে ভিয়েনা-কংগ্রেসের কথা কিসিংগার সুবাদে উল্লেখ করেছিলুম সে কংগ্রেসে সর্ব নেশনের উদ্দেশ্যে যেসব অনুরোধ-আদেশ জানানো হয়, তারই একটা— ইহুদিদের ব্যাপকতর রাষ্ট্রাধিকার দেবার জন্য, বিশেষ করে জর্মনিতে। সাধে কি আর জর্মন ইহুদি কিসিংগার মেটারনিষকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন! সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে মনে

www.pathagar.com

প্রশ্ন জাগে, শিষ্য কিসিংগার কি একদিন গুরুর মতো ইতিহাসে তাঁর নাম রেখে যেতে পারবেন? সে আলোচনা ক্রমশ আলোচ্য ও প্রকাশ্য; উপস্থিত একটি তথ্য পাঠকের স্মরণে এনে দিই— জর্মনির মহাকবি হাইনরিখ হাইনের বয়স আঠারো— ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়। সে কংগ্রেসের সুপারিশ অনুযায়ী অধিকার লাভের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বার্লিনে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ইহুদিরা আপন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন ও যুবা হাইনে সেটিতে সোৎসাহে যোগদান করেন। সদস্যরা আনন্দে আটখানা হয়ে হাইনেকে কোলে তুলে নেন, কারণ তখন হাইনের খ্যাতি জর্মনির ভিতরে-বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শতাধিক বৎসর ধরে যে হাইনের খ্যাতি অদ্যাবধি ক্রমবর্ধমান, নবজাতকসম অম্লান পদদলিত প্রণয় নিবেদনের মর্মদাহ সরলতম ভাষায় প্রকাশ করতে আজও যার সমকক্ষ কেউ নেই, অনুভূতির ভুবনে তাঁকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে কোন কৃত্রিম আত্মম্ভরিত্বের প্রতিষ্ঠান! ইহুদিদের এসব প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি ছিল, তারা জেহোভার নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ মানবসন্তান, তাদের প্রাচীন কীর্তির কাছে কি মিশর কি ব্যাবিলন বিশেষ করে গইম (অ-ইহুদি তুচ্ছার্থে, যে রকম আমাদের ভাষায় অনার্য-কাফের প্রভৃতি শব্দ আছে) গ্রিক-রোমান-ভারতীয় আর্য সভ্যতা দুগ্ধপোষ্য শিশুবৎ— এবং সবচেয়ে মোক্ষমতম তত্ত্ব তাঁদের 'মসিয়া' (আরবিতে মসিহ্ মাহদি অর্থে) একদিন ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে জেহোভার এই নির্বাচিত সন্তানদের চিরকালের তরে ত্রিভুবনেশ্বর করে দেবেন— গইমদের আর কোনও ভরসা থাকবে না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মিথ্যার সাবান দিয়ে তৈরি ভাবালু ভাপে-ভরা বুদ্বুদ হাইনেকে বিরক্ত, হয়তো-বা ক্রুদ্ধ অতিষ্ঠ করে তোলে। কয়েক মাস যেতে না যেতেই তিনি এদের সংস্রব চিরতরে বর্জন করেন। এই হাইনের আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর চেয়ে একুশ বছরের ছোট কার্ল মার্কস বিলেত থেকে প্যারিসে তীর্থযাত্রা করেন, এ হাইনের নামে স্বয়ং কাইজার পর্যন্ত শঙ্কিত হতেন। প্রতি নববর্ষে এ হাইনের নির্বাসনদণ্ড মোহককম করতেন স্বহস্তে। গরিব-দুঃখীর জন্য তাঁর লড়াই— কাইজারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার আজীবন আমৃত্যু সংগ্রাম— প্রথম যৌবন থেকে এ হাইনেকে, অতিশয় মাতৃভক্ত এই পুত্রকে, মাকে ছেড়ে— দূর বিদেশের নির্বাসনে সমস্ত জীবন কাটাতে হয়, মৃত্যুবরণ করতে হয় প্যারিসে।

একেই বলি যথার্থ ইহুদি। তিনি আল্লার স্বহস্তে নির্বাচিত মহাত্মা— জেহোভা তাঁকে নির্বাচন করুন আর না-ই করুন। কোথায় লাগেন স্বয়ং মেটারনিষ তাঁর পাশে— মেটারনিষের পরোক্ষ ভাবার্থে শিষ্য কিসিংগার, তিনি তাঁরও কত অতল তলে! অবশ্য এটাও তর্কাতীত নয়, সাক্ষাৎ মোলাকাৎ হলে মেটারনিষ তাঁকে গ্রহণ করতেন কি না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম যৌবনে, কাব্যলোকে যখন তিনি প্রথম ভীরু মৃদু পদক্ষেপে অবতরণ করছেন তখন হাইনে পড়ে তাঁর চারটি কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করেন। সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিতে গোরা রায়দের তাণ্ডবনৃত্যের খবর পেয়ে একদা লিখেছিলেন,

"টুটলো কত বিজয়তোরণ
লুটোলো প্রাসাদ চূড়ো
কত রাজার কত গারদ
ধুলোয় হল গুঁড়ো।

www.pathagar.com

আলিপুরের জেলখানাও
মিলিয়ে যাবে যবে
ভাবিস তোরা কিসিংগারী
ধাপ্পা তবু রবে!"

দু কান ছুঁয়ে অপরাধ স্বীকার করছি 'কিসিংগারি' অংশটুকুতে ইহুদি-বৈরী হিটলারের ভূত আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই সুবাদে একটি সত্য স্পষ্টভাষায় না বললে আমার মতো বাঙালি মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমি ইহুদি-বৈরী নই। ইহুদিদের নবী মুসা, নূহ আমারও নবী। নবী দাউদের বংশে জন্ম হজরত ঈসা মসীহকে আমি রূহুল্লা বলে স্বীকার করি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি একাধিক সুপণ্ডিত সহৃদয় ইহুদির কাছে তওরিত— হিব্রুতে তোওরা অধ্যয়ন করেছি, যদিও আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, প্রচুর প্রক্ষিপ্তাংশের দরুন তওরিৎ পরবর্তী যুগের কসুল উল আম্বিয়ারই মতো প্রামাণিক গ্রন্থ। খ্রিস্টানদের মতো আমি ইহুদিকুলকে বংশানুক্রমে চিরতরে ইল্লা বিল কিয়ামা— কিয়ামত অবধি শয়তানগ্রস্ত অভিশপ্ত— বলে মোটেই স্বীকার করিনি। পক্ষান্তরে আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ইজরায়েল রাষ্ট্র অভিশপ্ত। গৃহহারা আরবদের তারা কস্মিনকালেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দেবে না বলে তারা চিরতরে অভিশপ্ত। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আলবার্ট আইনস্টাইন ধন্য, কিন্তু মাতৃভূমি থেকে আরব বিতাড়নকারী, ইজরায়েল রাষ্ট্রের সমর্থকরূপে শেষবিচারের দিনে আল্লার সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হবে।

নিক্সনরূপী বিরাট রসাল কিংবা ওক অবলম্বন করে অতি অল্পকালের মধ্যেই কিসিংগাররূপী লতা— স্বর্ণলতার স্বর্ণটা উপস্থিত বাদ দিলুম, মগডাল অবধি চড়েছেন। লা ফতেনের লতার মতো তাঁর আচরণে বড়-ফাট্টাই ধরা পড়বে কি না, এখনও বলা যায় না। ইতোমধ্যে যদিও, যে কোনও কারণেই হোক (আমার বিশ্বাস, কারণ সন্ধানে বেশি দূর যেতে হবে না; ইহুদি কিসিংগার অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে যে বৃক্ষটি জড়িয়ে ধরতে পেরেছেন, সেটা যেন লতাসুদ্ধ মড়মড়িয়ে গুঁড়িয়ে না যায়, তার জন্য কুল্লে দুনিয়ার সাকুল্যে ইহুদি ব্যাঙ্কার প্রতিপক্ষকে খানিকটে মোলায়েম করে তুলে এনেছেন) নিক্সন দু দণ্ডের তরে দম ফেলার ফুরসত পেয়েই প্রতিপক্ষকে কটুকাটব্য ঝাড়তে আরম্ভ করেছেন, তবু ভবিষ্যৎবাণী করাতে সিদ্ধহস্ত এক মার্কিন কাগজ বলছেন, হোয়াইট হাউসের ভিতর নিক্সন যতই হাইজাম্প লংজাম্প মারুন, 'বাইরের ভুবনে এখনও বিস্তর মারাত্মক সব মাইন-বাঁধা ফাঁদ পাতা রয়েছে; তার পিঠ পিঠ সুপ্রিম কোর্ট যদি শেষ আদেশ দেয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাগনোকেও যদি অসম্মানে বিদায় নিতে হয়, তবে নিক্সনের অবস্থা হবে পূর্ববৎ"— সেই ফাটাবাঁশের মধ্যিখানে এক-ঘরে অবস্থায়। পত্রিকাখানি আখেরি বিভীষিকা দেখিয়ে বলেছেন, 'এবং শেষ পর্যন্ত নিক্সনকে করতে হবে শেষ সর্বনাশা (ফেটফুল) পদক্ষেপ।' তখন কি ইহুদি-নন্দন কিসিংগার প্রাক্তন লাট মালেকের কায়দায় হনুমানি লম্ফে আরেকটা রসাল জাবড়ে ধরতে পারবেন?

কিন্তু আসল প্রশ্ন, অদূর ভবিষ্যতে যাই হোক, যা-ই থাক, কিসিংগার কোন পথ নেবেন? ইজরায়েল নামক অতল গহ্বরে তাঁর বুদ্ধিতে ভালো করতে গিয়ে ইহুদিকুলকে শেষ ধাক্কা দিয়ে বিনাশ করবেন, না হাইনের সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শূন্যে আলোকলতার মতো দোদুল্যমান হৃদয়তাপে ভরা ইজরায়েলি রাষ্ট্রের ফানুসটাকে ফাটিয়ে দিয়ে তাঁর স্বজাতি ইহুদি

www.pathagar.com

কওমকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন? তা যদি না পারেন— বিরাট বসুন্ধরায়, আল্লার কুশাদা দুনিয়ার নিরীহজনকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ না করলেও বিশ্বইহুদির উমদাগুল্লাইস হয়— তবে তিনি হাইনের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। হজরত মুসা যে রকম একটা ইহুদি কওমের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

* * *

একটা মজাদার দিলচসপ সার্কাসের ক্লাউন ঢঙের খবর পাঠককে না জানিয়ে লেখাটা শেষ করতে পারছিনে। যাঁরা জানেন তাঁরা অপরাধ নেবেন না। তেসরা রমজানের সেহরির সময় বেতার নাড়াতেই হঠাৎ শুনি সিলেটি বাংলা! উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই, খবর দিচ্ছে মি. ভুট্টোর দিগ্বিজয় বাবদ। তার পর সালঙ্কার সবিস্তর বয়ান দিলে, যেসব বাঙালি পাকিস্তান থেকে শিগ্‌গিরই বাংলাদেশ ফিরে যাবেন তাঁদের কেনাকাটা সম্বন্ধে তাঁরা খবর পেয়েছেন বাংলাদেশে সব মাল বড্ড আক্রা, ইন্ডিয়ার আমদানি মাল বড্ড নিরেস।

ঠিক এই ধরনের ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল '৭১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে, বিলাতবাসী সিলেটিদের জন্য। উদ্দেশ্যটা চটসে বোঝা যেত যদিও সেটা কামুফ্লাজের চেষ্টা জোরসে করা হয়েছিল, 'ভাই বিলেতবাসী সিলেট্‌টিগণ, পূর্ব পাকের সর্বত্র পরিপূর্ণ সালামত। তোমরা আত্মীয়স্বজনকে যে টাকা পাঠাও সেটা বন্ধ কর না। সরকারের জরিয়ায় পাঠিয়ো কিন্তু।' এই শেষটাই ছিল আসল মতলব। আমি অবশ্য স্থানাভাববশত অতি সংক্ষেপে সারছি।

এবারে মতলব দুটো : যুদ্ধবন্দিদের বিচার করে কী হবে? এই তো বাঙালিরা ফিরে যাচ্ছে দেশে। বউ-বাচ্চার সঙ্গে মিলিত হবে। ওই বন্দিদেরই-বা আটকে রেখেছ কেন, তাদের কি বউ-বাচ্চা নেই? দ্বিতীয়, ভুট্টো সাব চান, বাংলাদেশের সঙ্গে দোস্তি করতে। পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। দুই দেশে দোস্তি হলে উপকার উভয়ত : গয়রহ্ গয়রহ্।

তোলা হল না একটি কথা : কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পিকটি নট, নট কিচ্ছু। ভারি মজার প্রপাগান্ডা। রসে টইটম্বুর। বারান্তরে হবে।

লন্ডনি স্বীকৃত বাংলাদেশ?

রাত পৌনে তিনটে থেকে সোয়া তিনটে অবধি সিলেটি ভাষায় পাক বেতার বিলেতবাসী সিলেটিদের জন্য প্রোগ্রাম দেয়। দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। নিজেদের নামও বলেছে তারা, আমার মনে নেই। আমি বাড়িয়ে বলছিনে, কিন্তু মনে হল, তাদের কণ্ঠস্বর বড়ই প্রাণহীন। ১৯৭১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে যারা এই প্রোগ্রামটি আঞ্জাম করত তাদের বেশ দু তিনজন গাঁক গাঁক করে হুঙ্কার ছাড়ত, কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট আভাস থাকত। বেচারিরা জানত না, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক মনে নেই, ষোল-সতেরো ডিসেম্বরে সে প্রোগ্রাম উঠে গেল। ওদের সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়। ওরা প্রতিদিন নিজেদের সিলেটি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিল এবং খাঁটি সিলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথম দিন প্রোগ্রাম পরিচিতির সময় শেষ দফায় বললে, সর্বশেষ সিলেট থেকে যাঁরা আপন আপন 'আত্মীয়-স্বজনকে' খবর পাঠাবেন, সেগুলো আপনারা শুনতে পাবেন। কিন্তু 'আত্মীয়-স্বজন' সমাসটি আমরা বড়ই শাজবাজ ব্যবহার করি। পরের দিন ঘোষক 'আত্মীয়-স্বজনের' পরিবর্তে বললে 'ভাই-বরাদর'।

www.pathagar.com

আমি মনে মনে বললুম, 'লেড়কার তরক্কি অইছে। মাশাআল্লা।' পরের দিন ছোকরা এক্কেবারে বন্দর-বাজারের চৌকে পৌঁছে গেল। বললে, 'খেশ-কুটুমর লগে মাতিবা।' আমি ফাল দিয়ে উঠে বললুম, 'সাবাশ! ঔতত বেটার চাক্কু মারি দিছ্ছে।' পাঠক হয়তো তপ্ত-গরম হয়ে খাট্টা গেরাবি দেবেন, 'তুমি তো বড় বইতল মশায়! বাংলাদেশের খেলাফে আজেবাজে বকছে, আর তুমি বলছ, সাবাশ!' আহা— আমি ভাষাটার কথা বলছি, তার বক্তব্যের— কিতাবের টেকনিক্যাল পরিভাষায় যাকে বলি 'মৎন', সেটার— তারিফ করতে যাব কেন? সেটা তো গাছে আর মাছে ভূমা বন্দর-বাজারি গফ। তা সে যাকগে, এর পরের প্রস্তাব পাড়ার পূর্বে, ইতোমধ্যে পূর্বোক্ত 'গেরাবি' শব্দটি খাস সিলেট-নাগরিক ভিন্ন অন্য সিলেটি এবং আর পাঁচজন আঞ্চলিক ভাষানুসন্ধানীজনকে বুঝিয়ে দিই। টিপ্পনী কাটা, গহার বা বাগার দেওয়া, ঘটিদের ফোড়ন দেওয়া আর গেরাবি দেওয়া এই ইডিয়ম। সিলেট শহরের আশেপাশে যখন ইংরেজ ম্যানেজারদের চা-বাগিচা বসল তখন বাবুর্চি-খানসামারা মেমসায়েবদের কাছে মাছ-গোস্তর 'মাখো মাখো ঝোল'-এর পরিভাষা 'গ্রেভি' শব্দটা শিখল। তার থেকে 'গেরাবি'। আমার জানামতে এরকম আরও গোটা ছয় ইংরেজি শব্দ সোজাসুজি সিলেটিতে ঢুকেছে। এই ধরনের একটি ভারি মজাদার শব্দের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল, চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষাতে 'অন্তিম্যান' শব্দটি প্রথমদর্শনে মনে ভীতির সঞ্চার করে। জীবনের 'অন্তি' অবস্থা— 'অন্তিম' 'মান' বুঝি এসে গেল! প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আমাদের পথ-প্রদর্শক মহবুবুল আলমের ভ্রাতা ওহীদুল আলম সাহেবের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'পৃথিবীর পথিক'-এর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মমাগ্রজ মূর্তজা সাহেব আমাকে অভয় দিয়ে ছাপার হরফে লিখেছেন, 'অন্তিম্যান হ্যান্ডনোটের অন ডিমান্ড' উক্তি থেকে এসেছে।

পাছে বিলাতবাসী সিলেটিদের (এদের সিলেটবাসীরা 'লন্ডনি' নাম দিয়েছেন) পূর্বোক্ত শব্দ-সঙ্কটে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাই করাচির সিলেটি অনুষ্ঠানে ঘোষক, অনুবাদক বিকট বিকট ইংরেজি শব্দ আদৌ অনুবাদ করেননি। যেমন প্রটোকল, এটমিক এনার্জি কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু কারখানা অর্থে প্লান্ট (মার্কিনি উচ্চারণে প্ল্যান্ট) কেন যে অনুবাদ করলেন না, বোঝা গেল না। ওদিকে জনগণ (আমরা বলি পাঁচজন, পাজ্জন), বন্যা (বান, ছয়লাব), 'ফসল ক্ষতিগ্রস্ত অইছে' (আমরা বলি ফসলার লুকসান অইছে) এবং সবচেয়ে মজার— সিলেটি 'মধ্যাহ্ন ভোজনের' জন্য সংবাদ-পাঠক বললেন 'মাদাউনকুর ভোজ'। মাদাউনকুর খানা, দাওৎ বা জিয়াফত আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আর এ স্থলে এটা আজিজ আহমদের দেওয়া দাওৎই ছিল— তাই 'মাদাউনকুর ভোজ'-এর মতো বিজাংগা গুরুচণ্ডালী একমাত্র করাচিতেই সুলভ।...পত্র-লেখকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষক ঠিকানা দিলেন 'পশ্চিম' পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান তো কবে মরে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে সহবাস করার একটা গল্প মোপাসাঁ লিখেছেন বটে! প্রেতাত্মা নিয়ে লিখে আমি নোবেল প্রাইজ পাব, নির্ঘাৎ।

রেকর্ড সঙ্গীতে 'কাফিরি' কীর্তন-সুরে উর্দুগীত বাজানো হল। সে এক অদ্ভুত ভুতুড়ে রসের অবতারণায় কুল্লে ঘরটা যেন ছিমছিম, মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করতে লাগল।

আল্লা জানেন, আমি সিলেটি প্রোগ্রামের এই তিনটি প্রাণীকে নিয়ে মস্করা করছিনে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এরা যেন অতিশয় অনিচ্ছায় একটা অপ্রিয় কর্ম করে যাচ্ছেন এবং বার বার আমার মনটা বিকল হয়ে যাচ্ছিল। বেচারিরা! এত শত লোক দেশে ফিরে আসছে, এরা চলে আসে না কেন? হয়তো বাধা আছে।

www.pathagar.com

ঢাকায় জনাব ভুট্টোর আসন্ন শুভাগমন

কিন্তু পাঠক, মাত্রাধিক বিষণ্ন হবেন না। আপনাদের জন্য একটি খুশ-খবর কোনও গতিকে জিইয়ে রেখেছি। যাঁরা রীতিমতো পাক বেতার শুনে থাকেন, তাঁরাও একই খবর শোনার আনন্দ দু বার করে পাবেন, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একখানা বাকিরখানি খেলে যে রকম দু খানি খাওয়া হয়। পাকিস্তান থেকে যখন একদল বাঙালি দেশে ফেরার জন্য প্লেনে উঠছেন তখন মি. ভুট্টো তাঁদের উদ্দেশে উর্দুতে একটি ভাষণ দেন। নানাবিধ মূল্যবান তত্ত্বদানের পর মি. ভুট্টো বলেন, আপনাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে। করাচিতে, লাহোরে কিংবা ঢাকা বা চাটগাঁয়।

যাদের মস্তিষ্ক উর্বর তারা তো সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ চিন্তাসূত্রের সম্মুখে দিশেহারা হয়ে যাবেন, কোনওটারই খেই ধরতে পারবেন না। আমার সে ভয় নেই। আমি ভাবছি মি. ভুট্টো কি বাংলাদেশ জয় করে ঢাকা-চাটগাঁয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন, না দুই দেশে রাতারাতি এমনই দহরম-মহরম হয়ে যাবে যে আমরা হরদম পিকনিক উইক-এন্ড করার জন্য ক্ষণে লাহোর ক্ষণে পিণ্ডি যাব, কনসেশন রেটে গিয়ে হব স্টেট গেস্ট! অবশ্য এটা লক্ষণীয়, মি. ভুট্টো কুয়েটা বা পেশাওয়ারে মোলাকাত হবে এ কথাটা বলেননি। বাংলাদেশ হাতছাড়া হওয়ার পর বেলুচ এবং পাঠান মুল্লুক এখন লাহোরের পাঞ্জাবিদের এবং করাচির খোজা-বোরা-সিন্ধিদের কলোনি হয়ে গিয়েছে— দুষ্ট লোকে এমন কথাও কয়। বাঙালিকে ওসব দেখানো দুলহাভাইকে তালই সাহেবের বাড়ি দেখানোরই শামিল।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

(১) সকলেই জানেন ওয়াটারগেটের জল যখন ডেনজার লেভেলে চড়েছিল তখন নিক্সন বলতে গেলে একরকম পর্দানশিন হারেমবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তার পর তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এসে এমনই কর্মকীর্তি আরম্ভ করলেন যে, আমেরিকার যেসব তালেবর পত্রিকা গণ্ডায় গণ্ডায় নামে রিপোর্টার কাম ডিটেকটিভ মোটা মোটা তখমা দিয়ে পোষে তারা পর্যন্ত হদিস পায়নি, এখনও পাচ্ছে না।

(২) এমন সময় আরও একটা মারাত্মক কেলেঙ্কারির কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ল। স্বয়ং নিক্সন কর্তৃক মনোনীত তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট (সংক্ষেপে ভিপ) অ্যাগনো সরকারি উকিলের নোটিশ পেলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ মেহেরবানি করে দেওয়া কন্ট্রাকটের কমিশন গ্রহণ, খাদ্য-মদ্যাদির নিয়মিত ভেট গ্রহণ— এককথায় দুর্নীতির জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা হবে। নিক্সন ভিপকে এক ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি করলেন, তিনি যেন রিজাইন দেন। নিন্দুক বলে, ভিপকে কাবু করার জন্য নিক্সনের খাস-দফতরের নাকি কারসাজি আছে এবং আসলে তিনি নাকি অ্যাগনোকে দেখিয়ে একজন বড় মানুষকে ভিপ বানিয়ে আনতে চান, যে তাঁর হয়ে— ওয়াটারগেট মামলা যদি নিতান্তই খারাপের দিকে বেয়াড়া গুড্ডির মতো মুণ্ড খেতে থাকে তবে— জব্বর লড়াই দেবে। সেই লোভে ইতোমধ্যেই নিক্সনের প্রতিপক্ষ ডেমোক্রাটিক পার্টির এক জাঁদরেল চাঁই

www.pathagar.com

শিঙ ভেঙে রিপাবলিকান দলে ভিড়ে যত্রতত্র চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করেছেন, টেপ দেওয়া না দেওয়ার পুরো এখতেয়ার একমাত্র প্রেসিডেন্টের।

(৩) এতদিন কিসিংগার থাকতেন নেপথ্যে। কিন্তু একদিন কংগ্রেসের সামনে নিক্সনের ফরেন মিনিস্টারকে দিতে হয় সাফাই। অতএব তাঁকে দাঁড় করানো হল কাঠগড়ায়। ওদিকে তিনি যে তাঁর বন্ধু।

অভিশপ্ত ফলস্তিন

চল্লিশ বৎসর পূর্বে মিশরের আলআজহারে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন ফলস্তিন দেখতে যাই। তাই বলে নয়, এমনিতেই ভবঘুরে বলে আমার একটা বদনাম আছে। শতাধিকবার আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে যতবার দেমাতি প্রকাশ করেছি পাঠক-সাধারণ ততই মুচকি হেসে, দ্বিগুণ উৎসাহে, আমাকে ভবঘুরেমি থেকে বাউণ্ডুলে পদে প্রমোশন দিয়েছেন। তবু শেষবারের মতো, আবার বলে নিই, যে-কোনও প্রকারের স্থান পরিবর্তন শারীরিক নড়ন-চড়ন আমার দু চোখের দুশমন। কট্টর মরণ-বাঁচন সমস্যা দেখা না দিলে আমি বারান্দা থেকে রক-এ পর্যন্ত রোলস-এ চড়েও যেতে রাজি হই না। বিছানা থেকে গোসলখানায় যাবার তরে জনকল্যাণ সরকারকে একটা বাস সার্ভিস খুলতে সকরুণ দরখাস্ত পাঠিয়েছি।

অপিচ, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, 'ফলস্তিন' গিয়েছিলাম সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সোৎসাহে। অবশ্যই, লাঞ্ছিত পদদলিত আরবদের দুরবস্থা দেখবার জন্য নয়। তখনও সে দুর্দিনের ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়নি। কিন্তু তার ইতিহাস আমি পাঠকের ওপর এখন চাপাতে চাইনে। ওপার বাংলায় একবার চেষ্টা দিয়েছিলুম— আমি আর প্রুফরিডার ছাড়া সে সিরিজ কেউ পড়েনি।

ফল্‌স্তিনের দুর্দশার জন্য দায়ী কে?

ইহুদিদের চেয়ে আরবদের— মুসলমানদের— আমি দোষ দি বেশি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরেজও ইহুদিদের পালে পালে ফলস্তিনে আসতে দেয়নি। বস্তুত হজরত ওমরের আমল থেকে শেষ তুর্কি খলিফার রাজত্ব অবধি সবসময়ই কিছু কিছু ইহুদি, এমনকি জার-আমলে রুশ ইহুদিও পুণ্যভূমিতে এসে বাসা বেঁধেছে। তারা ছিল গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। আরবদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তাদেরই মতো দু পয়সা কামিয়ে দুঃখে-সুখে দিন কাটিয়েছে। কালক্রমে তাদের মাতৃভাষাও হয়ে গেল আরবি। সঙ্কীর্ণ হলেও আরবি সাহিত্যে তাদের স্থান আছে।

চাষার সর্বনাশ

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যারা এল তারা সঙ্গে নিয়ে এল অফুরন্ত অর্থভাণ্ডার। যুদ্ধের সময় সারা বিশ্বজুড়ে ইহুদি সম্প্রদায় জেনে গিয়েছিল মিত্রশক্তি পুণ্যভূমি ফলস্তিন তাঁদের হাতে সঁপে দেবেন, তারা সেখানে, পাক্কা দু হাজার বছর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার জেহোভার 'জায়নের' নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করবে। প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তি কিন্তু আদপেই 'ইহুদি রাষ্ট্র'

www.pathagar.com

নির্মাণের কোনও ওয়াদা কাউকে দেয়নি। তারা বলেছিল ইহুদিরা গড়ে তুলবে 'জুয়িশ ন্যাশনাল হোম'— এবং এই 'হোম' কথাটার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল বার বার। কিন্তু ইহুদিরা সেটা জেনেশুনেও প্রচার চালাল সেটাকে রাষ্ট্র নাম দিয়ে। সেই রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যে কী পরিমাণ অর্থ, পরবর্তীকালে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়েছিল সেটার চিন্তামাত্র করা ডাঙ্গর ডাঙ্গর ব্যাঙ্কার মহাজনদেরও কল্পনার বাইরে।

ফলস্তিন কাঠ-খোট্টা দেশ বটে কিন্তু সে দেশের নায়েবরা গরিব চাষা-ভুষোদের লহু ফোঁটায় ফোঁটায় শুষে নেবার তরে যে কায়দাকেতা জানে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে শাইলকের চেয়েও ধড়িবাজ ইহুদি সম্প্রদায়। ওদিকে নায়েবদের হাতে সবকিছু সঁপে দিয়ে জমিদাররা ফুর্তি করতেন মধ্যপ্রাচ্যের মন্তে-কার্লো, বিলাস-ব্যসনের হুরীস্তান বেইরুতে। মদ্য মৈথুনের ব্যবস্থা সেখানে অত্যুত্তম এবং জুয়োর কাসিনোতে এক রাতে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও বেশি সর্বস্ব হারানো যায়। কাইরো ইস্কন্দরিয়াও এসব বাবদে সে আমলে খুব একটা কম যেতেন না। এসব বিলাসের কেন্দ্রে লেগে গেল জমিদারি বেচার হরিন্নুট। ইহুদিরা ধীরে ধীরে কিনে নিল কখনও সোজাসুজি, কখনও বেনামিতে ফলস্তিনের বিস্তর জমিজমা।

সে দেশের একাধিক যুবক আমাকে পই পই করে বোঝালেন,— না, প্রজাস্বত্ব আইন-ফাইন ওসব দেশে কস্মিনকালেও ছিল না। থাক আর না-ই থাক, প্রচুর জমি-জমা চলে গেল ইহুদিদের হাতে। বিস্তর আরবদের করা হল উচ্ছেদ। সেই পরিমাণে বয়তুল মকুদ্দসে (সংক্ষেপে কুদস, চালু উচ্চারণে উদস), অর্থাৎ জেরুজালেমে বাড়তে লাগল ভিখিরির সংখ্যা।

আরবদের অনৈক্য ইহুদির প্রধান অস্ত্র

কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে একদিন অবস্থা এমন চরমে গিয়ে দাঁড়াল যে ফলস্তিনকে দু ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে ইহুদি ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল, সেটা সবিস্তর বলার কণামাত্র প্রয়োজন এ স্থলে নেই। ইহুদির হাতে আছে কড়ি, তদুপরি আছে দুর্নীতিতে পাজির পা-ঝাড়া ফলস্তিনের ভিতরে-বাইরে আরব 'নেতারা'।

এক নিগ্রো বলেছিল, 'গোরারায়রা যখন আমাদের দেশে এল, তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। আজ জমি ওদের, বাইবেল আমাদের হাতে।'

ফলস্তিনের মুসলিম চাষা ইহুদিদের কাছ থেকে তৌরিত তালমুদ চায়নি, পায়ওনি। চাইলেও পেত না। কারণ বহুযুগ হল, ইহুদিরা দীক্ষা দিয়ে বিধর্মীকে আর আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। আরবদের দীক্ষা দিলে আরেক বিপদ। স্বধর্মে নবদীক্ষিত জনকে তো চট করে তার বাস্তুভিটে থেকে তাড়ানো যায় না। আফ্রিকায় গোরারায়রা ধর্মের বদলে লব্ধ জমির খাজনা নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট; নিগ্রোদের উচ্ছেদ করে সেখানে বিলিতি চাষা বসাতে চায়নি। ইহুদিরা কিন্তু চায় জমিটার দখল। ১৯৭১-এ পাঞ্জাবিরাও এ দেশে বলত, 'জমিন চাইয়ে। আদমি মর যায় তো ক্যা!'

তখনও ঠেকানো যেত ইহুদিদের। আরব রাষ্ট্রগুলো যদি গৃহ-কলহ ভুলে গিয়ে একজোট হত। তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে তারা, কিন্তু তার অধিকাংশই ছিল ফাঁপা, মিথ্যা, ভণ্ডামি।

www.pathagar.com

আমাকে যদি জিগ্যেস করেন, 'ওহে ভবঘুরে, এ দুনিয়ার সবচেয়ে তাজ্জব তিলিসমাৎ কি দেখেছ?' আমি এক লহমার তরেও চিন্তা না করে বলব, 'এই আরব জাতটা! ইরাক থেকে আরম্ভ করে ওই বহুদূর সুদূর মরক্কো অবধি বাস করে আরব জাত— অবশ্য সর্বত্রই কিছু না কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে (পৃথিবীতে অমিশ্র জাত আছে কোথায়?)। এই আরবদের দেহে আরব রক্ত, এদের ভাষা আরবি, এদের ধর্ম ইসলাম। মিলনের জন্য যে তিনটে সর্বপ্রধান গুরুত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন সে তিনটেই তাদের আছে। অথচ খুদায় মালুম, তারা আজ কটা রাষ্ট্রে বিভক্ত। এবং সেইখানেই কি শেষ? মাশাল্লা, সুবানাল্লা— বালাই দূরে যাক! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তারা এখনও যা প্রাণঘাতী কলহে লিপ্ত হয়, ভবঘুরে আমি— কোথাও দেখিনি,— পুস্তক-কীট আমি, কোথাও পড়িনি।

আর বাইরের শত্রু-মিত্রের কথা যদি তোলেন তবে সক্কলের পয়লা স্মরণে আসেন ইহুদিশ্রেষ্ঠ হের হাইনরিষ আলফ্রেড কিসিংগার। একদা নবী মুসা নিপীড়িত ইহুদিদের রক্ষা করেছিলেন জালিম মিসরিদের হাত থেকে। ইনিও এ যুগে সেই খ্যাতি অর্জন করবেন— তবে কি না, এবার বাঁচানো হবে জালিমকে মিসরিদের হাত থেকে।

গয়নীতি

ইংরেজ এই উপমহাদেশের ক্ষয়ক্ষতি করছে বিস্তর, একথা বলা যেমন সত্য ঠিক তেমনি এ কথাটাও সত্য যে তারা আমাদের অল্পবিস্তর উপকারও করেছে। কিন্তু অপকারের দফে দফে বয়ান দেবার সময় একথা কখনও বলা চলবে না, তারা আমাদের চাষাভুষোদের উচ্ছেদ করে সেখানে আপন জাত-ভাই গোরারায়দের বসবার চেষ্টা করছে, কিংবা এ রকম কোনও একটা কুমতলব তাদের ছিল। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান জমিদারে ঝগড়া-কাজিয়া হয়েছে প্রচুর, কিন্তু মুসলমান চাষাদের পাইকিরি হিসেবে ঝেঁটিয়ে হিন্দু জমিদার তার জাত-ভাই হিন্দু চাষাকে পালে পালে পত্তনি দিয়েছে, এমনতরো বার্তা কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না এবং তার উল্টোটাও না। যদিস্যাৎ কালেকস্মিনে হয়ে থাকে তবে সেটা নিতান্তই ব্যত্যয়।

কিন্তু ইহুদিকুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেদিন থেকে ফলস্তিনে আসা আরম্ভ করল সেদিন থেকেই তাদের পুরো পাক্কা প্ল্যান ছিল, এ দেশে তাদের কর্মপদ্ধতিটা হবে কী প্রকারের। একদিনে না, এক বৎসরে না,— ধীরে ধীরে কিন্তু মোক্ষম ঘা মেরে মেরে, ছুঁচ হয়ে ঢুকবে এবং ফাল হয়ে বেরুবে। না, ফাল হয়ে সেখানে আস্তানা গাড়বে। সেই মর্মে স্থির করা ছিল :

(১) 'হোম'-ফোম ওসব বাজে কথা নয়। সম্মুখে রাখতে হবে ধ্রুব উদ্দেশ্য— এ দেশে গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বাধিকারসম্পন্ন, সর্বার্থে স্বাধীন পরিপূর্ণ রাষ্ট্র। এবং সে রাষ্ট্র হবে 'বিশুদ্ধ' ইহুদি রাষ্ট্র। সম্পূর্ণ 'গয়'-বর্জিত। পাঠকের উপকারার্থে নিবেদন, ইহুদিদের প্রচলিত ভাষায় ইহুদি ভিন্ন এ দুনিয়ার কুল্লে নরনারীকে 'গয়' শব্দের মারফত পরিচয় দেওয়া হয়। কট্টর ধর্মান্ধ ইহুদির কাছে সব গয় বরাবর। সাধু-পাষণ্ডে, নিষ্ঠুর-সদয়ে, চোর-পুলিশে, ডাকাত-ফাঁসুড়েতে কোনও তফাৎ নেই। আমরাও শাজ-বাজ কাফির শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু অমুসলমান মাত্রই কাফির, এদের ভিতর ভালো-মন্দে কোনও তফাৎ নেই, এ রকম একটা আজগুবি তত্ত্ব কেউ এ

www.pathagar.com

যাবত প্রচার করেননি। তদুপরি গয় শব্দের সঙ্গে যে পাশবিক ঘৃণা মেশানো থাকে, কাফির শব্দের চতুর্দশ পুরুষ তার গা ঘেঁষতে পারবে না।

(২) রাষ্ট্রকে গয়-মুক্ত করার জন্য সর্ব আচরণ বৈধ। জনৈক ইহুদি সজ্জনই একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখে ইহুদি তথা বিশ্বজনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, হিটলার যে জর্মনিকে ইহুদিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন সে শিক্ষা তিনি পান ইহুদিদের কেতাব থেকে। গ্যাস-চেম্বার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

একথা আমি অতি অবশ্যই বলব না, সে আমলে বা এখনও সব ইহুদিই এসব বিধানে বিশ্বাস করেন। বস্তুত আমার বিস্তর ইহুদি বন্ধু ছিলেন, এখনও আছেন। যাঁদের প্রতিবেশীরূপে পেলে যে কোনও মুসলিম নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। কিন্তু মানুষের বদ-কিস্মৎ, রাষ্ট্র-নির্মাণ-কর্মে এঁদের ডাক তো পড়েই না, বরং এসব অন্যায় গোঁড়ামি, বিশ্বমানবের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে তাঁরা হন লাঞ্ছিত-বিড়ম্বিত। সভাস্থল থেকে এঁরা বহিষ্কৃত হন নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগাল শুনতে শুনতে। এ পরিস্থিতি এমন কোনও সৃষ্টিছাড়া অভিনব ঘটনা নয়। প্রভু খ্রিস্টের আমলেও ইহুদিরা চরমপন্থার অনুরক্ত ভক্ত ছিল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপস করতে কিছুতেই সম্মত হত না। তাই প্রভু খ্রিস্ট তাঁর সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ দানকালে 'মুখ খুলিয়াই' বলেন, 'ধন্য যাঁহারা আত্মাতে দীনহীন (অর্থাৎ আপন রূহ-এর গরিবি সম্বন্ধে সবিনয় সচেতন) কারণ তাঁদেরই নসিবে আছে বেহশত্।'

এর পর তাঁর সপ্তম উপদেশেই প্রভু বলছেন 'তাঁরাই ধন্য, যাঁরা (দুই বৈরী পক্ষের মাঝখানে) শান্তি-সুলেহ নির্মাণ করেন।' খ্রিস্টের এ উপদেশে গোটা ইহুদি জাত তাদের 'মৃত সমুদ্রে' ডুবিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে মারে। রোমান গবর্নর তাঁকে বাঁচাবার জন্য কী প্রকারের চেষ্টা দিয়েছিলেন, একটার পর আরেকটা সুলেহ্ পেশ করছিলেন, মথি-মার্ক ইত্যাদিতে আছে কিন্তু ইহুদি জনতা শুধু চিৎকারের পর চিৎকার করেই চলেছে— 'ক্রুশে মারো। ক্রুশে চড়িয়ে মারো ওকে।' সুলেহ্ মাত্রই তাদের কাছে দুর্বলতার লক্ষণ। সমস্ত ঘটনাটি এমনই নাটকীয় যে এর পুনরাবৃত্তি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে না।

শেষটায় গবর্নর পিলাতে যখন দেখলেন তিনি তাঁর প্রচেষ্টাতে এক কদমও এগুতে পারছেন না। (হি ওয়াজ নট গেটিং এনিহোয়ার) তিনি একটা ডাবরভর্তি পানি আনিয়ে জনতার সামনে দু হাত ধুয়ে বললেন, 'এই নির্দোষ সাধু ব্যক্তির রক্তপাতে আমার কোনও কসুর রইল না।' উন্মত্ত জনতা চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'এর লহুর দায় আমাদের ওপর পড়ুক, আমাদের বংশধরদের ওপর পড়ুক।'

যুগ যুগ ধরে ধর্মোন্মাদ খ্রিস্টান জনতা যখনই ইহুদিদের ওপর নির্মমভাবে খুনখারাবি চালিয়েছে তখনই ব্যঙ্গ করেছে, 'তোদের পূর্বপুরুষরা কসম খেয়েছিল না, প্রভুর খুনের দায় তোদের ওপর অর্সাবে? এখন "আমরা বেকসুর, আমরা মানুষ" বলে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

অথচ আইনত, ঈসা মসিহের শিক্ষার কসম খেয়ে অবশ্যই বলতে হবে, পিতার পাপ পুত্রে অর্সায় না। এরা বেকসুর।

www.pathagar.com

বেদরদ প্রাক্তন বাস্তুহারা

১৯৩৪-এ ফলস্তিনে গিয়ে দেখি, বাস্তুহীন, ভিটেহারা, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত জর্মন ইহুদিরা লেগে গেছে নতুন করে, কিন্তু নীরবে, লক্ষ লক্ষ নয়া ক্রুশ বানাতে। সর্ব প্রকারের আয়োজন চলছে সঙ্গোপনে। উত্তম উত্তম বাস্তু পাওয়ার পরও এরা বিধি-ব্যবস্থা করে যাচ্ছে, লক্ষাধিক বেকসুর আরবদের কী প্রকারে, কত সুলভ পদ্ধতিতে বাস্তুহারা করা যায়।

এইসব মাসুম চাষাভুষোদের সচরাচর আরব বলা হয়, মুসলিম বলা হয়, কিন্তু আসলে বলা উচিত ফলস্তিনি বা ফলস্তিনবাসী। ইহুদিরা মিসরের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে, ফলস্তিনে এসে একে একে যেসব আদিবাসী উপজাতিদের জয় করতে করতে ইহুদি-রাজত্ব বসায়, সেসব আদিম বাসিন্দারা ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কওমের নাম ছিল ফিলিস্তাইন, তাদের রাজত্বের নাম ছিল ফিলিস্তিয়া। এ রকম আরও ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল অনেক। ফিলিস্তিয়া থেকেই পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামের উৎপত্তি। ইহুদিদের ছিল দুটি রাষ্ট্র— জুদেয়া ও ইজরায়েল। এবং আজ প্যালেস্টাইন বলতে আমরা যে ভূখণ্ড বুঝি এই দুটি রাষ্ট্র মিলে তার দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। সিনাই বা সিনিন কস্মিনকালেও ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মোদ্দা কথা এই : ইহুদিরা ফলস্তিনের আদিমতম বাসিন্দা নয়। আদিম বাসিন্দারা পরবর্তীকালে খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং জেনারেল খালিদ সিরিয়া ও ফলস্তিন জয় করার পর ইসলাম গ্রহণ করে। আজ যখন ইহুদিরা ফলস্তিনকে আপন আদি বাসভূমি বলে হক্ক বসিয়ে প্রাচীনতম বাসিন্দাদের তাড়াতে চায়, তবে কালো দ্রাবিড়রা উত্তর ভারত দাবি করে আর্যদের খেদিয়ে দেবার হক্ক ধরে! যে কোনও রেড ইন্ডিয়ান ডক্টর কিসিংগারকে দূর দূর করে আপন দেশ থেকে বের করে দিতে পারে। তার আছে সত্যকার হক্ক।

ফি রোজ ঈদ ফি রোজ হালুয়া

জেরুজালেমের সর্বত্র কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বড় বড় রাস্তার উপর নবাগত ইহুদিরা বসিয়েছে বার্লিন প্যারিস ন্যুইয়র্কি কায়দায় ফেনসি কাফে-রেস্তোরাঁ। আরব ওগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না, তাকালে সে দৃষ্টিতে থাকে ঘৃণা আর ক্ষোভ। এসব ইহুদি রেস্তোরাঁয় খাদ্য-পানীয়ের দাম যে খুব একটা আক্রা তা নয়। খদ্দের ইহুদি, মালিক ইহুদি। এবং প্রায় সব কটাই চলে লোকসানে। তাতে কার কী? সব ইহুদি সাকুল্যে খর্চা, ফুর্তির কড়ি পাচ্ছে মার্কিন জাত-ভাইদের কাছ থেকে। তারা কিন্তু বাস্তু ঘুঘু। ধনদৌলতে ভরা, নৃত্যগৃহ, কাবারে, জুয়োর আড্ডায়, বেশ্যালয়ে আবজাব করছে যে দেশ, সে দেশ ফেলে তারা আসবে কেন এই কাঠখোট্টা প্রাচীনপন্থী প্যালেস্টাইনে— 'পুণ্যভূমি' 'পিতৃভূমি', 'আব্রাহামের দেশ' বলে মুখে মুখে যতই হাই-জাম্প লং-জাম্প মারুক না কেন।

আরব জাত গরিব। তাদের রেস্তোরাঁও গরিব। আমিও গরিব।

ঢুকলুম একটা শামিয়ানা-ঢাকা রেস্তোরাঁতে। সেটা ছিল রোজার মাস। ইফতার আসন্ন। সে যুগে বেতারের খুব একটা প্রচলন হয়নি। তাই রেস্তোরাঁর লাউড স্পিকারে কুরান-পাঠ আসছে,

www.pathagar.com

কাইরো বেতার থেকে, মশহুর কারী রেফাতের কণ্ঠে। আমরা আপন দেশে আসর-মগরীবের দরমিয়ান ওয়াক্তে সচরাচর কুরান পড়ি না। এরা দেখলুম, চুপ করে বসে আজান না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত শোনাটাই পছন্দ করে। দু চার জন ছোকরা গোছের খদ্দের ফিসফিস করে কথা বলছে। একজন দেখলুম উত্তেজিত মুখে দ্রুতবেগে কী যেন বলে যাচ্ছে আর বার বার খবরের কাগজের উপর আঙ্গুল ঠুকে, খুব সম্ভব তারই বরাত দিচ্ছে। অন্যজনের দৃষ্টি উদাস।

ছেঁড়া, তালি-মারা, জোব্বা পরা গোটা চারেক বয় টেবিলে ইফতার সাজাচ্ছে। একজন এসে ফিসফিস করে শুধাল, খাবে কী? ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি, কাইরোর মধ্যবিত্ত শ্রেণির হোটেলে যা-খাওয়া হয়, এখানেও টেবিলে টেবিলে সাজানো হচ্ছে তাই। আমি বললুম, যা ভালো বোঝো তাই।

ইতোমধ্যে একজন জোয়ান গোছের লোক আমার সামনের চেয়ারে খপ করে বসে বয়কে দিল ইশারা। বয় আসতেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, 'সব জিনিসের রেট বাড়িয়েছ তো ফের?' বয় ধবধবে সাদা দাঁত দেখিয়ে মুচকি হেসে বলে, "না, এফেন্দম।' লোকটা তেড়ে শুধোল, 'কেন বাড়ালে না? ঠেকাচ্ছে কে? তাই সই। যাব নাকি ইহুদি রেস্তোরাঁয়?' আমার গলা থেকে বোধহয় অজানতে অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছিল। বোঁ করে চক্কর খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাড়বে না দাম নিত্যি নিত্যি! ওই ইহুদি ব্যাটারা মুফতের সোনাদানা ওড়াচ্ছে দু হাতে। ওরা পারে আমাদের সর্বনাশ করতে।' আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'ওরা সস্তায় দেয় কী করে?'

'কী করে? অবাক করলেন এফেন্দম, ওদের লাভই-বা কী, লোকসানই-বা কী? দোকানি ইহুদি, খদ্দেরও ইহুদি!' তার পর যা বললেন সেটা বাংলায় হলে প্রকাশ করতেন একটি প্রবাদ-মারফত : কাকে কাকের মাংস খায় না।

ইহুদির দাপট

একাধিকবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ডক্টর হেনরি কিসিংগারের প্রতি। ইনি তখনও যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টারের পদ লাভ করেননি, কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও অভাগা বাংলাদেশের লোক তাঁকে চট করে চিনে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই যখন বিশ্বের সর্ব মিলিটারি ওয়াকিফহাল নিঃসন্দেহে বলতে থাকেন, কয়েকদিনের ভিতরেই নিয়াজি পরাজয় স্বীকার করে ফরমানকে ফরমান লেখবার হুকুম দেবেন, তার পূর্বে এবং পরেও ইসলামাবাদের সর্ব প্রভাবশালী বিদেশি ইলচিরা একবাক্যে বিশ্বজন তথা জুন্তাকে জানান যে, শেখ মুজিব সাহেবকে মুক্তি না দিলে কোনও প্রকারের স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নেই, তখনও এই মহাপ্রভু কিসিংগার গোপন বৈঠকে একাধিকবার বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, "না, না, না। 'শেখকে মুক্তি দাও', ইয়েহিয়াকে এ ধরনের কোনও সুস্পষ্ট স্পেসিফিক নির্দেশ আমরা দিতে পারব না।"

কোনও সুচতুর পদ্ধতিতে এই ইহুদিনন্দন শেষটায় শূন্য-মস্তিষ্ক বুদ্ধুরাজ মার্কিনের মাথায় সওয়ার হলেন সে-ইতিহাস দীর্ঘ! উপস্থিত সেটা থাক। কিন্তু একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। ইহুদিরা টাকা ও বিশ্বের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঐক্য-শক্তি দ্বারা মার্কিনের মাথায় কভু যে ডাণ্ডা বুলোয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আড়াল থেকে অদৃশ্য সুতো টেনে পুতুল-নাচ নাচায়, সে-তত্ত্বটা দুনিয়ার লোক জানেন না; নিরীহ মার্কিন পদচারীরও কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে সন্দেহ

www.pathagar.com

হয় মনে, বিশেষ করে বোটকা গন্ধ থেকে ওটা যেন বড্ড অস্নাত ইহুদি ইহুদি বদবো-র মতো ঠেকছে। কারণ একটি প্রবাদ অনুযায়ী এ সত্য নির্ধারিত হয়েছে, 'ফরাসি ও ইহুদিরা নৌকা-ডুবি ভিন্ন জীবনে কখনও গোসল করে না।' সুয়েজ কানালের পাড়েও ইহুদিরা বড্ডই অস্বস্তি অনুভব করত— পালাতে পেরে বেঁচেছে।

তা সে যাই হোক, মার্কিন ইহুদিদের তাগত কতখানি প্রচণ্ড সেটা উত্তমরূপে অবগত আছেন মার্কিন রাজনীতিকরা। এডওয়ার্ড কেনেডির প্রতি বাংলা-ভারতের অনেকেই শ্রদ্ধা পোষণ করেন, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় এ দেশের স্বাধীনতা স্পৃহার সমর্থন জানিয়ে নিক্সনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। পাঠক শুনে বিস্ময় ও বেদনা বোধ করবেন বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তিন দিন যেতে না যেতেই সেই কেনেডি, আমার জানা মতে, 'গয়'-দের মধ্যে সর্বপ্রথম মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন ইজরায়েলকে যুদ্ধের অ্যারোপ্লেন দিয়ে সাহায্য করেন। তার প্রথম কারণ, তিনিই ইজরায়েলের প্লেন নাশের অবস্থাটা তড়িঘড়ি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কারণই আসল এবং মোক্ষম। ১৯৭৬-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি উমেদার, এবং আমার জানামতে, অন্তত এ শতাব্দীতে, ইহুদি-বৈরী কোনও ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। কেনেডি বেলাবেলিই ইহুদিদের সন্তুষ্ট করে রাখতে চান।

ইজরায়েল! হিসাব দাও!

পাঠক কিন্তু তাই বলে এক লম্ফে হিটলারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে যাবেন না, তামাম মার্কিন মুল্লুক চালাবার কুল্লে কলকাঠি ইহুদিদের হাতে। মোটেই না। ইহুদিকুল শক্তি-উপাসক নয়। তারা করে লক্ষ্মীর উপাসনা। মার্কিন পলিটিক্‌সে তারা শক্তিধর হতে চায় না। যদি কখনও তাদের প্রত্যয় হয়, যে অমুক প্রেসিডেন্ট হলে তাদের টাকা কামাবার পথে কাঁটা হবেন, তবেই তারা কুল্লে ধন-দৌলত দিয়ে সাহায্য করে তাঁর দুশমনকে— কিন্তু গোপনে। মাত্র একবার তারা ভুল করে শক্তির পথে নেমেছিল। জাত-ভাইদের জন্য ফলস্তিনে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র গড়ার কুবুদ্ধি তাদের মাথায় ঢোকে, এবং গত পঞ্চাশটি বছর ধরে তারা যে কী পরিমাণ মাল দরিয়ায় ঢেলেছে সেটা জানে একমাত্র তারা আর জানেন জেহোভা। এইবারে তার হিসাব নেবার পালা এসেছে! ম্যাডাম গোল্ডা মেইর, মশে দায়ান, আবা এবানের টুঁটি চেপে ধরে মার্কিন ইহুদিরা শুধোবে, 'হিসাব দেখাও, টাকাটা গেল কোথায়! কে মেরেছে কত? এখন কুল্লে ইহুদি রাষ্ট্রটা যে ডকে উঠতে চলল তার জন্য দায়ী কে?'

কভু গোপনে!

কিন্তু এটা বাহ্য। আসল গরদিশে পড়েছেন বাবাজি কিসিংগার। মার্কিনদের হনুকরণ করে (এপিং করে) নাম পর্যন্ত বদলালেন, হাইনরিষ কিসিংগার থেকে হেনরি কিসিংগারে! আরও কত কী না করলেন, 'কেরেস্তান'দের সঙ্গে একদম লাইলি মজনুনের মতো দুই দেহে এক

www.pathagar.com

প্রাণ, হরিহরাত্মা হয়ে যেতে। ওদিকে ধাপ্পা দিলেন বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে— ইহুদিদের অবশ্যই বাদ দিয়ে— তিনি প্রভু নিক্সনের উপদেষ্টারূপে চারটি বৃহৎ বিশ্বশক্তির সঙ্গে গুফতো-গো করেন মাত্র : তাঁরা রুশ, চীন, জাপান আর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ (ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জর্মনি গয়রহ্)। মধ্যপ্রাচ্যে? আজ্ঞে না। ওটা ডিল করছেন স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিজ একসেলেনসি রজার্স। ভাবখানা এই, 'আমি ইহুদির বেটা। আরব-ইজরায়েলের ফ্যাসাদে আমার নাক গলানোটা কি নিরপেক্ষ, সুবিবেচনার কর্ম হবে ?'

তাই দেখা গেল, কিসিংগার যখন ক্ষুদ্র-অসাধুতা ('পেটি অ্যান্ড ডিজনেস্ট'— ফরেন আপিসের একাধিক উচ্চ কর্মচারীর মতে) পদ্ধতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব ছিনিয়ে নিলেন (গ্র্যাবড) তখন মিসরের জনৈক সম্পাদক, অস-সঈদ ইহসান আবদুল কুদ্দুস বললেন, 'আশা ছাড়ব কেন? ভেবে দেখুন, ফিল আখির— আফটার অল—বছরের পর বছর ধরে আমরা মি. রজার্সের সঙ্গে লেনদেন করার পর আখেরে আবিষ্কার করলুম, তিনি ক্লীব— শক্তিধর তাঁর পিছনে গদাধর কিসিংগার!' বিগলিতার্থ তা হলে দাঁড়াল এই, আরবরা বুদ্দু। কিসিংগারই কলকাঠি নাড়িয়েছেন ইজরায়েলের হয়ে, শিখণ্ডী ছিলেন রজার্স। এটাকে যদি ধাপ্পা, প্রতারণা না বলে তবে বঙ্গজন দয়া করে শব্দদুটোর সংজ্ঞা জানাবেন কি?

কভু হাটের মধ্যিখানে!

এই কি তার শেষ? কিসিংগার রুশের সঙ্গে দোস্তি জমালেন স্বয়ং খোলাখুলিভাবে। হঠাৎ দেখি, ইয়াল্লা, হুড়হুড়িয়ে বানের জলের মতো ইজরায়েলের পানে 'রাশ' করেছে রুশের ইহুদি-পাল! এরা যে ননী-মাখনে পোষা ইজরায়েলিদের চেয়ে হাজার গুণে সখৎ মোকাবিলা করতে পারবে আরবদের, সেটা স্বীকার করেছেন ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু জাঁদরেলগণ। চীন তো চটে গিয়ে রুশকে করেছে এর জন্যে দায়ী। কিসিংগারকে ছেড়ে দিয়ে কথা কইল কেন, সে আমি জানিনে।

সরল প্রশ্ন

কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সেবক, এ মূর্খ, লেখাটি আরম্ভ করেছে সেটি ভিন্ন, কিন্তু উপরের বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-বিজড়িত। আমি নাদান, কিঞ্চিৎ এলেম সঞ্চয় করতে চাই আপনাদের কাছ থেকে।

(১) আশা করি সবাই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশ বিশ্বসংসারে অসাধারণ শক্তিশালী এমন একটা রাষ্ট্র নয় যেখানে কোনও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেকে এ দেশের প্যারা করতে চাইবেন। আমার প্রশ্নটা পরে আসছে।

(২) কত রাজা, কত প্রেসিডেন্ট, কত প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ পদ গ্রহণ করার সময় নিত্যি নিত্যি শপথ নেন। তার কটা ফটো এই গরিব ঢাকার দৈনিকে বেরোয়, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো।

www.pathagar.com

(৩) তা হলে প্রশ্ন, হঠাৎ করে মি. কিসিংগার— রাজা না, প্রেসিডেন্ট না, এমনকি প্রধানমন্ত্রী না— ফরেন মিনিস্টারি নেবার সময় যে শপথ গ্রহণ করেন তার ছবি ঢাকার কাগজে কাগজে বেরুল কেন? নিশ্চয়ই ছবিটি মি. কিসিংগার যে ফরেন আপিসের বড় সাহেব হলেন, সে আপিসের ঢাকাসহ শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে। তা হোক, কিন্তু প্রশ্ন, এই ছবিটাই বিশেষ করে কেন?

(৪) উপরের প্রশ্নটি যত না গুরুত্বব্যঞ্জক, তার চেয়ে মোস্ট ইম্পরটেন্ট, মি. কিসিংগারের সম্মানিতা মাতা যে বাইবেল হাতে করে শপথের সময় দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা কে, কারা, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন? কত লোক কত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে, বা কোনও ধর্মগ্রন্থ না নিয়ে শপথ করে, কই, সেটা তো আজ অবধি কোনও খবরের এজেন্সি বা ইনফরমেশন সার্ভিস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকই বাইবেলের নামে গদগদ একথাও তো কখনও শুনিনি।

(৫) মি. কিসিংগার ইহুদি। বাইবেলের প্রথম অংশ, যার নাম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' সেটা ইহুদিদের সম্মানিত ধর্মগ্রন্থ— খ্রিস্টানদেরও। কিন্তু তার দ্বিতীয়াংশই আসলে খ্রিস্টানদের পরমপূজ্য 'নিউ টেস্টামেন্ট'— যাতে আছে প্রভু যিশুর জীবনী, তাঁর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিবরণ, এবং আছে তাঁকে যে ইহুদিরা ক্রুশে চড়িয়ে খুন করে তার করুণ কাহিনী। মি. কিসিংগার (এবং তাঁর মাতা) কি এই কাহিনীর 'পবিত্রতায়' বিশ্বাস করেন যে এটিকে স্পর্শ করে তিনি শপথ নিলেন? আমি যতদূর জানি, ইহুদিরা এই 'নিউ টেস্টামেন্টে' বিশ্বাস করেন না। অতি অবশ্যই ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তোওরাতে (তওরিতে) 'নিউ টেস্টামেন্টের' স্থান নেই।

(৬) তবে কি ফটোর বাইবেল খাস ইহুদি-বাইবেল? আমাদের জানা মতে, সে গ্রন্থে থাকে শুধু 'ওলড টেস্টামেন্ট'। তাই যদি হয়, তবে 'বাইবেল, বাইবেল' বলে সেটা অতখানি প্রচার করা হল কেন? ঢাকা-কলকাতার জনসাধারণ তো বাইবেল বলতে ওলড এবং নিউ, দুইয়ে গড়া বাইবেলই বোঝে, সেই কেতাবদ্বয়ের সম্মিলিত গ্রন্থই দেখেছে। যাঁরা ফটোর সঙ্গে ক্যাপশনটি বিতরণ করেছেন তাঁরা ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে ভালো হত না? 'বাইবেল' শব্দটিও মূলত গ্রিক বলে ইহুদিরা ব্যবহার করেন বলে শুনিনি। তাঁরা তোওরা, তালমুদ ইত্যাদি বলে থাকেন। হয়তো নিতান্ত 'গয়'দের উপকারার্থে মাঝে মাঝে বাইবেল বলেন।

(৭) ইহুদি কিসিংগারের পক্ষে কি বাধ্যতামূলক ছিল, বাইবেল স্পর্শ করে, শপথ নেবার? কাল যদি মুসল্লি মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) আমেরিকার মন্ত্রী হন, তবে তাঁকেও কি বাইবেল ছুঁয়ে কসম নিতে হবে?

(৮) তবে কি ড. কিসিংগার ও সম্মানীয়া মাতা সনাতন ইহুদিধর্ম ত্যাগ করেছেন? এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব— কিসিংগার চরিত্র যতখানি বুঝতে পেরেছি তার পর।...এসব বাবদে কিঞ্চিৎ এলেম হাসেল হলে উত্তম আলোচনা করা যাবে। যাঁরা এতখানি পয়সা খর্চা করে মুফতে ফটো বিতরণ করলেন, তাঁরা দু পয়সার কালি-কাগজ মারফত সত্যজ্ঞান বিতরণ করবেন না, এ-ও কি সম্ভব? মুফতে থোড়া বখশিশ দিয়ে বেতটার পয়সা ওনারা দেবেন না?

www.pathagar.com

বার্লিনে

১৯২৯-এ আমি বার্লিন যাই। সে যুগে বার্লিন এবং অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ছিল ইহুদি জগতের প্রবীণতম দুই কেন্দ্র। ইহুদি-বৈরী হিটলার এবং তাঁর গুরুমারা চেলা বৈরী-প্রধান গ্যোবেলস তখনও রাষ্ট্রশক্তি পাননি, এবং তাঁদের শক্তিকেন্দ্র ছিল বাভারিয়া প্রদেশের ম্যুনিকে। তবু মাঝে মাঝে বার্লিনের রাস্তায়, পাবে, মিটিঙে, নাৎসি আর কম্যুনিস্ট পার্টিতে হাতাহাতি মারামারি হত। তাছাড়া মোকায় পেলে মশহুর কোনও নাৎসি-বৈরীকে পেলে তাকেও দু ঘা বসিয়ে দিত, খুনও করেছে। এ স্থলে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই, ফ্রান্স-জর্মনিতে ইহুদিদের এক বৃহৎ অংশ নিজেরা প্রগতিশীল বলে, প্রগতিশীল কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিত। কম্যুনিস্ট প্যাঁদাতে পারলে নাৎসিদের ছিল ডবল আনন্দ। বহুৎ ক্ষেত্রে ফালতো রিসক না নিয়ে একাধারে কম্যুনিস্ট-ইহুদি দু জনকেই ঘায়েল করা যেত। যে কারণে এ দেশের হিন্দুকে খতম করে ইয়েহিয়া পেতেন ডবল সুখ— একাধারে হিন্দু এবং বাঙালি, দুই দুশমনের জন্য লাগত মাত্র একটা বুলেটের খর্চা।

ইউনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর টেবিলে নাৎসিদের কথা বড় একটা উঠত না। ছাত্রদের ভিতর তখন কম্যুনিস্টদের ছিল প্রাধান্য। এবং স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে ইহুদিদের ছিল উচ্চাসন। আমি যে ওদের সঙ্গেই গোড়ার থেকে ভিড়ে গিয়েছিলুম তার কারণ কম্যুনিস্টরা আপন 'ধর্মে' দীক্ষা দেবার জন্য নবাগতজনকে অভ্যর্থনা জানায় আর ইহুদিরা শত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় মেহমানদারি গুণটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে ইজরায়েল ব্যত্যয়। কিংবা হয়তো যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টানদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার সময় অখ্রিস্টান যাকে পেয়েছে তার সাহায্য পাবার আশায় তার সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা বলেছে। অবশ্য এটা স্মরণে রাখতে হবে ইহুদি জাত যেখানে গিয়েছে, সেখানেই কিছু না কিছু মিশ্রণের ফলে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা প্রায় অসম্ভব খ্রিস্টান জর্মন বা কে, আর ইহুদি জর্মনই-বা কে। এবং নাম থেকেও বলা সুকঠিন কে কোন জাত বা ধর্মের।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদি-শাস্ত্র চর্চা

১৯৩০-এ হিটলার হঠাৎ, কী কারণে কেউ জানে না, পার্লামেন্টে অনেকগুলি সিট পেয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে আমি চলে এসেছি বন শহরে। ছোট শহর বন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল সেমিনারটি জর্মনির ভিতর-বাইরে সর্বত্র সুপরিচিত। সেখানে আরবি, সংস্কৃত ও হিব্রু চর্চা হত প্রচুর। সেই সূত্রে ডজনখানেক ইহুদি ছাত্র ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল তো বটেই, দু তিন জনার সঙ্গে রীতিমতো হৃদ্যতাও হয়ে গেল। এদের একজন ছিলেন সেই সুদূর রুশ দেশেরও দূর প্রান্ত জর্জিয়ার লোক। ভারি আমুদে, পরিণত বয়স্ক, ছাত্রসমাজের মুরুব্বি। ওদিকে ইহুদি ধর্মতত্ত্বের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে পাস করেছিলেন বলে (অর্থাৎ তিনি রাব্বি পণ্ডিত-পুরোহিতের সমন্বয়) 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' প্রামাণিক সংস্করণের নতুন প্রকাশ নিয়ে দুনিয়ার যত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে দিন-যামিনী আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন। একদিন আরবিতে লেখা 'আজব উল-কবর' (মৃতজনকে গোর দিয়ে চলে আসার পর ফিরিস্তা এসে তার

www.pathagar.com

ঈমান সম্বন্ধে যেসব প্রশ্ন করেন তার বিবরণী) পড়ে আমার মনে হল, ইহুদিদের 'তালমুদ' গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকাটা অসম্ভব নয়। আমার হিব্রু বিদ্যে মাইনাস ডডনং। জর্জিয়ার রাব্বির কাছে গিয়ে প্যাসেজ দেখাতেই তিনি চোখদুটো বন্ধ করে চেয়ারের হেলানটায় মাথাটা ফেলে উর্ধ্বমুখী হয়ে বিড়বিড় করে হিব্রু শাস্ত্র আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি— তালমুদ তিলাওতের পালা আর সাঙ্গ হয় না। কুরান শরীফের শবীনা খৎম-ই এক ঠায় বসে এ জিন্দেগিতে আদ্যন্ত শোনার সওয়াব হাসিল করতে পারেনি এই বদ-কিস্মৎ গুনাগার। আর এই তালমুদ গ্রন্থটি ইটের থান মার্কা পাক্কা চল্লিশটি ভলুমের নিরেট মাল। সওয়াব ভি নদারদ, কারণ তালমুদ কেতাব পাক তওরিতের অংশ নয়।... আখেরে জেহোভার রহমত নাজির হল। হঠাৎ থেমে গিয়ে এক লম্ফে পেড়ে আনলেন এক খণ্ড তালমুদ। পাশের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে 'হিম্বৎ হা করব' (আমার নাম আজ আর মনে নেই) অনুচ্ছেদটি পড়তে আরম্ভ করলেন, আমার হাতে আরবি টেকসটটি তুলে দিয়ে। এবং হুবহু এক্কেবারে আমাদের মক্তবের ছাত্রদের মতো ঘন ঘন দুলে দুলে আর সুর করে করে। আর মাঝে মাঝে ঠিক মক্তবের বাচ্চাটার মতো মাথা ডাইনে-বাঁয়ে নাড়িয়ে সুর করেই বলেন 'হল না,' মেরামত করে ফের এগোন দ্রুততর গতিতে।

আমি তো অবাক। কবে কোন যুগে, ছেলেবেলায় আপন গাঁয়ে দেখেছি এই দৃশ্য! আর সেই দৃশ্য জর্জিয়ার তিফলিস থেকে এখানে এসে ফের হাজির! হ্যাঁ, ওখানেও একদা আরবি, তুর্কি ও ফারসিরও প্রচুর চর্চা হত। শুধু একটা অনুষ্ঠান ফারাক ছিল; রাব্বিকে বললুম, '"হল না" বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তালিব-ই-ইলম চট করে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নেয়, চাবুক হাতে মৌলবি সাহেব শুনতে পেরে তেড়ে আসছেন কি না।' সদানন্দ পণ্ডিত ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতেই চায় না।

গোপন ইহুদি রেস্তোরাঁ

এ কাহিনী এতখানি বাখানিয়া বলার উদ্দেশ্য আমার আছে। ১৯৩২-এ দেশে ফিরে ফের বন শহরে গেলুম '৩৪-এ। রাব্বির সঙ্গে দেখা হল না। ভাবলুম হয়তো-বা হবু ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলে চলে গিয়েছেন। এ রকম সুপণ্ডিত রাব্বি পুণ্যভূমিতে যাবেন না তো যাবার হক্ক ধরে কে? তাই ভারি খুশি হলুম, চিন্তিতও হলুম '৩৮-এ তাঁকে ফের বন শহরের স্টেশনের কাছে দেখে। হিটলার তখন এমনিই বেধড়ক দাবড়াতে আরম্ভ করেছে যে ইহুদিরা জর্মনি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে দলে দলে— একদা যে-রকম মিসর ছেড়ে তুরি সিনিনে পৌঁছেছিল। ওই সময়েই হের ডক্টর কিসিংগার— যিনি তরশু দিন চোখ রাঙিয়ে আরব নেশনকে শাসিয়েছেন, 'এখন পাঠাচ্ছি স্রেফ অস্ত্র-শস্ত্র (জাতভাইকে), দরকার হলে পাঠাব সেপাই জাঁদরেল,'— সেই, তখনকার দিনের চ্যাংড়া হাইনরিষ ডাকনাম হাইনৎস কিসিংগার পড়িমরি হয়ে জর্মনি ছেড়ে অদ্যকার মিলিটারি কণ্ঠটি খামুশ রেখে চড় চড় করে বীরগর্বে পালান মার্কিন মুল্লুকে।...রাব্বি আব্রাহাম আমাকে জাবড়ে ধরে নিয়ে উঠলেন একটা বাড়ির দোতলায়। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ইহুদি রেস্তোরাঁ। কারণ সামনেই ছোট্ট একটা টেবিলের উপর গোটা দশেক ছোট কালো কাপড়ের টুপি— নিতান্ত কুণ্ডুলীসুদ্দু মাথার খাপরিটা ঢাকা যায়

www.pathagar.com

মাত্র। ইহুদিরা অনাবৃত মস্তকে ভোজন বা ভজনালয়ে প্রবেশ করেন না। আম্মো একটা পরে নিলুম। সুন্নৎ।

মাখনে ভাজা মাছ এল। ইহুদি শরিয়তে মাছ তেলে ভাজতে নেই। আমি বললুম, 'বিসমিল্লা করুন।' তিনি তাই করলেন। কুশলাদি সমাপনান্তে আমি আশ-কথা পাশ-কথা দু চারটি বলে শুধালুম, 'পুণ্যভূমিতে যাবেন না।'

তাঁর মাথা আমার কানের কাছে এনে অতি চুপে চুপে বললেন, 'আমাকে তারা পছন্দ করবে না। কিন্তু এখানে না, রাস্তায় কথা হবে।'

আহারাদি ছ বছর আগে ছিল ঢের, ঢের ভালো।

টুপি ফের টেবিলে রেখে রাস্তায়, তার পর সেমিনারে। পূর্ববৎ গুরুশিষ্যের মতো মুখোমুখি হয়ে বসার পর নিজের থেকেই বললেন, 'আমি রাব্বি। আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, শাস্ত্র মেনে চলি। ইজরায়েল যারা গড়ে তুলেছে তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কোনও মতভেদ নেই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক সর্বপ্রথম সমস্যাতেই তারা যে পথে চলেছে সেটা ভুল পথ। আমার ব্যক্তিগত মত নয়। খুলে বলছি।

'প্যালেস্টাইন থেকে চিরতরে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে ইহুদিরা পুণ্যভূমিতে তিনবার সশস্ত্র সংগ্রাম করে। প্রতিবার তারা নির্মমভাবে পরাজিত হয়। একবার ব্যাবিলনের রাজা তো আক্রোশের চোটে তাদের ছেলে-বুড়ো-কুমারী-সধবাদের বিরাট এক অংশ দাসরূপে টেনে নিয়ে গেলেন প্যালেস্টাইন থেকে সেই দূর ব্যাবিলনে— সমস্ত সিরিয়া মরুভূমির উপর দিয়ে। বার বার জেনেশুনে, কারণে-অকারণে কখনও-বা পরের উস্কানিতে তারা বিদ্রোহ করে শুধু যে নিজেদের পার্থিব সর্বনাশ ডেকে এনেছে তাই নয়, ঐতিহ্যগত ধর্মের মারফত তারা যেটুকু সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়েছিল সেটারও পূর্ণ বিকাশ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রতিবার গোটা জেরুজালেম শহরটাকে পুড়ে খাক করে দিয়েছে, হাজার হাজার নারী পুত্রহীন, স্বামীহীন করেছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না, করার মতো শক্তি তাদের আদৌ ছিল না।

'তাই ইহুদিদের প্রফেটরা ধর্মগ্রন্থে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া তোমাদের পক্ষে পাপ, মহাপাপ!

"হোম" বানাতে গিয়ে প্যালেস্টাইনে এই নয়া ইহুদিরা আবার ধরেছে অস্ত্র আরবদের বিরুদ্ধে। বার বার আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাব্বিরা তাদের সম্মুখে শাস্ত্র খুলে তাদের মানা করেছেন। তারা শোনেনি।

'এখন বেশিরভাগ আর মুখ খোলেন না।'

'আমি রাব্বি। আমি বিশ্বাস করি শাস্ত্রের বচন। আরবদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ভিন্ন এদের অন্য কোনও পন্থা নেই। কিন্তু আমার কথা শুনবে কে?'

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বিদেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাতদুপুরেই হোক আর দিনদুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন শহরে। টোকিও, ব্যাংকক কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনও শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিলল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা যে স্বয়ং শার্লক হোমসকে পর্যন্ত তাঁর সব-কটা পুরু পুরু অতসি কাচ মায় তাঁর জোরদার মাইক্রোস্কোপটি বের করে, ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তাঁর পিঠে দাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আ লা হোমস স্প্রে ছড়িয়ে— বাকিটা থাক, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'স্কুলবয়'ও সেগুলো জানে— তবে বলবেন, 'হয় মন্তে কার্লোর রেজিনা হোটেল নয় য়োহানেসবের্গের অল হোয়াইট হোটেল।' দূর-পাল্লার অ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস অ্যার, লুফট হানজা, অ্যার ইন্ডিয়া না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আন্দেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন জাতের কোন মুল্লুকের তিমি?

ইন্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দি। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জর্মনি এ দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব অ্যার ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যারোপ্লেনকে একটা চানস দিতেই-বা আপত্তিটা কী? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ওই কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে, তদ্বির-তদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলব না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিয়ত তলব করে বসবেন, কোনও একজন ভিআইপি-কে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস 'নেটিভ' রাইটারের পিছনে তিনি আপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভিআইপি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভেবেছিলুম চুঙ্গিঘরের (কাস্টমসের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতোমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধাল, "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গিঘরের কর্মচারীদের একহাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এ যাত্রায় আমি হাজতে বাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পঞ্চপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ভাগুর ডাগুর ভিআইপি-কাম-সরকারি কর্মচারীকে বেআইনিতে মাল আনার জন্য নাজেহাল

www.pathagar.com

করেছিলেন।... একদিন জলের কল খুললে যেরকম জল না বেরিয়ে শব্দ বেরুত সেই সময় আমার ব্লটিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরুল ঘস ঘস খস খস চোঁ ধরনের কী যেন একটা।

নাহ্। এ লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এঁর বাড়িতে মাসে একদিন জল আসে বলে ওই ভাষা বোঝাতে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাবদে কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্তমনে ওই আরাম চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তার পর ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরেটক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনচারেক বাঙালি কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ করলেন যে, হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যেরকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গিঘর লেখাটা আমি ব্যান করে দেব। কার যেন দু-শো টাকা ফাইন হয়েছে।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ওই একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক— তা সে আমার আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরও একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের পেটের ভিতরকার তুলনায় অ্যারপোর্টে আজব আজব তাজ্জব চিড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশি। পাসপোর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তোরাঁয় তাদের আচরণ কেউ-বা সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মাণ, কেউ-বা গড্ ড্যাম্ ডোন্টো কেয়ার ভাব— ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা, অ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্রা যামিনী কাটিয়ে আলুথালু-বেশ, হৃত-পাউডার-রুজ,— এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলেস্তরা পলেস্তরা ক্রিম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাঁট স্যাঁট করছেন; আর ওই সুদূরতম প্রান্তে দেখুন,— দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই— কালো বোরখাপরা জড়োসড়ো গণ্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজযাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধারেন না। বেশিরভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি— হ্যাঁ, বেনের পুটুলি। গরুর গাড়িতে বা গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই! অনায়াসে হালকা স্যুটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওঁদের কাছে গরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা— এঁদের মক্কা পৌঁছলেই হল। হায়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ— তা সে যে কোনও কোম্পানিই হোক না কেন— গরুর গাড়িতে মুসাফিরি করার তুলনায় ঢের বেশি তকলিফ দেয়। এমনকি প্লেনে এঁদের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কী হয় জানিনে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এঁরা সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনও প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যের জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে— মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সেকথা পরে হবে। তবে হজযাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তবে তার তথ্য জানিনে; কোনও কোম্পানি অপরাধ নেবেন না।

www.pathagar.com

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়ায়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরি শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্লেনের ভিতরে দেখবার কিচ্ছুটি নেই। থার্ডক্লাস ট্রেনে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সিটে দুটো লোকের ঘাড়। তারও সামনে সারি সারি ঘাড়। দোস্ত আমার এ প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইন্ডো সিটের ব্যবস্থা করেছেন— অর্থাৎ বাঁ দিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায়। বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি আল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেনে যাচ্ছেন, কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু-বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়। বিদেশি এবং প্রধানত ইউরোপীয়। তারা জানে, ইন্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং মাঝে মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটেতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ যেন জ্বরের ঘোরে দু দিন না তিন দিন কেটে গেল বোঝবার কোনও উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

ক্যাথলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটানদের ঈষৎ সংযত কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাট্টাই করতে হবে, "হ্যাঁ, তেমন কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, দেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বত্তিচেল্লি। ও! সেটা বুঝি মোনালিসার লিনিং টাওয়ার।"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেঞ্চে বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশে শুধাতে শুনেছি, "কিন্তু আশ্চর্য, এই ইন্ডিয়ানরা এসব তৈরি করল কী করে— ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ, আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তার কোনও নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপন করা গেল না। একখানা পত্রাঘাত, তদ্দরুন স্ট্যাম্প জোগাড় করতে না করতেই অ্যার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যেরকম গরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকাল। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবি নয়। মোটা পালটা ঠিক বয়স্ক গরুরই মতো লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া-চিংড়িরা যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মতো এখানেও খাঁটি-ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ— এন্তের পড়ে আছে— কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের বাজারকেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ-বা গেছেন বিনমাশুলের (ট্যাক্স ফ্রি) দোকানে। হয়তো ইতালির নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি ফ্রা বিকেশন ইতালিয়ান Automobile Turino— এই আদ্যক্ষর নিয়ে Fiat। টুরিনো সেই শহরের নাম যেখানে এ গাড়ি তৈরি হয়) গাড়ি কিনে

www.pathagar.com

নিয়ে আসেন! একটি হাফাহাফি, আধা-আধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে মার্কিন চিংড়ি ওই হোথা বহু দূরে বার-এ বসে চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুরৎ ইতালিয়ান চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুরৎ বলতেই হবে— এই রোম শহরে ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে যিনি নাম করেছেন সেই মাইকেল এঞ্জেলো যেন এই সদ্য একে গড়ে 'চরে খাওগে, বাছা' বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর ইতালিয়ান যুবক-যুবতীর প্রতি মার্কিনিংরেজের যে পীরিতি সেটা প্রায় বেহায়ামির শামিল। চরে খাবে না কেন? সর্বশেষে বলতে হয়, ইতালির কিয়ান্তি মদ্য দুনিয়ার কুল্লে সুধার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটাও পাওয়া যাচ্ছে ফ্রি, গ্রেটিস অ্যান্ড ফর নাথিং। মুফৎমে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়ালঘর। মশা খেদাবার তরে গাঁয়ের চাচার বাড়িতে যেরকম স্যাঁতসেঁতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেন্ট, ডিঅডরেনট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বি ও— বডি ওডার— গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ।

সকালবেলায় আলো দিব্য ফুটে উঠছে। ইতোমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনেরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায়; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা! কী করে হল? বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের শুধোন।

২

প্লেন যখন ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মনির বাঘা দার্শনিক কান্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা-আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটা! কী করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরি এবং অটোমেটিক। অবশ্য একথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশি সময় কোনও প্রকারের ঝাঁকুনি না খেলে মাঝেমধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাতভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দু দিনের তরে। আমার পাশের সিটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সিটে এক বর্ষীয়সী— বাচ্চাটার ঠাকুরমা-দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, 'মাদাম, বেজেছে কটা, প্লিজ?' মাদামের এলোমেলো চুল, সকালবেলার 'ওয়াশ', মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর ঊষার লালবাতি জ্বালান হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন,'পারদোঁ মসিয়ো, জ্ ন্ পার্ল পা লেদুঁস্থানি।' অর্থাৎ তিনি 'হিন্দুস্তানি' বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্তানি, হিন্দুস্তানে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ। অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্তানিতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়ে ছিলুম আমার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব 'বাঙাল' ইংরেজিতে। ওদিকে এ তত্ত্বও

www.pathagar.com

আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসিরা নটোরিয়াস, একভাষী— ফরাসি ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য তাবল্লোক যখন হদ্দমুদ্দ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক— ফরাসির মতো লাজুক জবান শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হরহামেশা খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপসে তারা যে কিচির-মিচির করে সেগুলো শেখার জন্য খামোকা উত্তম ফরাসি ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারও ঈষৎ ন্যাজ মোটা হল। দূর-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনা করতে পারতেন যে হিন্দুস্তানিও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে— মুসাফির যেরকম অ্যার ফ্রান্সে ফরাসি, কে এল এম-এ ডাচ, বি ও এ সি-তে ইংরেজির জন্য তৈরি থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসিতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ— আ—! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময় সমস্যাটি ভারি 'কঁপ্লিকে' অর্থাৎ কম্‌প্লিকেটেড, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনে।'

'তবু?'

'সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। ভোয়ালা— নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে— আমি সেখানে বাস করি— বিকেল পাঁচটা-ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্‌ৎর্‌ দ্য লেতেঁরিয়রকে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার 'ইন্টেরিয়ের' 'এতেরিয়র'-কে) শুধিয়ে। সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে লা-মার্সেইয়েজ সঙ্গীত (বাংলায় পেটে যখন হুলুধ্বনি) বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার "এঁতেরিয়রেতে" সে সঙ্গীত ক্রেসেন্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা-দুটো।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তা এখখুনি বোধহয় লাঞ্চ দেবে।'

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না কিন্তু দেখলুম, তিনি প্রাকটিক্যাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন এই মিত্রোপাত্রে (মিৎ = মিড্‌লা,— রোপ; ইউরোপে-র শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইউরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ প্লেনে উঠেছে, তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/ লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে হিসেবে তো আর কোম্পানি ঘড়ি ঘড়ি কাউকে লাঞ্চো কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কি না এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান।... তাই বলছি, এসব টাইম-ফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জর্নি দীর্ঘতর মনে হয় না? আমি তো প্যারিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। "বঁদিয়ো" (দয়ালু ঈশ্বর) ঘন্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছিয়ে দেবেন। নাতনিটা নেতিয়ে গিয়েছে।'

মহিলাটি যেভাবে সবিস্তার গুছিয়ে বললেন, সেটা ধোপে টেঁকে কি না বলতে পারব না, কারণ আমি যতবার এসেছি-গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখিনি কোনটা লাঞ্চ, কোনটা কী? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালঙ্কার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। রেডিও, ট্রান্সজিস্টারের কল্যাণে এখন

www.pathagar.com

বাড়ির খুকুমণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে বলে গ্রিনিচ মিন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান টাইম কোনটা কী। তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কীভাবে কসরৎ বিন মেহন্নৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসি মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্রাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কী? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীরভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্যরূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন 'নো দাইসেলফ্' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখ)'। শ-বছর আগে লালন ফকিরও বলেছেন 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।' ফরাসি মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন, আপন পেটটিকে বিশ্বাস কর। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইম জানা হয়ে যাবে। ওইটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে-মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়ানো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ-ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর জানিয়ে দেয় তার ক্ষিদে নেই।

ইতোমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কী যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, 'সেটা কলেবর'। আমি মনে মনে বললুম, 'বপু।' অ্যাব্বড়া বড়া ভাজা সসিজ, পর্বতপ্রমাণ ম্যাশট পটাটো, টোস্ট-মাখন, মার্মলেড টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরও যেন কী কী। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে, এটা লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা-দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী বলছে ন-টা!

৩

অজগাঁইয়া যেরকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লি মেলও তার ধেধ্ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ ইসটিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরও বেশি। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে দেশের কোনও জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য অ্যার-ইন্ডিয়ার মুরুব্বি আমার, একগাল হেসে আমায় বলেছিলেন, 'এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান। দু-চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিসে— হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—' সঙ্গে যে মিত্রটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দু জনারই বয়স এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, এখন কলকাতা-দিল্লির রাস্তাঘাটেই যা দেখতে পাওয়া যায় প্যারিসের নাইট ক্লাব-কাবারে তার চেয়ে বেশি আর কী ভেল্কিবাজি দেখাবে? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে 'নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?' তাই আখেরে স্থির হল আমি অ্যার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারল্যান্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎস্যুরিষ্) নামব। হেথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মৌকামে পৌঁছব— অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই।

ফরাসিনীকে বিস্তর বঁ ভোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচের অ্যার পোর্টে নেমে পাসপোর্ট দেখালুম। তার পর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাব। উত্তর শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

www.pathagar.com

'অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর ॥'

তখন বেজেছে সকাল ন-টা। রামপন্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বি-প্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রোগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরোতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। 'স্তম্ভিত' বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরি অ্যারপোর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে না। যাই হোক যাই থাক, আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা বোমার দুদ্দাড় বোম্-বাম। আর হবেই না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতসবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে 'বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্‌টুঙ' অর্থাৎ 'বেঙ্গল রোনানি'; এবং এ-দেশের ফরাসি অংশে বলে 'ফ্য দ্য বাঙাল' অর্থাৎ 'ফায়ার অব বেঙ্গল'।[১] তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ফরাসি ভাষায় বঙ্গদেশকে বাঙ্গাল রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার 'জন্মনি, জন্মনি' অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়ব কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারও হক্ক থাকে তবে সে আমার। হুহুঙ্কার ছাড়লুম :

'কী বললে? ঝাড়া দিনটি ঘণ্টা আমাকে এই অ্যারপোর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাজ্জিম মাজ্জিম করতে হবে? আমার দেশ যে ভারতবর্ষকে তোমরা অন্ডর ডিভালাপড কন্ট্রি— সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ— বল, সেখানেও তো তিন-তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ— আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনও ডাকগাড়িতে করে যে-কোনও জংশনে পৌঁছই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে— সেটাও সাতিশয় কালে-কস্মিনে— খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম— অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন!) অ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরও তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পৌঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অন্যত্র অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরও দু পয়সা হয়।... অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়সা কামাতে চাও না? আর শোন ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন-প্লেনের কাহিনী, গরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক কার্ট? সেই গরুর গাড়িতে করে

১. আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন : এদেশে গুড় তৈরি হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে 'রাম' মদ তৈরি হত বলে তার নাম গৌড়ী— মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে— যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীন দেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরি চিনির নাম হল মিসরি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে— আতশবাজির জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়— এবং সেটা ভুল।

www.pathagar.com

যদি আমি দশ-বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডে অন্য গরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরি। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈ-হুল্লোড় লাগায় তার সামনে আন্তর্জাতিক পাণ্ডা প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পাণ্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব *মহাভারত*— থুড়ি, পাঁচখানা *ইলিয়াড* দশখানা *ফাউস্ট্* লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেনটে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক-একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে— তোমরা যাকে বল, পেইংথ দি নোজ। রোক্কা ছ হাজার পাঁচশোটি টাকা। তার পর ফরেন এক্সচেঞ্জ গয়রহ হিসাবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মতো। এ ভূখণ্ডে থাকব মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসাব কর তো সে বসে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূল্যটা কী? সে না হয় গেল! কিন্তু সে সময়টা যে বন্ধুবান্ধবীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনও সন্তাপানল প্রজ্বলিত হচ্ছে না? তারা—'

ইতোমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রি এন্টারটেনমেন্ট। আমার সোক্রোতেসপারা কিংবা দ্রৌপদী যে রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়বনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশিরভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতিসহ প্রকাশ করছে। 'য়া য়া', 'উই উই', 'সি সি' যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডি-সমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি-একুশ বছরের কিশোরী, আমি যাকে কেছে মুছে ইস্ত্রি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউন্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, 'আপনার টেলিফোন।' তন্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তেলব্যাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের 'আমারে ডাক দিলে কে ভিতর পানে' গানটি জানে।

কিশোরী একগাল হেসে আমাকে শুধালে, 'আপনার জন্য কী করতে পারি স্যার?'

দুত্তোর ছাই। আধ-ফোঁটা এই চিংড়ির সঙ্গে লড়াই দেব আমি!

'নাথিং বাট্ ইয়োর লভ।' বলে দুমদুম করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

৪

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দু হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাস নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিতজনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শুধোলেন, 'ভু পেরমেতে, মসিয়ো'— অর্থাৎ 'আপনার অনুমতি আছে, স্যার?' 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দামাফিক

www.pathagar.com

বললেন, 'ন ভু দেরাঁজে পা, জ ভু প্রি।' এর বাংলা অনুবাদ ঠিক কী যে হবে, অতখানি ফরাসি জানিনে, বাঙলাও না। মোটামুটি 'না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।' উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায়, 'তকল্লুফ ন্ কিজিয়ে' ওই ধরনের কিছু একটা। 'তকল্লুফ' কথাটা 'তকলিফ' (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ 'কষ্ট'। মোদ্দা : 'আপনাকে কোনও কষ্ট দিতে চাইনে।'

সেই দুটো গ্লাস টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।'

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেনস ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া-শ্যালদাতে যার অভাব নেই। ভাবসাব (কনফিডেনস) জমিয়ে বলবে, 'দাদা, তা হলে আপনি টিকিটদুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই।' ...টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভোঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ লোকটা আমার নেবে কী? সুকুমার রায়(?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভুঁড়িওলা জমিদার টিঙ-টিঙে দারোয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন, 'চোর ভাগা কি'ও?' দারওয়ান বললে, 'মেরা এক হাতমে তলওয়ার, দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?'— আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কী করে?

আমার একপাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে অ্যার ইন্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগলদাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এস্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনও এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে ফেলবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এরকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইনডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি— জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে দ্যপোঁ। তার পর একগাল হেসে শুধোলেন, 'যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্‌টিঙে বিশেষজ্ঞ?'

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম, 'কস্‌টিঙ? সে আবার কী?'

ভদ্রলোক আরও থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সে কী মশাই! এইমাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এদেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কী পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরো-পাক্কা, করেক্‌ট্ টু দি লাস্‌ট্ সাঁতিম, ব্যালানস শিট। একেই তো বলে কস্‌টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ওই নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না? মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনিভা : আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনিভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেড-রুম, বাথ-রুম, ডাইনিং-রুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধুলুম একেই কি বলে 'সামান্য একটি বাড়ি?')— আমাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

আহারাদি, দু দণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তার পর আপনাকে আপনার মোকাম কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।' তার পর একটু ইতি-উতি করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি এ প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইন্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসি জানেন না। আর আমার বিবি খাসা রাঁধতে পারেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনিভার টিকিট পাবেন কী করে?'

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, 'সেই ফরমুলা, "ন ভু দেরাঁজে পা"— আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা-ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কী করে! কাচ্চাবাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—'

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি ও বাবদে চিন্তা করবেন না। অ্যার-ইন্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কড়ি ঢালতে হবে না (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু নাম দিয়েছেন বিশ্বম্বহ। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটরগাড়ি, অটোমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এস্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে 'স্বতশ্চল বিশ্বম্বহ মূল্য পত্রিকা' অনায়াসে বলা যেতে পারে)।'

একটু থেমে বললুম, 'আমি এখখুনি আসছি।' অর্থাৎ সেস্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। অ্যাটাচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এরকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ এ দুটো হারাব, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু গ্লাস কিনে ফিরে এলুম সোফায়! একটা গ্লাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, 'আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন অ্যারপোর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাব। আমি আপনার সঙ্গে জিনিভা গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।'

আর মনে মনে ভাবছি, ইহসংসারে, এমনকি ইউরোপেও সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা একা খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, 'কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!'

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, 'তা হলে দেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?'

তাঁর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, 'কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশি হবে।' আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম :

www.pathagar.com

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

হায়! ফেরার পথেও দ্যপোঁর বাড়িতে যেতে পারিনি।

৫

জুরিকের মতো বিরাট অ্যারপর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তা হলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপিঠে এলেম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, 'আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যার।' আমি সত্যই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, 'ভুল করেননি তো'; 'এজ্ঞে না। আমি জানি—' সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাক্কা রপ্ত করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো 'ভোম্বল' 'ক্যাবলা' জাতীয় আমার সেই বিদঘুটে ডাকনামটা সে পাঞ্চজন্যে শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশি জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন।

অ। ফ্রলাইন ফ্রিডি বাওমান্। কিন্তু ইনি জানলেন কী প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচচ্ছি। তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে অ্যার ইন্ডিয়ার ইয়াররা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোনও পরিচিতজন আছেন কি না, কেননা ওখানে আমাকে কনেকশনের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ওঁরা হয়তো অ্যারপোর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখানে থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে লুৎসের্ন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং তাঁর নামঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি' 'গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনো নারিকেল; দুই ভাণ্ড সরিষার তেল; আমসত্ত্ব আমচুর—' এর মাঝখান কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয়া-কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখিনি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত-সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজি রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/ এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ্ সিং রাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার ওপর আমি জোর দিচ্ছিনে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

www.pathagar.com

আসল কথা, ফতেহ্ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী— সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইংরেজি সবকটাই বড় সুন্দর জানতেন। এদেশে এসেছিলেন বেকারির জন্য নয়। রোমান্টিক হৃদয়; ইন্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপূজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যেস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কী করে তাঁর প্রিয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেন্ট ফ্রান্সসিস আসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্মবোধ করাতে তিনি এদেশের মরমীয়া সাধক, ইরান-আরব-ভারতের সুফিদের সঙ্গে এমনই হরিহরাত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খ্রিস্টানের, ভক্তের না সুফির?

কিন্তু আমার কী প্রগল্‌ভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি। 'দেশ' পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুক্ত ফাদার দ্যতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কুমারী ফ্রিডির কথা পুনরায় লিখব। কন্টিনেন্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎর্সেন শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম— সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (অ্যার ইন্ডিয়া মারফত) টেলেক্স্ পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের অ্যারপোর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুরিতে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ক-কল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের উপকারার্থে এস্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আমাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্ ব্রাহ্মণ। আপন দেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য খান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌন্ডের বদলে সুইস মুদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরেজি বোঝে না। ভুল বুঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ওই তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউন্টার পুণ্যভূমি— আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বুথ কাগজার্থযাশী নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ওই সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চলুন ফের ওই পুণ্যভূমিতে। আরও বহুবিধ ফাঁড়াগর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহা! কী আনন্দ!! কী আনন্দ!!!

"কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

www.pathagar.com

৬

ওইয়্-যা! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল! পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গব্বযন্তনা, আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎর্সেন পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুন লাইন কাট অফফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোনযন্ত্রের বাকসে সুইটজারল্যান্ডে প্রচলিত তিন-তিনটি ভাষা— ফরাসি, জর্মন এবং ইতালীয়— লেখা আছে কোন গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষলাভ হয়! জিমনাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিক্কড় সিঙ-এর মতো মাস্‌ল্ গজায়! প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়।... আমি ইতোমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মতো খেসারতি দিয়ে 'হ্যালো হ্যালো' করছি। আর, এ খেসারতির কোনও আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেইখানেই কি শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যান্ডে আসব, তখন দেখব, বাবুরা এ ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নতুন কোনও এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি 'সরলতর' করেছেন। 'সরলতর' না কচু! তাই যাঁরা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন, যাঁরা এই হয়তো পয়লাবারের মতো কন্টিনেন্ট যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার 'সরলতম' উপদেশ, বিন্‌গুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘ্যাঁটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরও কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে হন্তদন্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং!

যাক! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

'তুমি লুৎর্সেন কখন আসছ?'

'অপরাধ নিও না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তার পর হামবুর্গ ইত্যাদি। তার পর লন্ডন নটিংহাম। সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎর্সেন। তুমি খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।'

'দ্যৎ! কিন্তু তদ্দিনে এখানে যে বড্ড শীত জমে যাবে। গরম জামা-কাপড় এনেছ তো? মাখ্‌ট্ নিষ্‌ট্‌স্ (নেভার মাইন্ড— আসে-যায় না)। আমার কাছে আছে।'

'তুমি এখনও ফ্রানসিস আসিসিরই শিষ্যা রয়ে গিয়েছ— কী করে কাতর জনকে মদৎ করতে হয়, সে-ই তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরুব? সেকথা থাক। আমাকে অ্যারপোর্টে আরও তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রোববার। তোমাকে অফিস দফতর করতে হবে না।'

'রোববার! সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎর্সেন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার অ্যারপর্টে। রোববার বলে আজ ঢের কম সার্ভিস। সবকটা উঠতি-নাবতিতে টায় টায় কোথায় পাব কনেকশন—' আমি মনে মনে বললুম, 'হুঁঃ। ফের সেই কনেকশন। ইলামবাজার রামপুরহাট।' ফ্রিডি বললে, 'আচ্ছা দেখি'।

আমি বললুম, 'কতকাল তোমাকে দেখিনি।'

www.pathagar.com

ফ্রিডি যদি এখানে আসেই তবে তার বাস দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমতো সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্‌জেন্। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট জোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা জোগাড় করতে করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোনগামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্ট্যান্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যান্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কী হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, 'উৎসাহে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়' সেইটি পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, 'আমার কোনও চিঠি নেই? কী যে বলছ? ফের খুঁজে দেখ।' "উৎসাহে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দিপরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, 'স্যর! আমি কি একটু বাইরে ওই বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারি?'

'আপনি তো ট্রানজিট। না?'

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, 'বাস-এ করে লুৎর্সেন থেকে আমার একটি বান্ধবী— ' হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। 'বান্ধবী! বান্ধবী!! সেরতেন্‌মাঁ (সার্টনলি) চের্‌ৎমানতে (ইতালিয়ানে, সার্টনলি)' এবং তার পর জর্মনে 'জিষার জিষার' (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে যদি কূল না পায়, মার্কিন ভাষায় 'শিঁয়োর শিয়োঁ'।

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলত, 'নো'। যদি বলতুম আমার বিবি, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা, তখনও হত 'না'— হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী! আমার সাতখুন মাপ!

৭

কলোনের নাম কে না শুনেছে? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন— জর্মনের ক্যলনিশ ভাষায়— কলোনের জল ব্যবহার করেননি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারিনা' এই দুটিকেই সবচেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এদেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত-আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না— সর্বোপরি 'প্রাকপ্রাণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর, যে হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপরিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গডেসবের্গ-এর মুখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাখার সাবান, দাড়ি কামাবার সাবান, ক্রিম, পাউডার— বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস— রাখা হয়েছিল। হিটলারের আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ করেছিলেন কি না জানিনে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া, তাঁর এ অভিসার তাঁর দেশবাসী কী চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস

www.pathagar.com

যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতোমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে :

'ইফ এট ফার্স্ট ইউ কানট সাকসিড/ ফ্লাই ফ্লাই এগেন।'

বলা বাহুল্য চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গডেসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিচে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে যৌবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করত। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএন্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সেসব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবই-বা কেন? জর্মন ট্যুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ 'ব্রাহ্মণ-বিদায়' করত তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যেরকম যেখানেই যান না কেন, অ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে অ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচুড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী ঊর্ধ্বপানে দুবাহু বাড়ায়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুত্তিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ-দুই তুর্কি ও অন্যান্য মুসলমান ওই গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানান, 'এ বছর ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।' বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না— কিন্তু...? এ শহরের লোক খ্রিশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরিবের কড়ি দিয়ে এ গির্জা সাতশো বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনও ওদেরই পয়সাতে এ মন্দিরের তদারকি দেখভাল চলে। সে-ও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্তপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা : সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরি মালিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনও প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজের এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বেরোল না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন 'টাইম' কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তার পর সন্দ করে কোন পিচেশ!

কলোন অ্যারপোর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকেসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট দে ছুট,— সেই ঘরের দিকে যেখানে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু-পাঁচ দিনের ভিতরেই আমার বেওয়ারিশ

www.pathagar.com

জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু আমি কোন মোকামে আস্তানা গাড়ব, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কী করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে! কোনও এক গ্রিক দার্শনিক নাকি বলেছেন, 'একই নদীতে তুমি দু বার আঙুল ডোবাতে পারবে না, একই শিখায় দু বার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।' মানলুম। কিন্তু একই স্যুটকেস নিশ্চয়ই দু বার, দু বার কেন দু-শোবার হারাতে কোনও বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, 'তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণে ক্ষণে/ ও মোর ভালোবাসার ধন।' কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাকসের বেলাও খাটে?

আপিসঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে একটি ফুটফুটে মেমসাহেব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কী কী আছে?'

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করেছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইউরোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এবারে করেছে— নিখুঁততর। কোন বাকসে কী মাল রেখেছে কী করে জানব!

কিন্তু মিসি বাবা সদয়া। পীড়াপীড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতোমধ্যে বার বার বলছেন, 'অ্যার ইন্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুইস-অ্যার বলুন কোনও লাইনেই কোনও লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।'

আমি মনে মনে বললুম, 'বট্যে!' বেরোবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, 'গ্নেডিগেস ফ্রলাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?'

সুমধুর হাস্যসহ, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

আমি বললুম, 'তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন অ্যারপোর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।'

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই একলম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস-এ।

বাঁচলুম বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলামেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান তবু চলছে যেন রোলস রইস— রইস খানদানি গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে'— আমি গাইলুম, 'বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস-এর ছায়ে।'

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি! কখনও মেঘমায়ায়, কখনও আলোছায়ায়। দু দিকের গাছপালার উপর সে রশ্মি কভু-বা মেঘের ভিতর দিয়ে আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু-বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ওই হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি রেখে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে 'এক তালে যায় মিলি'। এদেশের নবান্ন হতে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রোববার। রাইনল্যান্ডের লোক বেশিরভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেতখামারে তেমন ভিড় নেই। আমিও মোকামে পৌঁছেতে পারলে বাঁচি। ইংরেজিতে প্রবাদ : 'এ সিনার হ্যাজ নো সনডে'। 'পাপীর রোববার নেই'। আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই।

www.pathagar.com

৮

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানে রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায়? তারা তো ক্লাইপে বা সুধালয়ে যায় না— সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সিটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, 'স্যর, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলেমেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করত, দড়ি নিয়ে নাচত— এমনকি ফুটবলও খেলত। ওরা সব গেল কোথায়?'

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি, বন্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।'

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, 'কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর তবে শুধাব, এটা কি সর্বাংশে ভালো? ফারসিতে একটি দোহা আছে :—

হর্ চে কুনি, ব্ খুদ্ কুনি
খা খুব্ কুনি, খা বদ্ কুনি ॥

যা করবে স্বয়ং করবে
ভালো করো কিংবা মন্দই করো ॥

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা, তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভভাবে খেলাধুলো করা কি অনেক বেশি কাম্য নয়?'

গুণী এবারে চিন্তা না করেই বললেন, 'নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তাই-বা বলি কী করে? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম! কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন— কটা বয়স্ক লোকই সে জিনিস করে?'

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরও অনেক তত্ত্বকথা জেনে নিই। বললুম, 'তা টেলিতে কি ভালো প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না?'

'তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ওই যন্ত্রটির পূজারি নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার-আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পরপর বলেছিলেন সেটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে), রাজনীতিকদের সঙ্গে ইন্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইতালি ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েতনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেন্টে হ্যার ভিলি ব্রান্ট ও হ্যার শেলের বক্তৃতা— এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ওই একই কেচ্ছা, একই অন্তহীন খাড়া বড়ি থোড় থোড় বড়ি খাড়া (তিনি জর্মনে বলেছিলেন 'একই ইতিহাস'— ডি জেলবে গেশিষ্‌টে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কী দেখেছিলেন— মনের ওপর কোনও দানা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমতো বই বেছে নিচ্ছেন।'

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জ্যামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার হিসাব আমি রাখিনি। অথচ এদেশে রিকশা, ঠ্যালা, গরুর গাড়ি এমন কোনও কিছুই নেই যেসব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্যি নিত্যি ট্রাফিক জ্যাম জমাতে কখনও স্বেচ্ছায় কখনও অনিচ্ছায়— বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওই দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জর্মনের একখানা মোটরগাড়ি চাই। জর্মন মাত্রই মোটরের পূজারি।'

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধহয় বন শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশি চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মতো মেরামত করে বানানো। আসল কথা কী জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে নতুন করে, প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মতো— হার্ট অব দি সিটি— আর জানেন তো, পুরনো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিষ্ ফান বেটোফেন—'

আমি বললুম, 'ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা কী আমি আজও জানিনে।'

হেসে বললেন, 'ওই তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ফ্ল্যামিশ। তখন তারা 'ভান' না 'ফান' উচ্চারণ করত কে জানে— অন্তত আমি জানিনে—'

আমি বললুম, 'থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।'

'সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।'

'এমনকি তাজমহলও না।'

দুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। এ কী? ও। মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন শহরে। এবং সবচেয়ে প্রাণাভিরাম নয়নানন্দদান দৃশ্য— যে পরিবারে উঠব তারই একটি জোয়ান ছেলে ডিটরিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মুখে তিনগাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

৯

লক্ষ্মী ছেলে ডিটরিষ্। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনও আপত্তি না শুনে বললে, 'আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নাও। ও তো তোমাকে চেনে না।' মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে— কয়েকদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় যে সিগারেট-মুখী 'মডার্ন মেয়ের' ছবি বেরিয়েছে

www.pathagar.com

তার ঠিক উল্টোটি। কোনও প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধহয় সেটা আবছা আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধালে, 'বন কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন চিনিনে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবের্গে।'

সর্বনাশ! এবং পাঠক সাবধান!

ক্যোনিষবের্গ শহরটি এখন বোধহয় পোলান্ডের অধীনে। ওইসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশিরভাগই সেসব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান! ও-সব বাবদে ওদের কিছু জিগ্যেস কর না।

তবে এ তত্ত্বও অতিশয় সত্য যে মোকা-মাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধ গতিতে সবকিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশির সামনে। যে দু দিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলেছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনও ঘোটালার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালুম চেপে গিয়ে বললুম, 'ও ক্যোনিষবের্গ!' যেখানে এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্‌ট্‌ জন্মেছিলেন! এবং শুনেছি তিনি নাকি ওই শহরের বারো না চোদ্দ মাইলের বাইরে কখনও বেরোননি। শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন।'... ইতোমধ্যে ডিটরিষ্‌ স্টিয়ারিঙে বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে, 'ভালোবাসতেন না কচু। আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।' আমি বললুম, 'সেকথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দিই। বদলেছে, বদলায়ওনি—'

'তুমি মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—'

আমি বললুম, 'থাক, বাবা, থাক। বাস-এ এক বৃদ্ধ বিষয়টির অবতারণা করতে না করতেই মোকামে পৌঁছে গেলাম। আর এ তাবৎ দেখেছিই-বা কী?'

বন শহরের নাম করলেই দেশি-বিদেশি সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ করে। কারণ তাঁর দ্বিশতজন্মশতবার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ। এ শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদের বিরাটতম চত্বরে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন ম্যুনসটার গির্জার পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেন সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শুধু তাঁর সঙ্গীতে নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সর্বত্রই তাঁর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁর ঐকান্তিক আত্ম-নিবেদন বার বার স্বপ্রকাশ।

সেখান থেকে কয়েকটি মিনিটের রাস্তা— ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়ির ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউজিয়াম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত অনেক কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিয়ানাতে তল্‌স্‌তয়ের— বৃহত্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শো বছর পরের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণে যদ্যপি সেটা তলস্তয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।...

কিন্তু সেখানে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফোনের কানের চোঙাগুলো। বত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আরম্ভ করলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শুনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ওইসব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন

www.pathagar.com

বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগল। তাতে করে তাঁর কোনও লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনও সহচর বলতেন, 'বাহ্! কী মধুর সুরেলা বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি', আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তন্মুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকত যে সঙ্গীতে এখনও তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যেরকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, "যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকত, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তা হলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেত।" এবং সকলেই জানেন, বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণা করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পাননি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মতো তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শুনে যেতে পান। তার পর তিনি সধন্যান্তকরণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ডিটরিষ্ শুধাল, 'মামা, কথা কইছ না যে!'

বললুম, 'আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনও কাজে লেগেছিল?'

ডিটরিষ্ বললে, 'বলা শক্ত। কোনও কোনও আধাকালা একখানা কাগজের টুকরো দু পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশিরভাগটা মুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ওই কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পৌঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ-বা সামনের দু পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কী ফল হয় না হয় কে বলবে?... আচ্ছা মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে!'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, ওই যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লিজেল— দেখেছ, ঝড়তি পড়তি কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা নেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কী রকম সরেস স্যালাড তৈরি করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!... আর তোর-আমার যত আনাড়িকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মুরগি দিলেও আমরা যা রাঁধব সেটা তুইও খেতে পারবিনি, আমিও না। পিসি লিজেল কী বলবে, জানিনে। অথচ জানিস, ওই অদ্ভুত মুরগিটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসিরা বলে রাগু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস, অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুরগিটাতে আমরা যেসব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে অ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক আ মরি আ মরি বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।... প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে একরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। "একতারা" তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দু দিকে দুটি ফ্লেকসিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনও জোর কখনও হালকা চাপ দিয়ে, আর মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নটা নোট বের করা যায়। তবেই দ্যাখ্। বেটোফেনের মতো কটা লোক পৃথিবীতে আসে— আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের

www.pathagar.com

দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলা-জগতে আমরা এখন সাহারাতে। এবং—'

ডিটরিষ্ বললে, 'তুমি আমাদের পার্লামেন্ট হাউসটা দেখবে না। রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু-পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পৌঁছতুম।'

'দ্যাখ ডিটরিষ্, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক, পেসট্রি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—'

ডিটরিষের বউ বললে, 'মামা, শুধু কেক পেসট্রি বললেন। ওদিকে পিসি কী কী বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? ক্যানিঙসবের্গের ক্লপসে (ক্যানিঙসবের্গ শহরের একরকম কোফ্‌তা), ফ্রাঙ্কফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের শুরুয়া—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে তো জানি। কিন্তু লিজেল পিসি আমার জন্যে কি ক্যাঙারু ন্যাজের শুরুয়া তৈরি করেছে?'

দু জনাই তাজ্জব। আমি বললুম, 'ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতরে থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা? তার চেয়ে ক্যাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশি। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।'

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামল।

'এটা কী রে? মনে হয়, গোটা আষ্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে।' বললুম আমি।

ডিটরিষ্ বললে, 'এটাই আমাদের পার্লামেন্ট।'

১০

যাকে বলে মর্ডান আর্ট, পিকাস্‌সো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ সেই পদ্ধতিটি জর্মনরা কখনও খুব পছন্দ করেনি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম, যাঁকে এখনও মার্কিনিংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম— পলায়ন মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট-সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা— কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তা হলে আর্টিস্টের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই! সে তার আপন সুখ-দুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না! সে তা হলে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো।

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জর্মন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুত য়োখিম

www.pathagar.com

বেসার বলেছেন, জর্মন মাত্রই উপরের দিকে তাকায়; রাজা কী হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যান্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল 'মর্ডান আর্টের' যুগ। যেন কাইজারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেরিমেন্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ফুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে পুরবে)। আমি ওই সময়ে জর্মনিতে ছিলুম। মর্ডানদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একলম্ফে পুনরপি বেরিয়ে এসেছিলুম। একদা যেরকম কোনও এক জু-তে বোকা পাঁঠার খাঁচার সামনে থেকে বিদ্যুৎগতিতে পলায়ন করেছিলুম। বোটকা গন্ধে।

তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডাস্টবিন খুঁজলে কি আর খান দুই লুচি, একটা আলুর চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কী দায় পড়েছে!

এর পর ১৯৩৩-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাৎ দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপুরুষের মতো হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতই করত।... অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল, হিটলার-কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বারবার বলে যেতে লাগলেন, 'আর্ট হবে সমাজের দাস, অর্থাৎ নাৎসিদের দাস। সূর্যনিম্নে এই পৃথ্বীতলে তারা যে ন্যায়সম্মত আসন খুঁজছে, তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।'

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না, তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁরা মর্ডান ছবি আঁকত তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনও প্রকারেরই কোনও কিছু করেননি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হাওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের ওপর নির্যাতন। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল— কারণ এগুলো নাৎসি সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূর থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাইনি। পাছে প্রভুরা আমার রঙ দেখে, আমাকে ইহুদি ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি মঙ্গোলিয়ান। খাটো, বেঁটে, হ্রস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তার সাধনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনরা উঠেপড়ে লেগেছেন 'মর্ডান' হতে। চোদ্দতলা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা কয় না।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেন্ট।

ডিটরিষ্কে বললুম, 'জানো, ভাগিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হুশ হুশ করে আকাশপানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেকট এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন।... খেলা শেষ হল। তখন কেন জানিনে তিনি তাঁর দেশলাই আর খুঁজে

www.pathagar.com

পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দরদি কণ্ঠে বলল, 'দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেকট মশয়ের মডেলটি তোমরা কেউ গাপ মেরো না। ওই দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশতলার বিলডিং হাঁকাচ্ছেন! ওটা গায়েব হলে ওঁয়ার রুটি মারা যাবে যে'।'

ডিটরিষ্ বললে, 'জানো মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সিরিয়স। সর্বক্ষণ গুমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মতো আসন নিয়ে শুধু আত্মচিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে একথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়, ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মর্ডান আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ওই একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজমসহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভদ্রলোক কি তোমার মতো লেখেন-টেখেন— লিতেরাত্যোর?'

আমি বললুম, 'তওবা, তওবা! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশিদিন কাজ করেননি। ওইসব দার্শনিক সিনিক রসিকতা তিনি সর্বজন-সমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়— কী বল? কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য করলেন।'

ডিটরিষ্ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সবসময়ই জুৎমাফিক উত্তর দিতে পারে।

সে বললে, 'আমার অবস্থাও তাই। যে অফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশি হই; ওরাও খুশি হয়।'

১১

ওই তো সামনে গোডেস্‌বের্গ। ডিটরিষ্ শুধালে, 'মামু, পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশি ভালোবাস? কেন বল তো?'

আমি মুচকি হেসে কইলুম, 'যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার প্রথম প্রণয় হয়েছিল বলে?'

ডি। 'ধ্যত! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ করেছি, লিজেল পিসির ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হালকা জিনিস পড়ত। কিন্তু ছোট পিসি ওসবের ধার ধারত না। সে যেত প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন শহরে— সেখানে সে চাকরি করত—'

আমি। 'সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আম্মো ওই সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন যেতুম। আমরা আর সবাই দু-তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে উঠতুম। আর লিজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে 'তাচ্ছিলি' করে এক লাফে উঠত ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে-বাঁয়ে-সমুখ পানে তাকিয়ে বলত, 'গুটেন মরগেন' 'সুপ্রভাত'। ওর লম্ফ মেরে ওঠার কৌশল দেখে আমি মনে

www.pathagar.com

মনে বলতুম, 'একদম 'টম্ বয়'!' ওর উচিত ছিল, মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'— গুরুদেবের ভাষায়।

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদে শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ওই আটটা পনেরোর ট্রামে থাকত পনেরো আনা কাচ্চাবাচ্চা। স্কুলে যাচ্ছে বন শহরে। এরা সবাই জানত যে লিজেল পিসির, অবশ্য তখনও তিনি 'পিসি' খেতাব পাননি, কাছে আছে লেবেনচুস, দু-একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুইংগাম, মাঝেমধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলত অন্তত বার তিনেক 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত—'। তার পর সবাই তার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াত। সবাই বলত— 'প্লিজ প্লিজ, এজ্ঞে এজ্ঞে, এই এখানে বসুন।'

আমি বললুম, 'বুঝলি ডিটরিষ্, তোর পিসি লিজেল ছিল আমাদের হিরোইন অব দ্য প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস, ও কখনও প্রেম-ফ্রেমের ধার ধারত না। আমি দু-একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে— ওই অল্প বয়সেই বেশ দু পয়সা কামাত বলে। তখনকার দিনে ছিল— এখনও নিশ্চয়ই আছে— একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট— ভিতরে কন্যাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে— ওহ্! কী বলব— মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস, হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল একদম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ওই যে কন্যাক— তোরা যাকে বলিস ব্র্যানটভাইন, ইংরেজিতে ব্রান্ডি, নাড়িভুঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দিত, যাচ্ছেন কোনও মহারাজ।... আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলব, লিজেল ছিল বড্ডই লিবরেল। তাই যদিও নাৎসিরা তখনও ক্ষমতা পায়নি কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে— পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করত না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ইংরেজ যে ইতোমধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাত। পিসিও সেটা জানত। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলত, 'ও কথা থাক না।' ওরকম দরদি মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।'

হঠাৎ লক্ষ করলুম, ভাগিনা ডিটরিষ্ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধালুম, 'কী হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?'

কেমন যেন বিষণ্ন কণ্ঠে ভেজা-ভেজা গলায় বললে, 'মামা, তুমি বোধহয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কী করে।'

ডিটরিষের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুদ্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মতো কিছু ছিল না। বললুম, 'আমি তো জানিনে, ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কীরকম যেন ভারী ভারী শোনাচ্ছে—'

'তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি, পিসি দু জনাই নাৎসিদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসিপরিবারের কেউই নাৎসি ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সক্কলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসিকে— কট্টর নাৎসিকে। কেন করলেন জানিনে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাব। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—'

www.pathagar.com

বাধা দিয়ে বললুম, 'সে তো তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।'

'থ্যাঙ্কউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—'

'ভাগিনা, কিছু মনে কর না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণহৃদয় শান্তস্বভাব ধরতেন— তোর দুই মাসিই সেকথা আমাকে বারবার বলেছে। কিন্তু, আবার বলছি, কিছু মনে কর না, তা হলে তিনি নাৎসিদের কনসানট্রেশন ক্যাম্প সয়ে নিলেন কী করে?'

ডিটরিষ্ চুপ মেরে গেল। কোনও উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এরকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয়নি। বললুম, 'ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনও জবাব চাইনে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

ডিটরিষ্ বললে, 'না, মামু। তুমি যা ভেবেছ তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করত কী করে? এবং আরও লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিনিংরেজ রুশ-ফরাসি ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসিদের প্রশ্ন করেছে, "তোমরা কি জানতে না যে হিটলারের কনসানট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে খুন করেছে?" উত্তরে সবাই গাঁইগুঁই করেছে। সোজা উত্তর কেউই দেয়নি। জানো তো, যুদ্ধের সময় কত সেনসর কত কড়াকড়ি। কে জানবে, কী হচ্ছে, না হচ্ছে। আমার মনে হয়, আবার বলছি জানিনে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁছেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মনির সর্বাধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুবার লেখা আছে, "ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তার হক্কো কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসিদের মতো কলচরড জাত হত তবে আমরা এ নিয়ে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কলচরের কী বোঝে!" ওদের না আছে মাইকেল এঞ্জেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেক্সপিয়ার। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—' হঠাৎ বললে, 'ওই তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি॥'

১২

'ভু, হালুঙ্কে'

সোল্লাসে হুহুঙ্কারে রব ছাড়ল শ্রীমতী লিজেল। 'তুই গুণ্ডা—'

আমরা যেরকম কোনও দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'গুণ্ডা' বলে থাকি 'হালুঙ্কে' তাই। শব্দটা চেক ভাষাতে জর্মনে প্রবেশ লাভ করেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লিজেল এইভাবেই আমাকে 'অভ্যর্থনা' জানিয়েছে।

তার পর আমাকে জাবড়ে ধরে দু গালে দুটো চুমো খেল।

ডিটরিষ্ মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি, লিজেল ছিল ন-সিকে 'টম-বয়', এবং দু-একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। তবে এটা হল কী প্রকারে? শুচিবায়ুগ্রস্ত পদি পিসিরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি

আর 'টমবয়ত্ব' আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানাল।

আমি মনে মনে বললুম চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছর ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতোমধ্যে ডিটরিষ্ আমতা আমতা করে বললে, 'আমরা তা হলে আসি। রাত্রের পার্টিতে দেখা হবে।' ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তার গলা দিয়ে নাবাতে পারেনি— হজম করা তো দূরের কথা।

লিজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চলল। আমি বললুম, 'এ কী আদিখ্যেতা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদুপরি ওই বিরাট ড্রইংরুম! বাপ্‌স্! তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারি দূরবিনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাক-হরকরা, নিদেন একটি ট্রাঙ্ক-কল-ফোন ব্যবস্থা, আর—'

লিজেল সেই প্রাচীন দিনের মতো বললে, 'চোক্‌কোর চোক্‌কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশি বকর বকর করিস।'

গতি পরিবর্তন হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাস উনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁকা। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরি করা হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লিজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লিজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, 'এটায় বস।'

সত্যি বলছি, আমার চোখে জল এল। কী করে লিজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে (তিনি গত হয়েছে, বছর আটত্রিশেক হবে) তার পিতা আমাকে ওই চেয়ারটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানালা দিয়ে, ওই চেয়ারটার থেকে দূর-দূরান্তরের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বয়ং ওই চেয়ারটিতে বসে আপন ক্ষেত-খামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেলবাগানের দিকে নজর রাখতেন (মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যেরকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেতখামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারব না— যারা ঘোরাঘুরি করছে, তারা তাঁর আপন 'মুনিষ' না ভিন-জন আমি ঠাহর করব কী প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সে দিকে আমার কোনও চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ওই শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে— যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়— তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, 'তোমরা ইন্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনও কলকারখানা হয়নি। তোমরা এখনও আছো প্রকৃতির শিশু। শিশু কি মায়ের

www.pathagar.com

সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়— সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ওইরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেত-খামার করে খাদ্যরস আহারাদি সংগ্রহ কর। তোমরা এখন কী করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কী বোঝায়? সেটা শুরু হয় যখন মানুষ কলকারখানার গোলাম হয়ে যায়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—'

আমি বললুম, 'মানছি, কিন্তু দেখুন, গ্রিস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতে বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?'

ওইসব কথাবার্তা যেন ওই চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লিজেল আমার মাথায় মারল একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

'কী খাবে বলছিলে?'

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, 'আমি তো কিছুই বলিনি।'

'তবে চল, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি— অর্থাৎ পি সুপ (কলাইশুঁটির সুপ)— এবারে বল তুমি কী খাবে? তুমি যা খেতে চাও তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রিম আছে।'

আমি বললুম, 'দিদি, সুপ ছাড়া আমার অন্য কোনও জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জর্নিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।... তবে কি না আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই যদি একটা কিছু—'

বেচারি লিজেল।

শুকনো মুখে বললে, 'রাইনে তো আজকাল আর সে-মাছ নেই।'

আমি শুধালাম, 'কেন?'

বললে, 'রাইন নদে জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশি বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ওই নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যেসব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।'

আমি বললুম, 'তা হলে থাক।'

১৩

বিনু যখন সোয়ামির সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে, 'আহা, ওরা কেমন সুখে আছে।' আমরাও ভাবি ইংরেজ ফরাসি জর্মন জাত কীরকম সুখে আছে। কিন্তু ওদেরও দুঃখ আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দুঃখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসত্ত্বেও ওদের দুঃখ আছে।

লিজেলদের বাড়ি প্রায় দুশো বছরের পুরনো। সে আমলে স্টিল-সিমেন্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরি। দুশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে খাড়া রাখা যায় কী প্রকারে!

www.pathagar.com

আমি জিগ্যেস করলুম, 'লিজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?'

লিজেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'শুধু ছাদ নয়, দেয়ালগুলো ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশি) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনও ভাইও নেই। ক্ষেত-খামার দেখবে কে? আপেলবাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেব। ওরা সব পুরনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল এক্কেবারে খাঁটি রাইনল্যান্ডের।

আমি বললুম, 'এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোল না কেন?'

লিজেল বললে, 'যে টাকাটা কখনও শোধ করতে পারব না সে-টাকা ধার করব কী করে!'

আমার মনে গভীর দুঃখ হল। বাড়িটা সত্যিই ভারি সুন্দর। শুধু বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরিতরকারির ব্যবস্থা, কুয়ো, হ্যান্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা— গ্রামাঞ্চলে উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত-খামার গেছে যাক। ওদের আপেলবাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সে-ও গেছে যাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতোমধ্যে লিজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ও-ই একমাত্র যার বিয়ে হয়েছিল। যে ডিটরিষ্ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বন-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু-মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। বরটি ছিল খাসা ছোকরা— কিন্তু...

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসি ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদিরা প্রভু খ্রিস্টকে হয়তো ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, হয়তো করেনি। যাই হোক, যাই থাক— তাই বলে দীর্ঘ সুদীর্ঘ সেই ঘটনার দু-হাজার বছর পর এদের দোকানপাট, ভজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকবি হাইনরিষ হাইনের কবিতাও বাদ যায়নি), ইহুদি ডাক্তার, উকিল প্র্যাকটিস করতে পারবে না— এটা ওরা গ্রহণ করতে পারেনি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনও কনসানট্রেশন ক্যাম্প আরম্ভ হয়নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। চিঠি-চাপাটির[১] গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ ছিল না যে, লিজেলদের পরিবার এ প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শুধু যে ঘৃণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।... এসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জর্মনি যাই, তখন লিজেল আমাকে বলেছিল, 'ডু হালুঙ্কে, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই মুফেনডার্ফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জর্মনির ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমার প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা-দুটো ইহুদি পরিবার ছিল। দিদি সময়মতো ওদেরকে সুইটজারল্যান্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

১. আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, 'সিপাহি বিদ্রোহের' সময় চাপাটি-রুটির মারফত 'বিদ্রোহী'রা একে অন্যকে খবর পাঠাত বলে 'চিঠিচাপাটি' সমাসটি নির্মিত হয়। কোনও এবং কিংবা একাধিক বিদ্বজ্জন যদি এ বিষয়ে 'দেশ', পত্রিকায় সবিস্তর আলোচনা করেন তবে এ অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসরি লিখবেন না। এটা পাঞ্চজন্য। আমি ছাড়াও পাঁচজনের উপকারার্থে।

www.pathagar.com

এবারে আরম্ভ হবে ট্র্যাজেডি।

মারিয়ানা বড় সরলা। এসব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাত না। অবশ্য সে-ও ছিল আর দুই দিদির মতো পরদুঃখ-কাতর।

বিয়ে করে বসল এক প্রচণ্ড পাঁড় নাৎসিকে। কেন করল, এ মূর্খকে শুধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ নিগূঢ় তত্ত্ব দেবতারাও আবিষ্কার করতে পারেননি।

তার পর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

এইবারে মার্কিন-ইংরেজদের কৃপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসি-বৈরীরা। এরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসিদের। তখন আরম্ভ হল তাদের ওপর নির্যাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারদে নির্জন কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশ দিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেয় আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসল গারদে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল— সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সন্ধানে বেরুবেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার দরদি বন্ধু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে— অবশ্য যদি তাদের দু-পয়সা থাকে।... এটা কিছু নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে 'মহামান্য' টেগার্ট সাহেবের আমলে—

'বারে বারে সহস্র বার হয়েছে এই খেলা।
দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা ৷৷')

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা। বেরিয়ে এসে ছ-মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না, আমি নাৎসি-বৈরীদের দোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে :—

এদেশের লোক সবাই কৃশ্চান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খ্রিস্ট আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি, মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খ্রিস্টত্ব, তার মনুষ্যত্ব।

১৪

হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে।

কৈশোরে অবশ্য আমরা বলতুম, হিপ্‌স্ হিপ্‌স্ হুর্‌রে।

পুরোপাক্কা ক্রেডিট নিশ্চয়ই অ্যারইন্ডিয়া কোম্পানির।... দীর্ঘ হাওয়াই মুসাফিরির পর অঘোরে ঘুমিয়েছিলুম সকাল আটটা অবধি। নিচে নামতেই লিজেল চেঁচিয়ে বললে, 'ডু হালুঙ্কে! তোর হারানো সুটকেস ফিরে পাওয়া গিয়েছে।'

www.pathagar.com

'কী করে জানলি?'

'আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গডেসবের্গের যে বাড়িতে তুই বাস করতিস তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের 'হারানো প্রাপ্তির' দফতরে সুবুদ্ধিমানের মতো দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য! সে নম্বর তুই পুত-পুত করে এত বৎসর ধরে পুষে রেখেছিলি কী করে আর সেটা যে কলোনের সেই 'হারানো প্রাপ্তি' দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরও বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলেম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎদেশে টাইম বম রাখতে হয় (আমরা বাঙলায় বলি 'পেটে বোমা না মারলে কথা বেরোয় না'), ফিউজের হিসহিস শুনে তবে তোর বুদ্ধি খোলে। সে-কথা থাক। কলোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আব তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যান্ডলেডির মেয়ে 'আনা' সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিস। তাছাড়া যাবি আর কোন চুলোয়। আনা-র বিয়ে হয়েছে এক যুগ আগে। ভাতার আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিস। ফের বলছি সেকথা থাক। আনা কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বচ্ছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।'

লিজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনও মন্তব্য না করে বললে, 'সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে, তোর সুটকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ। আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর কলোনে? আধ-খানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি ক দিনের তরে! তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেরে দিয়েছে জুরিক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—'

লিজেল বাধা দিয়ে বললে, 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মূর্খ ঠাউরেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোর প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি ব্যত্যয়। অবশ্য আমি কখনও বলিনে, একসেপশন প্রুভজ দি রুল। আমি বলি, রুল প্রুভজ দি একসেপশন। তোর সুটকেস তারাই এখানে পৌঁছে দেবে।'

ওহ্! কী আনন্দ, কী আনন্দ। কাল রাত্রে ভয়ে ভয়ে আমি আমার হারিয়ে না-যাওয়া সুটকেসটি খুলিনি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের জন্য ছোটখাটো যেসব সওগাত এনেছি সেগুলো ওই বড় সুটকেসটিতে নেই! এটাকেই নাকি বিদেশি ভাষায় বলে অসট্রিচ মনোবৃত্তি।

ইতোমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়ল। লিজেল সেথায় গিয়ে কী যেন কথাবার্তা কইল। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া সুটকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, 'তোদের অ্যার-কোম্পানি তো বেশ স্মার্ট : কম্পিটেন্ট্। এত তড়িঘড়ি হুলিয়া ছেড়ে, বাক্সটাকে ঠিক ঠিক পকড় করে তোর কাছে পৌঁছে দিল!' আমার ছাতি—সুশীল পাঠক, ইঞ্চি ছয়— মাফ করবেন আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেন্টিমিটার মিলিমিটারে বলতে হয়— অর্থাৎ ১৫ মিলিমিটার (কিংবা সেন্টিমিটারও হতে পারে— আমার প্রিন্স্ অব্

www.pathagar.com

ওয়েলস অর্থাৎ বড় বাবাজি যে ইসকেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হদিস মেলে না) ফুলে উঠল।

বাক্সোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র যেসব বস্তু খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল তার সবই রয়েছে। (১) বারোখানা মুর্শিদাবাদি রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যায় মোষের শিঙে তৈরি ছটি হাতি, (৩) পূর্ববৎ ওই দেশেরই তৈরি পিঠ চুলকানোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বান্ডিল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লিজেল পরিবারের জন্য নয়; এগুলো আমার অন্য বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরম মশলা এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম স্কার্ফ (তাঁর শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দিই), (৭) তিনটি ফার্স্টক্লাস বেনারসি রেশমের টাই, কাশ্মিরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মতো এগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই-পৌন্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববৎ ওজনে দার্জিলিঙের চা।... এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে— তাঁর এক বিশেষ পূজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যান্ডে। আর কী কী ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুন্দোও ছিল। এই ইউরোপীয়ানদের বড্ডই দেমাক, তাদের মাস্টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমার উদ্দেশ্য ছিল, এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাঙলা দেশের কাসুন্দো এ-লাইনে অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরি ওদের মাস্টার্ড দু দিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুন্দো? মাসের পর মাস নির্বিকার ব্রহ্মের মতো অপরিবর্তনশীল।

লিজেলকে বললুম, 'দিদি, এসব জিনিস ওই বড় টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখ। আর খবর দে ডিটরিষ্ ও তার বউকে। মারিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।'

লিজেল বললে, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখান থেকে তুই যাবি ড্যুসলডর্ফে— সেখানে তোর বন্ধু পাউল আর তার বউ রয়েছে। তার পর যাবি হামবুর্গে; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে রয়েছেন। তার পর যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে রয়েছেন তোর ফার্স্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাত বিলিয়ে দিস তবে ওরা পাবে কী?'

একেই বঙ্গভাষায় বলে, পাকা গৃহিণী। কোন গয়না কে পাবে জানে ॥

১৫

গডেসবের্গ সত্যই বড় সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বার বার আহ্বান করেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারও সঙ্গে দেখা হলে, সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও, আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, 'গুটেন টাহ্'। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট গেরস্ত-বাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিয়েছে। যদি কোনও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রায়ই বাড়ির কর্তা কিংবা গিন্নি কিংবা তাদের ছেলেমেয়েদের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, 'আপনিও আমাদেরই একজন; কিছু ফুলটুল চাই? বলুন না, কোনগুলো পছন্দ হয়েছে।' তার পর একগাল হেসে হয়তো বলবে,

www.pathagar.com

'প্রেমে পড়েছেন নাকি? তা হলে লাল ফুল। হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি? তা হলে সাদা ফুল।' আমি একবার শুধিয়েছিলুম, 'আর যদি আমার প্রিয়ায় সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তা হলে কী ফুল পাঠাব?' যাঁকে শুধিয়েছিলুম তিনি দু গাল হেসে বলেছিলেন, 'সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রঙ।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সবুজ ফুল তো এদেশে দেখিনি কখনও। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।' 'ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনও প্রয়োজন নেই— ও মশাই—'

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা!

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাত্মার পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখে মুখে যে আনন্দ তার থেকে মনে হল তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুবমিনার কিংবা উভয়ই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাঙ্কে শ্যোন্, ডাঙ্কে রেষ্ট্ শ্যোন্' বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতোমধ্যে বাড়ির দরজা খুলে গেল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, 'ওগো, তোমার কফি—'

হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'চলুন না। এক পাত্র কফি— হেঁ হেঁ—'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনার গৃহিণী—?'

'না, না, না,— আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খাণ্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনও দেখেনি। চলুন চলুন।'

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, 'আপনাকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারিনি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কী?'

'এজ্ঞে আমি জানতুম, আপনি ইন্ডিয়ান। আর ইন্ডিয়ানরা সব ফিলসফার। তারা যত্রতত্র যার-তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে যেতেন রাইন নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি—। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায়?'

আমি বললুম, 'ব্রাদার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড্ডই খুশি হতুম।'

ইতোমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের টেবিলে রাখলেন। তাঁর গালদুটো আরও লাল হয়ে গিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ পাড়ায় কোনও কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টার্ট নিয়ে এসেছেন।

এস্থলে যে কোনও ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইত। বলত, 'এ সবের কী প্রয়োজন ছিল?' কিন্তু আমি চাইনি। আমাকে বেয়াদব, মূর্খ, যা খুশি বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তাঁর কপালটি মুছে দিলুম।

www.pathagar.com

১৬

হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফ্‌টুঙ্‌

ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে মানুষ আশকথা পাশকথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দুষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথে না যায় তবে অচেনা ফুলের, নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কী প্রকারে? কবিগুরুও বলেছেন,

'যে পথিক পথের ভুলে
এল মোর প্রাণের কূলে—'

অর্থাৎ প্রণয় পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে-মধ্যে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সহৃদয় পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আলেকজান্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌টের নাম কে না শুনেছে? নেপোলিয়ন গ্যোটে শিলারের সমসাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ওই সময়ে পাশ্চাত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুম্‌বল্‌টের সুখ্যাতি। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটক— ওদিকে কাব্য, দর্শন, অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ লেখাটি আরম্ভও করিনি।

হুম্‌বল্‌ট্‌ গত হন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। যেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ককেশাস সাইবেরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সযত্নবান ছিলেন তাই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনের জর্মন পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ওই দেশের জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান— এন্‌ডাওমেন্ট দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ওয়াকফ্‌, যা খুশি বলতে পারেন— নির্মাণ করল : নাম আলেকজান্ডার ফন্‌ হুম্‌বল্‌ট্‌ স্টিফ্‌টুঙ্‌। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশি ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জর্মনিতে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জর্মনির ওই দুর্দিনে (ইনফ্লেশন সবে শেষ হয়েছে; তার খোঁয়ারি তখনও কাটেনি) সে কী করে এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করল? আমরা বলি 'আপনি পায় না খেতে—'। অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াদাক্ষিণ্য আর্থিক সচ্ছলতার ওপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি ভিখিরিকে একটা কানাকড়ি দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুষ্মান ভিখিরি এক অন্ধ ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু-চার আনা থেকে দু-পয়সা দিতে। আমার এক চেলা এদানীং আমাকে জানাল গঙ্গাস্বরূপা ইন্দিরাজিও নাকি বলছেন, গরিবই গরিবকে মদত দেয়।

সে আমলে ইন্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ— আজ অনেক বেশি পায়।* সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।** ইনি সর্বজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি। সেকথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।..

গোডেসবের্গ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা হরফে লেখা,

---

* দয়া করে আমাকে প্রশ্ন শুধিয়ে চিঠি লিখবেন না, কী কৌশলে এ স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

** দয়া করে 'গোখেল' উচ্চারণ করবেন না।

www.pathagar.com

আলেকজান্ডার ফন
হুম্‌বল্‌ট স্টিফ্‌টুঙ্

আমারে তখন আর পায় কে? লম্বা লম্বা পা ফেলে তদ্দণ্ডেই সে বাড়িতে উঠলুম।

আমি অবশ্যই আশা করিনি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার লোক এ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভদ্রলোক। অতিশয় ভদ্রভাবে শুধোলেন,

'আপনি কোন সালে হুম্‌বল্‌ট্ বৃত্তি পেয়েছিলেন?'

'১৯২৯।'

ভদ্রলোক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লম্ফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও তাজ্জব বনে গিয়ে বললুম, 'কী হল?'

'কী! চল্লিশ বছর পূর্বে!'

'এজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মাইন গট্ (মাই গড্), এত প্রাচীন দিনের কোনও স্কলারশিপ-হোল্ডারকে আমি তো কখনও দেখিনি!'

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললুম, 'ব্রাদার, ইহ-সংসারে তুমিও অনেক কিছু দেখনি, আম্মো দেখিনি। তুমি কি আপন পিঠ কখনও দেখেছ? তাই কি সেটা নেই?'

যেহেতু আমি এ বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তারা ইতোমধ্যে চেক-আপ করে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলারশিপ পেয়ে এ দেশে এসেছিলুম।

হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'অ— অ— অ— । জানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ-হোল্ডার?'

আমি সবিনয় বললুম, 'তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় জাদুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেনখামের মমির পাশে কিংবা রানি নফ্রেটাট্রির পাশে আমাকে শুইয়ে দাও।'

১৭

সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়ির এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কী করে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায় না। বিশ্বময় সঠিক বলতে পারব না, তবে বোধ হয় চীন এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনও অপাঙ্‌ক্তেয়। গণ্ডায় গণ্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পরও হুম্‌বল্‌ট্ ওয়াক্‌ফের হাতে বেশকিছু টাকা বেঁচে যায়।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জব্বর পরব করে। তিন দিন ধরে। জর্মনিতে যে শত শত হুম্‌বল্‌ট্ স্কলার ছড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের সব্বাইকে তিন দিনের তরে বাড্ গডেসবের্গে নেমন্তন্ন জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চাবাচ্চাসহ;— বলা বাহুল্য ওই উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেনভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিন দিন ধরে

www.pathagar.com

নানাবিধ মিটিং পরব নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটরগাড়ি— এক কথায় সব— সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যেরকম জমিদারবাড়িতে বিয়ের সময় দশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনফুস্ স্টিফ্টুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'আপনার তুলনায় জর্মনিতে উপস্থিত যেসব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—'

আমি বললুম, 'আমার হেঁটোর বয়স।'

পাপেনফুস্ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেননি। সব দেশের ইডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরি হয় না। আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর বললুম, 'আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্যুস্ল্‌ডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট— এবং সর্বশেষে স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগাঁয়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলারশিপের মতো তিনিও চল্লিশ বছরের পুরনো— প্লাস তাঁর বয়স।'

লক্ষ করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি 'সভাস্থলে' উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে :

(১) এ তো বড় আশ্চর্য। ষাট বছর বয়সের প্রাচীনা প্রিয়ার অভিসারে যাচ্ছে এই নাগর।

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধন্যি মানতে হয়।

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ)।

ইতোমধ্যে কর্তা বললেন, 'সে কী কথা। আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পারে না। আপনার ভাষায়ই বলি, আপনার মতো "মিউজিয়ম পিস" আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে পারব না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনাদের অনেকেই ভাবেন, আমাদের আলেকজান্ডার ফন্ হুম্‌বল্ট্ স্টিফ্টুঙ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করে সেই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে— অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জর্মনি যখন তছনছ হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান দেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি দোষ দিইনে— সব জর্মনই তো ঐতিহাসিক মসজেন হয় না। অতএব চল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন বৃত্তিধারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হুজুরদের পেত্যয় যাবে—'

আমি মনে মনে বললুম, 'ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যেরকম পেডেস্টালের উপর গ্রিক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সেরকম নয় তো। তা করুক, কিন্তু জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুল্লে একখানা ডুমুরপাতা পরিয়ে দিলেই তো চিত্তির—'

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, 'আপনি পরবের সময় কন্টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব। এখানে হোটেলের ব্যবস্থা, যানবাহন সবই তো আমরা করে থাকি। তার পর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেয়ার করতে পারবেন না?... আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে।'

www.pathagar.com

বড্ডই নেমকহারামি হয়। তদুপরি এরা আমাকে দুই যুগ পরে আবার নেমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান, যে জর্মন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নেমক দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কী প্রকারে?

আমি সকৃতজ্ঞ পরিপূর্ণ সম্মতি জানালুম।

রেস্তোরাঁটি সাদামাঠা, নিরিবিলি ছোটখাটো ঘরোয়া। ব্যান্ডবাদ্যি, জ্যাজ্ ম্যুজিক, খাপসুরৎ তরুণীদের ঝামেলা কোনও উৎপাতই নেই। বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না যে এ রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। তার অন্যতম প্রধান কারণ 'মেনু' (খাদ্যনির্ঘণ্ট) দেখেই আমার চক্ষুস্থির। ত্বরিতেই হিসাব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাঞ্চ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগবার কথা। আমাদের হিসাবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট! অবশ্য গচ্চাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যক্তি অর্ডার দিল সে-ই পেমেন্ট করবে— যে খেল তার কোনও দায় নেই।

কিন্তু এস্থলে সেটা তো কোনও কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'কী খাবেন, বলুন।' আমি কি তখন তাদের ঘাড় মটকাব!

আমি শুধোলুম, 'আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাঞ্চ খেতে আসেন?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী খান; মানে, কোন কোন পদ।'

'সুপ, মাংস আর পুডিং। কখনও-বা আইসক্রিম— তবে সেটা বেশিরভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝেমধ্যে শীতকালেও!'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'শীতকালে আইসক্রিম!'

তখন আমার মনে পড়ল, আমরাও তো দারুণ গরমের দিনে গরমোতর চা খাই। তবে এরাই-বা শীতকালে আইসক্রিম খাবে না কেন?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাঞ্চ অর্ডার দিলাম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার গলা মটকাতে নেই।

১৮

আহারাদির কেচ্ছা শুরু হলেই আমি যে বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই আমার সম্বন্ধে সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে, তার সাফাই এখন বেবাক তামাদি— ইংরেজি আইনের ভাষায় 'টাইম-বার' না কী যেন বলে— হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক 'ধর্মাবতারের' সমুখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি— 'আমি দোষী, অপরাধ করেছি।'

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জনৈক জেল-সুপারিনটেনডেন্ট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে 'জাত-ক্রিমিনাল' হয় না। হুঁ! আমি

www.pathagar.com

যে জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি এসব দায়িত্বহীন 'বাক্যবিন্যাস' করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্চের বর্ণনা পুনরায় দেব।

সুপ আমি বড্ড বেশি একটা ভালোবাসিনে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নুড়ি নই। ডাচেস অব উইন্ডসর (উচ্চারণ নাকি 'উইনজার') অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন। তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুনুরি। ভোজনটি কী প্রকারে 'কমপোজ' করতে হবে— এ তত্ত্বটি তিনি খুব ভালো করে জানেন।

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙালি মাত্রই ভাবি, ভোজনে যত বেশি পদ দেওয়া হয় ততই তার খানদানিত্ব বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের চচ্চড়ি, তিন রকমের মাছ, দু-তিন রকমের মাংস, চিনি-পাতা দই আর কত হরেক রকমের মিষ্টি তার হিসাব না-ই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য! কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায় না। অতএব বেগুনভাজা মেগনোলিয়ার আইসক্রিমের মতো হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের মতো, গরম লুচি কুকুরের জিভের মতো চ্যাপটা, লম্বা— খেতে গেলে রবারের মতো। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড রাইস। চীনারা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব বলে 'ফ্রাইড লাইস'— অর্থাৎ 'ভাজা উকুন'! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকড়ি মাত্র আপত্তি নেই। শুনেছি, মহাকবি শেক্সপিয়ার বলেছেন, 'গোলাপে যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে।' তাই 'ফ্রাইড রাইস' বলুন বা 'ফ্রাইড লাইস'ই বলুন— সোওয়াদটি উত্তম হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চেঙ্গিস হতে রাজি আছি) নেটিভ পাচক দিয়ে 'ফ্রাইড লাইস' নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, যে মহামূল্য সম্পদ জিহ্বাগ্র স্পর্শ করার পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু 'উকুন ভাজা'। আলবৎ আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি, 'উকুন ভাজা' আমি এই কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান মেহেরবানির পূর্বে কখনও খাইনি। তাই গোড়াতেই বলেছি, আমরা মেনু কম্পোজ করতে জানিনে।

তা সে থাক, তা সে যাক। পরনিন্দা মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দিই। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাঞ্চ-ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনও সুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য: 'এই যে বাবুরা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছে গ্যালন গ্যালন ককটেল, হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। সক্কলেরই পেট তরল বস্তুতে টইটম্বুর— ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত : এর পরও যদি হুজুররা তরল দ্রব্য সুপ পেটে ঢোকান তবে, তার পর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কী প্রকারে? তাই তাঁর ডিনারে 'নো সুপ!' অবশ্য ডাচেস সহৃদয়া মহিলা। কাজেই যাঁরা নিতান্তই সুপাসক্ত তাঁদের জন্য সুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু-চার চামচ সুপ গলাতে ঢালেন।

www.pathagar.com

অতএব আমাকেও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুম্‌বলট্‌ স্টিফ্‌টুঙ প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিৎ সুপ সেবন করতে হল।

বাহ্‌! উত্তম সুপ! ব্যাপারটা তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যেসব দেশের কলোনি নেই— বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইন্দোনেশিয়ার— তারা গরম মশলা পাবে কোত্থেকে? কেনার জন্য অত রেস্ত কোথায়? শত শত বৎসর ধরে তাদের ছোঁকছোঁকানি শুধু গোলমরিচের জন্য। শুনেছি, ভাস্কো দা গামা ওই গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্লেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, কলমবসও নাকি ওই একই মতলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন— অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন। এর পর ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লঙ্কা আবিষ্কার করল, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ না। যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরামানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দীর্ঘতর করব না।

ইতোমধ্যে জর্মনির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শুধু কালা মরিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়— এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে 'কারি পাউডার' আর লবঙ্গ, এলাচি, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কন্টিনেন্টের কুত্রাপি কাঁচা সবুজ ধনেপাতা দেখিনি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কন্টিনেন্টের কুবের সন্তানরা ধনে-পাতা-লঙ্কা-তেঁতুল-তেলের চাটনির সোয়াদটা বুঝে যাবেন, সেদিন হবে আমাদের সর্বনাশ। হাওয়াই জাহাজের কল্যাণে কুল্লে ধনে-পাতা হিল্লি-দিল্লি হয়ে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এটা তো এমন কিছু নয়া অভিজ্ঞতা নয়। ভারত বাংলাদেশের বহু জায়গাতেই আজ আপনি আর চিংড়িমাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উদরে না এসে সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ কন্টিনেন্টে— সেখানে চিংড়িমাছ কেন, সর্ব ভারতীয় যুবকই যেতে চায়) প্রস্থান করেন। একমাত্র কোলাব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোনও দুঃখ নেই। যাক, যত খুশি যাক। এটা ফরাসিদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। তবে কি না বাঙালোর থেকে তারস্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন, পাইকিরি হিসেবে এভাবে কোলাব্যাঙ বিদেশে রফতানি করার ফলে ওই অঞ্চলে মশার উৎপাত দুর্দান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ ওই কোলাব্যাঙরাই মশার ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্নসৃষ্টি করত।

এটা অবশ্যই সমস্যা— দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কী? আমার তো একটা মশারি আছে।

১৯

'গুর‌্মে' ভোজনরসিকরা বলেন, 'সুইটজারল্যান্ডের জর্মনভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপোলিয়ন না কে যেন বলেছেন— 'ইংরেজ এ নেশন অব্‌ শপকিপার‌্জ্‌ (অবশ্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে 'সাকি' নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সুরসিক ইংরেজ লেখক বলেন, 'আমরা এখন এ নেশন অব্‌ শপ্‌লিফ্‌টার‌্জ্‌' অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে

www.pathagar.com

চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করাতে ওস্তাদ) এবং 'সুইসরা এ নেশন অব হোটেলকিপারস'। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইউরোপে সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে কিন্তু প্রশ্ন : তোমার হোটেল-রেস্তোরাঁ যতই সাফসুৎরো রাখো না কেন তোমার রেস্তরাঁর সুপে ব্লন্ড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র— সুইটজারল্যান্ডে নয়, অন্য এক নোংরা দেশের হোটেলে— একদিন ম্যানেজারকে শুধোলেন, 'আপনার রান্নাঘরে তিনটি পাচিকা আছেন, না? একজনের চুল ব্লন্ড, অন্যজনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কী?' ম্যানেজার তো থ। এই ভদ্রলোকই কি তবে শার্লস হোমসের বড় ভাই মাইক্রফট হোমস? সবিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শুধাল, 'স্যার, আপনি জানলেন কী করে? আপনি তো আমাদের রসুইখানায় কখনও পদার্পণ করেননি!' বন্ধু বললেন, 'সুপে কোনও দিন ব্লন্ড, কখনও-বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই— কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশি। এ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তো দেকার্ত-কান্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি ওই কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আর পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যেরকম টাইট সাদা টুপি পরা থাকে ওইরকম কোনও একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দুর্দান্ত খুসকি'— পাঠক অপরাধ নেবেন না, এ কেচ্ছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না। সুদ্দুমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে সে দেশে আসবে এ-ও কি কখনও সম্ভবে? আমার সোনার দেশ পূবপচ্ছিমওতর বাঙলায় সুপ তৈরি হয় না। অতএব প্লাটিনাম ব্লন্ড, সাদামাটা ব্লন্ড, চেসনাট ব্রাউন, মোলায়েম ব্রাউন, কালো মিশকালো কোনও রঙের কোনও চুলের কথাই ওঠে না। 'মোটেই মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।' কিংবা বলতে পারেন, হাওয়ার গোড়ায় রশি বাঁধার মতো।') তাই বলে কি মার্কিন-সুইস টুরিস্ট এদেশে আসে না?

'বিজনেস ইজ বিজনেস'— তাই সুইস এ পর্যন্ত তাদের রান্নাতে প্রাচ্যদেশীয় মশলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

আমার কাছে একখানা সুইস সাপ্তাহিক আসে। তার কলেবর প্রায় ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ল্যাটে এলে আমরা ঠাট্টা করে বলতুম, 'কী বেরাদর, কেপ অব গুড হোপ হয়ে এলে নাকি?'— সুয়েজ কানাল যখন রয়েছে। এখন কিন্তু এটা আর মস্করা নয়। অ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাটপৃষ্ঠা বপুধারী পত্রিকা তো আর অ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খর্চা যা পড়বে সেটা সাপ্তাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দিতে বলে— 'লড়কে সে লড়কার গু ভারী'— বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশি।

সেই পত্রিকার একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ আছে। কেউ শুধাল, 'মাংস আলু তরকারিসহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দ্য রেজিসতাঁস) খাওয়ার পর যেটুকু তলানি সস্ (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাত্তাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাউরুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে, কাঁটা দিয়ে সেগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে চেটেপুটে খাওয়াটা কি প্রতোকোলসম্মত— এটিকেট মাফিক, বেয়াদবি 'অভদ্রস্থতা' নয় তো?'

উত্তর : 'পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে, ওই সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ

www.pathagar.com

উত্তরদাতা কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগত, কিংবা গরিব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত— এঁটো প্লেটের তলানি সস্ তো পরবর্তী ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরিব-দুঃখীকেও বিলোনো যায় না— লেখক)।' তার পর তিনি বলেছেন, 'কিন্তু আপনি যদি নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।' তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নমত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদব-কায়দা যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন : 'কোহিনূর প্রস্তর কোন ভাষার শব্দ?'

উত্তর : 'ফারসি।'

(সম্পূর্ণ ভুল নয়। 'কোহ্' = পাহাড়— ফারসিতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহিস্তান রয়েছে (আমার সখা আব্দুর রহমান ওই কোহিস্তানের লোক)। কিন্তু কোহ্-ই-নূরের 'নূর' শব্দটি 'ন' সিকে আরবি। খাঁটি ফারসিতে যদি বলতেই হয় তবে 'নূর'-এর বদলে 'রওশন' বা 'রোশনি' [বাঙলায় 'রোশনাই'] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ্-ই-রওশন্। শুদ্ধ আরবিতে বলতে হলে 'জবলুন্ (পাহাড়) নূর।'... কিন্তু এ রকম বর্ণসঙ্কর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। 'দিল্লীশ্বর' ইত্যাদি।)

প্রশ্ন : 'আমার বয়স বত্রিশ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সতেরো বছরের ভেরি ডিয়ার ক্লাসফ্রেন্ড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কী?'

উত্তর : 'আপনি ওকে সঙ্গোপনে নিয়ে গিয়ে বলুন, "তুমি তোমার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম কর। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোনও অভাব নেই।" কিন্তু আমার মনে হয়, ছেলেটার বোধহয় মাদার কমপ্লেক্স্ আছে— অতি অল্প বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সন্ধানে আছে।' তার পর আরও নানা প্রকারের হাবিজাবি ছিল।

এ উত্তর যে কোনও গোগর্দভ দিতে পারত।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

কয়েক মাস পূর্বে— মনে হল— একটি প্রাচীনপন্থি মহিলা— প্রশ্ন শুধালেন : 'আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমনকি মেয়েরাও বড্ড বেশি মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের "মাই লর্ড" রেস্তোরাঁওয়ালারা কী জঘন্য ঝাল, মাস্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো— লেখক), আর মা মেরিই জানেন কী সব বিদকুটে বিদকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্তোরাঁয় যেতুম। এক চামচ সুপ মুখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগল। আমার কপালে, সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগল। মনে হল, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঢেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করল সেটা দেখে আমার কাছেরই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শুধাল— "মাদাম, আমি বহু দেশ-বিদেশ দেখেছি— যেখানে টিয়ার গ্যাস ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যান্ডে তো কখনও দেখিনি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরোয় এটা তো তা নয়"।'

www.pathagar.com

২০

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরুল : 'এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?'

সেই 'সবজান্তা' উত্তরিলা :

'মাত্রা মেনে খেলে কোনও আপত্তি নেই, কোনও বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।' (মরে যাই! এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদি পিসি, স্কুলবয় সবাই দিতে পারে!—লেখক) তার পর সবজান্তা বলছেন— 'ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহার-রুচি বৃদ্ধি করে। তদুপরি আরেকটা গুরুত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ এটা খাব না ওটা ছোঁব না এরকম পুতুপুতু করে আপনার ভোজনযন্ত্রটিকে ন'সিকে মোলায়েম করে তোলেন, (ইংরেজিতে একেই বলে 'মলিকড্‌ল্' করেন) তবে কী হবে? আপনি যতই চেষ্টা দিন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরি মশলা বিবর্জিত রান্নামাত্রই খাব তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া গর্দিশ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনও রেস্তোরাঁতে একবেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নিমন্ত্রিত হলেন। শক্তসমত্ত জোয়ান আপনি। কী করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন? ওদিকে রেস্তোরাঁ বলুন, ইয়ার-বখশির বাড়িই বলুন সর্বত্রই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরমমশলার মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাত। অতএব'— আমাদের সবজান্তা বলছেন, 'কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ার অভ্যাসটা করে ফেলাই ভালো।'

কিন্তু মশলা পুরাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে। ইতোমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন :—

যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
তবু মনে রেখ।

কিন্তু এ আশা রাখেননি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মৃদুমন্থনে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাসস্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে মেয়েটি বসেছিল সে জ্বল জ্বল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাইনি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসাব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্ল্যাঁশেত মারফত ঈশ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই যবনভূমিতে নামাতে হবে।

অবশ্য লক্ষ করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, 'মেয়েটি'। কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমনকি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কী যায়-আসে! বিদগ্ধ পাঠকের অতি

www.pathagar.com

অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যেমশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল[১] চাটুয্যেমশাই প্রেমের কীই-বা জানেন। মুখে আর যে কটা দাঁত যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা : ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস!

প্রেম হয় হৃদয়ে।... একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যোটে, আনাতোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর যারা ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও দু-একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই-বা এমনকি ব্রহ্মহত্যা করেছি যে হুট করে প্রেমে পড়ব না।

বললে পেত্যয় যাবেন না, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন 'আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নিপরিচয় গেল লেখি।'

সে চেঁচাল 'হ্যার সায়েড!'

একসঙ্গে আমি চেঁচালুম 'লটে।'

তার পর চরম নির্লজ্জার মতো সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হন্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, আমার দেশের মরালিটি-রক্ষিণী বিধবা পদিপিসি এতক্ষণে এক বাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করে 'ছ্যা ছ্যা' বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছিনে। এস্থলে আম্মো তাই করতুম— যদি না নাটকের হেরোইন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম 'সালর্ট') হত। বাকিটা খুলে কই। ওর বয়স যখন নয়-দশ, আমার বয়স ছাব্বিশ, আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরতম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকত দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আরও গোটা পাঁচেক মেয়ে— তাদের বাড়ির পরে। কারওরই বয়স বারো-তেরোর বেশি নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট,
আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সবকটা মেয়ে এ তথ্যটা জানত এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে-হিংসে ভাব পোষণ করত। ওদের আশ্চর্য বোধ হত, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন কিছু গুলে-বাকাওলি নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই 'প্রেমে মজে যাব।' এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। 'প্রেমে মজার' কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কী জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মতো মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মতো। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়ত। আর লটে ছিল আমার বোনদের মতো সত্যই বড় লাজুক। সক্কলের সামনে নিজের থেকে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলত না।

---

১. বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

www.pathagar.com

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একচিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা-দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জান না। আমিও অপরাধ নেব না। আমরা যে আইএফএ শিলডে লড়াই দেবার জন্য সে-আমলে ভারতবর্ষে আসিনি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা : অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না এবং দোসরা : আমাদের 'কাইজার টিমে' পুরো এগারো জন মেম্বার ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আটো জন। তৃতীয়ত যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবি নেবুর মতো। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান কক্খনও প্যাটার্ন-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং, ডাকিঙের সুযোগ পাননি।

হায়, হায়। এ জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে করেই কেটে যায়।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয়।

চল্লিশ বছর পর পুনরায়, এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন। লটে হঠাৎ শুধুলো, 'হ্যার সায়েড! তুমি বিয়ে করেছ?'

শুনেছি, ইহুদিরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া না হলে কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়। আমি শুধলুম, 'তুই?'

খল খল করে হেসে উঠল।

'কেন? আমার আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং, বিয়ের আংটি দুটোই এখনও তোমার চোখে পড়েনি। আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়েছি। চল আমাদের বাড়ি।'

আমি সাক্ষাৎ যমদর্শনের ন্যায় ভীতচকিত সন্ত্রাসগত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, 'সে যদি আমায় ঠ্যাঙায়।'

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নির্মল মৃদু হাসি এঁকে নিয়ে বললে, 'বটে! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়কে সে প্যাঁদাবে! তা হলে সেই হালুঙ্কেটাকে আমি ডিভোর্স করব না।'

তওবা, তওবা!

২১

লটে ছেলেবেলায় কথা কইত কমই। এখন দেখি মুখে খই ফুটছে, তবে সেই বাল্য বয়সের শান্ত ভাবটি যায়নি। আমি বললুম, চল না 'কাফে স্নাইডারে'। এক পট কফি আর আপফেল টার্ট (এপল টার্ট)— পঞ্চাশ বছরের কোনও মহিলা যদি বাসস্ট্যান্ডের পেভমেন্টে বসে হঠাৎ হাততালি দেয় তবে সবাই একটু বাঁকা নয়নে তাকায়। লটে বেপরোয়া। হাততালি দিয়ে উল্লাসভরে বললে, 'তুমি ডিয়ার, সেই প্রাচীন দিনের ডিয়ারই রয়ে গেছ। কাফে স্নাইডার অতি উৎকৃষ্ট আপফেল টার্ট বানাতো সে তোমার এখনও মনে আছে।'

আমি বললুম, 'সোওয়াদটি এখনও জিভে লেগে আছে... অবশ্য তোমাকে যদি নিতান্তই ট্রাম ধরতে হয় তবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মুফেনডর্ফ—'

'মুফ্রিকা বল। ওই অজ পাড়াগাঁটা এমনই প্রোহিস্টরিষ (প্রাগৈতিহাসিক) যে আমরা ওটাকে আফ্রিকার সঙ্গে এক কাতারে ফেলে মুফ্রিকা নাম দিয়েছিলুম— ভুলে গেছ?'

www.pathagar.com

আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমি এখনও নিজেলকে মুফ্রিকানরিন (মুফ্রিকাবাসিনী) ডাকি। সে আমায় ডাকে "হালুঙ্কে" (গুণ্ডা)— তুমি যেরকম এইমাত্র ওই নামে তোমার বেটার-না-ওয়ার্স ৫০%-কে রেফার করলে। তুমিও আমার মতো অপরিবর্তনশীল।'

লটে বিষণ্ন কণ্ঠে বললে, 'উপায় কী বল। এই ধর না, কাফে স্নাইডারের আপফেল টার্ট। ওটা কেন এত মধুর হত জানো। ওটা বানাতো সম্পর্কে আমার এক মাসি। আর তোমার মনে আছে কি আমার ঠাকুদ্দার বাবা যখন একশো বছর বয়সে পা দিলেন তখন মা পরবের দিন আপফেল টার্ট বানিয়েছিল,— মাসির চেয়েও ভালো। কার বুদ্ধিতে জান? থাক! আমি বড্ড লাজুক ছিলুম; তাই তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি তো খাও চড়ুইপাখির হাফ রেশন। তাই তুমি যখন পুরো দু পিস খেলে তখন আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল। ওমা! তার পর সবাই চলে যাওয়ার পর বাড়ির লোক আমাকে যা খ্যাপাল। এস্তেক ঠাকুদ্দার বাবা। ওঁর কথা তখন জড়িয়ে যেত। জন্মদিনের বিশেষ সিগারে দম দিয়ে তাঁর খাস প্যারা ছেলেকে— বয়স তখন তাঁর সত্তর— বললেন, 'আমাদের লটে বাঁচলে হয়। তবে হ্যাঁ, আমার ঠাকুমা লটের চেয়েও মর্ডান ছিলেন। ন বছর বয়সে প্রথম প্রেম করেন। সে হল গে ১৭৫০ কিংবা তারই কাছে-পিঠে। এবং জানো, সেই দজ্জাল ছুঁড়ি আখেরে সেই ছোকরাকেই বিয়ে করে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'দ্যৎ! ন-দশ বছরে আবার প্রেম! তবে কি না, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ নাকি ওই বয়সেই ভাব-ভালোবাসা করেছিলেন।'

'আখেরে ঠাকুরমার ঠাকুরমার মতো ওই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন?'

আমি বললুম, 'না। উনি বিবাহিত ছিলেন।'

'তাঁর বয়স কত ছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে বেশ কিছুটা সিনিয়র ছিলেন। আমাদের কাব্যে আছে :—

'নিশাকাল, এ যে ভীরু, তুমি রাধে
লয়ে যাও ঘরে
হেন নন্দাদেশ পেয়ে চলে পথে
যমুনার কূলে
শ্রীরাধামাধব কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে
রস কেলি করে।'

অপিচ শ্রীরাধার নানা বর্ণনার মধ্যে একটি বর্ণনা আমার মনের গভীরে উজ্জ্বল হীরকের মতো চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। আমাদের দেশের কাব্য নাট্যাদি আরম্ভ করার পূর্বে লেখক-নাট্যকার সরস্বতী বা ঈশ্বরের কোনও অবতারের বন্দনা তথা এবং পাঠক-দর্শক মণ্ডলীর মঙ্গল কামনা করেন। এখন হয়েছে কী, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে বড্ড দামাল ছেলে ছিলেন। প্রায়ই মায়ের তৈরি ননী—'

'সে আবার কী?' আমার মস্তকে অনুপ্রেরণা এল। প্রিয়াকে প্রীত করার জন্য আমার মতো গণ্ডমূর্খের প্রতিও কন্দর্প সদয় হন। অবশ্য হৃদয়ে ওই অত্যাবশ্যকীয় প্রেমরসটি থাকা চাই-ই। তাই হাফিজ গেয়েছেন,

www.pathagar.com

নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন ॥
প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মতো ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে ॥

বললুম, 'এই যে তোকে কাফে স্নাইডারে নিয়ে যাবার জন্য এতক্ষণ ধরে ঝুলোঝুলি করছি, সেখানে আপফেল টার্টের উপর যে হুইপট ক্রিম বিছিয়ে দেয় অনেকটা সেই বস্তু।'

সঙ্গে সঙ্গে লটে উঠে দাঁড়াল। 'চল।'

আমি বললুম, 'তুমি না কোথায় যেন যাচ্ছিলে?'

উত্তরে লটে যা বললে হিন্দিতে সেটা ভালো, 'মারো গোলি (গুলি)। গোল কর্ যাও।' 'চুলোয় যাকগে' বড্ড রূঢ়।

লটে বললে, 'রাধার বয়ঃসন্ধিক্ষণ না কী যেন বলছিলে?'

আমার বাধো বাধো ঠেকছিল। যদিও তার বয়স এখন পঞ্চাশ তবু ক্ষণে ক্ষণে তার ঠোঁটের কোণের লাজুক হাসি, কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকানো এসব যেন তাকে চল্লিশ বছরে উজিয়ে নিয়ে দশ বছরের ছোট্ট পরিবর্তিত মেয়েটিকে করে তুলছিল। তবু দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম। বললুম, 'সেই শ্রীকৃষ্ণ পাঠক দর্শককে আশীর্বাদ করুন যিনি ছিলেন ননীচোরা। ধরা পড়ার পর নন্দপত্নী মাতা যশোদা যখন তাঁকে শুধালেন, 'তুমি কতখানি ননী চুরি করেছ?' তখন তিনি শ্রীরাধার স্তনযুগল দেখিয়ে বললেন, 'ওই অতটুকু'— সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বজনকে আশীর্বাদ করুন।'

বলা শেষ হতে না হতেই কেমন যেন লজ্জা পেলুম। অবশ্য মোদ্দা কথাটি এই ওইটুকু আট বছরের বাচ্চা আর কতখানি ননী খেতে পারে। অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীর তখন উঠতি বয়স মাত্র।

লটে আমার লজ্জারক্ত ভাব দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, "হায়, হায়, হায়; হাস আমাদের হ্যার ডক্টর। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তুমি মেয়েছেলের মতো যেরকম লাজুক ছিলে এখনও তাই আছ। ইতোমধ্যে কত কী হয়ে গেল, মায় একটা বিশ্বযুদ্ধ। এখনও তোমার চোখে পড়েনি, ছেলেমেয়ে পাশাপাশি ভিড়ে ভর্তি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন অন্যজনের কোমরে হাত দিয়ে— মেয়েটা ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে— নাচের সময় আমরা যে পজিশন নিই— ঘাড় বাঁকিয়ে একে অন্যকে চুমো খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে— ধীর পদে। তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। রাস্তার লোক নির্বিকার, পুলিশও তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছে। আমার কুড়ি বছর বয়সে নির্জন বনের ভেতরও হেরমান যখন আমাকে আদর করত আমার আড়ষ্টতা তখনও কাটত না। রাস্তায় চলতে চলতে চুম্বন— এ টেকনিক আমি আর কখনওই রপ্ত করতে পারব না।... চল্লিশ বছর! কত পরিবর্তন হয়েছে— বাইরে ভিতরে— এবং তোমার-আমার লিজেল 'আনার' পক্ষে সে পরিবর্তন যে কী নিদারুণ ট্র্যাজেডি সেটা বুঝতে তোমার বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। তুমি কাফে স্নাইডার স্নাইডার করছিলে। আমি তোমাকে নিরাশ করতে চাইনি, ও কাফে কতকাল উঠে গিয়েছে। ওখানে এখন পঁচিশ গজি লম্বা একটা মার্কিন বার। বারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হলে ট্যাক্সি ভাড়া নেয় মার্কিনরা। সেই শান্ত সুন্দর বাড়িটি; ভিতরে বসে শোনা যেত মাসি যে ঘরে টার্ট বানাত সেখান থেকে আসছে আধমুঠো পরিমাণ ক্ষুদে ক্যানারিপাখির কাঁপা কাঁপা

www.pathagar.com

হুইস্‌ল্‌, আর আসছে বেকিং-এর কেকের মৃদু গন্ধ, আরও সর্বোপরি, ভেসে আসে, মাসির রুমালের ল্যাভেন্ডার গন্ধ।

সেকথা থাক। অন্য একটা মধুর চিন্তা আমার মাথায়— হৃদয়েও বলতে পার ভিনাস্ টিলার প্রজাপতির মতো— সর্বক্ষণ ঘুর ঘুর করছে যদিও আমি কথা বলছি, তোমার কথাও শুনছি। সেটা বলি; এতদিন ধরে যে সবাই আমাকে ক্ষেপাত যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানত, ছাব্বিশ বছরের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট (জর্মনিতে যে যুগে স্টুডেন্টরা উচ্চ সম্মান পেত— ধরে নেওয়া হত এরা সব এরিস্টোক্রেট) দশ বছরের বাচ্চার প্রেমে পড়ে না। সে পীরিত করে মেয়ে-স্টুডেন্টদের সঙ্গে কিংবা বেকার কিন্তু ধনী ঝিয়ারীদের সঙ্গে। কিন্তু ওরা একটা কথা জানত না, আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতুম যাকে জর্মন বলে 'লিবে' ইংরেজিতে বোধহয় 'লাভ'।"

আমি তো অবাক। কিন্তু যেরকম গম্ভীর কণ্ঠে সিরিয়াসলি শব্দ কটি উচ্চারণ করল তাতে ওই নিয়ে পাগলামি করার মতো রুচি বা সাহস আমার ছিল না। সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার বয়স ছিল লটের আড়াই গুণ। এখন তো আর আড়াই গুণ নয়— তা হলে আমার বয়স হত ১২৫ বৎসর। আমাদের বয়স এখন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। ওর যদি আশি বৎসর হয়— আর হবেই না কেন, ওর ঠাকুদ্দার বাপ তো একশো এক বছর অবধি বেঁচে ছিলেন— তখন আমার ছিয়ানব্বই আর ওর আশিতে তো কোনও পার্থক্যই থাকবে না।

তুমি ভাবছ, দশ বছরের মেয়ে কি প্রেমে পড়তে পারে? পারে, পারে, পারে! অবশ্য সিচুয়েশনটা খুবই অসাধারণ হওয়া চাই।

'আর তোমার যে পাকা একটি বান্ধবী ছিল— বন-এ তোমার সঙ্গে পড়ত, নাম আনামারি—'

সর্বনাশ! নামটা পর্যন্ত জানত। এখনও স্মরণে রেখেছে।

২২

গডেসবের্গের সবচেয়ে বড় রাস্তা দিয়ে চলেছি। এ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আগের প্রায় দোকানিকে চিনতুম বলে তারা রোদ পোওয়াবার তরে চৌকাঠে দাঁড়ালে 'গুটন্ মর্গেন' 'গুটন্ টাখ' কিংবা দিনের শেষে ক্লান্ত কণ্ঠে 'গুটন্ অকেনট' বলতুম। সুদ্ধমাত্র ফুলওলার দোকানটির কাছে আসামাত্র পা চালিয়ে দ্রুতবেগে ওটাকে পেরিয়ে যেতুম। কেন? শো-উইন্ডোর বিরাট কাঠের জানালা দিয়ে দেখা যেত কত না সুন্দর তাজা ফুল— একেবারে সাক্ষাৎ গুলস্তান। অনেক কিশোর-কিশোরীই এই শো-উইন্ডোর সামনে রাঁদেভু করত। দ্বিতীয় পক্ষ সময়মতো না এলে প্রথম পক্ষ ফুল দেখতে দেখতে হেসে-খেলে দশ-বিশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারত। তবে কি আমি ফুল ভালোবাসিনে? খুবই ভালোবাসি। বিশেষ করে শীতকালে যখন সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে যায়, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত ঝরে গিয়ে উঁচু উঁচু শাখা ন্যাড়া সঙিনের মতো ভয় দেখায়। শুনেছি, তখন এ দোকানের বেবাক ফুল আসত দক্ষিণ ইতালি, মন্তে কার্লো, কোৎদাজুর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল চার্লস ল্যামের রুদ্র রসিকতা। এক শৌখিন ধনী

www.pathagar.com

ব্যক্তি তাঁকে শুধিয়েছিল, 'আপনার ঘরে ফুল নেই যে। আপনি কি ফুল ভালোবাসেন না?' তিনি জানতেন যে ওই স্থব তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা বাবদে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও এই বেতমিজ প্রশ্ন শুধিয়েছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'স্যার! আমি ছোট্ট বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে নিয়ে ফুলদানিতে সাজাই না।'— আমি দাঁড়াতুম না অন্য কারণে। সেই প্রাচীন যুগে আমি এখানে আসার দু-তিন দিন পর যখন মুগ্ধ নয়নে ফুলগুলো দেখছি, এমন সময় দরজা খুলে দোকানি একগুচ্ছ ফুল হাতে দিয়ে মৃদু হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, 'গুট্ন্ টাখ য়্যুঙার হ্যার (ইয়াং জেন্টলম্যান)! এই সামান্য কটি ফুল গ্রহণ করে আমাকে আপ্যায়িত করবেন কি? আমার ভাইঝি লিসবেতের কাছে শুনলুম আপনি আমাদের এই ক্ষুদে গোডেসবের্গে ডেরা পেতেছেন। আমাদের এখানে যে কজন বিদেশি আছেন, তাঁদের সংখ্যা গোনবার জন্য হাতের একটা আঙুলই যথেষ্ট! কিন্তু জানেন, এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর পরিবেশে— সে শতাধিক বৎসরের কথা— এখানে বাস করতেন রাজদরবারের এক সম্মানিত আমির[১] তাঁরাই জলসাঘরে বন শহরের বেটোফেন তখনকার দিনের গ্রাঁ মেৎর্ (গ্রান্ড মাস্টার) ওস্তাদস্য ওস্তাদ হ্যান্ডেলকে বাজনা বাজিয়ে শোনান—'

বলা বাহুল্য আমি দাম দেবার চেষ্টা করে নাস্তানাবুদ হয়েছিলুম।

ফুস করে একটি ক্ষুদ্রতম দীর্ঘশ্বাস বেরুল কিন্তু লটের কান যেন বন্দুক। শুধাল, 'কী হল? এরই মধ্যে আমার সঙ্গসুখ তোমার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠল?' আমি সজোরে মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, না।' তার পর ওমর খৈয়াম থেকে আবৃত্তি করলুম—

'তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি,
তোমাদের ছাড়িয়া মসজিদে গিয়ে
কী হবে মন্ত্র স্মরি!'

তার পর সেই ফুলওলার কাহিনী বয়ান করে বললুম, 'ডার্লিং লটে! আমি এসব দোকানপাট তো বিলকুল চিনতে পারছিনে। কিন্তু সেই ফুলের দোকান নিশ্চয়ই সামনে এবং নিশ্চয়ই ফের চেষ্টা দেবে আমাকে মুফতে ফুল দেবার। চল অন্য পেভমেন্টে।'

লটে পুনরায় ডুকরে কেঁদে বললে, 'হায়, হায়, হায়! কোন ভবে আছ তুমি! সে দোকান আর নেই। তার মালিক ওটাকে বেচে দিয়ে মাইল সাতেক দূরে আলু— আলু গো, আলু ফলাচ্ছেন। প্রাচীন দিনের আর কজন দোকানি আপন আপন দোকান বাঁচাতে পেরেছে। এই ছোট্ট জায়গাটিতে যারা বংশপরম্পরায় বাস করেছে তারা হয় পালিয়েছে, নয় আপন আপন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তায় পর্যন্ত বেরুতে চায় না। এই তোমার লিজেল— অন্তত চার মাইল না হাঁটলে অর্থাৎ মুফেনডর্ফ-গোডেসবের্গে দু বার না চষলে যার পেটের চকলেট হজম হত না (মনে পড়ল অত্যুৎকৃষ্ট ব্রান্ডি ভর্তি মোটা মোটা লাল আঙুরের চকলেট খেত লিজেল) সে তো এখন আর একদম বাড়ি থেকে বেরোয় না। তোমার ল্যান্ডলেডির মেয়ে আনা বেরোয় না, আমাদের

১. অধুনা বাঙলায় একাধিক লেখক একবচনে 'ওমরাহ্' লিখে থাকেন। বস্তুত ওমরাহ্ শব্দটি বহুবচন। একবচন আমির শব্দের বহুবচন ওমরাহ। এবং 'আমির-ওমরাহ্' সমাস কলেক্টিভ নাউন রূপে ফারসি, উর্দু, বাঙলাতে ব্যবহার হয়।

www.pathagar.com

যে একটি ক্ষুদ্র বিউটি সেলুন ছিল তার মালিক কাটেরিনা সৌন্দর্য আর যৌবন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিস্তর সন্ধিসুড়ুক জানত বলে— এবং বাঁচিয়ে রেখেছেও— এখনও তাকে দেখলে মার্কিন চ্যাংড়াদের মুণ্ডুগুলো বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে, সে পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরোয় না।

তাই তো তোমাকে পেয়ে আমার এত আনন্দ। তোমার আজকের দিনের চেহারাতে আর সেদিনকার চেহারাতে আর কতখানি মিল? বার বার মনে হয়, যেন তোমাকে ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছি। কী রকম জানো? তুমি যে বাড়িতে থাকতে সেটা প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। সে-যুগে আস্তানার ভালো ব্যবস্থা ছিল না বলে আমার বাপ-মা'র বেডরুম সবকটা ঘর ছিল খুদে খুদে— যেন বেদেদের কারাভানের গাড়িতে ক্ষুদে ক্ষুদে বেড-রুম, ডাইনিং-রুম, কিংবা— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ওয়ালট ডিজনির ম্যাজিকল্যান্ডের রাজকন্যা বনের ভিতর কাঠুরের অতি ছোট্ট ঘরে আশ্রয় নিয়ে জানালার পাশে বসে আপন মায়ের কথা ভাবছে।

হুবহু ঠিক ওই রকম একটি ছোট্ট জানালা ছিল তোমার ঘরে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে একহাত হয় কি না হয়। তুমি আসবার আগে ওটাতে একটা সাদা মোটা পর্দা ঝুলত। কিন্তু তোমার এখানে আসা স্থির হয়ে যাওয়ার পরই আনার মা আপন হাতে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে একটুকরো নেট্ বুনল। তার যা বাহার! আর তার মিহিন কাজ ডাচ লেসকেও টিঙ দেয়। আমি যখন মাখম কিনতে গেলুম আনাদের দোকানে তখন আনাকে শুধালুম, 'অতিথি আসছে নাকি?' উত্তর শুনে আমি ভয়ে ভিরমি যাই আর কি! আমাকে একদিন ভয় দেখাবার জন্য বাবা বলছিল, 'তবে ডাকি একটা ইন্ডারকে! তার মাথায় পাগড়ি, ইয়াব্বড়া দাড়ি আর হাতে বাঁকা ছোরা। (আমি বুঝলুম শিখ আর গুর্খাতে লটের বাবা ককটেল বানিয়ে ফেলেছিল— লেখক) নাভিকুণ্ডলীর উপর সেঁধিয়ে দিয়ে এক হ্যাঁচকায় পাঁজর অবধি ফাঁসিয়ে দেয়।' ওমা! তার পর কোথায় কী? সেই রাত্রে তোমার ছোট্ট জানালার বাহারে লেসের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখি, ঠিক তাই, তোমাকে এইমাত্র যা বললুম, তোমাকে যেন তখন ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছি, তুমি টেব্ল্ ল্যাম্পের সামনে বসে কিছু একটা লিখছিলে।'

আমি বললুম, 'কত যুগের কথা! কিন্তু জাস্ট বাই চান্স্ তোমার মনে আছে কি, সেটা কী বার ছিল?'

'দিব্য মনে আছে। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা।'

'অ। তাই বল। শুক্রবার রাতদুপুরে ইন্ডিয়ার জন্য লাস্ট মেল ছাড়ে। প্রতি মাসে চিঠি না পেলে সব বড্ড চিন্তিত হয়। তোমার রাজকন্যা যেরকম বনের ভিতর কাঠুরের কুটিরে ছোট্ট জানালার পাশে বসে তার মায়ের কথা ভাবত, আমার মায়ের মনও তেমনি আমার দিকে উধাও হয়ে চলে আসে।'

লটে বললে, 'আহা!' সেই অল্প বয়সে লটে লাজুক ছিল বটে কিন্তু তার দরদি হিয়াটি সে কখনও লুকিয়ে রাখতে পারত না। বললে, 'একদা যেখানে কাফে স্নাইডার ছিল সেখানে পৌঁছে গিয়েছি।'

আমি বললুম, 'না। টাকার জোরে মার্কিনরা যে প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করেছে সে পাপালয় তো ব্রথেল। আমি ওখানে যাব না।'

লটে যেন খুশি হল। বললে, 'ওই যে "ব্রথেল" বললে, সেটা একদম খাঁটি কথা। হয়তো না ভেবে বলেছ, কিন্তু পেরেকের ঠিক মাঝখানে মোক্ষম ঘা-টি মেরেছ। সেদিন একটা বইয়ে

www.pathagar.com

পড়ছিলুম, ইহুদিরা ঠিক এমনি ধারা কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে প্যালেস্টাইন গিয়ে সেখানকার গরিব আরব দোকানদারদের দোকানপাট কিনে তো নিলই তার পর কিনল ওদের জমিজমা। আরবরা এখন নাকি ভিটেছাড়া হয়ে সর্বত্র ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেকটা বইয়ে পড়ছিলুম, কোনও জায়গায় যদি একটা নতুন বন্দর তৈরি করা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এন্তের "বার" আর বিস্তর "ব্রথেল" হুশ হুশ করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাতে থাকে।

আমি চিরকালই অ্যাডেনাওয়ারকে ভক্তি করেছি। তাঁরই কল্যাণে যুদ্ধে-বন্দি বিস্তর জর্মন মুক্তি পায় রুশ কারাগার থেকে, সাইবেরিয়া থেকে। ওদের মধ্যে ছিল আমার এক মাসতুতো ভাই— আমার মা তাকে ভালোবাসত আপন ছেলের মতো। তা হলেই বুঝতে পারছ, আডেনাওয়ারের প্রতি আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা। এবং সকলেই জানে এই বন্দিদের মুক্ত করার জন্য তাঁকে তাঁর মাথা অনেকখানি নিচু করতে হয়— সে লোক হিটলারের সামনেও কখনও নিজেকে খাটো করেননি।

কিন্তু এই যে তিনি ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট শহর বন-কে জর্মনির রাজধানীরূপে মনোনীত করলেন তাতেই হল বন-এর সর্বনাশ এবং আমাদের গোডেসবের্গের সর্বস্ব নাশ। বন-এর আশপাশে ফাঁকা জায়গা নেই। বিদেশি রাজদূত বাবুরা গোডেনবের্গের চতুর্দিকে গমক্ষেত বরবাদ করে হাঁকলেন বিরাট বিরাট এমারত, তৈরি করলেন আপন আপন "কলোনি"। অফ্ কোর্স মার্কিনরাই হলেন পয়লা নম্বরি কলোনাইজারস। তাঁরা চান ঝাঁকে ঝাঁকে বার। রাতারাতি গোডেসবের্গের চেহারা বদলে গেল। এদেশে স্লেভারি নেই। নইলে আমরা সব্বাই ওদের নিগ্রো স্লেভ বনে যেতুম।'

তার পর ঝপ করে আমাকে একটা চুমো খেয়ে বললে, 'একটু দাঁড়াও— না, তুমিও সঙ্গে চল। হেরমানকে ফোন করব, আমার ফিরতে দেরি হবে।'

২৩

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতার পাবলিক টেলিফোন বক্স্, ফোন কিয়োস্ক্ থাকে। তার কোনও কোনওটাতে আপনি যদি প্রার্থিত নম্বর না পান, বা এনগেজড থাকে তবে B বোতাম টিপলে আপনার প্রদত্ত কড়ি একটা ফুটো দিয়ে ফেরত পাবেন। এখন হয়েছে কী, বেশিরভাগ লোকই আপন বাড়ি থেকে ফোন করে। নম্বর না পেলে বা এনগেজড পেলে বোতাম টেপার কোনও কথাই ওঠে না। তাই পাবলিক ফোন থেকে ওই দুই অবস্থায় B বোতাম টিপতে ভুলে যান। অতএব আপনার মতো শেয়ানা লোকের কর্তব্য, পাবলিক ফোনে ঢুকেই প্রথম B বোতাম টেপা। যদি আপনার পূর্ববর্তী ভোলামন জনের কড়ি সেখানে থাকে তবে ফোকটে সেটি আপনি পেয়ে যাবেন এবং তাই দিয়ে আপনার কলটি— মাছের তেলে মাছ ভাজার প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেরে নেবেন। এমনকি আপনি কোনও ফোন করবেন না; পথে যেতে যেতে দেখলেন একটি ফোন বাক্সো। ঢুকে B টিপবেন। কড়ি পেয়ে গেলে ভালো। না পেলে কীই-বা ক্ষতি। কড়িটি পকেটস্থ করে শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে চলবেন যতক্ষণ না আরেকটা ফোন বক্স্ পান। মার্কিন প্রসাদাৎ গোডেসবের্গের নানাবিধ অধঃপতন

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও ঘড়ি ঘড়ি পথপ্রান্তে অর্থোপার্জনের এ ধরনের চিত্তহারিণী প্রতিষ্ঠান ফোন বক্স্ খুবই কম, কিন্তু হামবুর্গ, বার্লিন, কলোন— মরি! মরি! তিনশো কদম যেতে না যেতেই সেই নয়নাভিরাম প্রতিষ্ঠান। আবার ঢুকবেন আবার টিপবেন। কীই-বা সময় যায় তাতে! এতে আপনার বিবেকদংশন হওয়ার কথা নয়। কারণ কড়িটা তো সরকারের নয়। ওটা আপনার মতোই কোনও নাগরিকের। ওতে আপনার হক্কই বেশি।

লটেকে এ কৌশলটি শেখাবার মোকা পূর্ববর্তী যুগে আমি কখনও পাইনি। ইতোমধ্যে আমার মতো জউরি প্রেমিকও সে বোধহয় পায়নি। ফোন বক্সে ঢুকে যেই না পয়সা ঢালতে যাচ্ছে আমি অমনি লম্ফ দিয়ে তাকে ঠেকালুম— 'কর কী? কর কী?' বলে B-তে দিলেম চাপ।

ঈশ্বর পরম দয়ালু
তাঁহার কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাঁকালু।

দু-কান ভরে যেন কেষ্টঠাকুরের মুরলিধ্বনি শুনতে পেলুম। যদ্যপি খটাং করে— কাঁসার থালার পর টাকাটি ফেললে যে রকম কর্কশ ধ্বনি বেরোয়। তিনটি গ্রশেন, আমাদের দিশি হিসাবে সাড়ে ন গণ্ডা পয়সা সুরসুর করে বেরিয়ে এল।

লটে তাজ্জব মেনে শুধাল, 'এ আবার কী?'

ভারতের জন্য প্রথম এটম বানাতে পারলে আমার একাননে সীতালাভে দশাননে যে আত্মপ্রসাদ অহংশ্লাঘা উদ্ভাসিত হয়েছিল তারই আড়াই পেঁচ মেখে নিয়ে হিটলারি কণ্ঠে আদেশ দিলুম, 'এই কড়ি দিয়ে উপস্থিত সাত পাকের সোয়ামিকে ফোন তো কর; পরে সবিস্তর হবে।'

লটে : 'হেরমান?'

অন্য প্রান্ত থেকে ক্বচিত জাগরিত বিহঙ্গ কাকলীর মতো শব্দ হল। হায়, কেন যে সেই ফরাসি কৌশল বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল না— আফসোস করি প্যারিসে একদা পাবলিক কল বক্সে ফোনযন্ত্র থেকে একটি সরু রবারের নল— তার মাথায় ক্ষুদে একটি লাউডস্পিকার, এমপ্লিফায়ার— বোতাম লাগানো— ঝুলতে থাকে। এখানে সেটা থাকলে আমি সেই বোতামটি কানে লাগিয়ে দিব্য শুনতে পেতুম ওই প্রান্ত থেকে হেরমান কী বলছে।

লটে : 'আমি লটে বলছি। লিকসটে (ইংরেজিতে এস্থলে হানি = মধু!) আমার ফিরতে দেরি হবে।... আঁ না না! আমার প্রাচীন দিনের এক লাভারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। এখন তার সঙ্গে কফি টার্ট খাব। তার পর সিনেমা। তার পর ছ-পদী ডিনার। সর্বশেষে পার্কের বেঞ্চিতে বসে দু দণ্ড রসালাপ (মৃদু মর্মরগানের মর্মের কথার মধুময় মাখামাখি)।' ওদিকে আমি প্রাণপণ হাত ছুড়ে ছুড়ে সর্বাঙ্গে মৃগী রোগীর কাঁপন তুলে তুলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি— 'কাট্ আউট, কাট্ আউট— মা-মেরির দিব্যি, সান্তা মাগদালেনের দিব্যি, সান্তা আনার, সান্তা তেরেসের দিব্যি...।'

হেরমান বেশ একটানা কিছুক্ষণ কীসব যেন বললে। লটে বললে, 'দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু তোমার সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত থেকো।'

আমার বহু বৎসরের নিপীড়িত অভিজ্ঞতা বলে মেয়েছেলে একবার ফোন ধরলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে মর্নিং ওয়াক (রবীন্দ্রসরোবর প্রদক্ষিণ তদ্ অন্তর্ভুক্ত) সেরে ফোন বক্সে ফিরে

www.pathagar.com

দেখবেন তখনও তিনি বলছেন, 'তা হলে ছাড়ি, ভাই। বাইরে জনা তিনেক ফোন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কেন বাপু, আর ফোন বক্স নেই কাছে পিঠে। এই তো মাত্র দু-মাইল দূরের গোরস্তানে (বাপ্‌স্‌— সেই রাতের ভুতুড়ে অন্ধকারে গোরস্তানের শর্টকাট প্রাশান আর্মি অফিসার পর্যন্ত এড়িয়ে চলে) আরেকটা কল বক্স রয়েছে। তা হলে ছাড়ি ভাই—' এই ছাড়ি ভাই, ভাই— তার পরও নিদেন দশটি মিনিট ধরে চলবে।

কিন্তু লটে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। যেই না দেখেছে একটি মহিলা কিয়োস্কের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অমনি লটে বললে, 'আউফ ভিডার হ্যোরেন' যতক্ষণ না পুনরায় একে অন্যের কণ্ঠস্বর শুনি (ততক্ষণের জন্য বিদায়— এটা উহ্য থাকে।)[১]

রাস্তায় নেমে লটে বললে, 'ফোন বক্স থেকে যে কৌশলে পয়সা বের করলে সেটা বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'হেরমান কী বললে? এবং তার কটা পিস্তল?'

খিল খিল করে হেসে বললে, 'দুটো। হেরমানের রেজিমেন্ট যখন রাশা থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে জর্মনি ফিরল তখন কোনও দফতর পর্যন্ত নেই যে পিস্তলটা জমা দেয়। অন্যটা তার দাদার আপন নিজস্ব ছিল। সে রয়ে গেছে।' আমি অন্যদিকে ঘাড় ফেরালুম। সুশিক্ষিত জর্মন জাত পর্যন্ত পয়া-অপয়া মানে। 'সে রয়ে গেছে' অর্থাৎ সে যুদ্ধ থেকে 'ফেরেনি।'— খুব সম্ভব মারা গেছে। হয়তো আত্মীয়স্বজন সৈন্যবিভাগ থেকে চিঠি পেয়েছে, অমুক অমুক দিন অমুক স্থলে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু তারা ভাবে, মৃত সৈন্য সনাক্ত করাটা সব সময় নির্ভুল হয় না। হয়তো-বা সে সাইবেরিয়ার কারাগারে বা লেবার ক্যাম্পে আছে। কিংবা হয়তো শেল শক্‌ খেয়ে তার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে (এমনেসিয়া)। নিজের নামধাম পর্যন্ত স্মরণে আনতে পারছে না। হয়তো কোনও হাসপাতালে পড়ে আছে, নয় ইডিয়টের মতো রাশার গ্রামে গ্রামে ভিখারির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত কী হতে পারে। হয়তো একদিন ফিরে আসবে। 'মারা গেছে' এই অপয়া কথা বলি কী করে? সত্যি তো, আমিও তাই বলি।

কিন্তু সুশীলা লটে-চরিত্রের কোনও কোনও অংশ বেশ টনটনে। বললে, 'কিন্তু ফোন থেকে যে কড়ি দুইয়ে বের করলে সেটা বুঝিয়ে বল।'

আমি বললুম, 'সেটা পরে হবে। তুমি বরঞ্চ বল, হেরমান কী বললে?'

---

১. সাক্ষাৎ দেখাদেখির পর বিদায় নেবার সময় জর্মন বলে 'আউফ ভিডার জেন (দেখা) হয়।' ফোনে বলে আউফ ভিডার হ্যো রে ন্‌ (শোনা যায়)। ভিয়েনাতে বলে 'আ দিয়ো' (ভগবানের হাতে দিলুম)। নানা দেশে নানা রকমের বিদায়বাণী বলা হয়। জানিনে, এই লক্ষ্মীছাড়া মুল্লুকে এখন পনেরো আনা লোক— এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত ঘোর অপয়া 'এখন তবে যাই' বলে। যেন অগস্ত্য যাত্রা করছে! 'এখন তবে আসি' প্রায় উঠে গেছে। আমরা তখন উত্তরে বলতুম 'এসো।' এখন কী উত্তর দেয়।

এই আধুনিক আধুনিকারা যখন কেউ বলে, 'এখন তবে যাই?' তারা কি 'হ্যাঁ, যাও' বলে? সর্বনাশ! এর চেয়ে মারাত্মক বর্বর অপয়া উত্তর কী হতে পারে। 'যাই' শুধু তখনই বলা চলে যখন কেউ আসছে। ডাকলুম, 'রামা, রামা, এদিকে আয় তো, বাবা।' সে উত্তরে বলে, 'যাই বাবু।'

www.pathagar.com

হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'দেখো হের ডক্টর হের প্রফেসর, প্রাচীন দিনের কথা স্মরণে আনো। তোমার কোনও আদেশ, কোনও নির্দেশ আমি কস্মিনকালেও অমান্য করেছি? এখনও কি আমার পালা আসেনি আদেশ করার'— গলায়, অল্প অত্যল্প ভেজা ভেজা অভিমানের সুর।

আমি হন্তদন্ত হয়ে বললুম, 'এ কী বলছ তুমি। তুমি যা বলবে, তাই হবে। সে আমলে বললেও হত। ওই যে ফোনের বাক্স—'

তার বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে পাঁজরে দিলে কাতুকুতু।

আমি 'কোঁক' বলে সামনের দিকে দু ভাঁজ হই আর কি!

লটে ভারি পরিতৃপ্ত হয়ে বললে, 'একদিন তোমার বাড়িতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখি সেই গুণ্ডা অসকার তোমাকে সোফায় চিৎ করে ফেলে তার লোহার আঙুল দিয়ে তোমার পাঁজরে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। আর তুমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছ। আমারও বড্ড শখ হয়েছিল, আমিও মজাটা চেখে দেখি। এবারে ভাবলুম, এত দিনে বোধহয় পাঁজরে তোমার আর সে সেনসিটিভনেস নেই। আছে, আছে, আছে। তুমি এখনও আমাদের সনাতন ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। থাক ফোনের কেচ্ছা। হেরমান বলছিল, কাফেতে যাচ্ছি, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ডিনার বাইরে কেন? তার শিকারের উত্তম হরিণের মাংস যখন বাড়িতে রয়েছে।'

আমি বললুম, 'আহ্!'

'মানে?'

আমি জিভ চ্যাটাং চ্যাটাং করে বললুম, 'হরিণ আমি বড্ড ভালোবাসি। কিন্তু তার জন্যে হরিণের মতো আমিও কি তার হাতে শিকার হব!'

"আর বললে, 'সিনেমাটা বাদ দাও। ওখানে তো রসালাপ করতে পারবে না। বরঞ্চ বাড়িতে ডিনার খেয়ে পার্কে যাবে।' আমি বললুম, 'চেষ্টা দেব বন্ধুকে নিয়ে আসতে। এখন চল কাফেতে।"

আমি পুনরায় মেরির ভেড়ার মতো লটের পিছনে পিছনে কাফেতে ঢুকলুম।

২৪

'ভোজনান্তে দীর্ঘ জীহ্বা প্রকাশিয়া ইন্দ্রধনু বিনিন্দিত হনুদ্বয় বিস্তারিয়া'

আপনি যদি উদরস্থ বায়ু পাঠান-মুল্লুকের গিরিদরি প্রকম্পিত করে সশব্দে আস্যদেশ থেকে উচ্ছ্বসিত না করেন, সোজা বাঙলায় একটা বিরাট রামবোম্বাই ঢেঁকুর না তোলেন (নাবালেও পাঠান বিচলিত হয়ে স্বীয় উষ্ণীষপুচ্ছ নাসিকারন্ধ্রে স্থাপন করবে না) তবে পাঠান অতিথিসেবক বড্ডই ম্রিয়মাণ হয়ে আন্দেশা করে, তার ধর্মপত্নী স্বহস্তে ১২৮ ডিগ্রির উষ্ণতম বাতাবরণে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া যে খাদ্যাদি প্রস্তুত করলেন সেটি আপনার রসনাপূত হয়নি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই 'ভদ্রস্ততা' কোনও ডিউক— ডিউক কেন, ডিউকেতরের— বাড়িতেও করেন তবে অনায়াসে ধরে নিতে পারেন যে ও-বাড়িতে প্রভু খ্রিস্টের ন্যায় ওইটেই আপনার লাস্ট সাপার (Suffers) এবং সেইটে অজরামর করে রাখবার জন্য লেওনার্দো দা ভিঞ্চির সন্ধান নিতে পারেন।

ইংল্যান্ডের কায়দা-কেতার সঙ্গে কন্টিনেন্টের কায়দা-কেতার বেশ খানিকটে তফাৎ

www.pathagar.com

আছে। ইংল্যান্ডে সবসময়ই লেডিজ ফার্স্ট। এই সুবাদে একটি অতি মনোরম সত্য ঘটনা মনে পড়ল। সেটা বলছি।

ইতোমধ্যে সদর রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকে লটে ছোট একটা কাফেতে ঢুকল। আমি পিছন পিছন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তত তিনটি কণ্ঠ যেন গির্জের 'হাল্লেলুইয়া, হে প্রভু! তোমার স্বর্গরাজ্য এই খর-তাপদগ্ধ মরুতে নেবে আসুক, ডমিনুস্ ভবিসকুম্' শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত, অবশেষে অবশেষে, আখের আখের এলি। দর্শন পেলুম। দিবারাত্তির মিনষেকে জাবড়ে ধরে শুয়ে থাকিস নাকি? না—'

লটে রেসেপশন কমিটির গণ্যমান্য সদস্যদের হুলুধ্বনি উপেক্ষা করল মদ্দেশীয় কংগ্রেসি মাইলর্ডরা যেরকম সর্বপ্রকারের প্রশস্তি নবমীনিন্দিত আবাহন 'তাচ্ছিল্য' ভরে উপেক্ষা করেন কিন্তু শুনে যাওয়ার ভান করেন। লটে অবশ্য কোনও প্রকারের ছলাকলা কস্মিনকালেও জানত না। তাই শুধাল, 'হের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দকে যে একটা মামুলি গুড মর্নিংও বললিনে!' মেয়েগুলো লটের মেয়ের বয়সী; আমাকে চিনবে কী করে? একজন বললে, 'মাকে ডেকে আনি।'

লটে : 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই কর। ওর সঙ্গে হয়তো আমাদের কালামানিকের গোপন প্রেম ঘুপসি ভাব-ভালোবাসা ছিল। আমাদের লটবরটি তোদের মায়ের যৌবনে ছিলেন একটি আস্ত পেটিকোট-শিকারি ব্রা-বিজয়ী।' আমি বললুম, 'ছিঃ! প্ফুই।'

লটে বললে, 'মডার্ন হতে শেখো। নইলে আমার সঙ্গে নাগরালি চতুরালি করবে কী করে? নিরামিষ প্রেমে আমার অরুচি।'

আমি কথাটা চাপা দেবার জন্য বললুম, 'তোমাকে একটা মর্মস্পর্শী সত্য ঘটনা বলছি— এটিকেটের সুবাদে এইমাত্র মনে পড়ল। তোমদের দেশে তো প্রায় কুল্লে মোকা-বেমোকাতে লেডিজ ফার্স্ট। এখন হয়েছে কী, ফরাসি বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত জনতা কোনওপ্রকারের বাছবিচার না করে কচুকাটা করছিল ফ্রান্সের ড্যুক, ব্যারন জমিদার— তাবৎ খানদানি অভিজাতদের। প্রথম তাদের জেলে পুরে, পরদিন ভোরবেলা একজনের পিছনে অন্যজনের দীর্ঘ লাইন করে মেয়ে-মদ্দ সবাইকে মন্থর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেত গিলোটিনের দিকে কারাগারের বিরাট চত্বর ক্রস করে। সর্বপ্রথম জন এগিয়ে গিয়ে মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে দিত গিলোটিনের ফ্রেমের ফুটোটাতে। হুশ করে নেবে আসত দারুণ ভারি সুতীক্ষ্ণ ট্যারচা তিনডবল খড়গের চেয়ে সাইজে বড় একটা কাটার। বিদ্যুৎবেগে মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ত মাপ-মাফিক অদূরে রক্ষিত একটা বাস্কেটের ভিতর (ফরাসি স্ল্যাঙ্গে তাই এখানে বলে 'বাস্কেটে থুথু ফেলা' অর্থাৎ গিলোটিন প্রসাদাৎ পরলোকগমন)। জল্লাদ সেটা সরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন বাস্কেট রাখার পর কিউয়ের দ্বিতীয় 'উমেদারের' দিকে তাকাবার পূর্বেই তিনি এগিয়ে আসতেন। পূর্ববৎ প্রক্রিয়া।

এখন হয়েছে কী, সে প্রভাতে কিউয়ের পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন এক সাতিশয় খানদানি মনিষ্যি, ফ্রান্সাধিরাজ সম্রাটের ভাগ্নে না কী যেন। তিনি বন্দি হওয়ার সময়ই জানতেন তাঁর অদৃষ্টে কী আছে। তাই তাঁর সর্বোত্তম রাজদরবারি বেশ পরেই তিনি কারাগারে এসেছিলেন। সকালে বধ্যভূমিতে নির্গত হওয়ার পূর্বে ঘণ্টাখানেক ধরে প্রসাধন করেছেন। জুতোর খাঁটি রুপোর বগলস ঘষে ঘষে ঝাঁ চকচকে করেছেন। পা থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষে মাথার পরচুলার উপর সযত্নে পাউডার ছড়িয়েছেন। আহা যেন নব বর— গিলোটিন-বধূকে

www.pathagar.com

আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন।

তিনি লক্ষ করেছিলেন, কিউয়ে ঠিক তাঁরই সামনে একটি মহিলা।

আমাদের নব বর কিউ থেকে একপাশে সরে গিয়ে ডান হাত দিয়ে মাথার হ্যাট তুলে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে কোমরে দুভাঁজ হয়ে বাও করে মহিলাটিকে বললেন, "আমাকে স্মরণাতীতকাল থেকে আমার মা-জননী আদেশ করেছেন, লেডিজ ফার্স্ট। সে আইন আমি কস্মিনকালেও অমান্য করিনি। আজ বড়ই প্রলোভন হচ্ছে মাত্র একবারের তরে সে আইন খেলাফ করি। একবারের বেশি যে করব না সে-শপথ আমি মা মেরির পা ছুঁয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রমাণস্বরূপ আরও নিবেদন করতে পারি মাতৃলব্ধ সেই অনুশাসন ভঙ্গ করার পর 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'র অশেষ করুণায়— যাঁর পদপ্রান্তে আমরা ত্রিসন্ধ্যা অশ্রুজলসিক্ত প্রার্থনা জানাই, দেবতাত্মা মা মেরি দেবজননী। পাপী-তাপী আমাদের ওপর এক্ষণে তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ কর এবং যখন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে। আমেন— তাঁরই অশেষ করুণায় আমার মাতৃদত্ত সেই অনুশাসন ভঙ্গ করার পর আমি মাত্র মিনিট তিনেক ইহসংসারে মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করার বিবেকদংশনে কাতর হব, তিন মিনিট হয় কি না হয় মরণের ছায়া ঘনিয়ে আসবে, মা মেরি আশীর্বাদ করবেন, তাঁরই পদপ্রান্তে অনন্ত শান্তি অশেষ আনন্দ পাব।

আমার একান্ত অনুরোধ কিউয়ে আপনি আমার স্থানটি গ্রহণ করুন। আমি আপনার স্থানটি গ্রহণ করার ফলে গিলোটিনে যাব আপনার পূর্বে— লেডিস ফার্স্ট আইন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করব এ জীবনে প্রথমবার এবং এ জীবনে শেষবারের মতো। এই আমার সকরুণ ভিক্ষা আপনার কাছে।[১] যে বংশে জন্মেছি তার প্রসাদে এবং প্রাসাদে আমাকে কখনও ভিক্ষা করতে হয়নি। এ জীবনে এই আমার সর্বপ্রথম ভিক্ষাভাণ্ড গ্রহণ এবং দ্বিতীয়বার এ দীনাচার করার পূর্বে সেটা চূর্ণবিচূর্ণ করে অনন্তলোকের প্রতি অভিযান। মা মেরির জয় হোক।"

লটের চোখ দেখি ছলছল করছে। মেয়েটা চিরকালই স্পর্শকাতর আর অভিমানী।

কাফের রেসেপশন কমিটির মেয়েরাও তখন গুড়ি গুড়ি এসে আমার কাহিনী শুনছে।

আমি বললুম, 'তুমি তো সাতিশয় খানদানি—'

'কী যে বল!'

আমি বললুম, 'তোমরা লিসেমরা রেগরা, গ্রেটে-কেটেরা, তোমরাই তো এখানকার প্রাচীনতম বাসিন্দা। এবং আপস্টার্ট মার্কিনদের সঙ্গে দু-পয়সার মোহে ধেই ধেই নৃত্য না করে উপায়ান্তর না দেখে আপন আপন বাস্তুবাড়িতে নিজেদের জ্যান্ত গোর দিয়েছ—'

'থাক, থাক। আমি হলে কী করতুম? বলতুম, "না, সম্মানিত মহাশয়। আমি তিন মিনিট

---

১. আত্মহত্যা করার পূর্বে হিটলার তাঁর উইলে অনুশাসন করেন এবং তাঁকে বাচনিক আদেশ দেন গোবেলস যেন তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলর) রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু গোবেলস আত্মহত্যা করেন হিটলারের মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা পর। তাঁর উইলে লেখেন, 'আমার জীবনে এই প্রথম আমি ফ্যুরারের আদেশ অমান্য করলুম। কিন্তু এটা লিখতে ভুলে গেলেই এবং এইটেই শেষ অবাধ্যতা।' আফটার অল গোবেলস তো খানদানি ভদ্রলোক নন। ফরাসি অভিজাতদের মতো তাঁর পেটে এত এলেম, বুকে অত দরদ হবে কোথায়?

www.pathagar.com

বেশি বাঁচলুম কি না বাঁচলুম সেটা অবান্তর। কিন্তু আপনি আপনার মাতৃ আজ্ঞা— তা সে মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেই হোক আর তিন বছর পূর্বেই হোক— লঙ্ঘন করতে যাবেন কেন? ফল যাই হোক না কেন। অবশ্য আমি নিশ্চয় জানি, আপনার পুণ্যশীলা মাতা মা মেরির পদ-প্রান্ত থেকে সস্নেহ দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আপনাকে আশীর্বাদ করবেন, আপনাকে গর্ভে ধরে নিজেকে ধন্যা মনে করবেন।" '

লটে হঠাৎ বলে উঠল, 'এই ছুঁড়িরা, তোরা ভাগ দেখি এখান থেকে। আমি হেরমানকে ফাঁকি দিয়ে ছোঁড়াটাকে (আমি মনে মনে বললুম, আমি সিক্স্‌টি সিক্স্‌ ইয়ার ওল্ড নই, আমি সিক্স্‌টি সিক্স্‌ ইয়ার ইয়ং) নির্জনে নিয়ে এলুম পীরিত করব বলে। তোরা আবার বাগড়া দিচ্ছিস কেন? যাঃ!' মেয়েগুলো হুড়মুড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান। শুধু একজন বললে, 'কোজনেফ মা! লটে মাসি যে অ্যাদ্দিন ডুবে ডুবে শ্যামপেন খাচ্ছিলেন সে তো এ মুল্লুকের কোনও চিড়িয়াও জানত না।'

লটে আমার পায়ের উপর জুতো বসিয়ে সম্পূর্ণ মোলায়েমসে চাপ দিল।

আমি সোৎসাহে বললুম, 'গো... ল।'

লটে : 'মানে?'

'তোমার পা দিয়ে কী করছ? ফুটবল খেলছ না?'

বললে, 'ধ্যৎ'। আমার পাশেই ছিল একটা হ্যাট-স্ট্যান্ড। হঠাৎ লটের নজর গেল সেদিকে। সবচেয়ে ধূলিমাখা হ্যাটটি নামিয়ে এনে বললে, 'এইটেই তো তোমার? দাঁড়াও আসছি।' বলে কাউন্টারে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এল একটা ব্রাশ। টুপিটাকে অতি সযত্নে ব্রাশ করতে করতে বললে, 'তোমাকে দেখভাল করার জন্য ইহসংসারে কেউ নেই। টুপিটার গণ্ডির নিচের দিক থেকে যে ধুলো বেরুল সে-রঙের ধুলো এ দেশে নেই। আর এদেশে দেখভাল করার তরে কেউ যে নেই সেটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'কী যে বল। তুমি তো রয়েছ।'

লটের চোখে ফের জলের রেখা। হতাশ কণ্ঠে বললে, 'কদিনই-বা এদেশে থাকবে। আর কবারই তোমার দেখা পাব। কিন্তু ভেবে দেখ দিকি, এটা কি একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বল দেখি এ পৃথিবীতে কটা মেয়ে দশ বছর বয়সে যাকে ভালোবেসেছে তাকেই ফিরে পেল চল্লিশ বছর পরে। তা-ও নিতান্তই দৈবাৎ। তুমি যদি দশ মিনিট পর ট্রাম-স্ট্যান্ডে আসতে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হত না; আমার ট্রাম এসে যেত আর আমি চলে যেতুম কোথায় কোন পোড়ারমুখো বন শহরে। তার পর ফের দেখা হত পঞ্চাশ বছর পরে।'

আমি বললুম, 'মোটেই বিচিত্র নয়। তোমার ঠাকুদ্দার বাবা তো বেঁচেছিলেন একশো এক বছর! তুমিই-বা কী দোষ করলে।'

রাগের ভান না রাগ, হতে পারে দুটো মিশিয়ে, বললে, 'তোমার শুধু হাসাহাসি আর ঠাট্টা মজা। কোনও জিনিস সিরিয়াসলি নিতে পার না।'

আমি শঙ্কা আর দুর্ভাবনার ছল করে শুধালুম, 'আমাদের প্রেমটা কি বড্ডই সিরিয়াস?'

'আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু' বললে, 'দারুণ ডেঞ্জারাস, কখন যে ফট করে আমার হার্টটা টুক করে ফেটে যাবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। আর শোনো, আমি একশো বছর বাঁচতে চাইনে।'

'কেন?'

www.pathagar.com

'হেরমানের পরিবারের সবাই স্বল্পায়ু... বাপের দিক থেকে, মায়ের দিক থেকেও। সে আমার আগে চলে গেলে আমি সইতে পারব না। বেশিদিন বাঁচব না।' আমি মনে মনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করলুম। 'তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় থাকুক। তোমার জীবন যেন খণ্ডিত না হয়। তুমি অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হও।'

২৫

আমি শুধালুম, 'লটে, এদেশে তো নিয়ম কাফে-রেস্তোরাঁ-পাব-এ ঢোকার সময়ে ব্যত্যয় হিসেবে লেডিজ ফার্স্ট নয়, পুরুষ আগে ঢোকে। তবে তুমি হুট করে এ-রকম পয়লা ঢুকলে কেন?'

উত্তর শুনে বুঝলুম লটে রীতিমতো তালেবর মেয়ে হয়ে উঠেছে। বললে, 'এটিকেট যারা অন্ধভাবে মেনে চলে তারা হয় মূর্খ নয় স্নব। স্নব-রা সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ওই বুঝি এটিকেটের পান থেকে চুন খসে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই বুঝে গেল যে সে আসলে নিম্ন পরিবারের লোক কিন্তু এখন দু-পয়সার রেস্ত হয়েছে বলে উঠেপড়ে লেগেছে কী করে খানদানি সমাজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। তা হলেই তো সর্বনাশ। স্নেক অ্যান্ড ল্যাডার খেলায় সাপের মুখে পড়লে যেরকম এক ধাক্কায় স্-স্-স্-র করে পিছলে পড়ে ফের আপন কোটে ফিরে যেতে হয় তারও হবে সেই হাল। আবার, ফের, ফিন্‌সে। আসলে এ এটিকেটের কারণটা কী? রেস্তোরাঁ-পাব-এতে আকছারই কোনও কোনও পেঁচি মাতাল এমনকি অতিশয় খানদানি মনিষ্যিও (শোনোনি 'ড্রাঙ্ক লাইক এ লর্ড') বানচাল হয়ে হইহুল্লোড় লাগায় আকছার। ওই অবস্থায় কোনও লেডি যদি হুট করে হঠাৎ ঢুকে পড়েন তবেই তো চিত্তির। তিনি হবেন বিব্রত অপ্রতিভ। তাই সঙ্গের পুরুষ তার আগে ঢুকে পাব-এর বাতাবরণটা জরিপ করে নিয়ে হয় তদ্দণ্ডেই বেরিয়ে যায় নয় তাঁকে গ্রিন সিগনেল দেয়। বেরুবার সময় কিন্তু লেডিজ ফার্স্ট। লেডির উপস্থিতিতে সে হয়তো বিল বাবদে স্লো সার্ভিস নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে চায়নি। লেডি বেরিয়ে গেলে কাউন্টারে গিয়ে প্রেমসে লড়াই লাগাবে। হয়তো-বা বড্ড বেশি বিয়ার খাওয়ার ফলে পেট টনটন করছে— সে স্থলে স্বয়ং কাইজারও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না— অর্থাৎ বাথরুম— সে স্থলে একটা ঢুঁ মেরে আসতে চায়।

এ কাফেটি আমি চিনি আমার হাতের চেটোর মতো— দশ বছর বয়স থেকে। কাফের অধিষ্ঠাত্রী মালিক আমাকে চেনেন সেই আদ্যিকাল থেকে। এখানে আমি হুট করে ঢুকলে বিব্রত হব কেন? তদুপরি সবচেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব যেটা অবতরণিকাতেই বলা উচিত ছিল যে, এ কাফেতে মাদকদ্রব্য আদৌ বিক্রি হয় না। এখানে বানচাল হবে কী গিলে? আইসক্রিম, চা, কোকো, নেবুর রস, ইওগুর্ত (দই), কফি?— আর কালো কফি খেলে তো নেশা কেটে যায়।'

আমি শুধালুম, 'লটে, তুমি কখনও নেশা করে বানচাল হয়েছ?'

লটে বললে, 'বা রে। সেই যে দশ বৎসর বয়সে তোমাকে ভালোবেসেছিলুম সে নেশার খোঁয়াড়ি তো এখনও কাটেনি। অবশ্য একথা ঠিক, তোমার সঙ্গে যদি ফের দেখা না হত তবে সে প্রেম এরকম মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠত না। শুনেছি, চীন দেশে নাকি একরকম মোক্ষম দারুণ কড়া মদ আছে। রুশদের ভোদকা, ফরাসিদের আবস্যাঁৎ তার কাছে নাকি একদম

www.pathagar.com

নিম্বুপানি। সে-মদ রাত দশটা অবধি দু-তিন পাত্তর খেতে না খেতেই পুরো পাক্কা নেশা। তার পরও যদি খাও তবে হয় বমি করবে, নয় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। পরের দিন ঘুম ভাঙতে দেখবে নেশা বিলকুল কেটে গিয়ে মাথা একদম সাফ। তখন সামান্য একটুখানি প্রাতরাশ সেরে খাবে দু-পেয়ালা গরম জল। আর যাবে কোথা? চড়চড় করে ফের নেশা চড়বে হুবহু আগের রাত্তিরের মতো। চীনারা বলে, আগের রাত্তিরের নেশার একটা তলানি পেটে জমে থাকে— আর পাঁচটা মদের মতো শরীর থেকে বেরিয়ে যায় না। সেটাতে গরম জল পড়লেই সে মাথাচাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, আবার সেই অরিজিনেল মদের কাজ করে। পরের দিন আবার দ্বিতীয় দিনের মতো স্রেফ দু-পেয়ালা গরম জল ঢাললেই ফের উত্তম নেশা, করে করে একবার মদ খেয়ে তিন দিন ধরে তিন বার নেশা করা যায় একই খর্চায়।'

আমি শুধালুম, 'মদ্যাদি ব্যাপারে যে তুমি এত গবেষণা করেছ সে তো আমি জানতুম না।'

চোখ পাকিয়ে বললে, 'তুমি একটা আস্ত বুদ্ধু (জর্মনে বলে 'ডোফ্'— তার পর সেই 'ডোফ্' শব্দের তর তম করে বললে 'ডোফ'— 'ডোভার'— 'কালো')। রূপকটা একদম ধরতে পারনি। আমার দশ বৎসর বয়সে তুমি যে প্রেমমদিরা খাইয়েছিলে, চল্লিশ বৎসর পরে এসে তার তলানিতে ঢাললে দু পেয়ালা গরম জল। সে প্রেম ফের চাড়া দিয়ে উঠল। বুঝলে? না টীকার জন্য প্রফেসর কির্ফেলের সন্ধানে বেরুতে হবে।'[১]

খানিকক্ষণ মুচকি হেসে শুধালে, 'আচ্ছা বল তো, আমার বয়স যখন কুড়ি আর তোমার ছত্রিশ তখন আমাদের দেখা হলে কী হত?'

আমি সতর্কতার সঙ্গে শুধালুম, 'হেরমান তখন বাজারে ছিল কি?'

বললে, 'জোঃ। শুধু হেরমান! আমি কি অতই ফ্যালনা! আমার রসের হাটে অন্তত হাফ ডজন নাগর ছিলেন। সপ্তাহের ছটা দিন ছটা উইক-ডে ওদের ভাগ করে দিয়েছিলুম রীতিমতো টাইম-টেবল বানিয়ে। আর রোববারটা রেখেছিলুম ফ্রি চয়েসের জন্য। সপ্তাহের ছ দিনের আটপৌরে কাপড় পরার মতো আটপৌরে লাভার নিয়ে তো রোববার বেরুনো যায় না। পরতে হয় সানডে বেসট্। কিন্তু কই আমার কথার তো উত্তর দিলে না।'

'কোন কথা?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'লাও! কোন কথা? হায়রে আমার লাভার! আমার বয়স যখন কুড়ি আর তোমার—'

'অ! বুঝেছি বুঝেছি, কিন্তু জুলিয়েটের বয়স তো ছিল চোদ্দ।'

'সে তো ইতালির মেয়ে, প্রেমের ফুল ফুটে যায় কলিটা ভালো করে শেপ নেবার পূর্বেই। ওরা তো দক্ষিণ দেশের।'

মনে মনে বললুম খাস কলকাত্তাই বজবজের লোককে বলে 'দোনো'। ওরা নাকি বড্ডই অকালপক্বতা রোগ ধরে— দোহাই ধর্মের আমাকে দোষ দেবেন না— শুনেছি, কলকাতায় ফুর্তি করতে এসে চারটি পয়সা বেঁচে গেলে কাগজ কিনে খুড়োর নামে একটা ভুয়ো

---

১. প্রফেসর কির্ফেল গডেনবের্গে বাস করতেন বলে লটে তাঁকে চিনত। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতেন। পুরাণ সম্বন্ধে তিনি একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। নাম 'ইন্তিশে কসমোগনি'। বহু জর্মন-অজর্মনকে উত্তম সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন— আমাকে শটকে শেখাতে পারেননি। সেনসাস রিপোর্টে ধর্মস্থলে তিনি লেখেন, 'বৌদ্ধ'।

www.pathagar.com

মোকদ্দমা লাগিয়ে গ্রামে ঢোকার সময় খুড়োকে শুধিয়ে যায় 'মোকদ্দমা লাগিয়ে এসেছি, খুড়ো! এইবারে শিকের ঝুলনো হাঁড়ি থেকে ধুতি শার্ট বের কর। সদরে কবার ছুটোছুটি করতে হবে রাসবিহারী ঘোষও বলতে পারবে না। আর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে যেও। নইলে খবরটা আমার কানে পৌঁছলে আমি তোমার ভাইপো হিসেবে বড্ড লজ্জা পাব যে।'

ওদিকে লটে অতিষ্ঠ।

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, 'ওই সময়ে দেখা হলে, হুঁ, একটা আতশবাজি, একটা বিশ্বযুদ্ধ, একটা ভূমিকম্প, একটা দাবানল, একটা প্রলয়ঙ্করী মন্বন্তর, একটা—' মুখে আর কথা জোগাল না। ঈষৎ ভয় পেয়ে বললুম, 'কিন্তু নাৎসিরা তখন সর্বশক্তিমান! তারা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইত! আমাকে ইহুদি ভেবে—'

'যাহ্। তোমাকে ইহুদি ভাবতে যাবে এমনতরো দু চোখ কানা নাৎসিদের ভিতরও হয় না। ইহুদিদের মতো শকুনিপারা বাঁকা নাক তোমার কোথায়? কোথায় মোটা মোটা ঠোঁট যার নিচেরটা ঝুলে পড়েছে বিঘৎ খানেক? কোথায় দুটো বিরাট বিরাট কান যেগুলো মাথার সঙ্গে চেপ্টে না গিয়ে পার্পেনডিকুলার হয়ে যেন আকাশের দু-প্রান্ত ছুঁয়ে উঠে আছে দুনিয়ার কে কী বলছে সেসব সাকুল্যে শোনার জন্য যেন ফাঁদ পেতেছে। আর বলতে নেই কিন্তু কোথায় তোমার সেই হাফ-মেয়েলি নাদুসনুদুস যুগ্ম নিতম্ব— ইহুদিদের পেটেন্ট করা মাল? বরঞ্চ আমাকে ইহুদিনী বলে ভাবতে পারে।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'করেছিল নাকি?'

তাচ্ছিল্লির সঙ্গে বললে, 'এক লক্ষ্মীছাড়া কালো কুর্তিপরা নাৎসি আমার সঙ্গে আলাপচারী করার জন্য কোনও অরিজিনাল পন্থা না পেয়ে শেষটায় ক্যাবলাকান্তের মতো বত্রিশটা পোকায় খাওয়া মুলোর মতো হলদে দাঁত বের করে শুধল, আমি ইহুদিনী কি না?'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ!' আমসটার্ডমের আন ফ্রাঙ্কের কথা মনে পড়াতে শরীরটা শিউরে উঠল। কনসানট্রেশন ক্যাম্পে অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে যে গেল, তার দিদি মৃত্যুশয্যায় ছটফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে মারা গেল। তাদের বুড়ি মা গেল অন্য ক্যাম্পে অনাহারে, কিন্তু শান্তসমাহিত-চিত্তে। পরিবারের মাত্র একজন বেঁচে গেলেন অবলীলাক্রমে। হুকুম এসেছিল যে কটা ইহুদি, বেদে, বামন বাঁটকুল আছে (এই বাঁটকুলেরা সার্কাসের ক্লাউন প্রভৃতি সেজে নাৎসি কসাইদের মনোরঞ্জন করত বলে এদের গ্যাস-চেম্বারে পাঠানোটা ক্রমেই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল) তাদের সবাইকে খতম করে কনসানট্রেশন ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করা হোক। কিন্তু সে আদেশ পালন করার পূর্বেই রাশানরা ক্যাম্প জয় করে সবাইকে মুক্তি দিল। এরই মধ্যে ছিলেন আন ফ্রাঙ্কের পিতা। ইনি যখন কৃষ্ণ সমুদ্র থেকে 'বাড়ি' 'আমসটার্ডম' পাড়ি দিলেন তখন তাঁরই মতো অবলীলাক্রমে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ইহুদিদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন তাঁর পরিবারের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির কথা।[১]

---

১. হিমলার সম্প্রদায় যে কী মারাত্মক আহাম্মুকিবশত কত লোক মেরেছে তার হিসাব নেই। একবার ধরা পড়ে কয়েকশো বা হাজার এক অজানা জাতের লোক। বিস্তর এনসাইক্লোপিডিয়া ঘেঁটেও হিমলারের 'জাতি নিরূপণ বিভাগের' ভুঁইফোঁড় 'পণ্ডিতরা' স্থির করতে পারলেন না, এরা আর্য না

www.pathagar.com

লটে বললে, 'আমি তেড়ে বললুম, আমার চতুর্দশ পুরুষ ইহুদি।' তার পর হ্যান্ডব্যাগ থেকে বের করে আমাদের ছাপানো কুলজি দিলুম বাছাধনের হাতে। ওটা ছাপা হয়েছিল কাইজারের আদেশে। তিনি অবশ্য তখন নির্বাসনে। কিন্তু কাইজার থাকাকালীন তিনি এরকম কেউ শতায়ু হলে তাকে অভিনন্দন জানাতেন, ঠাকুদ্দার বাবাকেও সেই রীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা জানান এবং অনুরোধ করেন আমাদের কুলজি যেন নির্মাণ করা হয়।

আমাদের অধ্যাপক কির্ফেল, গেরেমভারি বিস্তর বাঘা বাঘা প্রফেসর মায় পাদ্রি সাহেবরা, যাঁদের গির্জেতে আমরা বাপ্তিস্ট হয়েছি এবং চার্চের কেতাবে আমাদের নাম রয়েছে— এন্তের গবেষণা করে প্রমাণ করলেন আমাদের পরিবার সাতশো বছরের পুরনো ক্যাথলিক। এর চেয়ে প্রাচীনতর কোনও পরিবার আছে বলে তাঁরা জানেন না। এটা যখন তৈরি হয় নাৎসিরা তখনও দাবড়ে বেড়াতে আরম্ভ করেননি। কাজেই ওতে কোনও ফাঁকি-ফক্কিকারি ছিল না। আর গোটা ফতোয়াটাতে ক্যা অ্যাব্বড়াবড়া শিলমোহর— সুপ প্লেটের সাইজ।'

কথা থামিয়ে হঠাৎ বললে, 'বেচারি হেরমানকে কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? না বাইরে খাবে।'

আমি বললুম, 'না হয় হেরমানের হাতে গুলি খেয়েই মরব। কিন্তু হরিণের মাংসটা খেয়ে নিয়ে।'

বললুম, 'এই আসছি', কাউন্টারে গিয়ে কিনলুম একটা ঢাউস কেক।

ফিরতেই লটে বললে, 'এ আবার কী আদিখেত্তা।'

আমি বললুম, 'হেরমানের জন্য ঘুষ।'

বললে, 'আখ্! ঘুষ দেবার প্রাচ্যদেশিক পদ্ধতি এদেশে আবার আমদানি করছ কেন?'

২৬

বন-গডেসবের্গে একদা প্রবাদ ছিল, হাতে যদি মেলা সময় থাকে তবে ট্রামে চাপো, নইলে হন্টনই প্রশস্ততর, অর্থাৎ সংকীর্ণতর অর্থাৎ কম সময় লাগবে। কারণ এসব প্রাচীন শহরে এত গলিঘুঁজির শর্ট-কাট রয়েছে যে ট্রামকে অনায়াসে টিড দিতে পারেন— কারণ তাকে যেতে হয় চওড়া রাস্তা দিয়ে এবং তাকে অনেকখানি ঘুরে-ফিরে কখনও-বা ট্রায়েঙ্গেলের দুই সাইড কাভার করে, কখনও-বা চতুর্ভুজের তিন ভুজ দিয়ে তিন হদ্দি (ঈশ্বর রক্ষতু। চৌহদ্দি হয়) কেটে মোকামে পৌঁছতে হয়। বস্তুত আপনি ঘলিঘুঁজি দিয়ে যাবার সময় ওই ট্রামকে অন্তত বার দু তিন অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন— আপনার অনেক পিছনে। বস্তুত সে আমলে তিন শ্রেণির লোক ট্রামে চাপত: প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে আহত খঞ্জ, বাচ্চা-কোলে মা এবং থুত্থুরে বুড়ি। বস্তুত কোনও সুস্থ-সমর্থ যুবক ট্রামে উঠলে সবাই ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাত : ভাবত নিশ্চয়ই অগা টুরিস্ট কিংবা মুক্ত পাগল (বদ্ধ পাগল নয়) : পাগল গারদকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে।

অনার্য, 'সাবধানের মার নেই' এই তত্ত্বের স্মরণে শেষটায়— বোধহয়, একটা মুদ্রা টস করে— ওদের গ্যাস-চেম্বারেই পাঠানো হল। যুদ্ধের পর সন্দেহাতীতরূপে আন্তর্জাতিক গবেষকরা মীমাংসা করলেন এরা আর্য। এ জাতের কটা লোক এখনও বেঁচে আছে কেউ জানে না।

www.pathagar.com

শুনেছি, কাশীর ঠিক মধ্যিখানে ওই একই হাল। হাতে এন্তের সময় থাকলে টাঙ্গাগাড়ি নেবে, না থাকলে চরণশকট। দিল্লিতে তো রীতিমতো এর আঙ্গিনা দিয়ে, ওর রান্নাঘরের দাওয়া থেকে লম্ফ মেরে তেসরা আদমির চৌবাচ্চায় উঠে, এমনকি সুড়ুৎ করে কোনও রমণীর প্রসাধনকক্ষের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোকাম পৌঁছানই রেওয়াজ। কেউ কিছুটি বলবে না।

রাস্তায় নেমে লটে শুধাল, 'ট্রাম না হন্টন?'

আমি গুনগুন করে গান ধরলুম,

'— তোমারি অভিসারে
যাব অগম পারে—'

লটে খুশি হয়ে বললে, 'বাহ্ তোমার তো বাস ডুঙ্কেলে (অন্ধকার) গলা।'

আমি শুধালুম, 'ডুঙ্কেলে স্টিমে, সে আবার কী?'

'ও হরি, তা-ও জানো না। হেলে স্টিমে— সে হল পরিষ্কার গলা—'

আমি অভিমানভরে বললুম, 'বদখদ গলা? সেকথা সোজা কইলেই পার, অত ধানাইপানাই কেন? আর তোমার হেরমানের গলা বুঝি কোকিলের মতো, ৎসুজ কুকুক্ নখ্মাল্ (চুলোয় যাকগে)'—[১]

বাধা দিয়ে লটে বলে, 'তোর বুদ্ধি বাড়তি না কমতি?' সুকুমার রায় যেরকম 'হযবরল' নামক তুলনাহীনা পুস্তিকায় কার যেন বয়স কত জানার পর বিদকুটে প্রশ্ন শুধান 'বাড়তি না কমতি?' অর্থাৎ বয়স বাড়ছে, না কমছে?

আমি তাড়া দিয়ে বললুম, "আমি ছেলেবেলাতেই ছিলুম অলৌকিক বালক। যে রকম বেটোফেন আট না দশ বছর বয়সে ওস্তাদস্য হেন্ডেল একবার এই গোডেসবের্গে এলে পর তার সামনে কী যেন এক যন্ত্র বাজান, মেন্ডেলজন ওই বয়সেই গ্যোটের সামনে পিয়ানো বাজান। তোমরা যাকে বল ভুন্ডার কিনট্ (ওয়ান্ডার চাইলড্) ইংরেজিতে বলে 'চাইলড্ প্রডিজি'।"

---

১. জর্মন শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে : কোকিলকে জর্মনে কুকুক্ বলে। তবে দু টাতে বোধহয় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে— যদ্দুর আমার জ্ঞান। ৎসুজ কুকুক্ নখ্মাল্, অনেকটা আমাদের 'কচু, ঘণ্টা, হাতি'-র মতো। এস্থলে কোকিলকেই কেন বেছে নেওয়া হল সে প্রশ্ন যদি আপনি শুধোন তবে উত্তর, 'কচু, ঘণ্টা, হাতি'ই বা আমরা বেছে নিলুম কেন? 'ছাই জানো' কেন? আর জর্মনে বলা হয়, যে কোকিললোকে (কুকুকস্ল্যান্ড) বাস করেছে সে মহাশূন্যে বাসা বেঁধেছে; বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। হিটলারের তাবৎ সৈন্যদল যখন পরাস্ত, রুশরা বার্লিন উপকণ্ঠে হানা দিয়েছে তখনও হিটলার ম্যাপের উপর লাল-নীল নানা রঙের বোতাম সাজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক সেনাবাহিনীর (কারণ তারা তখন হেরে গিয়ে উধাও) প্রতীক দিয়ে কোথায় তিনি পুনরায় আক্রমণ করে রুশদের মরণকামড় দেবেন, তারই স্ট্র্যাটেজি-পরিকল্পনা করছেন। যেসব জেনারেল তখনও তাঁকে ত্যাগ করেননি তাঁরা বাস্তবের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন বলে যুদ্ধশেষে লিখেছেন, 'হিটলার তখন কোকিললোকে বাসা বেঁধেছেন।' বিশেষ করে কোকিলকেই কেন বাছা হল— সে তো খুব উর্ধ্বাকাশে যায় না— তার কারণ বোধহয় সেই অবাস্তবলোকে কোকিলই তাঁকে মধুর আশার বাণী শোনায়।

www.pathagar.com

লটে আমাকে জড়িয়ে ধরে— জায়গাটায় ঈষৎ আলোছায়ার লুকোচুরি চলছিল— বললে, 'হ্যাঁ আলবৎ! তুমি সেই ছাব্বিশ বছরেই ছেষট্টি বছরের বুদ্ধি ধরতে।'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'হেঁ হেঁ।' তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, লটে মিন করেছে, ছাব্বিশের পর আমার বুদ্ধি বাড়েনি। বললুম, 'কী বললে?'

লটে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললে, 'এই তো তোমার আরেক প্রিয়া, লিস্‌বেটের বাড়ি।'

আমি চিন্তান্বিত হয়ে বললুম, 'লিস্‌বেট? লিস্‌বেট?— আ এলিজাবেৎ।'

অবহেলার চরমে পৌঁছে লটে যা বললে সেটা আমরা বাঙলায় বলি, পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন।

আমি বললুম, 'ওর সঙ্গে আমার আবার কবে ভাব-ভালোবাসা হল? আমাদের মেলার সময় সবাই সকলের সঙ্গে কথা কয়। সেখানে প্রথম আলাপ। তার পর তো মাত্র দু-তিন বার ট্রামে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি আর ও তোমরাই তো ছিলে দু জন যারা এখান থেকে বন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে।'

ট্রামে সামান্য আলাপ হয়।'

'তার পর সেটা যে দানা বাঁধল না তার একমাত্র কারণ, মেলার তিন-চারদিন পরই তো তোমার ল্যান্ডলেডি গোডেসবের্গের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বন-এ ফ্ল্যাট নিল। তুমিও সুশীল ছেলের মতো তার সঙ্গে সঙ্গে বন চলে গেলে। কেন? গোডেসবের্গে কি অন্য ঘর আর ছিল না?'

আমি চুপ।

বললে, 'আমি কেঁদেছিলুম।'

আমি তো অবাক।

আমরা তখন র‍্যোমার প্ল্যাৎসে পৌঁছে গিয়েছি। লটে বললে, 'ওই দ্যাখো একটা ট্রাম আসছে। ওটা ধরলে পাঁচ মিনিটে বাড়ি পৌঁছে যাব।'

আমি সেই প্রাচীন প্রবাদ 'সময় হাতে থাকলে ট্রাম, নইলে হন্টন' উদ্ধৃত করলুম।

'ছোঃ, এখন তো ট্রামটা একদম ফাঁকা রাস্তা দিয়ে নাক বরাবর মেলেম যাবে! একদম আমাদের বাড়ির সামনে ট্রামের টার্মিনাল।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'পায়ে চলার পথ দিয়ে কিছুটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে একদম রাইনের পাড়ের উপর একটা ফুটফুটে কটেজ আছে বলে মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার কী করে এতসব মনে আছে?'

'য়োহানেস সে তো যুদ্ধে রয়ে গেল, আংনেস আর আমি এখানে প্রায়ই আসতুম— রাইনে সাঁতার কাটতে। একদিন হয়েছে কী— সে ভারি মজার গল্প— আংনেস একটা ঝোপের আড়ালে ফ্রক-ট্রক ছেড়ে সেগুলো একটা উঁচু ঝোপের নিচের ডালে ঝুলিয়ে রেখে সুইমিং কস্ট্যুম পরে বেরিয়ে এল। সাঁতার কাটতে কাটতে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ফেরার মুখে আংনেস কিছুতেই সে ঝোপ খুঁজে পায় না। বেঝো ঠেলা। য়োহানেস, জানো তো, সবসময়ই ঠাট্টামস্করা করতে ভালোবাসত। সে বিজ্ঞভাবে বললে, 'নিশ্চয়ই আংনেসের কোনও এডমায়ারার চুরি করেছে।' যেন চাপানের ওতর দিলুম, 'যেন বৃন্দাবনের বস্ত্রহরণ।' য়োহানেস

শুধাল, 'সে আবার কী?' ওদিকে আংনেস কাঁদো কাঁদো। সুদ্দুমাত্র সুইমিং কসট্যুম পরে এখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত সদর রাস্তা দিয়ে সে যাবে কী করে। চোখের জলে প্রায় ভেসে গিয়ে বললে, 'তোমরা দু জনার কেউ কি লক্ষ করনি আমি কোন ঝোপটার আড়ালে কাপড় ছেড়েছিলুম?'

য়োহানেস, 'বা রে! আমরা বুঝি আড়ি পেতে দেখব একটি তরুণী কী প্রকারে বিবস্ত্র হচ্ছে?'

কোরাস :

আমি, 'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! ভদ্রতায় বাধে নইলে—'

আংনেস : অশ্রুবর্ষণ তথা রোদন।

শেষটায় আমি বললুম, 'ওই যে রাইনের পাড়ে বাড়িটি— সেখান থেকে না হয় তোমার জন্য একটা ফ্রক ধার নেওয়া যাবে।' অবশ্য ও-বাড়ির বাসিন্দাদের আমরা আদৌ চিনতুম না।

লটে বললে, 'তখন সে বাড়িতে থাকতেন আমার শ্বশুরশাশুড়ি আর হেরমান। তাঁরা গত হলে পর— সে অনেক দিনের কথা— হেরমান আমাকে বিয়ে করে ওই বাড়িতে তোলে। নইলে তো অন্য বাড়ি খুঁজতে হত। কিন্তু—'

ট্রামগাড়ি তখন প্রায় ফাঁকা। টার্মিনাসে পৌঁছেছে কি না। ঠাঠা করে অট্টহাস্যে কন্ডাক্টরকে সচকিত করে লটে শুধু হাসে আর হাসে।

আমি শুধালুম, 'কী হল?'

হাসতে হাসতে বললে, 'সে বাড়িতে তখন তো আমার শাশুড়ি ভিন্ন অন্য কোনও মেয়েছেলে নেই। তাঁর ওজন ছিল নিদেন একশো কিলো। ইয়া দশাসই গাড়র্গুম লাশ। আংনেসের চেয়ে দেড় মাথা উঁচু। তাঁর ফ্রক পরে আংনেস রাস্তায় নামলে তোমাদের দু জনাকে মাটিতে লুটনো সেই ফ্রকের শেষপ্রান্ত তুলে ধরে চলতে হত— বিয়ের সময় গির্জেতে দুটি মেয়ে যে রকম কনের অ্যাল্‌লম্বা ফ্রকের শেষপ্রান্ত তুলে ধরে পিছন পিছন যায়। তা সে যাকগে। শেষটায় হল কী তাই কও।'

'পর্বতের মূষিকপ্রসব। ব্যাপারটা কী জানো, আমাকে তোমরা যতখানি ভালো ছেলে বলে মনে করতে—'

'কে বললে?'

'আমি ততখানি মোটেই ছিলুম না। আড়ি পেতে বেশ কিছুটা—'

'চোপ!'

'অবশ্য আমি চালাকও বটি। যখন ঝোপটা খুঁজে পেলুম তখন তার থেকে বেশ খানিকটে দূরে গিয়ে য়োহানেসকে ডেকে বললুম, 'ওহে সোনার চাঁদ য়োহানেস, ওই হোথা ঝোপটায় তদন্ত কর তো। আমি এদিকটা সামলাই।'

মূর্খ য়োহানেস যখন আবিষ্কারের বজ্রধ্বনি ছাড়ল তখন কোথায় লাগে প্রাচীন যুগের 'ইউরেকা'— সে তো ঝিঁঝিঁ পোকার মর্মরধ্বনির মৃদু গুঞ্জরণ।

আংনেস তখন য়োহানেসের দিকে যেভাবে তাকাল তার তুলনা তুমি যদি আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে খুনের শাসানি দিয়ে শুনতে চাও তবে বলব, য়োহানেস যদি কোনও গ্রামের দয়ানিধি নিরীহ পাদ্রিসাহেবকে সপরিবার হত্যা করে তাদের লাশ ওই গ্রামের একটিমাত্র কুয়োতে ফেলে দিয়ে তার জল বিষিয়ে দিত তবুও বোধ হয় গ্রামের কনস্টেবল তার দিকে ওভাবে তাকাত না।'

মনে মনে বললুম, 'খেল্লেন দই রামকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন।'

www.pathagar.com

সেই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে বনের পথে আঁধার-আলোর আলিম্পনের উপর দিয়ে আমি লটের কোমরে হাত রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। লটে যেন আরও ধীরে ধীরে যাচ্ছে। সে বনে যেন আবেশ লেগেছে। রাইন থেকে বয়ে আসা বাতাসের পরশে পাতায় পাতায় যেন নূপুরধ্বনির মৃদু গুঞ্জরণ। হায় যদুপতি, কোথায় গেল মথুরাপুরী— না, না, কোথায় গেল সেই কদম্ব বনঘন বৃন্দাবন! কলিযুগে দেবতাদের স্মরণ করা মাত্রই সম্বল।

— চলি পথে যমুনার কূলে
শ্রীরাধামাধব কিবা
কুঞ্জে কুঞ্জে রসকেলি করে।
বল লটে, কেবা যায় ঘরে!!

হায়, আমার কপাল যে বড়ই মন্দ।

লটে তার দীর্ঘতম উষ্ণ প্রশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি বড় দেরিতে এলে।'

আমি মনে মনে বললুম, 'তবু তো এসেছি।' কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণীর শোক তো লটে জানে না। শ্যামসুন্দর যখন মথুরা চলে গেলেন তখন তারই স্মরণে আমারই গ্রামের কবি গেয়েছিলেন :

'দেখা হইল না রে, শ্যাম, আমার এই
নতুন বয়সের কালে।'

লটে বাড়ির দোরে ল্যাচকি লাগাবার পূর্বেই হুস করে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে— কে আর হবে— হেরমান।

আমি মূর্ছাহতের ন্যায় দরজা চেপে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কটা পিস্তল?'

২৭

এই হেরমান লোকটির সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার জীবনে একটা দুঃখ থেকে যেত। খবরের কাগজে তাই কোনও কোনও বেসাতির চতুর বেসাতি বিজ্ঞাপনে বলেন, 'আপনি জানেন না, আপনি কী হারাইতেছেন' অর্থাৎ আপনি যে 'সানসার্ফ' কিংবা 'অমূল্য রমা-দালদা' ব্যবহার করছেন না— তাতে করে আপনার যে কী মারাত্মক সর্বনাশ হচ্ছে সেকথা আপনি জানেন না।' উত্তরে গুণীরা বলেন, 'হুঁ! যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে, সেটা আমার আর কী ক্ষতি করতে পারে। যতক্ষণ আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলস্বরূপ আপনি জানতে পারেননি আপনার একচেটে প্রিয়া বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাস করেন, ভূমাতে আনন্দ পান, কাউকে কোনও ব্যাপারে বঞ্চিত করে তাকে মনোবেদনা দিতে অতিশয় বিমুখ, ততক্ষণ আপনার কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ভয়।' কিন্তু হায়, এ তত্ত্বও সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয় না। আপনার সেই প্রিয়াই আপনার অজানাতে খাদ্যে সেঁকো মিশিয়ে দিল। আপনি সেঁকোর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না বলে সেঁকো কি আপন ধর্মানুযায়ী কর্ম করে আপনাকে নিমতলায় পাঠাবে না? সেকথা থাক।

ইতোমধ্যে লটে টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুট দিয়েছে, রান্নাঘরের দিকে।

www.pathagar.com

হেরমান দেখলুম তৈরি। কোনও গুরুর কৃপায় জানতে পেরেছে যে আমি মোজেল খেতে ভালোবাসি। অত্যুৎকৃষ্ট মোজেল নিয়ে এল ফ্রিজ থেকে। একটা গেলাসে নিজের জন্য ঢেলে নিয়ে আমার গেলাসে ঢালল। পাঠক হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, এটিকেট পর্যায়ে যেরকম প্রথম আপ্তবাক্য, লেডিজ ফার্স্ট, ঠিক তেমনি মেহমানদারির মামেলায় প্রথম অনুশাসন, 'গেস্ট ফার্স্ট'। কিন্তু লটে নির্দেশিত প্রথম আপ্তবাক্যের যে রকম ব্যত্যয় আছে, এই অনুশাসনের বেলাও হুবহু তাই। আপনি যদি মেহমান (অতিথি সৎকারক)[১] হন, তবে আপনি সরবত, হুইস্কি ইত্যাদি দেবার সময় প্রথম মেহমানের জন্য ঢালবেন। কিন্তু যদি যে বোতল থেকে ঢালছেন সেটা কর্ক দিয়ে ছিপি আঁটা থাকে তবে নিজের জন্য ঢালবেন, পয়লা। কারণ অনেক সময় কর্কের অতি ছোট ছোট টুকরো বা গুঁড়ো পানীয়ের উপরে ভাসে। হোস্ট নিজের গেলাসে প্রথম ঢালতে সে 'রাবিশ' তিনি গ্রহণ করবেন। বিবেচনা করি বিদ্যেসাগরমশাই এই নীতিটি ঈষৎ সম্প্রসারণ করেই দুধ ঢালবার সময় আরশোলাটা আপন গেলাসে গ্রহণ করেছিলেন।[২]

হেরমান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলেন, 'ইচ্ছে হোক।'

আমি সঙ্গে আনা কেকটা করিডরের একটি ছোট্ট টেবিলে রেখে এসেছিলুম। চিন্তা করতে লাগলুম, লটের অসাক্ষাতে কেকটি এই বেলা দরগায় ভেট দেব কি না। এমন সময় লটেই ছুটে গিয়ে কেকটা নিয়ে এসে বললে, 'এই নাও তোমার ঘুষ। তোমার কাছে দুটো পিস্তল আছে শুনে সেই ভয়ে এনেছে।'

হেরমান বললে, 'তা হলে শেমপেন অনুপানরূপে ব্যবহার করতে হয়। তাবৎ ইউরোপে বিশেষ করে বিলেতে 'কেক অ্যান্ড শেমপেন', 'শেমপেন অ্যান্ড কেক'। (মদ্দেশীয় 'মুড়ির সঙ্গে পাঁপড়ভাজা' কিংবা 'মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু মরণকালে হরির নাম')। তুমি একটু বসো লটে, আমি সেলার থেকে নিয়ে আসছি।' কে বা শোনে কার কথা। হেরমানের অনুরোধ শেষ হওয়ার পূর্বেই সেলারের কাঠের সিঁড়িতে শোনা গেল লটের জুতোর খটখট শব্দ।

বোতল ঘিরে মাকড়ের জাল এবং দেড় পলস্তরা ধুলো। জর্মন, ডাচ, অস্ট্রিয়ান, সুইসরা ঘরদোর মাত্রাধিক ছিমছাম রাখে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ কুঠুরির মদের বোতল কক্খনও ঝাড়ামোছা করা

---

১. মেহমান শব্দ আমরা জানি, কিন্তু মেজমান (host) শব্দটিও যদি বাঙলায় চালু হয় তবে একটা জুৎসই শব্দ পাওয়া যায়। অতিথি-সৎকার ইত্যাদি শব্দে আমি ঈষৎ ভীত। এক মারওয়াড়ি 'বিদ্যাসাগর' নাকি তাঁর বাঙালি অভ্যাগতকে সবিনয় বলেন, 'আপনি এই এখানে দেহরক্ষা করুন। আমি আপনার সৎকার (আপ্যায়ন) করি।'

২. 'বঙ্গের রত্নমালা' না কী যেন এক পুস্তকে আমি এটা পড়ি। সেখানে 'গেলাস' শব্দই ছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে-যুগে তখনও ফিরিঙ্গির গেলাস গৌড়ীয় পরিবারে প্রবেশাধিকার পায়নি। আর পাঠান-মোগল ব্যবহার করত 'জাম'— যার থেকে জামবাটি। ইদানীং ইন্দ্রমিত্র মহাশয় নাকি বিস্তর বিদ্যাসাগরীয় লেজেন্ড ফুটো করে দিয়েছেন (আফটার অল, ঘটির দেশ তো!), এটা করেছেন কি না জানিনে। কারণ তাঁর পুস্তকখানি প্রাপ্তির ঘণ্টাখানেকের ভিতর সেটি কর্পূর হয়ে যায়। চোর মহাশয় যদি সেটা ফেরত দেন তবে আমি রাবণের মতো দশ হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করব। হায়রে দুরাশা—

www.pathagar.com

হয় না। এবং মেহমানের সামনেও সেটা পেশ করা হয় ওই অবস্থাতেই। তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাবেন, ইটি প্রাচীন দিনের খানদানি বস্তু।[৩] ইতোমধ্যে লটে এনেছে একটা রুপোর কিংবা ওই জাতীয় কোনও ধাতু সংমিশ্রণে তৈরি, বরফে ভর্তি একটা বালতি। হেরমান বতরিবৎ বোতলটি ন্যাপকিন দিয়ে সাফসুৎরো করে বালতিতে ঢুকিয়ে বললে, 'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আমাদের সেলারটিই আধা ফ্রিজ। এই হল বলে। ততক্ষণ মোজেল চলুক।'

আমি রহস্যভরা কণ্ঠে বললুম, 'যতক্ষণ বেত না আসে কানমলা চলুক।'

এরকম বেরসিক আছে যারা কোনওকিছু না বুঝতে পারলে হাসে। ভাবে, যখন বুঝতে পারিনি তখন নিশ্চয়ই কোনও রসিকতা। আশস্ত হলুম, হেরমান সে গোত্রের নয়।

এস্থলে এটা রসিকতা। এবং এতই উত্তম যে যদিও এটি আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করেছি তবু অক্লেশে এটার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

বললুম, 'আমাদের দেশের গ্রামঞ্চলে কোনও মর্কট বড্ড বেশি বাঁদরামি করলে পণ্ডিতমশাই সর্দার পড়ুয়াকে আদেশ করেন 'একখানা লিকলিকে বেত নিয়ে আয় তো' এবং ছেলেটার কান মলতে মলতে বলেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে কানমলা চলুক—'

অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ না শুনেই হেরমান হো হো করে হেসে বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। যতক্ষণ শ্যেমপেন না আসে মোজেল চলুক। উত্তম রসিকতা।'

'বিলকুল এবং শুধুমাত্র তাই নয়, এটা নিত্য ব্যবহার্য না হলেও পালপরবে অবশ্যই। এমনকি আপন গৃহেও। এই মনে করুন লটে আপনাকে কী একটা হাবিজাবি মাছ খেতে দিল। আপনি নিমন্ত্রিত বন্ধুসহ দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে রান্নাঘর থেকে মুরগি রোস্ট করার খুশবাই পেয়েছিলেন। তাই সেই হাবিজাবি খেতে খেতে ইয়ারকে বলবেন, যতক্ষণ বেত (রোস্ট) না আসে' ইত্যাদি এবং তার পর সেটি রসিয়ে রসিয়ে বুঝিয়ে বলবেন। এবং—'

ইতোমধ্যে আমার কোচের পশ্চাৎ থেকে হুঙ্কার শুনতে পেলুম, 'কী! আমি বুঝি হাবিজাবি মাছ রাঁধি! জানো, রাইনের জন্ম হওয়ার বহু বহু যুগ আগের থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে রাইনের পারে বাস করছি (আমি মনে মনে বললুম, 'রামের পূর্বেই রামায়ণ!'), রাইনের মাছ আমি রাঁধতে জানিনে— মুরমুরে ভাজা, আঙুর পাতায় জড়ানো স্যাঁকা— খেয়েছ কখনও?'

আমি বললুম, 'রাইনের মাছ যে অপূর্ব সে বিষয়ে সন্দেহ করে আমি কি তৃতীয় পিস্তলকে আমন্ত্রণ জানাব? আমাদের গঙ্গার ইলিশও কিছু ফ্যালনা নয়। সংস্কৃতে শ্লোক আছে, আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, কিসের উপরে যেন কী, তার উপরে যেন আরও কী, তার উপর বোধ হয় জল, তার উপর কচ্ছপ, কচ্ছপের উপর পৃথিবী, তার উপর হিমালয়— তোমাদের আলপ্‌স্‌ তো তার হেঁটোর বয়সী— তার সর্বোচ্চ চুড়ো এভারেস্টের উপরে শিব—'

'ও! শিবের কাহিনী আমি জানি। কিন্তু বলে যাও।'

---

৩. এটিকেট, যার বাড়াবাড়িকে চালিয়াতি বলা যেতে পারে, বিলেতে নগণ্য জন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়ে 'হঠাৎ নবাব' (আপস্টার্ট) বনে যাওয়ার পর সে যখন সমাজের উচ্চতম স্তরের ডিউক-আর্লদের সঙ্গে দহরম মহরম করে কল্কে পেতে চায় (স্নবারি) তখন তাকে সাহায্য করার জন্য একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লেখেন এক ডিউক স্বয়ং— বিলেতের প্রাচীনতম ডিউকদের অন্যতম। ডিউক অব বেডফর্ড লিখিত পুস্তিকার নাম 'বুক অব স্নবস'। ইনি তাঁর প্রাসাদ দর্শকের জন্য অবারিতদ্বার করে দেন দেড় শিলিঙের দক্ষিণার পরিবর্তে।

www.pathagar.com

'শিবের উপর তাঁর জটার ভিতর গাঙ্গেস (গঙ্গা) তার জলের উপর কেলি করেন ইলিশ। সেই সর্বোচ্চ স্থানাসীন ইলিশ যে খায় না, তার চেয়ে বৃহত্তর মূর্খ ত্রি-সংসারে আর কেউ আছে কি?[৪] কিন্তু ভদ্রে, আমি তো শুনেছি, অগুনতি জাহাজের পোড়া তেল ইত্যাদি (বিল্‌জ্) প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে এখন নাকি রাইনের মাছে আর সে সোয়াদ নেই।'

লটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। দশ সেকেন্ড যেতে না যেতে বলল, 'এখুনি আসছি।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তুমি ঠিক আমার বোনেদের মতো। যখনই ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠি— এবং সেটা ঝাড়া চল্লিশ বছরের ব্যবধানে নয়— তখনই তারা ঠিক তোমারই মতো ডার্বি ঘোড়ার স্পিডে ঘড়ি ঘড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুট দেয়। ভালোমন্দ এটা-সেটা নয়, রাজ্যের তাবৎ পদ খাওয়াবে বলে। আমি বলি, 'বোস, তোর সঙ্গে দুটি কথা কই, কতদিন পরে দেখা। আমি তো খেতে আসিনি।' কিন্তু ওরা শোনে না, ওরা জানে, যবে থেকে মা গেছে, অন্য কারওরই রান্না আমার পছন্দ হয় না। ওরাই কিছুটা পারে, কিছুটা নয়, বেশ বিস্তর।'

লটে তার ঠোঁটের উপর করুণ মুচকি হাসির সঙ্গে মধুরিমা মিশিয়ে বললে, 'সে আমি জানি। তুমি একদিন বিষ্যুৎবারে রাত নটার সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছিলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। আমি তখনও ছোটদের মধ্যে। টায়-টায় আটটায় শুয়ে পড়তে হত। সে রাত্রে পূর্ণিমার চাঁদ পড়লেন তাঁর কড়া আলো নিয়ে আমার চোখের উপর। পর্দাটা টানবার জন্য জানালার কাছে যেতেই দেখি তুমি। ফিস ফিস করে ডাকলুম তোমাকে। তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে, "এক লহমার তরেও সময় নেই। চিঠি ফেলতে ডাকঘরে যাচ্ছি।" তার পর ঠিক জানালার নিচে দাঁড়িয়ে—'

হেরমান বিগলিত কণ্ঠে মুদিত নয়নে কাব্যিক কাব্যিক সুরে বললে— যেটা বাঙলায় দাঁড়ায়— 'মরি গো মরি! সখী তোরা আমায় ধর, ধর। এ যে সাক্ষাৎ রুমিয়ো-জুলিয়েট। আর বলতে হবে না। রুমিয়ো তখন পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী মেনে লটে— থুড়ি শারলটে-কে, ফের থুড়ি, জুলিয়েটকে তাঁর অজরামর প্রেম নিবেদন করলেন— তোমাদের কপাল ভালো, মাইরি। সে সন্ধ্যাটা পূর্ণিমা না হয়ে অমাবস্যাও হতে পারত, পূর্ণিমা হয়েও গভীর ঘনমেঘের ঘোমটা পরে আত্মগোপন করে থাকতে পারত—'

লটে বললে, 'কী জ্বালা! হ্যার সায়েডের বুকপকেটে তখন তার প্রিয়া আনামারি, জরিমানা, মার্লেনে— জানিনে কোন প্রিয়ার নামে লেখা প্রেমপত্র। আর সে তখন শপথ করবে আমাকে প্রেম নিবেদন করে! অতখানি ডন জুয়ান আমার বন্ধু কস্মিনকালেও ছিল না। শোনোই না বাকিটা। আমি তো সেই সন্দ করে ঠোঁট বাঁকিয়েছি—' আমার দিকে তাকিয়ে বললে— 'এখখুনি ছুটতে হবে। ইন্ডিয়ান সাপ্তাহিক মেল-এর শেষ ক্লিয়ারেনস গোডেসবের্গে হয় প্রতি বিষ্যুৎবারে—'

রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। বললুম, 'তাই বল— নইলে সেটা যে বিষ্যুৎবার ছিল সেকথাটা এত যুগ পরেও তোমার মনে রইল কী করে, আমিও তাই ভাবছিলুম।'

৪. সংস্কৃত শ্লোকটি কোনও কাব্যচঞ্চু মহোদয় যদি 'দেশ' সম্পাদক মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব, তথা বহু পাঠক উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

লটে অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'শোনোই না! তুমি আর হেরমান যেন যমজ দুই ভাই জেমিনাই (অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়) একজন যদি থামলেন তো অন্যজন পোঁ ধরলেন।'

আমি মুদিত নয়নে উর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করলুম, 'আমেন, আমেন।'

লটে : 'মানে?'

'অতি সরল। জেমিনাই জমজ... অন্তত আমাদের দেশে— একই সময়ে একই রমণীর প্রেমে পড়েন।'

হেরমান লম্বা এক দমে শেমপেন গেলাস শেষ করে বললে, 'লাও! অ্যাদ্দিন বাদে এসে জুটলেন আমার, সাতিশয় মাই ডিয়ার, টুইন ব্রাদার তার, খবর নিতে। তখন কোথায় ছিলে, বৎস, হ্যার ডক্টর, যখন লটের প্রেমে আমি চোখের জলে নাকের জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, বিষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে রাঁদেভূতে পৌঁছে মাদমোয়াজেলকে না পেয়ে তিক্ততম সত্য অনুভব করলুম, সেই জলঝড়ে তিনি তাঁর সাত বছরের পুরনো ফ্রকটি— যেটা এ আমলের ফ্যাশানের নিদর্শনস্বরূপ লুভর যাদুঘরে হেসে-খেলে উচ্চ সিংহাসন পায়— সেটাকেও বরবাদ করতে নারাজ, এবং—'

হেরমানের খেদোক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লটে যেন শুধু আমাকে বললে— দু গালে দুটি টোল জাগিয়ে— 'তখন তুমি বললে, "সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে সেই সুদূর ইন্ডিয়ায় মা বসে আছে এই চিঠির প্রতীক্ষায়। শেষ ক্লিয়ারেন্স মিস করলে ইন্ডিয়ান মেলও মিস। মাকে নেক্স্ট চিঠির জন্যে প্রহর গুনতে হবে আরও পুরো সাতটি দিন। আর— আমার মা স্বপ্নেও কাউকে কখনও অভিসম্পাত করেনি— নইলে তার অভিশাপে গোটা জর্মন দেশটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মনে পড়ছে?" '

আমি ভেজা গলায় বললুম, 'খুব মনে পড়ছে। কিন্তু তোমার মনে আছে কি, তুমি প্রায়ই আমাকে তার পর শুধাতে, "মায়ের চিঠি লিখেছেন? কেন বাপু, বিষ্যুৎবারের শেষ মুহূর্তে চিঠি লিখতে বসা? দু দিন আগে ধীরেসুস্থে চিঠিটা লিখে পোস্ট করতে আপনাকে ঠেকিয়ে রাখে কোন হিন্ডেনবুর্গ?" তুমি বড় পাকা মেয়ে ছিলে, ডার্লিং লটে!'

২৮

'যোগাযোগ, যোগাযোগ! সবই যোগাযোগ।' দার্শনিকার মতো বললে লটে।

আমি শুধালুম, 'কী রকম?'

বললে, 'এই যে আকস্মিকভাবে আমাদের দেখা হল।'

হেরমান জর্মনে যে শব্দটি ব্যবহার করল সে যদি বাঙাল হত তবে বলত 'খাইছে!' ঘটিগো ভাষায় 'খেয়েছে!' 'এই মরেছে'-তে ঠিক যেন সেরকম খোলতাই হয় না। আবার ওরা যখন বলে 'মাইরি' তখন আমাগো ভাষায় তার ইয়ার পাওয়া যায় না।... তার পর বললে, 'বা— রে! এত বড় অত্যাচার! "অদ্য রজনীর" টাইমটেবল তো পাকাপোক্ত করা হয়ে গিয়েছে। আহারাদির পর তোমরা যাবে সিনেমায়, তার পর শাস্ত্রানুযায়ী যাবে পার্কে— অশাস্ত্রীয় রসালাপ করতে। তবে কেন, আমার প্রাণের লটে, আমার হক্কের ওপর ট্রেসপাস করছ? আমাকে দুটি কথা কইতে দাও না, সায়েডের সঙ্গে।'

www.pathagar.com

লটে বললে, 'কোথায় হল ট্রেসপাস আর কোথায়ই-বা রসালাপ! ট্রামে আসার সময় সায়েড আমাকে বলছিল, ১৯৩০-এ তুমি-আমি হিটলারের থোড়াই তোয়াক্কা রাখতুম। তার পর ওই তিরিশেই আখেরে সে পেল মেলাই ভোট। আমরা তবু নিশ্চিন্ত মনে আমাদের ফুটবল চালিয়ে গেলুম।[১] তিন বৎসর যেতে না যেতে ভিয়েনার সেই ভ্যাগাবন্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আটপৌরে নিতান্ত সাধারণ একটা করপোরাল্— তার পর কী জানি কোন এক ভাষায় কী একটা কবিতা আউড়ে বললে আমি আবৃত্তি করেছিলুম, 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।' 'লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে পোহালে শর্বরী বসে গেল রাজসিংহাসনে' জর্মনির মতো অত্যুচ্চ শিক্ষিত দারুণ ঐতিহ্যপন্থি দেশের হয়ে গেল চ্যান্সেলার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর লটে ফের বললে, 'যোগাযোগ! যোগাযোগ, সবই যোগাযোগ! এই যে আমরা খানিকক্ষণ আগে হোটেল ড্রেজেনের গা ঘেঁষে এলুম না, সেখানে এসে উঠেছিলেন হিটলার। সমস্ত জর্মনির সব হোটেলের চাইতে তিনি বেশি ভালোবাসতেন এই হোটেল ড্রেজেন। আর রাইনের ওপারে পেটেরসবের্গ পাহাড়ের উপরকার হোটেলে উঠেছিলেন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত চেম্বারলেন। সমঝাওতা হল না। শুভক্ষণে শুভলগ্নে কোন্ যোগাযোগ হল না বলে সবকিছু ভেস্তে গেল, সে তত্ত্ব আমরা কখনও জানতে পারব না।

কিন্তু আরেকটা বিবরণ জানা আমার আছে।

গেল বছর আমি গিয়েছিলুম ম্যুনিক। তুমি হয়তো জানো না, সয়েড, জর্মনদের এখন এমনই বস্তা বস্তা ধনদৌলত হয়েছে যে কী করে খরচ করবে ভেবে পায় না। তাই নিত্যি নিত্যি লেগে আছে সেমিনার কনভেরজাৎসিয়োনে, কনফারেন্স আরও কত কী। আমার আজ আর মনে নেই যেটাতে গিয়েছিলুম সেটা বিশাল জর্মন ট্যারাদের কনফারেন্স না—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ট্যারাদের কনফারেন্সে তুমি যাবে কী করে? তুমি তো ট্যারা নও। এস্তেক লক্ষ্মীট্যারাও নও।'

---

১. এই ফুটবল খেলা নিয়ে আমি বহু বৎসর পূর্বে ৮/১০/১২ বছর হতে পারে একটি 'গল্প' লিখি। তার প্লট : আমাদের ফুটবল গ্রাউন্ডের (অর্থাৎ সরু একচিলতে গলির) শেষ প্রান্তে বাস করতেন ফ্রাউ উলরিষ, খাণ্ডারিনী, ইয়া লাশ বুড়ি। একবার যদি তিনি কারণে-অকারণে চটে গিয়ে বকা আরম্ভ করতেন তবে যতক্ষণ না তাঁর পরবর্তী ভোজনের সময় আসে তিনি নায়গ্রা প্রপাতের মতো নাগাড়ে বকে যেতে পারতেন। আমাদের পুরোপাক্কা খবরদারি হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও একদিন 'ফুটবলটা' দড়াম করে গিয়ে পড়ল তাঁর জানালার উপর— শার্সিখানা খান খান। এহেন অন্যায় আচরণ ফুটবলের নয়, আমাদের— যে তাঁকে সেদিন বকাবকির রেকর্ড নির্মাণের তরে টুইয়ে দেবে সে তত্ত্ব বাৎলে দেবার জন্য হেমলেটের পিতৃপ্রেতাত্মা কেন, আমি টেঁশে গেলে যে মামদো জন্মাবে তারও প্রয়োজন নেই। সে পেল্লায় কটু বক্তিমের মূল বক্তব্য ছিল— 'সরকার কি রাস্তা বানিয়েছে ফুটবলের তরে?' বহু বৎসর পরে জানতে পাই, বুড়ি উলরিষ তার বেবাক সঞ্চিত ধন উইল করে দিয়ে যায়, আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ক্ষুদে প্লেগ্রাউন্ড নির্মাণ করার জন্য। কাহিনীটি আমি হারিয়ে ফেলার ফলে সেটি পুস্তকাকারে কখনও প্রকাশিত হয়নি। কোনও সহৃদয় পাঠক যদি দয়া করে আমাকে জানান (C/o সম্পাদক 'দেশ' ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-১) কোন বৎসর, কোন মাস, কোন পত্রিকায় এটি বেরোয়, তবে আমি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

www.pathagar.com

বললে, 'কে বলল আমি ট্যারা নই। ওই তো সেদিন আমার এক আত্মীয় কোত্থেকে জানি নিয়ে এল এক নয়া যন্তর। আমার হাতে সেটা দিয়ে বললে, 'ওই ফুটাটার ভিতর দিয়ে তাকাও তো একটিবার। দেখতে পাবে একটা খাঁচা আর অন্য প্রান্তে একটা পাখি। এইবারে এই হ্যান্ডিলটা নাড়িয়ে পাখিটাকে খাঁচার মধ্যে পোরো দিকিনি হুঁ!'

দম নিয়ে বললে, 'হেরমানের মতো সদাই উড়ুক্কু উড়ুক্কু চিড়িয়াকে পুরেছি চোখে-না-যায়-দেখা, হাতে না-যায় ছোঁওয়া খাঁচায়। আমারে ঠ্যাকায় কেডা?'

হেরমানের দিকে চোখ মেরে বললে, 'কই, কিছু বলছ না যে?'

'কে কাকে পুরছে তার খবর রাখে কোন গেস্তা, কোন ওগ্‌পু? চিড়িয়াখানায় খাটাশটার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা চিত্তবিনোদন করি। ওদিকে খাটাশটা ভাবে, নিছক তার চিত্তবিনোদনের জন্যই আমাদের ডেকে আনা হয়েছে। আমাকে জু-র বড়কর্তা অতিশয় সঙ্গোপনে বলেছেন, যেদিন জলঝড় ভেঙে দু চারটি মুক্ত-পাগল ভিন্ন অন্য কেউ জু-তে আসে না সেদিন খাটাশটা তার নিত্যদিনের চিত্তবিনোদন বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে রীতিমতো মনমরা হয়ে যায়।'

লটে বললে, 'কই তোমাকে তো কখনও মনমরা হতে দেখিনি।'

আমি মনে মনে বললুম, 'লাগ, লাগ, লাগ'। বাইরে বললুম, 'কে কাকে খাঁচায় পুরেছে সে তক্‌রার উপস্থিত থাক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দু জনাতে একই খাঁচাতে তো দিব্য দুঁহু দুঁহু কুঁহু কুঁহু করছ। রীতিমতো হিংসে হয়। তা সে যাকগে। তুমি তো খাঁচায় পুরলে সেই চিড়িয়াটাকে। ডাক্তারের আলুক্ষেতে তাতে করে ক গণ্ডা পুলি পিটে গজালো, শুনি।'

লটে : 'সায়েডষেন, সেইখানে তো রগড়। ডাক্তার বলে কি না, আমি নির্ভেজাল চোদ্দ ডিগ্রি ট্যারা।'

'সেন্টিগ্রেড না ফারেনহাইট?'

লটে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বললে, 'কোনওটাই না। তুমি কিছু বোঝ না। চোদ্দ ডিগ্রি বলেছিল, না চোদ্দ কেজি বলেছিল সে কি আর আমি কান পেতে শুনেছিলুম। চোদ্দ— কোনও কিছু একটা। তার পর ডাক্তার কী বলল, জানো? বললে, এই ট্যারাইসিন সারাতে হলে হয় কামচাটকা, নয় লুলুম্বা হুলা হুলা থেকে আনাতে হবে এক অতি বিশেষ রকমের চশমার পরকলা—' হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকে শুধাল, 'তোমার কী হল সায়েড ডিয়ার? হঠাৎ অভিনিবেশ সহকারে এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছ কেন? বিস্তর পুরুষমানুষ দেখেছি যারা ডিনার শেষে ওয়েটার বিল নিয়ে আসছে দেখলে হঠাৎ অতি অকস্মাৎ জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লেগে যায়। ও প্রকৃতির কী মাহাত্ম্য! পাঁচো ইয়ার তখন আর কীই-বা করেন। হাঁড়িপানা মুখ করে সেই জিরাফকণ্ঠী বিলটা শোধ করে দেন। কই, আমরা তো এখনও তোমাকে কোনও বিল দিইনি, মাইরি।'

আমি চিন্তাকুল কণ্ঠে বললুম, 'যত দুর্ভাবনায় ফেললে, লটে সুন্দরী।'

'যথা?'

'ওহে হেরমান, এমন মোকাটি হেলায় অবহেলা কর না ভাই। টাপেটোপে কই। তোমারই মতো এক নিরীহ, গোবেচারীর বউয়ের জিভে কী যেন কী একটা বিদকুটে ব্যামো দেখা দিল। বউ একদম একটি কথাও বলতে পারছে না। এমনকি গা গা ইডিয়টের মতো গাঁ— আঁ— আঁ,

www.pathagar.com

গাঁ— আঁ— আঁও করতে পারছে না। বেচারি সেই সাত পাকের সোয়ামি নিয়ে গেল বউকে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মাত্র একটিবারের তরে বউয়ের জিভের উপর চামচের চ্যাপটা হাতলটা বুলিয়েছে কি বুলোয়নি— দ্যাখ তো না দ্যাখ— সাত পাকের হাত পাকড়ে ধরে দে ছুট। বৃহৎ হাসপাতালের নিভৃততম কোণে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, হিপোক্রাতেসের শপথে এ বিধান নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমার ধর্মবুদ্ধি বলে কারও কোনও ব্যামো যদি অন্য কারওর উপকার সাধন করে তবে উপকৃতজনকে এ বিষয়ে কনসাল্ট করে নিতে। আপনাকে অতিশয় সঙ্গোপনে একটি তথ্য নিবেদন করি : আপনি সত্যিই বড্ড "লাকি" পুরুষ; কথায় বলে "স্ত্রী ভাগ্যে" ধন। এই যে আপনার স্ত্রীর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোনও প্রকারের শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করতে পারছেন না, টুঁ ফ্যা দূরে থাক, অষ্টপ্রহর বকর বকর করে আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারছেন না,— এরকম "লাক" দৈবাৎ কখনও কোনও স্বামীর কপালে নৃত্য করে।' বললে পেত্যয় যাবেন না, শতেকে গোটেক নয়, লাখে এক হয় কি না হয়। ডাক্তার দম নিয়ে স্বামীকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ভেবে দেখুন, ভালো করে চিন্তা করে নিন আপনি কি সত্য সত্য, তিন সত্য চান, যে আমি আপনার স্ত্রীর জিভটা সারিয়ে দিই। বলুন, আবার বলছি চিন্তা করে বলুন।'

হেরমানের হাসির পরিমাণ থেকে অনুমান করলুম, সে লটেকে কতখানি ডরায়।

বললে, 'কিন্তু গল্পটি আমারই উদ্দেশে বিশেষ করে বললে কেন?'

আমি বললুম, 'বলছি, বলছি। অত তাড়াহুড়ো করছ কেন, হের গট— সদাপ্রভু তো এক মুহূর্তেই বিশ্বসংসার নির্মাণ করতে পারতেন; তবে পূর্ণ ছয়টি দিন ওই কর্মে ব্যয় করলেন কেন? কিন্তু তার পূর্বে লটে-কে একটা প্রশ্ন শুধান দরকার। আচ্ছা লটে, তুমি যে চৌদ্দ ডিগ্রি না চৌদ্দ গজ ট্যারা সে তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার ট্যারাতর ট্যারাতম মার্জিন আর কতখানি? ষোলো, আঠারো? আমাদের ছেলেবেলায় চশমার 'পাওয়ার' মাইনাস কুড়ির চেয়ে বেশি হত না।[১]

লটে বললে, 'আমি ঠিক ঠিক শুধোইনি। যদ্দূর মনে পড়ছে চোদ্দই শেষ সীমা। তবে মেরে-কেটে আরও দু-এক মাত্রা, দু-এক পেগ সেবন করতে পারি বোধহয়।'

'তাই সই। ওহে হেরমান, তুমি এই বেলা সময় থাকতে থাকতে লটের বিরুদ্ধে একটা ডিভোর্স কেস ঠুকে দাও। আদালতকে বলবে, 'এই রমণী আমাকে ধাপ্পা মেরে বিয়ে করেছে। বিয়ের পূর্বে একবারও সেই গুহ্য তথ্যটি প্রকাশ করেনি যে, সে ট্যারা। আর যা তা ট্যারা নয় হুজুর, একদম চৌদ্দ ডিগ্রি ট্যারা। এর বেশি ট্যারা মি লাট— মাই লর্ড— বিবাদিনী গেল বছর যে বিশাল— জর্মন ট্যারা কনফারেন্স-এর নিমন্ত্রিত হয়ে ম্যুনিক গিয়েছিলেন—

এস্থলে আদালত বাধা দিয়ে তোমার উকিলকে শুধোবেন, বিবাদিনী কেন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন?

তোমার উকিল সোল্লাসে : ঠিক ওই বক্তব্যেই আমরা আসছিলাম, হুজুর। আমরা জনৈক প্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসককে সাক্ষীরূপে এই মহামান্য আদালতে হাজির করব, এবং তিনি কিছু হেজিপেজি যেদোমেধো—'

---

১. সুকুমার রায় যজ্ঞির ভোজে পরিবেশকদের বর্ণনা করেছেন, 'কোনও চাচা অন্ধপ্রায় মাইনাস কুড়ি। ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।'

www.pathagar.com

আদালত ঈষৎ শুষ্ক তথা দৃঢ়কণ্ঠে : 'বিজ্ঞ আইনজ্ঞের শেষোক্ত জনপদসুলভ গ্রাম্য সমাসদ্বয়ের প্রয়োগ মহামান্য আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবার অবকাশ ধারণ করে।'

উকিল : 'আমি খুশমেজাজে বহাল তবিয়তে— (মহামান্য আদালত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করলেন কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি ভাষার জগাখিচুড়িকে আর ঘাঁটাতে চান না।) ওই দুটো লক্ষ্মীছাড়া সমাসকে আদালত থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলুম। কিন্তু হুজুর, ইংরেজও বেকায়দায় পড়লে এ জায়গায় টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি এস্তেমাল করে থাকে।'

আদালত : 'অত্র আদালত স্বাধিকার-অপ্রমত্ত। কিন্তু অত্র আদালত অর্বাচীন আলবিয়নের রসনাসহযোগে অস্মদ্দেশীয় রাইন-মোজেল-মদিরা আস্বাদন করে না।'

উকিল : 'তথাস্তু মি লর্ড্। পুরনো কথার খেই ধরে নিয়ে উপস্থিত জটটা ছাড়াই : সেই চোখের ডাক্তারের সুনাম দেশ-বিদেশের কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ছড়িয়ে পড়েছে। গত বৎসর তিনি প্যারিস যান। 'সারা জাহাঁ আঁখ মজলিসের' দাওয়াত পেয়ে। তিনিই হরেক রকম হাতিয়ার চিড়িয়া পিঁজরা হুনর দিয়ে মহামান্য আদালতকে বাৎলে দেবেন, বিবাদিনী চোদ্দ পেগ-এর ট্যারা।'

বিবাদিনীর উকিল পেরি মেসন কায়দায় হাইজাম্প মেরে : 'আমি আমার সুবিজ্ঞ সহকর্মী বাদিপক্ষের উকিল যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্রতম প্রতিবাদ জানাই। তিনি অশোভন ইঙ্গিত করছেন, আমার সম্মানিতা মক্কেল চৌদ্দ পেগ হুইস্কির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

হেরমান বাধা দিয়ে বললে, 'তোমাদের সিনেমা গমনের কী হল! আচ্ছা, তুমি বলছ, আমার কেস একদম ওয়াটার টাইট? মোকদ্দমা জিতবই জিতব?'

আমি সোৎসাহে : 'আলবৎ, একশো বার।'

'আর তুমি তখন লটেকে বগলদাবা করে ড্যাং ড্যাং করে নাপাতে নাপাতে এন্ডিয়া বাগে সটকে পড়! না? অফ কোর্স নট। আমাদের ফরেন মিনিস্টারের নাম হের শেল (Scheel), অর্থাৎ ট্যারা, লক্ষ্মীট্যারা নয়, সমুচা ট্যারা। তার বউ তো তাকে তালাক দেয়নি।'

লটে এক লাফে হেরমানের কোলে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে খেতে বললে, 'ডার্লিং, তুমি সত্যই আমার মূল্য বোঝো।'

আমি বললাম, 'কচু বোঝে। ওয়াইলড বলেছেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই এমন সব রদ্দিমাল আছে যা আমরা সানন্দে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতুম। শুধু ভয়, পাছে অন্য কেউ না কুড়িয়ে নেয়।" এস্থলে আমি শর্মা রয়েছি যে।'

'কী! আমি রদ্দি মাল! তোমার সঙ্গে সিনেমা যাব না, না, না!!'

২৯

আমি বললুম, 'সুন্দরী লটে, তুমি যাত্রারম্ভে বার বার মন্ত্রোচারণ করেছিলে "যোগাযোগ, যোগাযোগ, সবই যোগাযোগ", এবং সঙ্গে সঙ্গে হিটলারেরও উল্লেখ করেছিলে সেটা তো সঠিক প্রকাশ করলে না। আমি জানি, ভালো করেই জানি জর্মন মাত্রই হিটলার-যুগটাকে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যেতে চায়। আমি তাদের খুব একটা

www.pathagar.com

দোষ দিইনে; আমি দেশে বসেই হিটলারের বিজয়ের পর বিজয়, পতনের পর পতন, প্রায় সবকিছুই স্বকর্ণে শুনেছি—'

'মানে?'

'অতি সরল। বেতার আমাদের দেশে ত্রিশ শতকেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ইউরোপীয় বেতারকেন্দ্রগুলো আমাদের বড় একটা পরোয়া করত না— একমাত্র বিবিসি আমাদের জোর তোয়াজ করত। বোঝাবার চেষ্টা করত, আখেরে ইংরেজ জিতবেই জিতবে। ওদের ভয় ছিল আমরা যদি ইংরেজ পরাজয়ের মোকাটি হেলায় অবহেলা না করে ভারত থেকে তাদের তাড়াবার বন্দোবস্ত শুরু করি তা হলেই তো চিত্তির। তাই তারা সুবো-শাম জোর প্রপাগান্ডা চালাত— বিশেষ করে ডানকার্কের অতুলনীয় পরাজয়ের পর— যে ইংরেজকে হারানো চারটিখানি কথা নয়। জর্মনি তখন বিজয়মদে মত্ত। বিজয় মাত্রই কড় কড়া মদ। সে মদে যদি আবার 'পঞ্চরঙ' মিশিয়ে দাও তা হলে তো আর কথাই নেই—'

'পঞ্চরঙ আবার কী মদ?'

আমি সবিনয় নিবেদন করলুম, 'ওই বস্তুটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি বলে আমি সত্যই লজ্জা বোধ করি। শুনেছি পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পাইপে ('ছিলিম' তো এরা বুঝবে না) পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন জাতের নেশা, যেমন গাঁজা, চরস, ভাঙ—'

'এসব আবার কী?'

'বোঝানো শক্ত, কারণ নিজেই জানিনে। তবে ইউরোপোমেরিকায় প্রচলিত হশিশ, হেরোইন, মরফিন এগুলোর প্রায় সবকটাই হয় গাঁজা নয় আফিম থেকে তৈরি হয়। এই যে তোমাদের হিপিরা—'

লটে ভুরু কুঁচকে বললে, 'আমাদের!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'সরি সরি! এই যে ইউরো-আমেরিকা থেকে হিপিরা ভারতে যায়, তারা তো সক্কলের পয়লা ধরে গাঁজা।[১] ওটার একটা লাতিন নামও আছে— কানাবিস ইন্ডিকা না কী যেন— তা সে যাকগে!... যা বলছিলুম, গাঁজা, চরস, ভাঙ, আপিঙ,— আরেকটার নাম

১. পশ্চিম বাঙলায় প্রচলিত আছে কি না জানিনে বলে একটি গঞ্জিকাপ্রশস্তি নিবেদন করি :

জীবন গাঞ্জা, তোরে আমি ছাড়তাম না (ধু)
এক ছিলিমে যেমন তেমন
দুই ছিলিমে মজা
তিন ছিলিমে উজির নাজির
চার ছিলিমে রাজা।
পাঁচ ছিলিমে হুক্কুর হুক্কুর
ছয় ছিলিমে কাশ
সাত ছিলিমে রক্ত— গা

(মডার্ন মেয়েরা যাকে 'বাথরুম পাওয়া' বলে।)

আট ছিলিমে নাশ

হিপিদের উচিত এটা তাদেরই কোনও একেলে বেটোফেনকে দিয়ে সুরে বসিয়ে ইন্টারনেশনাল রূপে গাওয়া।

www.pathagar.com

ভুলে গিয়েছি— পাঁচটা পাইপে সাজিয়ে সে পাইপগুলো ঢুকিয়ে দেয় আরেকটা মোটা পাইপে। দেখে নাকি মনে হয় যেন একটা গাছের গুঁড়ি থেকে পাঁচটা শাখা ট্যারচা হয়ে উপর বাগে উঠেছে। আবার সেই বড় পাইপটা ঢুকেছে একটা খোলে। সে খোলে থাকে কড়া ধান্যেশ্বরী। সেই খোলের একটা ফুটোর ভিতর ছোট্ট একটি পাইপ হুবহু সিগ্রেট হোল্ডারের মতো দেখতে, দেবে ঢুকিয়ে। ওদিকে পঞ্চ পাইপের মুণ্ডুতে ধরাবে মোলায়েম আগুন। আর হোল্ডারে মুখ লাগিয়ে দেবে ব্রহ্মটান। ওহ্! তাতে নাকি কৈবল্যানন্দ লাভ হয়। তা সে যাকগে। হিটলার আর তাঁর জাঁদরেলরা তো জর্মন জাতটাকে খাইয়ে দিলেন বিজয় মদ। তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন নাৎসি পার্টির হের ডক্টর অর্থাৎ গ্যোবেলস 'পঞ্চরঙ্গ' প্রোপাগান্ডা। কিন্তু তিনি নিজে মাতাল হলেন না। একে তোমার মতো রাইন নদের পারে তার জন্ম—'

লটে 'থাক, থাক' কিন্তু মোলায়েম গলায়। আমি ও মনোভাবটা বুঝি! গ্যোবেলস মার্কা-মারা পাজির পা-ঝাড়া হতে পারে কিংবা সৎ ব্রাহ্মণের পদধূলিও হতে পারে, কিন্তু যাই বল যাই কও সে তো তার জন্মভূমি রাইনল্যান্ডকে বিশ্বের সুদূরতম কোণে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বললুম, 'তার শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে, নাৎসি পার্টির করাতের গুঁড়ো ভর্তি মাথাওলাদের ভিতর ওরকম পরিষ্কার মগজওলা দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। মায় হিটলার।[২] ইংরেজ জাত ফরাসি জাতটার ওপর অত্যধিক সুপ্রসন্ন নয়, তারা পর্যন্ত স্বীকার করে লাতিন জাতের ফরাসিরাই এ জাতের অগ্রণী, ইতালীয়রা যতই চেল্লাচেল্লি করুক না কেন— এতে পরিষ্কার মাথা স্যাকসন টিউটনদের হয় না, এবং গ্যোবেলসের ধড়ের উপর যে ব্রেন-বক্সটি হামেশাই সজাগ থাকত সেটা ছিল লাতিন মগজে টইটম্বুর। আশ্চর্য নয়, এই রাইনল্যান্ডেই যে জর্মন রক্তের সঙ্গে ফরাসি রক্তের সবচেয়ে বেশি সংমিশ্রণ হয়েছে সে তত্ত্বটি বর্ণসঙ্কর বিভীষিকায় নিত্য নিত্য ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখনেওলা হিমলার পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেননি। কেন লটে, তোমার যে চোদ্দ ডিগ্রি ট্যারার মতো চোদ্দ কেন, চোদ্দশো পুছ কালো চুল তার জুড়ির সন্ধানে বেরুতে হলে তো যেতে হয় ইতালি বা স্পেন মুল্লুকে। কী বল, আমার কৃষ্ণা কেশিনী?'

তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'রেখে দাও তোমার ওই রক্ত নিয়ে ধানাইপানাই। হিটলার চেল্লালেন, 'জর্মনরা সব নর্ডিক। এখন রব উঠেছে, আমরা রাইনলেন্ডার নই, প্রাশান নই, এমনকি আমরা জর্মনও নই(!), আমরা সব্বাই এখন ইউরোপীয়ান!' ছোঃ। কিন্তু এই সুবাদে শুধোই, লোকে বলে বিপরীত বিপরীতকে টানে। তোমার চুল তো কালো। তবে তুমি প্লাটিনাম ব্লন্ড রুপোলি ব্লন্ডের এফাকে উল্লাসে নৃত্য করতে করতে তোমার টিমের গোলি না করে আমাকে করতে কেন?'

হেরমান এতক্ষণ অবহিত চিত্তে আমাদের চাপান-ওতোর শুনছিল। মৌনভঙ্গ করে বললে, 'শাবাশ! হে অশ্বিনীপ্রধান! (আশা করি শ্রুতিধর পাঠককে অযথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন অভিন্নমনা ছিলেন বলে উভয়ে একই কামিনীকে কামনা করতেন) তোমার জয় হোক। তৎপূর্বে প্রিয়াকে সদুত্তর দাও। অনুজ শিক্ষালাভ করুক।'

---

২. স্বয়ং গ্যোবেলস তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন, 'ফ্যুরারের পশ্চাদ্দেশে (তিনি এস্থলে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি জর্মনির গ্রাম্যতম আটপৌরে শব্দ এবং ইংরেজিতেও একই অর্থ এবং প্রায় একই ধ্বনি ধরে) আস্ত একটা জ্যান্ত টাইম বম না রাখা পর্যন্ত তাঁর চৈতন্যোদয় হয় না।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'প্রিয়ে কৃষ্ণকুন্তলে! তোমার চুল আমাকে আমার দেশের খেলার সাথীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। তাদের চুল ছিল তোমারই মতো কালো।'

(লটের চোখে কেমন যেন সন্দ সন্দ ভাব)

'আমার প্রথম খেলার সাথী জোটে সাত-আট বছর বয়সে।'

(লটের ঠোঁটে ক্ষীণতর মধুর স্মিতহাস্য)

'করে করে আমার পাঁচটি সঙ্গিনী জুটল। আমি আমার ছোট বোনেদের কথা বলছি—'

লটে আমার দিকে রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, 'খুশি হব, না ব্যাজার হব ঠিক অনুমান করতে পারছিনে। তুমি যদি বলতে, আমার চুল দেখে তোমার আপন দেশের প্রিয়ার কথা স্মরণে আসে তবে আমার বুক নিশ্চয়ই হিংসায় কিছুটা খচ খচ করত। তা-ও না হয় সয়ে নিতুম, কিন্তু আমার চুল তোমাকে তোমার বোনেদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়— সে যে বড্ড পানসে।'

হেরমান বললে, 'মানুষের মতিগতি এমনিতেই বোঝা ভার, তার ওপর যে মানুষ দূর বিদেশ থেকে এসেছে তার হৃদয়, তার রুচি বোঝা আরও কঠিন। লটে ঠিকই শুধিয়েছে, কালো চুলের প্রতি তোমার, বিশেষ করে তোমার এহেন অহেতুক আনুগত্য কেন? কালোর কীই-বা এমন ভূলোক দ্যুলোক জোড়া বাহার?'

মুচকি হেসে এবং বেশ গর্বসহকারে বললুম, 'এর উত্তর তোমাদের কান্টও দেননি, আমাদের শঙ্করাচার্যও দেননি। দিয়েছে বাঙলা দেশের এক গাঁইয়া কবি। গেয়েছে,

'কালো যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?'

ব্লন্ডের সন্ধান সে কবি জানতেন না। কেশ পাকলে সাদা হয়, আর ধবল কেশ মানেই তো বার্ধক্য। তা সে কেশকে যে নামেই ডাকো না কেন— ব্লন্ড, প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড, সিলভার ব্লন্ড, পরান যা চায় সে নাম দাও। হ্যাঁ, স্বীকার করি, সত্যিকার ব্লন্ড চুল অদ্ভুত চিকচিক করে, ঠিক যে রকম লটের কালো চুল চিকচিক করে (লটের একটা ক্ষীণ আপত্তি শোনা গেল— তার চুলে নাকি পাক ধরতে শুরু করেছে)। কিন্তু যবে থেকে না জানি কোন নাৎসি লক্ষ্মীছাড়া ছাতের চিমনির উপর থেকে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করল, খাঁটি নর্ডিক জাতের চুল হয় ব্লন্ড, অমনি আর যাবে কোথা— বইতে লাগল গ্যালন গ্যালন হাইড্রোজেন পারক্সাইড না কী যেন এক রাসায়নিক দ্রব্য। রাতারাতি সবাই হয়ে গেল ব্লন্ড। কিন্তু সে দ্রব্যের প্রসাদাৎ— যে ব্লন্ড নির্মিত হন, তিনি না করেন চিকচিক, না আছে তেনাতে কোনও জৌলুস।'

লটে বললে, 'থামো না। তুমি কি ওয়ার্লড ফেডারেশন ফর দি প্রিভেনশন অব হাইড্রোজেন পারক্সাইডের প্রেসিডেন্ট?'

আমি বললুম। 'আর একটুখানি সময় দাও। কিন্তু আমি জানি, হেরমান কেন তোমাতে মজেছে। চুল কালো হলে এদেশে চোখ হয় কটা। বিদকুটে কটাও আমি দেখেছি— ঠিক যেন বেড়ালের চোখের মতো। কিন্তু কালো চুল আর নীল চোখের সমন্বয় বড়ই বিরল। লটের বেলা সেই সমন্বয় ঘটেছে। আর জানো সুনীল-নয়না লটে, নীল চোখ আমি বড় ভালোবাসি। তোমাদের দেশে খাঁটি নীল রঙের আকাশ বড় একটা দেখা যায় না। যেটা আমাদের দেশে

দিনের পর দিন দেখা যায়— বিশেষ করে শরৎকালে। নীল চোখ এন্তের না হলেও বিরল নয় এদেশে। লটের কালো চুল আমার স্মরণে আনত বোনেদের কথা, আর তার নীল চোখের দিকে তাকালেই আমি যেন দেশের নীলাকাশ দেখতে পেতাম; মনটা বিকল হবে না তো কী? বিশ্বাস করবে না, ওই নিয়ে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলুম।

কাতরে শুধাই, একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?'

জর্মন অনুবাদটা আমার পছন্দসই হল না। কিন্তু লটেকে পায় কে? সে কবিতার বাকিটা শুনতে চায়।

আমি কিন্তু-কিন্তু করে গোটা দুই ঢোঁক গিলে বললুম, 'কিছু মনে কর না লটে, আর ব্রাদার হেরমান, কবিতার বাকিটা একটু স্কেটিং অন থিন আইস, আমাদের দেশের ভাষায় সদ্য নতুন ভেসে-ওঠা চরের চোরাবালির উপর হাঁটা। যে যুগে কবিতাটি লেখা হয় তখন সেটা রীতিমতো দুঃসাহসিক কর্ম ছিল।'

হেরমান বললে, 'বাইরের দিকে দেখতে গেলে কবিতা গদ্যের তুলনায় অনেকখানি শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাকে ছন্দের বন্ধন, মিলের কড়া শাসন মেনে চলতে হয়; আর সনেট রচনা করতে গেলে তো কথাই নেই। সেখানে এসবের বন্ধন তো আছেই তদুপরি ক ছত্রে সে কবিতাটিকে সুষ্ঠু সমাপ্তিতে আনতে হবে সেটা যেন রাজদণ্ডাদেশ। কোনও কোনও দেশে যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্থ চোদ্দ বছরের শ্রীঘর। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় এই চোদ্দর অনুশাসনটি আইন-কর্তারা ধার নিয়েছেন কবিদের কাছ থেকে, তাদের সনেট হবে চতুর্দশপদী। এবং তারও ওপর আরেকটা মোক্ষম বন্ধন— বিষয়বস্তু কোন কায়দাকেতায় পরিবেশন করবে সেটাও আইনকানুনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। প্রথম চার ছত্রে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় চার ছত্রে— আমার মনে নেই আরও যেন কী কী। কিন্তু ঠিক এই কারণেই সে অনেক-কিছু বলার স্বাধীনতা পেয়ে যায়, যেটা গদ্যের নেই, গদ্যে সেটা কর্কশ এমনকি ভালগার শোনায়। এই যে আমি লটেকে বিয়ে করে পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছি—'

লটে : 'অর্থাৎ বিয়ের সদর রাস্তা ছেড়ে আইবুড়ো বয়সের সাইড জাম্প আর মারতে পার না।'

'ইগ্‌জেকলি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নীলাকাশে উড্ডীয়মান হওয়ার মতো, কিংবা বলতে পারো লটের নীল চোখের গভীরে ডুবে যাওয়ার মতো এমন একটা স্বাধিকার লাভ করেছি যেটা অতুলনীয়, যেটা না পাওয়া পর্যন্ত বাউণ্ডুলে আইবুড়ো সেটার বিন্দু পরিমাণ কল্পনাও করতে পারে না। লটেকে আমি সবকিছু বলতে পারি। এস্তেক আমার মারাত্মকতম দুর্বলতা। কবিতার বেলাও তাই। দেখোনি— প্রিয় অপ্রিয় গোপন কথা বাদ দাও— বহু কবি তার হীনতা নীচতা পর্যন্ত অম্লান বদনে স্বীকার করেছেন আপন আপন কবিতায় এবং সেটাও কোনও বিশেষ ব্যক্তির সম্মুখে নয়, বিশ্বজনকে সাক্ষী মেনে। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।'

আমি তবু আমতা আমতা করে বললুম, 'পূর্বেই বলেছি তোমাদের দেশে নীলাকাশ হয় না, কিন্তু নীল নয়ন হয়। ঠিক তেমনি না হলেও বলা যায়, তোমাদের দেশে পদ্মফুল ফোটে না

www.pathagar.com

বটে, অর্থাৎ সরোবরে ফোটে না, কিন্তু ফোটে অন্যত্র! আমাদের দেশে মেয়েরা শ্যাম, উজ্জ্বল শ্যাম, এমনকি ফর্সাও হয় বটে, কিন্তু ধরো আমাদের লটের মতো ধবলশুভ্র কস্মিনকালেও হয় না। তাই, যার নীল নয়ন দেখে দেশের নীলাকাশ মনে পড়েছিল তাকে বললুম,

তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেত পদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?'

৩০

হেরমান দুষ্টু হাসির মিটমিটি লাগিয়ে বললে, 'লোভ হচ্ছে না?'

আমি বললুম, 'সে আর কও কেন, ব্রাদার?'

লটে বুঝতে পারেনি। চটে বললে, 'কী সব হেঁয়ালিতে কথা বলছ তোমরা?'

কবি বলেছেন

"মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।'

আসলে লটে কী করে জানবে, সামান্য কয়েক গ্লাস ওয়াইন খেতে না খেতে তার গাল দুটি আরও টুকটুকে হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছে হেরমান, লক্ষ করছি আমি। লটে জানবে কী করে? আমাদের দেশের সাধারণ জনের বিশ্বাস, ইউরোপের মেমসায়েবরা সায়েবদেরই মতো জালা জালা মদ গিলে ধেই ধেই নৃত্য করে। দ্বিতীয়টা সত্য। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা নাচতে ভালোবাসে বেশি (কাষ্ঠরসিকরা তার সঙ্গে আবার যোগ দেন, 'বাচ্চা বয়সে তারা আপন খেয়াল-খুশিতে নাচে; একটু বয়স হওয়ার পর বেকুব পুরুষগুলোকে নাচায়') কিন্তু মদ তারা খায় পুরুষের তুলনায় ঢের ঢের কম। কেন কম খায়, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তবু একটা ইঙ্গিত দিতে পারি; কাচ্চাবাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাওয়ার পর অনেক মেয়েছেলেই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে শুরু করে এবং বিস্তর পয়সাওলী বৃদ্ধা খাটে শুয়ে শুয়ে রাত বারোটা অবধি খাসা চুকুস চুকুস করে। লটের এখনও বাচ্চা হতে পারে কি না বলা কঠিন— অসম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক, লটের ওয়াইন চুকুস চুকুস করার কায়দাকেতা থেকে পষ্ট মালুম হয়, ও রসে এ গোবিন্দদাসী বঞ্চিত না হলেও আসক্তা তিনি নন। তাই কুল্লে আড়াই গ্লাস চুষতে না চুষতেই তার গোলাপি গাল দুটি হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল— বুড়িদের নাক হয়ে যায় বিচ্ছিরি কোণী ঘেঁষা লাল।

হেরমান নির্ভয়ে বললে, 'হের সায়েড তার দেশের কী এক মাছের বিরাট বয়ান দিয়ে বলেছিল না, সে মাছ যে খায় না সে মূর্খ। তোমার গাল দুটি যা টুকটুকে লাল হয়েছে— মনে হয় ঠোনা দিলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে— সে গালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিতে যে লোকের ইচ্ছে হয় না সে মূর্খের চেয়েও মূর্খ, গবেট, গাড়ল এবং বর্বর।'

লটে আমার দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'আর তুমি সায় দিচ্ছিলে?'

www.pathagar.com

আমি ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে— এ পোড়ার দেশে আবার টাইট কলারের চাপে আপন অপ্রতিভ ভাবটা যথারীতি পাকা ওজনে চুলকোনোও যায় না— নানা প্রকারের অস্ফুট আনুনাসিক মার্জার সুলভ অ্যাঁও ম্যাঁও করতে করতে বললুম, 'তা, — সে— এটাতে— সত্যি বলতে কী,— এহেন দুরাকাঙ্ক্ষা যদি আমার হৃৎকন্দরে অঙ্কুরিত হয় তবে সেটা এমনকি অন্যায় হল বল তো। তোমাদের দেশেই তো, বাপু, প্রবাদ আছে, "বেড়ালটা পর্যন্ত খুদ কাইজারের দিকে তাকাবার হক্ক ধরে।"

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, লটে বোধহয় বিরক্ত হয়েছে।

ওমা, কোথায় কী! লটে চটেনি।

বললে, 'আমার বয়স পঞ্চাশ— বুড়ি হতে আর ক বছর বাকি?'

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, 'জর্মনিতে বুড়ি নেই। এ দেশে কেউ বুড়ি হয় না।'

'মানে?'

'এ তত্ত্বটা আমি শিখি এই গোডেসবের্গ শহরেই। তোমার মনে আছে, আমাদের সেই ফুলওলা? সবে এখানে এসেছি, তার সঙ্গে আলাপ হয়নি। ইতোমধ্যে মার পেটে কী যেন একটা হল। জব্বর অপারেশন করলেন কলোন থেকে এসে ডাকসাইটে এক সার্জন।'

লটে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পষ্ট মনে আছে। আমাদের পাড়ার হাসি-খুশি তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'একদম খাঁটি কথা। আনার মা যখন সেরে উঠছেন তখন ভাবলুম, কিছু ফুল নিয়ে যাই। ঢুকলুম সেই ফুলের দোকানে। সেই ছোকরা— প্রায় আমার বয়সী— তো উল্লাসে প্রায় নৃত্যমান। বার তিনেক জপ-মন্ত্রের মতো 'গুটন্ মর্গন্' বলতে বলতে শুধালে, 'আপনার ইচ্ছে? আদেশ করুন।' এবং পূর্ববৎ অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে লাগল।

জর্মন ফুলের তত্ত্ব তখনও কিছু জানিনে। কোন ফুল নিলে ভদ্রদুরস্ত হয় সে বাবদে আরও অজ্ঞ। তাই 'কিন্তু কিন্তু' করছি দেখে অতিশয় লাজুক খুশিভরা মুখে বলল, 'স্যর, কিছু মনে করবেন না। কে, কার জন্য, কোন ফুল নেবেন কি নেবেন না, সে সম্বন্ধে কোনও প্রকারের কৌতূহল দেখানো আমার পক্ষে, সর্ব ফুলবেচনেওলার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই, হেঁ— হেঁ, কিছু মনে করবেন না, যদি সামান্যতম ইঙ্গিত দেন—'

আমার বয়স তখন আর এমন কী। লজ্জা পেয়ে থতমত হয়ে তোতলালুম, 'না, না, সেরকম কিছু নয়। আমি ফুল কিনব একজন অসুস্থ বৃদ্ধা—'

সঙ্গে সঙ্গে— যেন কেউ তার উদোম পিঠে সপাং করে বেত মেরেছে— কোঁৎ করে ককিয়ে বললে, 'এমন কথাটি বলবেন না, স্যর।'

আমি তো রীতিমতো ভীতসন্ত্রস্ত। নাচতে গিয়ে আবার কোনও এটিকেট নাম্নী মহিলার পা মাড়িয়ে দিয়েছি।

কোমরে দু ভাঁজ হয়ে বাও করে বিনয়নম্র কণ্ঠে বললে— আপনি বিদেশি; তাই জানেন না, আমাদের এই "ডয়েচ্শ্লানট য়্যুবার আলেসের" দেশে, বিশেষ করে এই সুর-কানন-সুন্দর রাইনল্যান্ডে কোনও বৃদ্ধা, এমনকি প্রৌঢ়া মহিলাও নেই। কস্মিনকালে হয়নি, হবেও না। বলতে হয় "বর্ষীয়সী" এবং সর্বোত্তম পন্থা, কিঞ্চিৎ "হেঁ হেঁ" করে যেন বড়ই অনিচ্ছায় বলছেন, "এই একটুখানি বয়স হয়েছে আর কি"।' সেই আমার প্রথম শিক্ষা। তাই বলি, 'পঞ্চাশ! ছোঃ! সে আর এমন কী বয়স!'

www.pathagar.com

লটে বললে, 'পিরামিডের তুলনায় তেমন আর কী?... সেই যে বলছিলুম, আর বচ্ছর যখন আমি ম্যুনিক গিয়েছিলুম—'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'হিটলার', 'যোগাযোগ', 'ড্রেজেন হোটেল' এসব দিয়ে কেমন যেন একটা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ বানাচ্ছিলে?"

'ম্যুনিকে পরিচয় হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, পরবের শেষ পার্টিতে। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, তিনি হিটলারের যে অ্যারোপ্লেন পাইলট ছিলেন বাওর, তাঁর নিকট-আত্মীয়। আমাদের মধ্যে কে যেন আশকথা-পাশকথার মাঝখানে 'যোগাযোগের' মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। আত্মীয়টি তখন বললেন, "এই যে পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর বীভৎসতম যুদ্ধ হয়ে গেল, কত নিরপরাধ ইহুদি কনসানট্রেশন ক্যাম্পে মারা গেল, বমিঙের ফলে হাজার হাজার নারী-শিশু মারা গেল এর কিছুই হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘটত না, যদি না সামান্য একটা 'যোগাযোগে' একটুখানি গোলমাল হয়ে যেত।" তার পর বিশেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি গডেসবের্গের বাসিন্দা বললেন না, সেই গডেসবের্গের ড্রোজেন হোটেলে গিয়ে উঠেছেন হিটলার। তারিখটা ২৯-এ জুন ১৯৩৪। আমার আত্মীয় বাওর বলেন, হিটলারের আশু প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু জানত না। তবে হিটলার তাঁকে বলে রেখেছিলেন, তাঁর প্লেন যেন হামেহাল তৈরি থাকে। বাওর খানিকক্ষণ পরে এসে বললেন, 'সে প্লেনে নাকি কী একটা গলদ দেখা গিয়েছে তবে তিনি অন্য প্লেনে বার্লিন গিয়ে সেখান থেকে রাতারাতি স্পেয়ার নিয়ে আসতে পারবেন। হিটলার অসম্মতি জানালেন। রাতের খানাদানা শেষ হলে পর হিটলার কেমন যেন চুপ মেরে গেলেন। যথারীতি তাঁর প্রিয় ভাগনারের রেকর্ড বাজতে শুরু করল। হিটলারের সেদিকে যেন কান নেই, অভ্যাসমাফিক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঠেকাও দিচ্ছেন না আর সর্বক্ষণ উসখুস করছেন। বাওর তখন সেই একঘেঁয়েমি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হিটলারের কাছ থেকে ঘণ্টা দুত্তিনের ছুটি চাইলেন। ইচ্ছে, পাশের বন শহরে একটা রোঁদ মেরে আসেন। এটা কিছু নতুন নয়। হিটলার হামেশাই এ ধরনের ছুটি সবাইকে মঞ্জুর করতেন। আজ কিন্তু বললেন, 'না, তোমাকে যে কোনও সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে।' দুপুররাতে বাওরকে বললেন, 'খবর নাও তো, ম্যুনিক ফ্লাই করার মতো আবহাওয়া স্বাভাবিক কি না।' বাওর পাশের বড় অ্যারপোর্ট কলোন শহরে ট্রাঙ্ককল করে খবর পেলেন, আবহাওয়া খারাপ। হিটলার কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বাওরকে আদেশ দিলেন, খানিকক্ষণ বাদে বাদে যেন তিনি ট্রাঙ্ককল করে আবহাওয়ার খবর নেন। বাওর তাই করে যেতে লাগলেন। শেষটায় রাত তিনটের সময় বাওর সুসংবাদ দিলেন, এখন ফ্লাই করা সম্ভব। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠলেন, প্লেনে চেপে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে এমন সময় ম্যুনিক পৌঁছলেন। এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, হিটলারের আপন প্লেন মেরামত হয়নি বলে তিনি ম্যুনিক পৌঁছলেন অন্য প্লেনে। অ্যারপোর্টে পৌঁছেই হিটলার জোর পা চালিয়ে গিয়ে উঠলেন মোটরে। সে গাড়িতে তাঁর কয়েকজন অতিশয় বিশ্বাসী সশস্ত্র সহচর তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। মোটর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে উধাও হল। বাওর প্লেন হ্যাঙারে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়ে অ্যারপোর্টে পায়চারি করছেন এমন সময় তাঁর পরিচিত এক অফিসার তাঁকে দেখে শুধোলেন, 'আপনি এখানে?' 'কেন, ফ্যুরারকে খানিকক্ষণ আগে প্লেনে করে এখানে নিয়ে এলুম যে।'

www.pathagar.com

অফিসার আরও আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'সে কী? তাঁর প্লেন তো দেখতে পেলুম না।'

'আমরা অন্য প্লেনে এসেছি। কিন্তু ব্যাপার কী?'

অফিসার অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, 'কেপটেন র‍্যোম আমাকে খাড়া হুকুম দিয়েছিলেন, আমি যেন এখানে কড়া চোখ রাখি, ফ্যুরারের প্লেন দেখা গেলেই যেন তাঁকে ফোন করে খবর দিই। এখন করি কী?'

বাওর বললেন, 'করার তো কিছুই নেই আর। ফ্যুরার তো এতক্ষণে কেপটেন র‍্যোমের ওখানে নিশ্চয়ই পৌঁছে গিয়েছেন।'

এস্থলে বলা প্রয়োজন, হিটলার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বই পড়া না থাকলেও একাধিক ফিলমের মারফত অনেক পাঠকই জানেন, এই কেপটেন র‍্যোমই হিটলারের সর্বপ্রধান অন্তরঙ্গ সখা যিনি হিটলারকে জর্মনির চ্যানসেলর রূপে গদিনশিন করার জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান। তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ নাৎসি যুবক আধা-মিলিটারি ট্রেনিং পেয়েছিল। হিটলার নাকি হঠাৎ খবর পান— কখন পান বলা কঠিন— যে র‍্যোম নাকি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তাঁকে হটিয়ে স্বয়ং গদিতে বসবেন। তাঁবেতে আছে, বিশেষ করে তাঁরই (র‍্যোমেরই) অনুগত পাঁচ লক্ষ নাৎসি— এদেরই নাম ব্রাউন শার্ট।

হিটলার তাই কাউকে কোনও খবর না দিয়ে, গোপন ব্যবস্থা করে হঠাৎ গোডেসবের্গ থেকে (সেখানে গিয়েছিলেন যেন পূর্বাভ্যাসমতো বিশ্রাম নিতে— আসলে র‍্যোমের চোখে ধুলো দেবার জন্য; অবশ্য র‍্যোমও কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন বলে পূর্বোল্লিখিত অফিসারকে অ্যারপোর্টে মোতায়েন করেছিলেন) ম্যুনিকে পৌঁছে সোজা র‍্যোম যে হোটেলে স্বাস্থ্যোদ্ধার করছিলেন, সেখানে অতি ভোরে পৌঁছে তাঁকে অতর্কিতভাবে হামলা করে বন্দি করেন।

র‍্যোম এবং তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ষড়যন্ত্রকারীদের গুলি করে মারা হয়।

লটে বললে, "আবহাওয়ার যোগাযোগ তো আছেই কিন্তু আসল কথা এই, হিটলার যদি আপন প্লেনে আসতেন তবে সেই পাহারাদার অফিসার তৎক্ষণাৎ র‍্যোমকে জানাতেন। র‍্যোমও তৈরি থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে জড়ো করতেন। কে জানে, আখেরে কী হত। হয়তো র‍্যোমই জিততেন। তা হলে কী হত? কে জানে? হিটলারের মতো র‍্যোম তো ফ্রানসের প্রতি বিরূপ ছিলেন না— ভালোবাসতেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর জানো, সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর বাওর এই প্লেনের গুবলেট-কাহিনী হিটলারকে বলেন।

হিটলার নাকি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'নিয়তি'।

লটে বললে, "আমি বলি, 'যোগাযোগ'।"

৩১

"আচ্ছা লটে, আর পাঁচজন জর্মনের মতো তুমি তো হিটলার-যুগটা একটা বিভীষিকা ভরা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যেতে চাও না। তবে একটি কাহিনী আমি শুনতে চাই— বরঞ্চ বলা উচিত, আমি শুনতে চাই আর না-ই চাই, আমার দেশের ছেলেছোকরা মোকা পেলেই

www.pathagar.com

আমাকে শুধোয়, 'হিটলার বিয়েশাদি করলেন না কেন?' তা সে করুন আর না-ই করুন— ইউরোপে যখন দুধ সস্তা তখন গাই কিনে সেটার হেপাজতির বয়নাক্কা— ঝামেলা পোয়ানো মহা আহাম্মুকি— প্রেম-ট্রেমের দিকে তাঁর কি কোনও প্রকারেরই ঝোঁক ছিল না?'

লক্ষ করেছি, এ প্রশ্নে অনেক জর্মনই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু লটে মেয়েটির সমঝ-বুঝ আছে। একদিকে যেমন খানিকটে প্যুরিটানিজম আছে, অন্যদিকে কথাপ্রসঙ্গে যদি প্রেম এমনকি আলোচনা দৈহিক কামনার দিকে মোড় নেয় তবে সে সবসময় নাসিকা কুঞ্চিত করে না। এমনকি মাঝে মাঝে হাজার ভল্টের প্রাণঘাতী শকও দিতে জানে। যেমন আমাদের তিনজনাতে বেশ যখন জমে উঠেছে তখন লটে বেশ রসিয়ে রসিয়ে য়োহানেস-আঙনেস-আমার স্নান-বিহারের বিপর্যয় কাহিনী হেরমানকে শোনাল। হেরমান কৌতুকভরে আমাকে শুধাল, 'আচ্ছা সায়েড, সবই তো হল কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে অষ্টাদশী আঙনেসের বার্থডে ফ্রকপরা যে অনাবিল সৌন্দর্য—'

ঝোপের ভিতর দিয়ে আসার সময় কাহিনী বলতে বলতে যখন এই অঙ্কে পৌঁছই তখন যে রকম রসভঙ্গ করে লটে ধমক দিয়ে বলেছিল 'চোপ', এস্থলে সেটা তদ্বৎ।

আমি হেরমানের দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানালুম, 'ভায়া হেরমান, আড়াল থেকে মাত্র দুটিবার এ জীবনে নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—'

ঠোঁটকাটা হেরমান শুধলে, 'আর মুখোমুখী?'

লটে ফের ধমকাল, 'চোপ!' এ— 'চোপেতে' আমার সর্বান্তঃকরণের সম্মতি।

রূঢ়বাক্য প্রয়োগের বেলায় লটের শব্দভাণ্ডার বড্ডই বাড়ন্ত। অনুমান করলুম, প্রাচীনদিনের সেই নবীনা লটে নানা অনাবশ্যকীয় কিন্তু অনিবার্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই লটে এখনও শান্তা নাম নিতে পারে। কাউকে ধমক-টমক দিতে দিতে কড়া কথার স্টক বড় একটা বাড়াতে পারেনি।

আমি হেরমানকে করুণতর কণ্ঠে বললুম, 'শুনলে ভাইয়া, শুনলে? দেখলে, কী মারাত্মক প্যুরিটান, ঝুরঝুরে সেকেলে পদি পিসি!'

লটে স্থির নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গে যুগ্ম অভিসারে বেরিয়েছ আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে—'

আমি মনে মনে খানিকটে আমেজ করে গুনগুনালুম,

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।

লটে বাক্যের শেষাংশ পুনরাবৃত্তি করে বললে— 'আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে, আর আমাকে শুনতে হবে, কান ভরে শুনতে হবে, প্রাণভরে 'আ মরি-আ মরি' বলতে হবে আংনেসের নগ্ন সৌন্দর্যবর্ণনার প্রতিটি শব্দ যখন আমার কানের পর্দাতে কটাং কটাং করে হাতড়ি ঠুকবে। ভেবো না আমি হিংসুটে। নগ্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা যে কোনও পুরুষ যে কোনও রমণীর এবং ভাইস-ভার্সা দিক। আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই— তা সে বিন্দু সরেসতম নেপলিউন ব্রান্ডিরই হোক আর নিরেসতম জাপানি বিয়ারেরই হোক; কিন্তু তুমি যদি দিতে চাও— তা সে তোমার জীবনে প্রথমবারের মতোই হোক, আর শেষবারের মতোই হোক— তুমি দেবে আমায় রইল কথা।'

www.pathagar.com

হেরমান বললে, 'ব্রাভো, ব্রাভো, ন-বউ বাঁচলে হয়।'

এবার আমার 'চোপ' বলার পালা। হেরমান যেন রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে বলল, 'কেন? শুনতে পাবার মতো অধিকার আমার কাছে কি, বর্ণনাটা গেলবার মতো প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি কি, সে সিনেমাটা এ মার্কা না বি-মার্কা, জানতে পারি কি? কেন আর্টিস্টরা কি ন্যুড মডেল সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকে না? আর দাঁড় করিয়েই বা বলছি কেন? আর্টিস্ট পিট্‌ম্যুলারের স্টুডিয়োতে যখনই গিয়েছি, তখনই দেখেছি, নিদেন গোটা তিনেক মডেল বার্থডে ফ্রক পরে কেউ বা কফি বানাচ্ছে, এখান থেকে দেশলাই আনছে, ওখান থেকে চিনিটা আনছে, সেখানে আতিপাতি খুঁজছে, কফির কৌটোটা গেল কোথায় শুধোচ্ছে, জানো তো আর্টিস্ট মাত্রই কী রকম মারাত্মক গোছ-গোছানোর নিট অ্যান্ড ক্লিন বেড়ালটির স্বভাব ধরেন— অন্যজন ম্যুলারের আসন্ন প্রদর্শনীর জন্য ছবি খুঁজতে গিয়ে কখনও কাত হয়ে গড়াতে গড়াতে সোফার নিচে ঢুকছেন, কখনও-বা অর্ধ লম্ফে জানালার চৌকাঠের উপর উঠে একটি বাহু সম্প্রসারিত করেছেন সর্বোচ্চ শেলফের দিকে, আমি তো ভয়ে মরি, হাতখানির প্রলম্বিত ওই টান-টান টানের ফলে দেহশ্রীর উচ্চার্ধ না বক্ষচ্যুত হয়—'

হেরমান সবিনয় বললে, 'তাই সই!' বাকিটা সংক্ষেপে সারছি। কারণ তৃতীয়া মডেলটি সবাকার সেরা। সেই বিরাট স্টুডিয়োর মাঝখানে তিনি মেদ বৃদ্ধি নিবারণার্থে জিমনাস্টিক জুড়েছেন। আর সে যা তা জিমনাস্টিক নয়— ভারতীয় সাপুড়ে নাচ থেকে শুরু করে মিশরি বেলিডানস— নাভিকুণ্ডলীটি কেন্দ্র করে।

আর ওইসব হুরীপরীদের কর্মকলাপের মধ্যিখানা যেন তুর্কির পাশা জর্মন পিট্‌ম্যুলার তার খাস-প্যারা ডিভানটির উপর অঘোরে ঘুমঘোরে নাক ডাকাচ্ছেন। একদিন পিট্‌কে শুধিয়েছিলুম, মঞ্চের উপর মডেল ছিল... দাঁড়িয়ে আছেন সে না হয় বুঝি। কিন্তু কাজকর্ম করার সময় ওনারা জামা-কাপড় পরলে কী দোষটা হয়। পিট্ বললে, আমি নাকি একটা আস্ত বুদ্ধু। দুনিয়ার তাবৎ মেয়েই তো এমন কিছু আর্টিস্টের মডেলের মতো 'যাবজ্জীবেৎ' ততকাল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে 'সুখং জীবেৎ' বরাত নিয়ে আসে না। ওরা হাঁটে, কাজ করে, উপু হয়ে এটা-সেটা কুড়োয়, পায়ের আট আঙুলের উপর ভর দিয়ে নাগালের প্রায় বাইরের তাকটা থেকে আচারের বোয়াম নামায়। এগুলোও তো আঁকতে হয়— অবশ্য ফ্রক ব্লাউস তখন তাদের পরনে থাকে, আমিও তাই আঁকি। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থান পরিবর্তন এবং তজ্জনিত নানাবিধ আন্দোলন ন্যুডে না দেখা থাকলে ছবি ডাইনামিক হয় না। উদাহরণ দিয়ে পিট্ বলেছিল, গাছের যে ডালপালা— তার গতিবিধি হুবহু জানতে হলে গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, যখন শীতকালে সে সর্ব পত্রবিবর্জিত নগ্ন।

আমি বললুম, 'তা হতে পারে। কিন্তু আর্টিস্টরা সবকিছু দেখে নিরাসক্ত নয়নে। ন্যুড গাছ, ন্যুড রমণীকে— একই নিরাসক্ত নয়নে। কিন্তু আর পাঁচজন তো প্রভু খ্রিস্টের মতো নয়। তিনি বলেছেন, 'পাপনয়ন উপড়ে ফেল'। আর বললে বিশ্বাস করবে না, আমাদের দেশের এক বেশ্যাসক্ত পাপী ওই উপদেশ না জেনেও জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়াতে চর্মচক্ষু উপড়ে ফেলে। আশ্চর্য, প্রভু খ্রিস্ট উদ্ধার করলেন ভ্রষ্টা নর্তকী মারি মাগদেলেনকে আর ভ্রষ্টা নর্তকী চিন্তামণির উপদেশে উদ্ধার পেল পাপী বিল্বমঙ্গল। কিন্তু সেকথা থাক। আমি বলছি, তোমার বউ তো বিরাট ওকগাছ—'

www.pathagar.com

লটে : 'কী বললে! আমি ধুমসী মুটকী ওকগাছ?'

'আহা চটো কেনে? অন্য হাতটা আনতে দাও—'

'সে আবার কী জ্বালা?'

'পরে হবে,— কিংবা তুমি তন্বঙ্গী চিনার গাছও নও, তা হলে, বল বৎস, হেরমান, করি কী?'

হেরমান : 'কে বললে তোমাকে, আর্টিস্টরা নিরাসক্ত নয়নে কুল্লে দুনিয়ার দিকে তাকায়? তা হলে কোনও ন্যুডকে সরলা, কোনওটিকে চিন্তাশীলা, কোনওটিকে কামুকা, কোনওটিকে চিত্তপ্রদাহিণী, কোনওটিকে শান্তিদায়িনী আঁকে গড়ে কী প্রকারে? নিশ্চয়ই তাঁদের হৃদয়মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদয় হয়। অবশ্য পূর্ণ সিদ্ধা মডেল তার থোড়াই পরোয়া করে। 'সঙ অব সঙ'— 'সঙ অব সলমন' নামেও পরিচিত— ফিলিম দেখেছ? আমাদের ওই পাশের শহরে কলোনের মেয়ে— হিটলার-বৈরী রমণী মার্লেন ডিটরিষ্ সে ফিলিমের প্রধান নায়িকা। গাঁইয়া মেয়ে এসেছে শহরে পিসির দোকানে কাজ করতে। সেখানে এক ছোকরা ভাস্করের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ। ছোকরা পিসির ভয়ে বেরুবার সময় শুধু আঙ্গুল দিয়ে দেখাল— সামনের পাঁচতলার বাড়ির চিলেকোঠায় তার স্টুডিও। মেয়েটা মজেছে। সে রাত্রেই গেল আর্টিস্টের কাছে। আর্টিস্ট সত্যই মেয়েটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে— যেন সন্ধান পেয়েছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, মাস্টারপিস 'সঙ অব্ সঙস্' সর্বগীতির সেরা গীতি ওরই ন্যুড দিয়ে নির্মাণ করবে। অনুপ্রাণিত ভাষায় মেয়েটিকে তার আদর্শ, তার সর্বকীর্তির শ্রেষ্ঠতম কীর্তির কথা বলে বলে সেই সরলা বালার হৃদয়ে তার ভাবাবেগ সঞ্চারিত করল। অবশেষে অনুরোধ করা মাত্র সর্ব আবরণ খুলে ফেলে দাঁড়াল মঞ্চের উপর সে মেয়ে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আর্টিস্ট ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুততম গতিতে এঁকে যেতে লাগল প্রথম স্কেচ। সম্বিতে ফিরে এল স্কেচ শেষ হওয়ার পর। তখন এই সর্বপ্রথম, সে লক্ষ করল মেয়েটির দেহের সৌন্দর্য। তার চোখের উপর ফুটে উঠল সে ভাব-পরিবর্তন, মেয়েটি এক পলকেই সে আবেশ লক্ষ করল। সঙ্গে সঙ্গে পেল নিদারুণ লজ্জা। ছুটে গিয়ে সর্বাঙ্গ জড়াল, হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে।

এতক্ষণ অবধি দু জনার কারওরই কোনও আচরণে কোনও প্রকারের আড়ষ্টতা ছিল না। দু জনা একই সৃষ্টিকর্মের ভাবাবেশে নিমজ্জিত, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত— একজন ডাইনামিক অন্যজন স্টাটিক। একজনের সে ভাব পরিবর্তন হওয়া মাত্রই সে পরিবর্তন ওর মনে সঞ্চারিত হল। মৃন্ময় দেহ সম্বন্ধে সে এই প্রথম সচেতন হল। সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তে উদয় হল, সঙ্কোচ ব্রীড়া লজ্জা। সঞ্চারিত হল দেহে।

অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে এ মেয়েটির বিবস্ত্র হওয়া, আর্টিস্ট যতক্ষণ স্কেচ করছিল আপন নগ্নদেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকা, স্কেচ শেষে হঠাৎ আর্টিস্টের চোখের ভাবান্তর লক্ষ করে চিন্ময়ভুবন থেকে মৃন্ময়লোকে পতন— এ সবই সম্ভব হয়েছিল, তার একটিমাত্র কারণ সে ছিল জনপদবালা সরলা কুমারী।'

হেরমান ঠিক সমে এসেই থামল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বে-আদবি মাফ হয়। আমি একটু আসি।'

আমি লটের দিকে তাকালুম। তার নয়ন মুদ্রিত। হেরমানের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনে চোখ মেলে আমার দিকে গভীর স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে বললে, 'হেরমান

www.pathagar.com

অনায়াসে চিন্ময়-মৃন্ময়ে আনাগোনা করতে পারে। আমার অতখানি বুদ্ধি নেই, অতখানি স্পর্শকাতরও আমি নই। আমি অত্যন্ত সাদামাটা রাইনের কাদায় গড়া মানুষ। তবু বলব, হেরমান যেভাবে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলল, এর পর হিটলারের প্রেম নিয়ে আলোচনা করা যায় না। লোকে বলে 'হিটলারের প্রেম', কিন্তু সে পঙ্কিল বস্তুটাকে প্রেম নাম দিতে হলে অনেকখানি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, ওটা আজ থাক।'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধাল, 'আজ চাঁদের আলোটা ঠিক তেমন উজ্জ্বল নয়, সেই সে-রাত্রে তুমি যখন রাইন গল্ট্ এক্সপ্রেসের তুফান বেগে চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছিলে। তবু নেই নেই করে কিছুটা তো আছে। আচ্ছা তুমি কখনও চাঁদের আলোতে ক্যানভাসের ফোলডিং বোট-এ রাইনের উপর ঘোরাঘুরি করেছ?'

আমি বললুম, 'কেন?'

'আমাদের একটা আছে! যাবে?'

আমি শুধালুম, 'সে তো বেশ কথা। হেরমান নিশ্চয়ই ভালো নৌকো বাইতে জানে— রাইনের পারে জন্মাবধি এতটা কাল কাটাল।'

লটে খিল খিল করে হেসে বললে, 'তুমি কি ভেবেছ আমাদের ফোলডিং বোট স্বর্গীয় মানওয়ারি জাহাজ 'বিসমার্ক' বা 'কুইন মেরি' সাইজের জাহাজ। ওটাতে মাত্র দু জনার জায়গা হয়।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ।'

৩২

কথায় বলে 'কানু ছাড়া গীত নেই।' অবশ্য সে গীত শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্য, তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এমনকি তিনি যে মথুরায় একাধিক বিবাহ করেছিলেন এবং হয়তো-বা এঁদের কোনও একজন বা একাধিক জনকে ভালোও বেসেছিলেন— এসব বিষয় নিয়ে নয়। সত্রাজিত দুহিতা সত্যভামার প্রতি তিনি যে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মহাভারতে আছে, 'সত্যভামা কোপাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন।' এবং ফলস্বরূপ পরে যে হানাহানি আরম্ভ হয় সেটাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিস্তর ভোজ এবং অন্ধক বংশের বীরদের বিনষ্ট করেন। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যভামার প্রতি বাসুদেবের অনুরাগ নিয়ে কোনও কবি উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি করেছেন বা 'গীত' গেয়েছেন একথা তো কখনও শুনিনি। কানুর গীত মানেই শ্রীরাধার উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রেমনিবেদনের গীত এবং তার চেয়েও মধুরতর এবং বেদনায় নিবিড়তর— বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়— কানুর বিরহে রাজার ঝিয়ারীর আর্তগীতি।

গোডেসবের্গ-মেলমের অতি কাছেই রাইনের দুটি অপরূপ সুন্দর দ্বীপ। অর্থাৎ লটেদের বাড়ি থেকে দূরে নয়। কিন্তু উজানবাগে।

হেরমান নৌকাটি ফিটফাট করে সেটাকে এক ধাক্কায় ভাটির দিকে ঢালু করে দিয়ে বেশ উঁচু গলায় বললে, 'বলি লটে, বেশি বাড়াবাড়ি কর না। রিভার-পুলিশ কাছেই।' আমাদের

www.pathagar.com

স্টেশনে স্টেশনে যেরকম একদা সাইনবোর্ড সাবধানবাণী শোনাত 'পকেটমার নজদিকে হৈ।' আমি বললুম, 'তবেই হয়েছে।' বলেই ফিক করে আধগাল হেসে নিলুম।

"তোমার কথায় আর আচরণে কোনও মিল নেই। এদিকে বলছ, 'তবেই হয়েছে', অর্থাৎ কাছেপিঠে রিভার-পুলিশ থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে। ওদিকে ঠোঁটের আলোতে খেলে গেল মোলায়েম হাসি। মানে খুশি। কোনটা ঠিক? হেঁয়ালি ছেড়ে কথা কও। তুমি চিরকালই বেখেয়ালি। অভদ্র ভাষায় বলতে হলে নির্ভয়ে বলব, তুমি আমার মনে আমার বুকে কী চলছে সে সম্বন্ধে উদাসীন। আচ্ছা, তুমি কি একবারের তরেও নিজের মনকে শুধিয়েছ, আমি তোমাকে সর্বক্ষণ কোন প্রশ্নটি, মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই? বল।"

এর চেয়ে পকেট-বুক সাইজের ভেলা, মোচার খোলও অক্লেশে বলা যেতে পারে ত্রিসংসারে হয় না। জর্মন জাতটাই দুই একসট্রিম নিয়ে গেণ্ডেরি খেলতে ভালোবাসে, ক্ষণে আসমান ক্ষণে জমিন, ক্ষণে মোচার খোলা নৌকো ক্ষণে জেপেলিন। এ ভেলাটি সাইজে দেশের মাদ্রাজি মেসবাড়ির— মাদ্রাজি উচ্চারণে হিন্দিতে 'চোট সে চোটা'— তক্তপোশের যমজভাই দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে। অবশ্য নৌকাটির হাল আর গলুইয়ের দিক দুটো ছুঁচল বলে সে দু-প্রান্তে তক্তপোশকে অবশ্যই হার মানায়। লটে হাল ধরে বসেছে একপ্রান্তে, আমি অন্যদিকে। দেশের কোঁদা নৌকোর সঙ্গে এ ভেলার আর একটা সর্বনাশা প্রাণঘাতী মিল আছে। কোঁদা নৌকোতে ওঠার সময় নৌকোর ঠিক মধ্যিখানে না বসলে, বসার পরও ডাইনে-বাঁয়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির বেশি, হঠাৎ কাত হয়েছ কি অমনি নৌকো কুপোকাত। হাটবারে কচ্ছপকে চিৎ করে রাখে, আর ইনি হয়ে যান উপুড়। হ্যাঁ, হেরমান অতি নিশ্চিত তালেবর মাল। এ ভেলায় আর যা হয় করতে চাও কর কিন্তু ঢলাঢলিটি— উভয়ার্থে— করতে যেয়ো না, বাপধন! আচ্ছা এক নয়া সেফটিবেল্ট আবিষ্কার করেছে রাম ঘুঘু হেরমান। ওদিকে আমি তো 'ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু। ফাঁদ তো, বাবা দেখিনি ॥'— হেরমান যখন পার্কের বেঞ্চিতে বসার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে কত না সোহাগভরে তরণীবিহারের প্রস্তাবটা পাড়লে তখন সে কত ধুরন্ধর বুঝতে পারিনি— পরে লটে বলেছিল।

সংস্কৃতের ডাকসাইটে অধ্যাপক প্রফেসর কির্ফেল বহু বৎসর রাইনের পারে বাস করেছেন। একদিন আমি যখন রাইনের পাড়ে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন তখন তিনি আমার পাশে এসে বসাতে আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি শুধালেন, 'রাইন আজ কী রকম?' আমি বললুম, 'নদীর এ-পার ও-পার দু-পারই তো বেশ পরিষ্কার কিন্তু ঠিক জলের উপরটা কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখায়।' প্রফেসর বললেন, 'সে প্রায় গোটা বছর ধরেই চলে। তাই যেসব আর্টিস্ট রাইনের ছবি এঁকেছেন তাঁরাই রাইনের ঠিক উপরটা যেন সামান্য কুয়াশাঢাকা ঝাপসা ঝাপসা এঁকেছেন।' এ বাক্যালাপের পর আমি রাইনের বহু ছবি দেখেছি। প্রফেসরের কথা ন-সিকে খাঁটি।

আজও তাই লটেকে দেখতে পাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো আজ রাতে তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু সে আরও কুহেলির গ্লানি ছিন্ন করে মাঝে মাঝে তার মুখের রেখা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। কপালের উপরকার অতি সামান্য ঘাম তখন চিকচিক করে ওঠে। আর চিকচিক করে ওঠে তার অতি কৃষ্ণ কুন্তলের মাঝখানে তুষারশুভ্র সীমান্তরেখা। এরকম শুভ্র সিতের সমন্বয় তো আমাদের দেশে চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আমার দিকে এক ঝলক তাকায় আর একটুখানি মুচকি হাসে।

www.pathagar.com

শুধাল, 'কই? আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না!'

মুশকিল! বললুম, 'তুমি কী প্রশ্ন শুধাতে চাও সেটা আমি এতক্ষণ চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। তাই সমস্যাটার কোনও শেষ সমাধানে পৌঁছতে পারিনি। কখনও পারব বলে মনেও হয় না।'

'আমি বলব?'

'বল।'

'তুমি বাকি জীবন এই গোডেসবের্গ-মেলেমে কাটাবে না, সে আমি জানি। কিন্তু কদিন এখানে থাকবে সেটা আমি বার বার জিগ্যেস করতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। যদি হঠাৎ বলে বসো, কালই চলে যাচ্ছ, তখন কী? এটা বলতে তোমার তো এতটুকু বাধবে না সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হৃদয়ে যে রত্তিভর মায়ামহব্বৎ নেই সে আমি ভালো করেই জানি। আর সত্যি বলতে কী, তোমার-আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন যে চাঁদের আলোতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একদা জানালার পাশে এসে আমি দেখি, তুমি ছুটে চলেছ মায়ের চিঠি ডাকে ফেলতে। তুমি যদি সেদিন রহস্য করে যা লোকে আকছারই করে থাকে, বলতে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, এই— এই— প্রিয়ার চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ছিঃ! দশ বছরের বাচ্চা মেয়েকে কেউ কখনও এরকম কথা বলে?'

লটে অবাক হয়ে বলল, 'কেন? সবাই তো বলে, সক্কলের সামনে!'

'আমাদের দেশে বলে না।'

'সেকথা থাক! আসল কথা তুমি যে তোমার মাকে খুব ভালোবাস সেটা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছিল সেদিন। ওইটুকু ছিল বলে—'

'কাকে-চিলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়নি।'

'মানে?'

'অতি সরল, অর্থাৎ এমনই পচা জিনিস যে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। পচা জিনিসের প্রতি লোভ কার? কাকের-চিলের। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি, লটে, যদি প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা নিয়ে তার পর তুমি আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা জুড়বে না, কোনও প্রশ্ন শুধোবে না।'

'প্রতিজ্ঞা করছি।'

গলায় দরদ ঢেলে বললুম, 'তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে লটে। তা হলে বলি। আমি আমার মাকে জানা-অজানায় যতখানি কষ্ট দিয়েছি অন্য কেউ সেরকম দিয়েছে কি না বলতে পারব না। আর আমি আমার জীবনে যা-কিছু দুঃখকষ্ট পেয়েছি সে শুধু মাকে কষ্ট দিয়েছিলুম বলে তার শাস্তিস্বরূপ, সেকথা জানি। ব্যস, এ বিষয়ে আর কোনও কথা না। এবারে তোমার কথার উত্তর দিই। আমি গোডেসবের্গ ছেড়ে কাল যাচ্ছিনে, পরশু যাচ্ছিনে, তরশুও না।'

খুশিতে গলা ভরে বললে, 'বাঁচালে।' তার পর মনমরা হয়ে শুধাল, 'তরশু'র পর?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, 'লটে, তোমার কথা শুনলে যে কোনও লোক ভাববে যেন কোনও বাচ্চা মেয়ে জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়েছে।'

নিশ্চিন্ত মনে লটে বললে, 'তা ভাবুক না। আমার তাতে কী? যে জিনিসের মূল্য না বুঝে কিংবা নিজেদের এঞ্জেলের মতো মনে করে দম্ভভরে কতকগুলি পাঁড় ইডিয়ট হাসি-ঠাট্টা করে তার গায়ে তাতে করে কোনও ক্ষত হয় না।'

www.pathagar.com

আমি উৎসাহভরে বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কথাতে আমার গুরুর একটি আপ্তবাক্য মনে হল। শোনো, শোনো।

'বাহুর দন্ত, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্য কালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে,
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনও ক্ষত।'

হায়, অনুবাদে কি আর সে রস আসে, সাধে কি বিবেকানন্দ বলেছেন, অনুবাদ— সে তো কাশ্মিরি ডিজাইনের উল্টো দিকটা দেখার মতো।'

লটে বললে, 'মূর্খ মূর্খ মূর্খ, কী ভাববে সবাই? বুড়ি লটের ভীমরতি ধরেছে, এইবারে দেখে নিও। কী কেলেঙ্কারিটাই না হয়। ড্যাং ড্যাং করে লাফাতে লাফাতে হের সায়েডকে বগলে চেপে চলল লটে মন্তে কার্লো কিংবা হাওয়াই দ্বীপে। জব্বর অপারেশন করিয়ে মুখের চামড়া টান-টান করাবে। পাকি-পাকছি পাকি-পাকছি চুলের উপর লাগাবে তিন পলস্তরা কলপ—'

'তা হলে?'

'তা হলে? এই যে তুমি তিন দিন থাকবে আমি কি তোমার পিছন পিছন ছোঁক ছোঁক করব নাকি? তোমার গায়ে পোস্টেজ স্ট্যাম্পের মতো সেঁটে রইব নাকি—'

'গেল গেল' চিৎকার করে উঠলুম আমি। কী যেন কী একটা ভাসন্ত জিনিসের সঙ্গে ভেলা খেয়েছে জব্বর এক ধাক্কা ॥

৩৩

জর্মন কবি গ্যোটেকে নিয়ে যত গবেষণা আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তার শতাংশের একাংশ হয়েছে কি না সন্দেহ। অথচ জর্মন সাহিত্যে গ্যোটে ছাড়াও এমন সব কবি রয়েছেন যাঁদের দু-চারজনকে পেলে আমাদের সাহিত্য বর্তে যেত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাই অল্প বয়সেই জর্মন কবি হাইনের গুটিকয়েক কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেন। লোকে বলে গ্যোটের সম্বন্ধে জর্মনে তথা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতে এত বেশি আলোচনা টীকা-টিপ্পনী করা হয়ে গিয়েছে যে আজ নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক ছোকরা গবেষক তার ডকটরেটের জন্য অন্য কোনও সবজেক্ট্ না পেয়ে থিসিস লেখে 'গ্যোটে ও দন্তশূল' বিষয়ের ওপর। তার বক্তব্য ছিল গ্যোটের কাব্যে যেসব বিষাদময় নৈরাশ্যব্যঞ্জক অনুভূতি আমরা পাই, তার অধিকাংশই কবি রচনা করেছেন যখন তিনি দাঁতের কনকনানিতে কাতর, কিংবা কাতর না হলেও সেটা তাঁকে স্বস্তিতে আপন রুচি অনুযায়ী (কলকাত্তা-ই হিন্দিতে যে রকম বলে 'আপন রুচি খানা') কবিতা রচনা করতে দিত না। দন্তরুচি অনুযায়ী অর্থাৎ দাঁতের যা রুচি, সেই অনুযায়ী লিখতে বাধ্য হতেন, অর্থাৎ 'পর রুচি' খেতেন— এখানে আমি অবশ্য 'দন্তরুচি' প্রচলিত 'দাঁতের সৌন্দর্য' অর্থে ব্যবহার করিনি। এবং দাঁতের রুচি যে কী হতে পারে সেটা ভুক্তভোগী পাঠক নিশ্চয়ই আমার নিবেদন শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই দন্তরুচি বিকশিত করে সহাস্য আস্যে অনুমান করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

এসব অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, নদী এবং প্রধানত পদ্মাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের কতখানি বৃহৎ অংশ অধিকার করে তাঁকে সুখে-দুঃখে সঙ্গ দিয়েছে। এমনকি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করার পর থেকে পদ্মার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যজগতে 'সে বিরাট নদী চলে নিরবধি'। ক্ষীণস্রোতা তো হয়ইনি, বরঞ্চ সে মৃন্ময়ী নদী তখন চিন্ময় রূপ ধারণ করে তাঁর জীবনদর্শনে প্রধানতম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তাই বৈতরণীর সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি গেয়েছেন :

'ওরে দেখ, সেই স্রোত হয়েছে মধুর,
তরুণী কাঁপিছে থর থর।...

তিনি চলবেন,

মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।'

নদী তরণীর দেশ 'বাঙলা দেশ'। সে শুভদিন প্রত্যাসন্ন সেদিন ওই বাঙলা দেশের ভাবী পদ্মা-সন্তান 'রবীন্দ্রনাথ-পদ্মাতরণী' রচনা করে বাঙলা দেশের চিন্ময়রূপ আলোকিত করবেন।

পদ্মার জলে স্নান করেছি, সাঁতার কেটেছি বিস্তর। কিন্তু নৌকো কুপোকাত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কখনও নাকানিচোবানি খাইনি। একদা মিস মেয়ো যখন তাঁর ড্রেন-ইনিস্‌পেক্টর রিপোর্টে ভারতবাসীর নোংরা স্বভাবের চুটিয়ে নিন্দা করেন তখন তদুত্তরে প্রাতঃস্মরণীয় লালা হরকিষণ লালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কানহাইয়া লাল গাওবা তাঁর 'আংকল শ্যাম' (Uncle Sham = ঝুট চাচা বা 'ঠক চাচা'ও বলতে পারেন) পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে মার্কিনদের স্বপ্নলোক ফ্রানস্‌ভূমি— মার্কিন প্রবাদে আছে 'অশেষ পুণ্যবান আমেরিকান পরজন্মে ফ্রান্সভূমিতে জন্মলাভ করে'— তথা তথাকার জনসাধারণের বদখদ নোংরা স্বভাব সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেন, 'সেই ফরাসি দেশ— যেখানকার আপামর জনসাধারণ নিতান্ত জাহাজডুবি ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থাতেই স্নান করে না।' কিন্তু আমি এমন কী পাপ করেছি যে এই রাতদুপুরে নৌকোডুবির ব্যবস্থা করে বরুণদেব আমাকে স্নান করাবেন— আমি তো হে, প্রভো, নিত্য প্রভাতে দিব্য স্নান করি। তদুপরি যে দুর্ভাবনা আমার মনের ভিতর চড়াৎ করে নেচে গেল সেটি শুনলে লেডি-কিলার মাত্রই আমাকে বর্বরস্য বর্বর ভিন্ন অন্য কোনও উপাধি দেবেন না— লটে সাঁতার জানে তো, আমি তো ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী নটবর মি. প্রফুমো নই যে মাঝরাতে রাইন নদীতে লটের সঙ্গে জলকেলি করব। হুঃ—

নদী জলে স্নান করাটা
বলেন গুণী, স্বাস্থ্যকর।
প্রাণটা আগে বাঁচাই দাদা,
জলকেলিটা তাহার পর ॥

কিন্তু উলটো বুঝলি রাম; লটে চেঁচিয়ে শুধাল, 'সায়েড, তুমি সাঁতার জানো তো?'

www.pathagar.com

বাঁচাল। কারণ যে সুরে প্রশ্নটা শুধাল, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, লটে সাঁতার জানে, তার দুশ্চিন্তা আমকে নিয়ে। বদরপীর সোনাগাছির জন্মদাতা সোনা গাজি দু জনই পানির পীর, এবং মাঝি-মাল্লার ত্রাণকর্তা। এতক্ষণ মনে মনে উভয়কে স্মরণ করছিলুম; এখন বিস্তর শুকরিয়া জানালুম।

কিন্তু কোনও পীর, কোনও বরুণদেবের শরণ না নিলেও চলত। লটে দেখি খোলামকুচিখানা খাসা সামলে নিয়েছে। কিন্তু ধাক্কা লেগেছিল কিসে? কোনও বয়াতে নাকি? কিন্তু লটে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা বিলকুল বেকার মনে করে শুধাল, 'ভয় পেয়েছিলে নাকি?'

'না।'

লটে তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'এরকম তো আখছারই হয়। আর ছোট নৌকো তো বড় জাহাজের চেয়ে ঢের বেশি নিরাপদ। নইলে বিরাট জাহাজ ডুবে গেলে মানুষ ক্ষুদে লাইফ-বোটে ওঠে কেন? তা হলে আগেভাগে ছোট নৌকো চড়লেই হয়। কিন্তু এ যুক্তিটা আমার আবিষ্কার নয়। কে যেন এক মিনি-নৌকো-পাগল দুঁদে আটলান্টিক শিকারি, বলতে গেলে ডিমের খোলায় চড়ে স্পেন থেকে পানামা না কোথায় যেন পৌঁছায়। সেখানে কেউ ওকে না থামালে হয়তো তার পর লেগে যেত প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে। তাকে নাকি হিটলার প্রশ্নটা শুধিয়েছিল। হয়তো লোকটার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু ওরকম সাগর পাড়ি দিতে একা একা পারব না।'

'কেন, মেয়েরা একা কোনও কাজ করতে ভয় পায়, তাই?'

'কিছু জানো না তুমি সায়েড। একা একা বিস্তর কাজ করে থাকে মেয়েরা। কিন্তু ভয় পায় একা থাকতে। শারীরিক-মানসিক দুই অবস্থাতেই ভয় পায় একা থাকতে। এই যে ছোঁড়াছুঁড়িরা ধেই ধেই করে নৃত্য করছে, তাদের তিন কোয়ার্টার শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আরেকটা একা থাকা সত্যিই রীতিমতো বিপজ্জনক। আমাদের বাড়িটা দেখেছ তো— চতুর্দিক নির্জন। যে কোনও রাত্রে এমনকি দিনের বেলাও যে কোনও মহাপ্রভু মার্কিন স্টাইলে বাড়ি হানা দিতে পারেন— হাতে পিস্তল চোখের উপর দুটো ফুটোওলা পট্টি। এবং মেয়েরাও কম যান না। পিস্তল ব্যবহার করতে মোটেই বাধে না। ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। ব্যস হয়ে গেল। তুমি দু-ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে— না, দড়াম করে নয়, চুবশে-যাওয়া বেলুনটার মতো ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর গুটিয়ে পড়বে। তার পর রক্তগঙ্গা—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লটে, তুমি বড্ড বেশি মার্কিন 'ক্রিমি' পড়েছ (ক্রাইম-নভেল, ক্রাইম-টেলিভিশনের মার্কিনি এই শব্দটি জর্মনরা গোগ্রাসে গ্রহণ করেছে)। আমাদের দেশের লোক একটুখানি অলঙ্কার চাপিয়ে এস্থলে বলে, "ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছ"।'

'কথাটা তো চমৎকার। মনের খাতায় টুকে রাখলুম। কিন্তু তোমাকে যা বলছি সেটা একদম সত্যি। আচ্ছা, সবকিছু বাদ দিয়ে তোমাকে শুধোই, তুমি কখনও "বাড়ারমাইন্‌হফ্‌-গ্রুপ"-এর নাম শুনেছ?'

'না। পলিটিক্যাল পার্টি নাকি?'

www.pathagar.com

'না। তাই এখনও নিজেদের 'গ্রুপ' বলে। এই তো তোমাদের এলেম। কথায় কথায় তুমি যে আমাকে মার্কিনি মার্কিনি খেতাবটা দাও, যে আমি মার্কিন বেড়ালের জর্মন ন্যাজ, তুমি বরঞ্চ মার্কিন রিপ ভান উইনক্ল্‌কে হার মানাতে পার। সে ঘুমিয়েছিল কুল্লে কুড়িটা বছর, তুমি ঝাড়া চল্লিশটি বছর। এরকম—'

'আহা! চল্লিশটি বছরে আমার কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি, আর পাঁচটা দেশের তুলনায় জর্মনি যে অনেকখানি বদলে গেছে তার কোনও খবর রাখিনে— এই তো?'

'উ—'

'সে-ই তো ভালো। তাই তোমাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললুম,

'তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে
চিরপরিচিত তোর হাসি,
'আমি ভালোবাসি'॥

এইবারে বল, চল্লিশ বছরে আর পাঁচজন যেরকম বদলে গেছে আমার বেলা তাই হলে কি ভালো হত।'

খুশি মুখে লটে বললে, 'শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু এই ভালোবাসার ব্যাপারেই যে তুমি কী দারুণ অগা সেটা আমি তোমাকে না শুধিয়ে বুঝতে পেরেছি। এবং যৌন সম্পর্ক ব্যাপারে আজ জর্মনি কোন জায়গায় এসে পৌঁচেছে তার কোনও খবরই রাখ না। আচ্ছা বল তো, তোমার কি মনে হয়, এদেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের শতকরা ক জনের স্কুলে থাকতে থাকতেই যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়।'

'কী করে বলব, বল। খুবই অল্পই। ধর্তব্যের মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লটে বললে, 'তা হলে শোন, এবং ভিরমি খেয়ো না। ষোল-সতেরো বছর বয়স হতে না হতেই শতকরা পঁয়ত্রিশটি ছেলের ত্রিশটি মেয়ের পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। পনেরো বছর বয়সেই যথাক্রমে শতকরা চৌদ্দ/পনেরো ও দশ। এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই একশোটার ভিতর জনা পাঁচেক!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধোলুম, 'এসব কি সত্যি? আর তুমি জানলেই-বা কী করে?'

'জানতে হয় তাই জেনেছি। আমি যে একটা স্কুলে আমার বান্ধবীর হয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে যাই। হালেরই তো একখানা প্রামাণিক বই বেরিয়েছে। আমি তোমাকে শুধোচ্ছিলুম, তোমাদের দেশে পরিস্থিতিটা কী রকম, তার খবর নিয়ে তুলনা করে দেখতে। জানো, আমার নিজের বিশ্বাস যে দেশের লোক অল্প বয়সেই যৌন অভিজ্ঞতা পেয়ে যায় তারা উন্নতিশীল প্রোগ্রেসিভ হয় না। এসব কথা এখন থাক। তোমাকে সেই স্ট্যাটিসটিকস্ ভর্তি বইখানা দেব। তুমি সেটা পড়ে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে। কিন্তু হাতের কাছে ভিরমি ভাঙবার জন্য স্মেলিং সলটস্ রেখ।... ওই দেখ, আমরা জর্মন রাইষের প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে এসে গিয়েছি।'

www.pathagar.com

৩৪

এদেশে, এদেশে কেন পৃথিবীর সর্বত্রই এ যুগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এত বেশি আলোচনা, নাটক, ফিল্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত তৈরি হচ্ছে যে, আমরা এই হট্টগোলের মাঝখানে প্রায়ই ভুলে যাই যে, এই ভারতেই রতি বা কাম সম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক রচিত হয়। এই সর্বপ্রথম পুস্তক বহু যুগ ধরে সম্মানিত হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ যুগে পৃথিবীর সর্বত্র এ বই এমনই সিংহাসনে আসন পাচ্ছে, শুধু তাই নয়, এমনই জনপ্রিয় হয়েছে যে, একে এখন অক্লেশেই ওরো-আমেরিকার অন্যতম বেস্ট-সেলার বলা যেতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি, এক নাতিবৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে তাঁর ভাইঝি একখানা অতি মনোরম দ্য-লুকস বই উপহার দেয়— তাঁর জন্মদিনে। এই ভদ্রজন পুস্তক সঞ্চয়নে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং এরকম মরক্কো চামড়ার বাঁধাই সোনালি, চারুকার্যে ঝলমলিয়া কেতাব যে তিনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, মেয়েটি সে আশা নিশ্চয়ই করেছিল! জ্যাঠামশাই সেরকম কিছু করলেন না বটে, কিন্তু দেখা গেল, তিনি অতিশয় সযত্নে তাঁর আপন ডেসকে আর পাঁচটা দামি জিনিসের সঙ্গে সেটি তালাবদ্ধ করলেন। তার পর বহু বৎসর কেটে গেল, সামান্য এই ঘটনাটি কে-ই বা মনে রাখে। তাঁর মৃত্যুর পর (যতদূর মনে পড়ছে তাঁর অন্য এক ভাইঝি) তাঁর ঘরদোর গোছগাছ করতে গিয়ে ডেসকের ভিতর আবিষ্কার করল সেই প্রাচীন দিনের বইখানি। ততদিনে ইউরোপ নানা বিষয়ে মুক্তমনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভাইঝি বইখানা দেখে স্তম্ভিত। সেই সে আমলে কোনও ভদ্র পরিবারের মেয়ে তাঁর শান্তশিষ্ট বয়স্ক জ্যাঠামশাইকে 'কামসূত্র' উপহার দেবে, এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য। আসলে মেয়েটি দোকানে গিয়ে নিশ্চয়ই চেয়েছিল, কোনও একখানা বেস্ট-সেলার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেটার বাঁধাই যেন অসাধারণ চাকচিক্য ধরে। জ্যাঠামশাই সব জাতের বইয়ের খবর রাখতেন। রঙিন মোড়ক খুলে এক নজর তাকাতেই বুঝে ফেলেছিলেন, ব্যাপারটা কী, কিন্তু মেয়েটি যাতে লজ্জা না পায় তাই তিনি ওই পন্থা অবলম্বন করেন।

এর থেকেই পাঠক অনায়াসে বুঝে যাবেন যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মান্ধাতার আমলে; নিদেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণযুগে এবং খুব সম্ভব তাঁর পূতপবিত্র আপন দেশে। কারণ বহু বহু কন্টিনেন্টাল গুণীজ্ঞানীর দৃঢ় প্রত্যয়, কুল্লে ইউরোপের একমাত্র বিলেত দেশেই যৌনজীবন নামক কোনও প্রতিষ্ঠান নেই, কস্মিনকালেও ছিল না— অন্তত ফরাসিদের গলা কেটে ফেললেও তারা এ বিশ্বাস কিছুতেই ত্যাগ করবে না। অবশ্য দেশকালপাত্র হিসেবে নিয়ে ইংরেজ জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে সে তার মতবাদের অতি সামান্য কিছুটা অতি অবরে-সবরে সামান্য রদবদল করতে পারে। যেমন, একদা ইংরেজ সম্বন্ধে ফরাসিদের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রবাদ ছিল, 'কন্টিনেন্টের আর-সর্বত্র নরনারীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক থাকে, ইংরেজের থাকে, গরম জলের বোতল।'[১] কিন্তু ইতোমধ্যে এই পৃথিবীতে, তার সর্বোত্তম গৌরবময়

১. এদেশেও বলে, 'শীত কাটাতে হলে হয় দুই, নয় রুই (তুলার লেপ)।' ইংলন্ডের কাঠফাটা শীতে তুলোতে কিছু হয় না বলে হট-ওয়াটার-বটল্‌কে সে শয্যাসঙ্গিনী করে। ইংরেজের চাচাতো ভাই ডাচদের সম্বন্ধে বলা হয়— যদিও বিলেতের মতো ও দেশেও যৌন-জীবন নেই— এ কথা কেউ কখনও বলেনি— 'অন্য দেশের পুরুষ যৌবনে বিয়ে করে, হল্যান্ডের লোক পাশবালিশ কেনে', এটা চালু হয় ডাচদের কিপটেমি বোঝাবার জন্যে।

www.pathagar.com

যুগে, মানুষ কলকব্জা যন্ত্রপাতি, এক কথায় টেকনিকাল সর্ববাবদে এমনই উন্নতি করেছে যে, এস্তেক ফরাসিও সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বংশবৃদ্ধি বংশ-নিরোধ আরও মেলা আশকথা পাশকথা তার কানে এসেছে। তাই বিস্তর ঘাড় চুলকে অনেক ভেবেচিন্তে তার পূর্বেকার প্রবাদটি বছর দশেক পরে পরিবর্তিত করে সর্বাধুনিক পরিমার্জিত সংস্করণ ছাড়ল, 'এখন তারা ইলেকট্রিক কারেন্টে গরম করা লেপ ব্যবহার করে।'

এসব বিষয়ে অধুনা এক অতিশয় খানদানি ডিউক একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এ পুস্তিকা রচনা করার হক্ক তাঁর ন-সিকে, প্লাস 'শরণার্থী সহায়তা' কি লিয়ে পাঁচ নয়ে পয়সে। বললুম বটে কিন্তু বক্ষ্যমাণ 'জান' (কোম্পানি আমলের বানান) সায়েব যখন রাজসিক চাকচিক্যময় ডিউকত্ব লাভ করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন মহারানির রাজত্ব বাঁচাবার জন্য, সহায়তা কি লিয়ে চার মিলিয়ন পৌন্ডের চেয়েও বেশি মৃত্যু-কর, বা ডেথ ডিউটি। ফরেন এক্সচেনজ নিয়ে কালোবাজার করার মতো কিস্মৎ কপালে লেখা ছিল না বলে সেই পাঁচ পয়সী ডাকঘর যিনি নিরিখ বেঁধে মৃন্ময় টাকাকে 'হিরণ্ময়' পৌন্ডে পরিণত করেন সে আর্যা নির্দেশ দিয়ে বলে মোটামুটি ১০০,০০০,০০০ (দশ কোটি) টাকা— যদি খেসারতি চার মিলিয়নের উপরে ধরা হয়—; নইলে কত আর?— এই ধরুন কোটি সাত-আষ্টেক।

এ ভদ্রলোক বলছেন, 'যৌনসম্পর্ক ব্যাপারটা নিছক কন্টিনেন্টের একচেটে আবিষ্কার নয়। কন্টিনেন্টের বাসিন্দারা তাঁদের 'কমন মার্কেটে' আমাদের পাত পাড়তে না দিয়ে সে সুখ থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারেন কিন্তু প্রেম করার সুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তফাৎটা তবে কোথায়? ওনারা তাঁদের যৌনজীবন নিয়ে বিস্তর ঢাকঢোল বাজিয়ে বেহদ্দ চেল্লাচেল্লি করেন, এন্তের বড়ফাট্টাই মারেন, ওই নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাচর ভ্যাচর করেন। আমরা করিনে। আমাদের বিবেচনা-বোধ আছে, আমরা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসি। এর থেকে কি স্পষ্টই ধরা পড়ে না যে, নিজেদের ওপর ওদের প্রত্যয় নেই, আমরা ওদের চেয়ে সরেস? (ড্যুক বোধহয় বলতে চেয়েছেন, 'ইংরেজ জাতটা নীরব কর্মী'! — লেখক) আর এইটেই হল সব কথার নির্যাস। পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে এ দেশেও তাই ঘটে। শুধু আমরা আমাদের যৌনজীবন নিয়ে বড় একটা কথা বলিনে। হয়তো-বা প্রকৃতিদেবীই এই প্রবৃত্তিটি দিয়ে আমাদের গড়েছেন। পুরুষানুক্রমে হয়তো-বা আমরা নীতিবাগীশ— ওইটে পেয়েছি উত্তরাধিকারে। কিংবা হয়তো এ-ও হতে পারে যে, এ খেলাটার আইনকানুন আমাদের দেশে অন্য এক ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে; আর সবাই জানে স্পোর্টসের আইনকানুন মেনে চলাতে আমরা পয়লা নম্বরি এবং তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি কেরদানি আছে আমাদের ভণ্ডামিতে।'

এই এতক্ষণে আমাদের মাই লর্ড ডিউকপ্রবর হাটের মধ্যিখানে হাঁড়িটি ফাটালেন— ইংরেজিতে বলা হয় কার্পেটের হ্যান্ডব্যাগ থেকে লুকনো বেড়ালটা বের হবার মোকা পেয়ে এক লম্ফে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করে দিল। কিন্তু এস্থলে শ্রীযুক্ত জন-এর প্রতি সুবিচারের খাতিরে অবশ্যই বলতে হয়, তিনি সজ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে এককাঁড়া দুষ্টুবুদ্ধিও ধরেন। ইংরেজের নষ্টামি ভণ্ডামি চিচিং ফাঁক করে দিতে পারলে তিনি সর্বদাই নির্বিষ বিমলানন্দ উপভোগ করেন। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, সাতপুরুষের (আসলে ইনি গোষ্ঠীর ত্রয়োদশ পুরুষ) ভিটের উপর খাড়া প্রাচীন কাস্‌লটি বাঁচাতে হলে তাঁকে সরকারের প্রাপ্য

www.pathagar.com

অষ্ট কোটি টাকার ট্যাক্সটি দিতে হয় রোক্কা নগদানগদি, এবং সে রেস্তটা কাছারিবাড়ির ছেঁদো তহবিলে বাড়ন্ত। তাই বহু পূর্বেই নিবেদন করেছি, এস্থলে আমাদের উল্টো 'উপীন' যেন তেন প্রকারেণ কাস্‌লটি খুলে দিলেন পাবলিকের তরে। 'ফ্যালো দর্শনীর কড়ি— মাখো ত্যাল।' বলে কী! বিলেতের খানদানি পরিবারের কেউ কস্মিনকালেও এ হেন 'অনাছিষ্টি কম্মো' করেননি। নবাব সায়েবরা যে কী পরিমাণ চটেছিলেন তার জরিপ এ স্থলে অবান্তর। বরঞ্চ জন মিঞার দাদ নেবার কায়দাটি বড়ই মুখরোচক— তিনি ওনাদের যাবতীয় ধূর্তামি নষ্টামি বের করে দিলেন দু-খানি বইয়ে— এবং ইহসংসারে ভিলেজ ইডিয়টটা পর্যন্ত বিলক্ষণ অবগত আছে ভণ্ডামির গণ্ডা গণ্ডা ভাণ্ড চিরকালই যৌবনরসে টৈটম্বুর।

এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে ইউরোপের কাম-কাণ্ড নিয়ে অল্পবিস্তর গবেষণা করছি তার জন্য কোনও প্রকারের কৈফিয়ত দেবার বা সাফাই গাইবার প্রয়োজন আমার পাপ-বিবেক রত্তিভর অনুভব করছে না। আমার অকরুণতম পাঠক এমনকি এদানির যেসব রুচিবাগীশ মার্কামারা পদি পিসির পাল এসব 'ঢলাঢলি' না করে খট্টাঙ্গপুরাণ বা এরণ্ডমৌলার নবনির্ঘণ্ট নির্মাণ করতে মাণ্ডামাস ঝাড়েন তাঁদের স্মরণে আনছি যে, ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমি ভারত-ইউরোপ-আফ্রিকায় মাকু মারছি, ক্রনিক মেলিগনেন্ট বেকারি ব্যামো থেকে ভুগছি বলে গত বাইশ বছর ধরে মাঝেসাঝে সেই মাকু মারার বয়ান লিখে পথ্যির হাঁড়ি চড়িয়েছি, তার পূর্বেকার অর্থাৎ ভ্রমণারম্ভের প্রথম কুড়ি বছরের কাহিনী কাবলিওয়ালার বোয়াল মাছের মতো চোখ-রাঙানি সত্ত্বেও মা সরস্বতীর কাছ থেকে ভিক্ষে চাইনি। সেসব কথা এখন থাক। আমি শুধু শুধোচ্ছি, অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ব যা-সব লিখেছি তাতে কি পাঠকের মনে কখনও সন্দেহ জেগেছে যে, আমি যৌন কেচ্ছার সন্ধান পাওয়ামাত্রই তার পিঠের উপর ডাকটিকিটের মতো সেঁটে গিয়েছি? বরঞ্চ বলব ও বাবদে আমার উৎসাহ ছিল অত্যল্প। তার প্রধান কারণ, আমার ধারণা জন্মেছিল, যদিও ইউরোপের যৌনজীবন, প্রেমের ছড়াছড়ি প্রাচ্যভূমির তুলনায় অনেকখানি বে-আবরু তবু তাদের ঐতিহ্য বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে তাদের আচরণের খতেন মেলালে সামঞ্জস্যটাই চোখে পড়ে বেশি। (বরঞ্চ মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, *কামসূত্র, কুট্টনীমতম্‌, চৌরপঞ্চাশিকা*, এমনকি অর্বাচীনকালে *বিদ্যাসুন্দর* লেখার পর আমরা কেমন যেন ঈষৎ বেরসিক হয়ে গিয়েছি। সেকথা থাক।) মাত্র দশ বছর পূর্বেই ইউরোপে যে বাড়াবাড়ি দেখেছি তাতেও মনে হয়নি যে, ওই নিয়ে কাউকে অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। তবে খুব সম্ভব দু-এক জায়গায় আধা-সাদা অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছি। এবারে যা দেখলুম, শুনলুম, পড়লুম, বিশেষ করে লটে যেসব কথা বলল তার থেকে মনে প্রশ্ন জাগল, প্রতীচ্যের বহু দেশে অত্যধিক মদ্যপান যেমন এই শতাব্দীর গোড়ার থেকে একটা কঠিন সমস্যায় দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি এদের যৌন আচরণ যে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে, যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, বিশেষ করে স্কুলের পনেরো-ষোল-সতেরো বছরের ছেলেমেয়েদের ওপর এটা যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তার পরিণতি কোথায়? ব্যক্তিগতভাবে আমার মাত্র একটি বিষয়ে কৌতূহল আছে : ব্রহ্মচর্য, সেক্স স্টার্ভেশন কি মহত্তর কর্মে সাহায্য দেয়, উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে? দু-হাজার বছর ধরে ক্যাথলিক পাদ্রিরা ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করার পর আজ বহুতর ব্রহ্মচারী এবং গৃহীর মনে ওই নিয়ে সন্দেহ জেগেছে— বৌদ্ধদের ভিতর এ সমস্যা নিয়ে কোনও আলোচনা এখনও আমার কানে এসে পৌঁছয়নি।...

www.pathagar.com

পাঠকদের মধ্যে যাদের বয়স কম তাদের মনে নিশ্চয়ই আরেকটা চিন্তার উদয় হবে : আজ ইউরোপে যা হচ্ছে কাল সেটা এদেশে দেখা দেবে না তো? এবং দিলে দু-দিনের মধ্যে যে তার ভেজাল রূপ দেখা দেবেই সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

সবুরদার পাঠক! এ কচকচানিতে তুমি যদি কিঞ্চিৎ চঞ্চলিত হয়ে থাক, তবে আমি মাফ চাইছি। ভবিষ্যতে আর কক্খনও এমন গুনা করব না— এ-ওয়াদা করলে অধর্ম হবে, তবে চেষ্টা দেব, পরশুরামি ভাষায় তোমার 'মন যেন হিল্লোলিত হয় : চিত্তে চুলবুল লাগে।'

তার জন্য ওই জন্ সাহেবটির সরেস মন্তব্য যেন মন্তব্যমণ্ডলীর সায়েব।

পাঠক, ফরাসি দেশে তুমি যদি কোনও ফিলম-স্টার বা অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম জমাতে পারো তবে আর পাঁচজনের চোখে ফুটে উঠবে সম্ভ্রম; মুখে ফুটবে সপ্রশংস 'ও! লা লা!' বুকে ফুটবে কাঁটা— কিন্তু সেটি অতিশয় বেবি সাইজের, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ ফরাসি জাতটা মোটেই হিংসুটে নয়। 'কিন্তু', জন্ বলছেন, 'এমন কম্মটি লন্ডনে করতে যেয়ো না। এতে করে তোমার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়বে তো না-ই বরঞ্চ তোমার পক্ষে রীতিমতো খতরনাক্ হতে পারে— বিশেষ করে তুমি যদি এ লাইনে এমেচার হও। এমনকি মেয়ে আর্টিস্টের প্যার পেলেও ওই একই হাল। আর্টের সঙ্গে প্রেমে মোটেই ম্যাচ করে না। ও দুটোর মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই। ফরাসিরা অবশ্য প্রেমটাকে আর্টের উচ্চাসনে বসায় (গুরুচণ্ডালী!— বলব আমরা) এবং ওটাকে একটা অত্যন্ত প্রকৃষ্ট আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর্ট বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আমরা ইংরেজ জাতি স্পোর্টসের নেশন; এ দেশে প্রেম এক বিশেষ ধরনের ডনকসরত (জিমনাস্টিক) বলে স্বীকৃত হয়।'

৩৫

স্বখাত সলিলে আমি ডুবিনি, তোমাকে ডোবাইনি। পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আর ডুবলেই-বা কী? কবিগুরু বাউলের গীত উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যে জন ডুবল, সখী, তার কী আছে বাকি গো' অবশ্য 'পাতকো'তে নয়, 'রসের সাগরে' 'অমিয় সায়রে'। কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের আপন দেশে চতুর্দিকে গভীর জলের সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও সে ডোবাডুবির প্রস্তাব বড় একটা পাড়ে না। তাই ড্যুক জন্ সেটা লক্ষ করে বলেছেন, অন্য দেশের লোক প্রেমকে আর্টের পর্যায়ে ফেলুক (কিংবা ঈশ্বরোপলব্ধির প্রথম সোপান বলে গণনা করুক— লেখক), ইংরেজের কাছে প্রেম এক প্রকারের জিমনাস্টিক। কৌতূহলী মন জানতে চাইল, সেটা কোন প্রকারের জিমনাস্টিক? তখন, ও হরি, আবিষ্কার করলুম ইংরেজের আরেকপ্রস্ত ভণ্ডামি। মার্কিন জাতের পুণ্যভূমি যে রকম প্যারিস, বিলেতের ভণ্ড এবং স্নব— দু জনার মধ্যে খুব যে একটা ফারাক আছে তা নয়— দু জনারই মোক্ষক্ষেত্র অক্সফোর্ড। সেই অক্সফোর্ডে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজ মোকা-বে-মোকায় হামেশাই কভু-বা কনে বউয়ের মতো ফিসফিসিয়ে কভু-বা বাঘা জমিদারের মতো গলা ফাটিয়ে মহারানির যে রাজত্বে সূর্য কখনও অস্তমিত হন না সে রাজত্বের এবং তারই কাছেপিঠে উপীনদের যে দু বিঘে জমি আছে সেসব জায়গাকেও জানিয়ে দেয় অক্সফোর্ডের মতো বিদ্যায়তন ত্রিসংসারে আর কোথাও নেই, এবং এসব

www.pathagar.com

ব্যাপারে ইংরেজের ন্যাজ মার্কিন স্বব সাধারণ সর্বাঙ্গ ঘন ঘন আন্দোলিত করে সম্মতিসূচক মুদ্রা মারে। সেই বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় একখানা রাজভাষার অভিধান।[১] অভিধানটি উত্তম, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ববারিতে ভর্তি। সেই কোষ খুলে দেখতে গেলুম, 'টু মেক লাভ' বলতে কী বোঝায়? 'প্রেমে পড়া' সে তো খুব সম্ভব বিলেতে 'টু ফল ইন লাভ' থেকে কবে, কোনকালে পালতোলা জাহাজে করে সরাসরি এদেশে চলে এসেছে। দেখি 'টু পে অ্যামরাস অ্যাটেন্‌শনস্ টু—।' তবেই তো ফেলল মুশকিলে। ইংরেজ কী ধুরন্ধর জাত। যেখানে টাকাকড়ির ব্যাপার নয় সেখানে চট করে ঋণ স্বীকার করতে ভারি চটপটে। তদুপরি দায়টা ফরাসির ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিজে চটসে সরে পড়ল— প্রেমট্রেম তো বাধা, জানে ওরাই। কথাটা এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে; 'আমূর' শব্দের অর্থ 'প্রেম' (মূলত অবশ্য এসেছে লাতিন 'আমরসুস্' থেকে) কিন্তু ফরাসিরা 'আমূর' বলতে প্রেম, কাম সবই বোঝে। ওদিকে ইংরেজ 'অ্যামরাস' বলতে বোঝে নিছক প্রেম— সে প্রায় আমাদের 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম/ কামগন্ধ নাহি তায়'... তা হলে আমাদের মহাখানদানি অক্সফোর্ড অভিধানের মতানুযায়ী 'টু মেক লাভ' কথাটার অর্থ 'বল্লভার প্রতি সপ্রেম মনোযোগ দেওয়া, তাঁর 'যত্ন আত্যিকর'। এস্থলে বলে রাখা ভালো 'লাভ' শব্দে 'সেক্‌স্' জাতীয় কোনও প্রকারের ভেজাল নেই এ কথাটা পষ্টাপষ্টি বলবার মতো দুঃসাহস অক্সফোর্ডের নেই। তাই অতি অনিচ্ছায় (আমার মনে হয়) স্বীকার করেছেন, 'সেকসুয়াল অ্যাফেকশন, ডিজায়ার' ইত্যাদি। পুনরপি বলেছেন, 'রিলেশন' বিটউইন সুইট হার্টস— এবারে পাঠক নিশ্চয়ই ঠাহর করে নিয়েছ শ্রাদ্ধটা কোন দিকে গড়াচ্ছে 'সুইট হার্টস'— একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত জনের সম্পর্ক তো হাজারো রকমের হতে পারে। এখানে যদি অক্সফোর্ড সত্যের খাতিরে সাতিশয় কায়ক্লেশে লিখতেন 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক' তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

এইবারে আইস, নিম্ননাসিক পাঠক, অন্য একখানা অভিধানের শরণাপন্ন হই। যে 'কনসাইস অক্সফোর্ড ডিকশনারি' নিয়ে এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলুম, যাঁর নাম শ্রবণেই শ্রীরাধার ন্যায় উন্নাসিকজনের 'কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে' তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে; পক্ষান্তরে আমি যে অন্য কোষের শরণাপন্ন হচ্ছি সে কোষ প্রথম যে রূপ নিয়ে

---

১. ইংরেজ জাতটার প্রাণপুরুষ যে বেনে সেটা বোঝাবার জন্য বহু জ্ঞানী বহুতর যুক্তিতর্ক উদাহরণ-হদিশ পেশ করেন। সেগুলো নিতান্তই কাঁচা পড়ুয়ার সেই যুক্তির মতো ডাস্টবিন মার্কা : 'গুরুমশাই, আমি ঘুমুচ্ছিলুম, কে যেন আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গেছে।' আসল মোক্ষম যুক্তি, কামারের এক ঘা-র মতো, এই বিপুল বসুন্ধরায় লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে একই গোয়ালে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কে কোথায়? ইংরেজ— অক্সফোর্ডে। পেত্যয় না হয় তো যান সেই বিগ্রহ-পাণ্ডার যুগল-মিলন দেখতে সেখানে। এই বিদ্যায়তন এন্তেক কেতাবাদি ছাপে, প্রকাশ করে। এবং সবচেয়ে বড় কথা লাভ করে। কন্টিনেন্ট বা ভারতের বিদ্যায়তনদের লাভ করা মাথায় থাকুন গচ্চা দিতে দিতে কণ্ঠশ্বাস। অর্থশাস্ত্রের মহাজনরা বলেন, ১৯৩০-৩২ যখন বিশ্বময় ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন্মৃত তখন যে প্রতিষ্ঠান রেকর্ড মুনাফা করেন তিনি অক্সফোর্ড। অস্মদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্টমন্ত্র 'Advancement of Learning' এই কাষ্ঠরসিকতা শুনে এক ইংরেজ বলেছিল, 'সে কী! একশো বছর হয়ে গেল, তোমরা এখনও ফালতো 'L' অক্ষরটি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের মতো Advancement of Earning করতে পারোনি!'

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় সেটি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ অক্সফোর্ডের প্রায় একশো বছর পূর্বে। তার অর্থ, গত একশো বছর ধরে এ অভিধানের ঐতিহ্য। একে সচরাচর ওয়েবস্টার বলা হয় এবং উপস্থিত 'Webster's Seventh New Collegiate Dictionary' নাম দিয়ে কলকাতায় রাস্তাঘাটে জলের দরে বিক্রি হচ্ছে— আমার হিসাবে যার দাম হওয়া উচিত ৬০/৭০ টাকা, বিক্রি হচ্ছে সেটি দশ টাকায়— চেষ্টা-চরিত্র করলে পাবেন আট টাকায়। এ অভিধান অবহেলা করার মতো কেতাব নয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, 'অভিধানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এ অভিধানের উল্লেখ না করলে সে বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যায়' এবং 'কনসাইস অক্সফোর্ড' যে পাঁচখানি 'বেসট্ মডার্ন ডিকশনারির' কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন তার মধ্যে ওয়েবস্টার রচিত কোষ অন্যতম। এইবারে দেখি ইনি কী বলেন। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ইনি ঈষৎ ধর্মভীরু, কারণ 'লাভ' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'পিতার ন্যায় ঈশ্বর মানবসন্তানের জন্য যে মঙ্গল চিন্তা করেন ('উদ্বেগ ধরেন'ও বলা যায়, কারণ ইংরেজিতে আছে 'ফাদারলি কনসার্ন')। অক্সফোর্ডে ভগবান নেই— না, না— আমি বলতে চাই, অক্সফোর্ড অভিধানে 'লাভ' শব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংকলনকারী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের, কিংবা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি কিংবা এই 'কুসংস্কারে' বিশ্বাস করেননি। তা সে যাই হোক, সেই ধর্মভীরু, ওয়েবস্টার 'লাভ' শব্দের নানা অর্থ দিতে গিয়ে (কেউ কেউ যে ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে 'লাভ' ব্যবহার করেন সেটাও বলেছেন) লিখছেন 'যৌন আলিঙ্গন' এবং সেটা বোঝাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখেছেন, 'COPULATION' অর্থাৎ 'মৈথুন' যৌন 'সঙ্গম' এবং যে 'টু মেক লাভ' নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলুম তার বেলা ইংরেজের মতো বিস্তর ধানাই-পানাই না করে, আশকথা পাশকথা (বিট অ্যাবাউট দি বুশ) না ঝেড়ে, এর ঘাড়ে ওর কাঁধে আপন বোঝা না চাপিয়ে একদম এক ঘায়ে সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছেন : 'টু এনগেজ ইন সেক্সায়েল্ ইন্টারকোর্স।'

অবশ্য বলতে পারেন, ওয়েবস্টার অভিধান মূলত মার্কিন অভিধান। এর উত্তরে নিবেদন : (১) এ অভিধান আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এর বিলিতি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এখনও যেসব ইংরেজ উন্নাসিকতা অপছন্দ করেন (আমি নেটিব ঘৃণা করি) তাঁরা এ অভিধানই ব্যবহার করে থাকেন; (২) কনসাইজ অক্সফোর্ড বহুস্থলে বিশেষ বিশেষ ইংরেজি শব্দ মার্কিন মুল্লুকে যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ করেন; এ স্থলেও করলে পারতেন; (৩) আমি ভূরি ভূরি ইংরেজ-লিখিত গল্প-উপন্যাসে এর ব্যবহার পেয়েছি। কিন্তু 'স্ক্রু' পাইনি, এবং ওয়েবস্টারেও শব্দটা নেই কারণ শব্দটা এখনও গ্রাম্য; (৪) এবং সর্বশেষ বক্তব্য, ওয়েবস্টার মার্কিন দেশগত বলে যদি তাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করতে হয় তবে এ অভিধানখানি এদেশের গুণীজনের আশীর্বাদ লাভ করল কী প্রকারে? কারণ গ্রন্থ পরিচিতিতে স্পষ্ট ছাপা আছে।

Published with the assistance of Joint Indian-American Text Book Programme'

এ বিষয়ে এতখানি লেখবার কারণ কী? গত সপ্তাহে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কচর কচর আর করব না, কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তার দু-দিন পরেই এক সদ্য বিলেতফেরতা তরুণের সঙ্গে মোলাকাত। ছেলেটি ভালো, কিন্তু বিলিতি মোহ ঝেড়ে ফেলতে এখনও তার ঢের সময় লাগবে। তখন হঠাৎ আমাকে স্ট্রাইক করল, কে যেন বলেছিল, বিলিতি স্নবারি স্বরাজ লাভের

www.pathagar.com

পর আদৌ কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে। যেসব ছেলেছোকরারা আমার লেখা পড়ে আমাকে সম্মানিত করে অন্তত তারা যেন অক্সফোর্ড বলতে ভিরমি না যায়, রকবাজি গুলমারার সময় খোদার-খামোখা বিলিতি স্নবারির 'চিত্রিত গর্দভ' না হয় তাই এতসব বলতে হল, অন্যান্য— যথা 'বিদেশের' বর্তমান অনুচ্ছেদ প্রধানত সেক্স নিয়ে— সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি। অভিধান নিয়ে আলোচনা করে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইংরেজ ভাজে ঝিঙে, বলে পটল।

ড্যুক অব বেডফোর্ড জন ভণ্ডামি সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অনেকখানি সর্বদেশে সর্বকালেই থাকে— তবে কোনও কোনও দেশে চক্ষুলজ্জাটার বাড়াবাড়ি কোনও কোনও দেশে কম। কোনও ফরাসি যখন সমাজের সম্মানিতা কোনও মহিলাকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সেটা গোপন রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না, কিন্তু বিলেতে ঠিক তার উল্টো— অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ তার 'ভাব-ভালোবাসাটা' এমনই নিরন্ধ্র গোপন রাখতে সক্ষম হয় যে মহিলাটিও তার ডবল সুযোগ নেবার পথটা নিজের থেকেই দেখতে পান। জন সাহেব একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একটি প্রখ্যাতা মহিলা (এই গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে) সমাজের অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত দু জন অভিজাত জনের সঙ্গে একই সময়ে প্রণয়লীলা চালালেন। কথায় বলে ডান হাতের কারবার বাঁ হাত জানে না— নটবরদ্বয়ের একজনও জানতেন না, মহিলাটি দু জনার এজমালি রক্ষিতা। মহিলাটি যেসব কেনাকাটা করতেন, তাঁর খরচাপাতি যা হত তার প্রত্যেকটি বিল তিনি দোকানির কাছ থেকে ডুপ্লিকেটে চেয়ে নিতেন এবং আমাদের চৌকস শেয়ালের একই কুমিরছানা দু-দুবার দেখাবার কায়দায় দুই মহাশয়ের সামনে পেশ করতেন। মাগ্যি-ভাড়ায় ছিমছাম যে বাড়িটিতে বাস করতেন তার ভাড়াও গুনতেন দুই হুজুরই। বলা বাহুল্য, হাফাহাফি নয়, পুরোপুরিই— কারণ প্রেমের বখরাদার আছে সে তথ্যটি না জানলে ভাড়ার বখরাদার জুটবে কোত্থেকে? কিন্তু তাবৎ কেচ্ছার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার : বেশ অনেক বৎসর ধরে উভয়েই কাচ্চাবাচ্চাগুলোর জনকরূপে গণ্য হতেন।

এখানে আমি পড়েছি বিপদে। কার কাছে গণ্য হতেন? ধরে নিচ্ছি তালেবর মহিলাটি সযত্নে দুই প্রস্থ বন্ধুবান্ধব বেছে নিয়েছিলেন যাদের এক প্রস্থ অন্য প্রস্থকে চিনতেন না। দুই প্রস্থকে দুই নাগরের নাম দিতেন। কিংবা হয়তো ড্যুকের চিন্তাধারা আদৌ সেদিকে যায়নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, দুইজনাই ভাবতেন, বাচ্চাগুলো তাঁরই। কিন্তু তবু শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, বাচ্চাগুলো ভাবত কী? তারা ঠিক যে রকম জানে, একজোড়া জুতোতে দুটো জুতো থাকে ঠিক সেইরকম মেনে নিয়েছে একই বাড়িতে দুটো বাপ আনাগোনা করে! পাঠক জানেন, আমার কল্পনাশক্তি বড়ই অনুর্বরা। আপনারাই না হয় এ সমস্যাটি সমাধান করে নিলেন।

এবং সর্বশেষ জন বলেছেন, দু-দুজন নাগরের কাছ থেকে প্রেম, আত্মনিবেদন, প্রশস্তি-গীতি, আসঙ্গসুখ লাভ করে, সমাজের দু-দুটো হোমরাও সিং চোমরাও খানকে আস্ত দুটো বোকা ম্যাড়ার মতো আঙ্গিনার খুঁটিতে বেঁধে রেখে তিনি যে তাঁর আত্মশ্লাঘা বাড়াতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি সবকিছু করেছিলেন সুদ্ধুমাত্র পৌন্ড শিলিং পেন্সের জন্য।

ফ্রান্সে তো এসব নিত্যদিনের ডাল-ভাত। রীতিমতো একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, জনও আমাদের বলছেন, পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে, বিলেতে তাই ঘটে, তবে, সায়েবরা এসব বাবদে উচ্চবাচ্য করেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু জন যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিলেত তথা তাবৎ কন্টিনেন্টের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন আপন মতামত প্রকাশ করেন, কিংবা যখন নীরব থাকেন, অথবা কোনও প্রকারের উপদেশ দেওয়া থেকে নিরস্ত থাকেন, সবক্ষেত্রেই তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। তারই একটা পরিস্থিতির উল্লেখ তিনি করেছেন বড় বে-আব্রু ভাষায়। আমি সেটা মামুলি ঢঙে পেশ করি। বলছেন, 'কোনও হাউস পার্টিতে (অর্থাৎ যেখানে উইক এন্ড কাটাতে হয়) যদি তুমি সুযোগ পেয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কিংবা কোনও বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে মাত্রাধিক প্রেম করে ফেল তবে সে-গেরো থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা কর— অবশ্য যতখানি পার ভদ্রতা বজায় রেখে। বলা বাহুল্য, অতিশয় চতুরতাসহ। কারণ কোনও মহিলারই হৃদয়ানুভূতিতে আঘাত হানা অনুচিত। কিন্তু হায়, ইহসংসারে সব গেরো তো আর এড়াতে পারা যায় না।'

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পরিস্থিতিটা জন-এর মনঃপূত নয়। কিন্তু তিনি তাঁর দেশবাসীর তথা বিশ্বজনের মনোবৃত্তি ভালো করেই জানেন বলে লম্বা লেকচার ঝেড়ে সদুপদেশ দেননি। তাঁর নীরবতা বহু ক্ষেত্রেই হিরণ্ময়।

৩৬

যুদ্ধ ব্যাপারটা কী তার সঙ্গে আমাদের সামান্য কিছু কিছু পরিচয় হচ্ছে। ভালোই। না হলে অবশ্য আরও ভালো হত। ভবিষ্যতে, কখনও, কস্মিনকালেও হবে না সে ভরসা যদি কার্তিকেয় দিতেন তবে হত সবচেয়ে ভালো। কিন্তু চতুর্দিকে যে হালচাল দেখছি তাতে তো মনে হয়, বর্তমান যুদ্ধটা ঝটপট শেষ হোক বা রয়ে-সয়েই শেষ হোক, এটাই শেষ যুদ্ধ নয়। আরেকটা মোক্ষমতর লাগবে। কবে লাগবে? সঠিক কেউ বলতে পারবেন না, তবে কোনও মস্তান যদি আমার কানের উপর পিস্তল বসিয়ে 'না বললে নিষ্কৃতি নেই' রবে হুঙ্কার ছাড়ে তবে বলব, বছর পঁচিশেকের ভিতর। কেন, কাতে কাতে, এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দেব না। আমি শুধু ভবিষ্যদ্বাণীটি করে রাখলুম এবং আজ দিনের যেসব নাবালক নিতান্ত আর কিছু না পেয়ে আমার এ লেখাটি পড়েছে তারা যেন সেদিন আমাকে স্মরণে আনে— অবশ্যই প্রাণভরে অভিসম্পাত দিতে দিতে। কারণ, ততদিনে আমি ইহলোকের ডাঙাকে এক লাথি মেরে পরলোকের নৌকোয় বসে ভরা পাল তুলে বৈতরণীর হেপারে।

যুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি উত্তম একথা কোনও সুস্থ ব্যক্তি বলেছেন বলে শুনিনি, বরঞ্চ বহু বহু বিজয়ী বীর যুদ্ধের অজস্র নিন্দা করে গেছেন। তবে একটা বিষয়ে যুদ্ধের কি শত্রু কি মিত্র সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। যুদ্ধের সময় অতি সাধারণ মানুষও প্রায়ই এমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বার্থত্যাগ, দেবদুর্লভ পরোপকার করে থাকে, পরের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেয় যে তার সামনে বহু রণের বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন-সম্প্রদায় পর্যন্ত অবনত মস্তকে স্বীকার করেন যে, ওই সাধারণ জনের অসাধারণ কীর্তির কাছে তাঁদের লক্ষ রণজয় তুচ্ছ।

www.pathagar.com

তারই একটা উদাহরণ লটে আমার সামনে পেশ করেছিল : তার উল্লেখ প্রকাশিত প্রবন্ধ বা পুস্তকে কোথাও আমি পাইনি, লটেও পায়নি।[১] কাহিনীটি পড়া সমাপ্ত করে পাঠক হয়তো কিছুটা নিরাশ হবেন। ইংরেজ এ স্থলেই বলে থাকে : 'নাথিং টু রাইট হোম অ্যাবাউট'— 'চিঠি লিখে বাড়িতে জানাবার মতো এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।' আমি কিন্তু তবু জানাচ্ছি, তার কারণ প্রথম দুশমন ইংরেজ যা করে না করে তার উল্টোটা করতে পারলে আমার জানটা বড় খুশ হয়। দ্বিতীয়ত ঘটনাটির নায়ক আমার পরিচিত। নাতিদীর্ঘ আট বছরের পরিচয়— সেটা দীর্ঘতম হবার সুযোগ কেন পেল না সেইটেই আমি 'রাইটিং হোম অ্যাবাউট'।

লটে বললে, 'উইলিকে তো চিনতে নিশ্চয়ই ভালো করে — তোমাদের সেমিনারের হাউসমাস্টার?'

আমি বললুম, 'বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পীরমুরশিদ চিনতেন না তাকে? এস্তেক সেমিনারের বড়কর্তা প্রফেসর ডকটর পাউল কালে পর্যন্ত উইলির বাক্যস্রোত চট করে থামাবার চেষ্টা করতেন না।'

এস্থলে কাহিনীর প্রথম অংশটা আমাকেই বলতে হবে। উইলির সঙ্গে লটের পরিচয়— বরঞ্চ বলা উচিত ফ্রাউ উইলির সঙ্গে লটের পরিচয় হয় অনেক পরে। বিশেষত, অন্তত দুটি বছর তার সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হতে হত প্রতিদিন পাঁচ-দশবার। তার পদবি ছিল 'হাউস মাইস্টার'। 'মাইস্টার' শব্দের অর্থ জর্মনে যদিও 'মাস্টার' তবু 'হাউস-মাইস্টার' বলতে 'হাউস মাস্টার' বা বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষক বোঝায় না। হাউস-মাইস্টার কোনও বাড়ি বা অফিসের দেখ-ভাল করে। একে দরওয়ান বলা চলে না। বরঞ্চ ইংরেজিতে 'হাউস-কিপার' বলা চলে, ফরাসিতে ইনিই 'কাঁসিয়ের্জ' নামে পরিচিত।

উইলি, তোলা নাম ভিলহেলম, সেমিনার বাড়িটা ফিটফাট ছিমছাম রাখত সে-কথাটার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেন্ট্রাল হিটিঙে উনিশ-বিশ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ফটোস্টাট করার জন্য ডার্করুমের পর্দা থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে এককণা ধুলো পড়ে থাকতে কেউ কখনও দেখেনি। কোনও একটা ট্যাপের ওয়াশার বিগড়ে যাওয়াতে সেটার থেকে পিটির পিটির জলের ফোঁটা ঝরছে, এহেন গাফিলতি কেটে কখনও দেখাতে পারলে, হাউস-মাইস্টার উইলি যে তন্মুহূর্তেই এক ছুটে রাইন ব্রিজের উপর পৌঁছে সেখান থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত সে সত্য সম্বন্ধে আমাদের কারও মনে ধূলিপরিমাণ সন্দেহ ছিল না।

সেমিনার বাড়ির পাশে ছোট একটি দোতলা বাড়ির উপরের তলায় ছিল মাইস্টার উইলির কোয়ার্টার। সেখানে সর্বাধিকারিণী ছিলেন তাঁর বিবি। গাব্দাগোব্দা শরীর, হাসিভরা মুখ—

---

১. 'অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ডালে মধুর সমীরে।'

গ্রে-র কবিতা থেকে এই অংশানুবাদ বছর চল্লিশ পূর্বে এতই মুখে মুখে প্রচারিত ছিল যে কেউ সেটা ছাপালে পাঠক সম্প্রদায় বিরক্তিভাবে অবজ্ঞাও প্রকাশ করত না। আজ সে যুগের পাঠক, বৃদ্ধরা পুরনো দিনের স্মরণে দু চোখের জল ফেলছেন, তরুণরা হয়তো পড়বেনই না— আদৌ 'মডার্ন' নয়।

www.pathagar.com

ন-সিকে টিপিকাল জর্মন হাউস-ফ্রাউ। বয়স চল্লিশের মতো হবে, কিন্তু উইলিকে দেখে ঠাহর করা যেত না তার বয়স কত হতে পারে। সেমিনারের সবচেয়ে পুরনো কর্মী বলতেন, পনেরো বছর ধরে তাকে ওই একই চেহারায় দেখছেন। সর্বাঙ্গে সর্বত্র অনেকগুলি ছোট ছোট সাইজের মাসল ছড়ানো; ছোট ছোট সাইজের কারণ আর পাঁচটা জর্মনের তুলনায় উইলি ছিল রীতিমতো বেঁটে।

সেমিনার পূর্ণসিদ্ধ অর্ধসিদ্ধ পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভর্তি, আর জনা পাঁচেক সুপ্রাচীন অর্ধপ্রাচীন অধ্যাপক। সর্বশেষে ডক্টরেটের থিসিস লেখাতে ব্যস্ত আমরা কয়েকজন তো ছিলুমই। আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগত, এতসব পণ্ডিত আর এঁদের দিনের পর দিন একটানা বিদ্যাচর্চা— দিনে দশ ঘণ্টা খাটা সেমিনারের ডাল-ভাত— এসব দেখে দেখে পাণ্ডিত্যের প্রতি উইলির মনোভাবটা ছিল কী? কাউকে যে বড্ড বেশি একটা সমীহ্ করে চলত, উইলির ধরনধারণ দেখে সেটা তো মনে হত না। তাকে কোনওদিন খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে দেখিনি। আমি তার কোয়ার্টারে বহুবার গিয়েছি, কারণ আশপাশের কাফের তুলনায় উইলির বউ আমাদের জন্য কফি বানিয়ে দিত ঢের সস্তায়। আমাদের সময়াভাব তাই তার ব্লিৎস সার্ভিস উপেক্ষা করে খুদ কাফেতে যাওয়াটা আমরা নিছক থার্ডক্লাস স্নবারি চালিয়াতি বলে মনে করতুম। সেমিনারের জানালা দিয়ে ফ্রাউ উইলিকে শুধু আঙুল তুলে দেখাতে হত ক-কাপ ক-পট কফি চাই। রেকর্ড টাইমের ভিতর ফ্রাউ উইলি ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে ট্রেতে করে কফি নিয়ে উপস্থিত। আমি কিন্তু সোজা ওদের ঘরে গিয়ে কফি খেতুম— কী হবে ওই ফুল স্লিম (গাব্দাগোব্দার ভদ্র ইংরেজি প্রতিবাক্য) ফ্রাউকে সিঁড়ি ভাঙতে দিয়ে। সেখানে একদিন লক্ষ করলুম, ঘরে মাত্র একখানা বই— বাইবেল। বহু ব্যবহৃত। আমি জানতুম, ক্যাথলিক জনসাধারণ সচরাচর বাইবেল বড় একটা পড়ে না— তারা তাদের 'উপাসনা পুস্তিকা' নিয়েই সন্তুষ্ট, গির্জেয় যাবার সময় ওই বই-ই সঙ্গে নিয়ে যায়। কথায় কথায় শুধালুম বাইবেলখানা পড়ে কে? উইলি। এবং একখানা বই ছাড়া অন্য কোনও কেতাব ছোঁয় না। তাই তো। সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

সেমিনার খোলা থাকত সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি। জবরদস্ত গবেষকরাও রাত আটটার সময় বাড়ি গিয়ে আর বড় একটা ফিরতেন না। কিন্তু আমার তখন 'গৃহিত্বৈব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ' মৃত্যু যেন তোমার চুল পাকড়ে ধরে আছেন এইভাবে ধর্মের আচরণ করবে। ধর্ম মাথায় থাকুন, মাথার উপরকার কেশ পাকড়ে ধরে আছেন আমার ট্যাঁক। সোজা বাঙলায় কইতে গেলে, ইংরেজ যে সত্যি বেনের জাত সেটা সপ্রমাণ করল আমার শেষ কপ্পীনখানা কেড়ে নিয়ে একদিন বিলকুল মিন নোটিশে— গোলড স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করে। আদাজল খেয়ে যে কড়ি ক-টা জমিয়েছিলুম— আরও ছটি মাস জর্মনিতে বাস করে রয়েসয়ে আমার 'গব্বযন্তনা' থিসিসখানা নামাব বলে, তাদের উপর বমিং হয়ে গেছে। গোলড স্ট্যান্ডার্ড নাকচ হওয়ার ফলস্বরূপ হঠাৎ একদিন দেখি আমার ট্যাঁকের তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় চটসে দু-কড়ি চাটুয্যেতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব আর মাত্র দুটি মাসের ভিতর যদি সেই লক্ষ্মীছাড়া থিসিসটা শেষ করে, তিন-তিনটি ভাইভা পরীক্ষা পাস না করতে পারি তবে শয়নং যত্রতত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে— তাই-বা কী করে হয়, এই পাথরফাটা শীতের দেশে যত্রতত্র শয়ন করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং বন শহরের হাটবাজারের ভিখিরিকে দিনান্তে খয়রাতি এক পেলেট সুপ দেবার ব্যবস্থাও নেই— ফ্যুরার হিটলার ভিয়েতন তেষার বরাতে একদিন যমরাজকে ফাঁকি দিতে পেরে অন্য 'পুণ্যভূমিতে' পরজন্ম লাভ করলেন। তাই তখন প্রাণপণ

www.pathagar.com

রেস দিচ্ছি টাইমের সঙ্গে। সকাল, বিকেল পাঁচ-পাঁচ দশ ঘণ্টা কাজ করার পরও মাঝে মাঝে আলুসেদ্ধ মাখম রুটি দিয়ে 'ব্যানকুয়েট' সেরে রাত সাড়ে আটটায় আরেক প্রস্ত সেমিনার যেতুম। কিন্তু আমার ওয়াটারলু ছিল অন্যত্র। সেটা এতক্ষণ পেশ করিনি, কারণ অধিকাংশ শ্যানা পাঠকই সেটা আমার লেখকজীবনের প্রথম প্রভাতেই জেনে গিয়েছেন; নিতান্ত যাঁরা জানেন না তাঁদের বলি লেখাপড়ায় আমি চিরকালই ছিলুম বিংশ শতাব্দীর এক নবকালিদাস যিনি মা সরস্বতীর কৃপালাভ কস্মিনকালেও কামনা করেননি এবং দেবীও অহেতুক তাঁকে দর্শন দেননি। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে কেতাবপত্র দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসত, স্কুলবাড়িটা আমার কাছে শ্মশানমশানের লাগোয়া ওয়েটিংরুমের মতো মনে হত এবং ক্যুয়েশচন পেপারের ওপর চোখ বুলুতে না বুলুতেই পরীক্ষার হলে কতবার যে ভিরমি গিয়েছি সেটা আমাদের শহরের এমবুলেনস তাদের রেকর্ডরূপে সযত্নে লোহার সিন্দুকে পুরে রেখেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কী করে, কোন দুষ্টগ্রহের তাড়নায় যে আমি বন শহরে ডক্টরেট নেবার জন্য এসেছিলাম সেটা গোপন রাখতে চাই— পাঠক অযথা খোঁচাবেন না।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় উইলি এসে আমাকে হুনো লাগিয়ে একখানা লেকচার ঝাড়ত। রাইনল্যান্ডের গাঁইয়া ডাএলেক্টে। সে ভাষা বোঝে কার সাধ্যি? সেমিনারের নমস্য পণ্ডিতগণ তো কানে ডবল আঙ্গুল পুরতেন। আমি যে অক্লেশে বুঝতে পারতুম তার একমাত্র কারণ আমার দিনযামিনী কাটত— এই শেষের ক মাস ছাড়া— শহরের বেকার, ফোকটে পয়সা মারায় তালেবর, ঘাঘরা-পল্টনের তাঁবেদার মস্তানদের সঙ্গে। তারা গ্যোটে-শিলারের ভাষায় কথা কয় না। কিন্তু থাক সে পুরনো কাসুন্দো।

সে লেকচারের সারাংশ : 'কী হবে হে, ছোকরা অত নেকাপড়া করে? দুটো প্যাখনা গজাবে বুঝি? ঢের ঢের বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের তো এই হাতের চেটোতে চটকালুম, বাওয়া, অ্যাদ্দিন ধরে! কী পেলুম ক দিকিনি, তবে বুঝি তোর পেটে কত এলেম। বলি— কান পেতে শোন, আখেরে ফয়দা হবে, তাই ভাঙিয়ে খাবি। এই যে হেথায় কেতাবে কেতাবে চতুদ্দিক ছয়লাপ, ওদেরই মতো ওরা খসখসে শুকনো— বুঝলি, শুকনো। রসকষের নামগন্দো নেই। বাড়ি যা, বাওয়া বাপের সুপুত্তুর— দু-গেলাস বিয়ার স্যাঁটস্যাঁট করে মেরে দে। গায়ে-গত্তি লাগবে। জানটা ত-র্-র্-র্ হয়ে যাবে, চোখের সামনে গুল-ই-বাকওয়ালির পাল ফটফট করে ফুটে উঠবে—'

আমি পকেট থেকে একটা সস্তার চেয়েও সস্তা সিগার বের করলুম। এদেশে সেটাকে 'র‍্যাট কিলার' 'মূষিক নিরোধ' খেতাব দেওয়া হয়। কিছু না, রান্নাঘরে ওরই এক টুকরো রেখে দিন। আর দেখতে হবে না— পরের দিন গণ্ডাখানেক মড়া ইঁদুর ঘরে-বাইরে পেয়ে যাবেন। ওই 'সিগারে' বার দুই ঠোক্কর মেরেই অক্কা লাভ করেছেন। এই সোনার শহর কলকাতাতেও বিড়িওলার কুঠুরিতে ব্লেক-আউটের মধ্যিখানেও সে দিব্য মূর্তমান। আমার এক মিত্র আকছার ওই মাল আমাকে রুপোর কেস থেকে বের করে সাড়ম্বর প্রেজেন্ট করে— জানিনে কোন্ দুরাশায়।

উইলির দিকে এগিয়ে দিয়ে সিরিয়াস গলায় বলতুম, 'পাক্কা বাকিংহাম পেলেসের সিগার। বহু কষ্টে তোমার জন্য পাচার করেছি। লাও, হল তো?'

উইলি পুনরায় সেই ধুয়ো ধরে, 'কী যে হয় নেকাপড়া করে'— বিড়বিড় করতে করতে চলে যেত এক পণ্ডিতের কামরায়। সেখানে লেকচার না ঝেড়ে চাবির গোচ্ছাটা শুধু ঝমঝমাত।

উইলি আর ঘণ্টা দেড়টাক তাড়া দিতে আসত না।

www.pathagar.com

কে বলে শুধু জর্মন মুলুকে ঘুষের মতো লুবরিকেনট ভাদ্রবধূ?

তবে হ্যাঁ, বলে রাখা ভালো, উইলি সিগারটার সওগাৎ প্রতিবারে নিত না। না নিলে ও আমার ম্যাদ বাড়াত, নিত্যি নিত্যিই।

৩৭

অর্ধশিক্ষিত বহু মার্কিন যে একটিমাত্র জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কথা শুনেছে সেটি বন শহরে প্রতিষ্ঠিত। এবং সে-খ্যাতির জন্য চোদ্দ আনা শিরোপা পায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগ তরো-বেতেরো ভাষা শেখায়— প্রাচীন মিশরীয় বাবিলনীয়, বৈদিক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে অদ্যদিনের মডার্ন জাপানি পর্যন্ত— তার নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনার। এখানে দুনিয়ার কুল্লে রকমের ঝোপ থেকে নানান রঙের চিড়িয়া আসে হরেক রকমের বুলি শেখার তরে এবং মাঝেমধ্যে অধ্যাপকরা যখন সেমিনারে অনুপস্থিত, তখন যা কিচিরমিচির লাগায় তাতে ধ্বনিশাস্ত্রের জানা-অজানা কোনও আওয়াজই বাদ যায় না। ওদিকে মার্কিনদেশের বাসিন্দাদের জাত আগাপাশতলা সাতান্ন জাতের জগাখিচুড়ি দিয়ে তৈরি। তাই তারা আসে বন শহরে, আর অনেকেই জর্মন দেশের সেরা সেই সেমিনারে বসে পড়ে আপন আপন মাতৃভাষায় খবরের কাগজ। অনেকটা সেই কারণে সেমিনারের কাছেই ছিল একটি খবরের কাগজের হরবোলা কিয়োসক্। আমরা উইলিমাস্টারকে কাছে পেলে তার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে বলতুম, 'ফেরার সময় আমার জন্য সেই খবরের কাগজটা এনে দেবে তো?' 'সেই' বলার কারণ ওস্তাদ উইলি পৃথিবীর তাবৎ ভাষা উচ্চারণ করত তার আপন নিজস্ব মৌলিক গাঁইয়া রাইন উচ্চারণে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, সেমিনারের সর্বাধিকারী খুদ ডিরেকটর সায়েব উইলিকে বললেন একখানা 'টাইম্‌স্' নিয়ে আসতে। উইলি এক সেকেন্ড চিন্তা করে বললে, 'ও! 'টে টিমেস্?' The Times-এর The জর্মন ভাষায় আইনানুযায়ী উচ্চারিত হয় 'টে' এবং Times উচ্চারিত হবে 'টিমেস'। ধ্বনিতত্ত্বের বাঘা পণ্ডিত অধ্যাপক মেনজেরাটের গুরুরও সাধ্য নেই যে লাতিন অক্ষরে লেখা শব্দ তা সে জর্মন হোক, ইংরেজি হোক বা সাঁওতালিই হোক, জর্মন উচ্চারণে যদি পড়তে হয় তবে মাস্টার উইলির উচ্চারণে খুঁৎ ধরেন। ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়ে ভাষা বাবদে আমার মতো মূর্খও সপ্রমাণ করতে পারবে যে মাস্টার উইলি আমাদের সেমিনারের লেকচারার হ্যারৎসিগেনশ্‌পেকের (নামটা শুনুন স্যর! শব্দার্থ 'ছাগলের চর্বি') যখন অতিশয় ধোপ-দুরস্ত সুমধুর উচ্চারণসহ 'রাজসিক' জর্মন বলতেন তখন উইলি উপস্থিত থাকলে তার মুখে স্পষ্ট দেখা যেত সে যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করছে। এমনকি যখন প্যারিস, ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, হারভার্ডের ইয়া বড়াব্বড়া দাড়িওলা বাঘা বাঘা প্রফেসর পণ্ডিতরা আমাদের সেমিনারে এসে এ দেশের সিঙিমার্কা বিদ্যেবাগীশদের সঙ্গে 'একটি একটি কথা যেন সদ্য-দাগা কামান' ঝেড়ে যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করতেন আর উইলি মেস্টার একপ্রান্তে ভুরভুরে খুশবাইয়ের ম-ম-মারা কফি সাজাত তখন তার চেহারা দেখে দিবান্ধ-জনও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করত, উইলি একটি সাক্ষাৎ পরমহংস : মিঞা মৌলানাদের বাক্যবর্ষণের ঝরঝর বারিধারা তার রাজহাঁসের পালকের উপর পড়ামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ঝরে যেত। পাঠকমাত্রই অবশ্য এসব শুনে বলবেন, বড় বড় পণ্ডিতদের যুক্তিতর্কে ভরা আলাপ-আলোচনা উইলি বুঝবে কী করে? কাজেই তার পক্ষে ওই প্রতিক্রিয়াই

www.pathagar.com

তো স্বাভাবিক। উত্তরে বলি, প্রবাদ আছে, 'কাজীর বাড়ির বাঁদীও দু-কলম জানে।' তা জানুক আর না-ই জানুক, এসব ক্ষেত্রে বহুলোক দু-পাঁচটা লবজো কুড়িয়ে নিয়ে স্নবের ন্যায় বিদ্যে জাহির করে। কিন্তু এহ বাহ্য : স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরকে স্মরণে এনে তাঁরই আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি করি : প্রকৃত সভ্যতার উপলব্ধির জন্য বিস্তর লেখাপড়া করতে হয় না, কেতাবপত্র ঘাঁটতে হয় না।.. এই যে সেদিন কুষ্টিয়া অঞ্চল রাহুমুক্ত হল, সেই অঞ্চলের গাঁইয়া লালন ফকিরের গীত নিয়ে কবিগুরু থেকে আরম্ভ করে যেসব তত্ত্বান্বেষী সজ্জন আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের আপ্তবাক্যটিকে বার বার নমস্কার জানিয়েছেন।

সেকথা যাক। আমার মনে কিন্তু একটা ধোঁকা ছিল। উইলি যদি সত্যই পাণ্ডিত্য বাবদে এতই উদাসীন হয় তবে সে আমাদের জন্য বই জোগাড় করার বেলা এত তুলকালাম কাণ্ড করে কেন? প্রয়োজনমতো আমরা তাকে সকালবেলা যেসব পুস্তক ধার চাই তার একটা ফর্দ দিতুম। সেইটেই নিয়ে সে যেত বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে। এবং ফিরে এসে করিডরে ঢুকতে না ঢুকতে প্রায়ই শোনা যেত তার উচ্চ কণ্ঠস্বর;— অর্থ, কয়েকখানা বই সে পায়নি। আমাদের কেউ কেউ তাকে কখনও-সখনও বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সবসময় সব বই পাওয়া যায় হেন লাইব্রেরি ইহসংসারে নেই। আমি স্বয়ং একদিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলুম, 'ও-বই না পেলেও আমার কাজ আটকাবে না।' উইলি মাস্টার গরগর করে বলেছিল, 'আটকাবে কেন? বই না হলে কি সংসার চলে না? বই লেখা না হওয়ার আগে কি সংসার চলেনি? ইত্যাদি ইত্যাদি।'

১৯৩২-এ পরীক্ষা পাস করে দেশে ফিরলাম। ১৯৩৪-এ ফের বন শহরের সেমিনারে উইলির সঙ্গে দেখা। এবারে আমাকে সেখানে তিনবেলা খেটে মরতে হত না। কিন্তু উইলিকে প্রাচীন দিনের কায়দা অনুযায়ী মাঝে মাঝে একটা সিগার দিতুম। হিটলার তখন দেশের কর্ণধার। তার চেলাচামুণ্ডারা গরম গরম বুলি কপচাচ্ছে। প্রধান বুলি যুদ্ধং দেহি। কিন্তু আজ এই বঙ্গদেশে এখনও বারুদের গন্ধ যায়নি। ও-কথা থাক!

১৯৩৮-এর গরমের ছুটিতে বন শহরে পৌঁছেই গেলুম সেমিনারে— পথমধ্যে উইলির সঙ্গে দেখা। ততদিনে নাৎসি আদেশে প্রায় সবাই একে অন্যকে 'হাইল হিটলার' বলে নমস্কার জানায়। 'গুটেন মর্গেন' 'গুটেন আবেনট্' উঠে যাওয়ার উপক্রম। অনেকটা যেমন অভ্যাসবশত উইলিকে 'হাইল হিটলার' বলে প্রীতি-অভিবাদন জানালুম। চার বছর পরে দেখা। উইলি সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কাছে এসে কেমন যেন বিষাদভরা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'তুমি তো, বাপু, বিদেশি। তুমি আবার হাইল হিটলার করছ কেন?' কথাটা সত্য। বিদেশির পক্ষে এ-আইন প্রযোজ্য ছিল না।

বুঝলুম— অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলুম— উইলি প্রচ্ছন্ন হিটলারবৈরী।

এইবারে লটে যেন আমার কাহিনীর খেই ধরে নিয়ে বললে, উইলি রাজনীতির বড় একটা ধার ধারত না। কিন্তু যুদ্ধ লেগে যাবার পর তখন আর কোথায় রাজনীতি কোথায় কী? গোড়ার দিকে জয়ের পর জয়। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি। বৃদ্ধেরা হিসাব করে দেখালেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। তাই সই। কিন্তু তখন কজন জানত জঙ্গল থেকে পুরোপুরি বেরুবার পূর্বেই আনন্দধ্বনি ছাড়তে নেই : আরম্ভ হল জর্মনির উপর বোমাবর্ষণ। প্রথমটায় বড় বড় শহরের উপর। ওই সময় একদিন ব্ল্যাক-আউটের ঠেলায় আশ্রয় নিতে হল উইলি-পরিবারে। স্বয়ং উইলির তখন দম ফেলার ফুরসত নেই। হেথা-হেথা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, বুংকার বানাচ্ছে এবং তার সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেমিনার বাড়িটাকে যেন

www.pathagar.com

হিটলারের আবাসভূমি কিংবা বাকিংহাম প্রাসাদের চেয়েও সুরক্ষিত জিব্রল্টর-দুর্গে পরিণত করে ফেলতে পারে— সে একা, তার দু-খানা হাত দিয়ে। স্বয়ং লর্ড মেয়ার থেকে আরম্ভ করে 'ভায়া' রেক্টর হয়ে, সেমিনারে এই একটিমাত্র নাৎসি, লেকচারার শ্রোডার এস্তেক সে সক্কলের সঙ্গে ঝগড়াকাজিয়া কান্নাকাটি করে জোগাড় করেছে সেমিনারের বরাদ্দানুযায়ী প্রাপ্যের চেয়ে তিন ডবল মালমশলা; অষ্টপ্রহর বয়ে বেড়াচ্ছে বালির বস্তা, ইঁট-সিমেন্টের ডাঁই।

লটে বললে, হ্যার উইলি ঘরে ঢুকল মজুরদের এপ্রন গায়ে। সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত কর্দমাক্ত। কথায় কথায় আমি বললুম, 'মার্কিনরা যত বুদ্ধু হোক, ওরা তো জানে, বন ইউনিভার্সিটি টাউন, এখানে বন্দুক-কামানের কারবার নেই বললেও চলে। এখানে বোমা ফেলে ওদের কী লাভ?'

উইলি একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, 'মার্কিনরা বন শহরটাকে ভালো করেই চেনে। এই সেমিনারেই কত মার্কিন এল-গেল। ডকটরেট পাস করল বাইবেল নিয়ে কাজ করে। আমিও তো অন্তত জনাতিরিশকে চিনি। ওরাই আমাকে বলেছে, তাবৎ মার্কিন মুল্লুকে সবচেয়ে বেশি করে নাম-করা এই বন-এর ইউনিভার্সিটি। কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাপারে ওরা আকাট। আকাশ থেকে বন শহরটাকে সনাক্ত করবে প্যারিস বলে, ভিয়েনাকে ভাববে ইস্তাম্বুল। আর হাতের তাগ তো জানো। দুনিয়ার সবকিছু এক্কেবারে চাঁদমারীর মধ্যিখানের বুলস-আইয়ের মতো বেধড়ক হিট করতে পারে— সব হিট করতে পারে, শুধু যেটাকে হিট করতে চায়, যেটাকে তাগ করেছে সেইটে ছাড়া! তাগ করবে বার্লিনের রাইষটগ, বোমা পড়বে বন-এর সেমিনারের উপর।'

লটে বললে, আমি জানতুম না উইলি দুরবস্থা দুর্দৈব নিয়েও পুটকারি করতে পারে। কিন্তু তার কথাই ফলল। ভগবান যে কখন কার মুখ দিয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়ে নেন কে জানে। এবং এখনও জানিনে কোন নিশানা তাগ করতে গিয়ে তারা লাগিয়ে দেয় সেমিনারের পাশের বাড়িতে আগুন।

উইলি তো প্রথম আপ্রাণ চেষ্টা দিল আগুনটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। যুদ্ধের শেষের দিক— শক্ত জোয়ানসোমথ মদ্দমানুষ কোথায় যে তাকে সাহায্য করবে; আগুন পৌঁছে গেল সেমিনার বাড়িতে।

তখনকার দিনের সেই ছেঁড়াখোঁড়া সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে অনেক আগেই উইলি বিস্তর মূল্যবান পুঁথিপত্র পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেমিনারের নিত্যদিনের গবেষণাকর্ম পঠন-পাঠন সিলমোহর সেঁটে তো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় না— বিশেষ করে ছাত্রদের অসম্পূর্ণ ডক্টরেটের থিসিস, অধ্যাপকদের পুস্তক। উইলি পাগলের মতো দোতলা-তেতলা উঠছে-নামছে আর দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সেসব সেমিনারের দোরের গোড়ায় নামাচ্ছে। তার বউ সেগুলো দূরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনার বাড়ি তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সবকিছু পুঁথিপত্র কেতাব কাগজের ব্যাপার। পুরনো কেতাবে আবার আর্দ্রতা এক্কেবারেই থাকে না। বারুদ-পেট্রলের পরেই বোধ হয় তারা পুড়ে মরতে জানে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে।

উইলি তখনও ওঠানামা করছে।

উইলির বউ প্রতিবার স্বামীকে উপরে যেতে বারণ করছে। সে-ও প্রতিবার বলে, 'এই শেষবার, বউ। আর যাব না।'

কী আর বলব।

www.pathagar.com

উইলির বউ বলেছিল, হঠাৎ বাড়িটা যেন একসঙ্গে হুড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ল। লটে রুমাল বের করে চোখের জল মুছল।

বললে, 'জানো সায়েড, উইলির বউ আমাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, শেষবারের মতো উইলি যখন তার বউকে বলে, এই তার শেষ ক্ষেপ, আর উপরে যাবে না, তখন তার গলায় এমন কিছু ছিল যার থেকে বউ বিশ্বাস করেছিল, এর পর আর সে উপরে যাবে না। সে তার কথা রেখেছিল— না? উপরে সে যায়নি— নাবেইনি যখন।

আরেকটা কথা আমার মনে বড় দাগ কেটেছে। উইলির বউ যেসব পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় এক ডাঁইয়ের উপর আরেক ডাঁই ডাম্প্ করেছিল সেগুলো পরে সরাবার সময় ধরা পড়ল উইলি 'ফাস্ট প্রেফরেন্স্' দিয়ে সক্কলের পয়লা উদ্ধার করেছিল ছাত্রদের অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ থিসিস— তার পর অধ্যাপকদের পাণ্ডুলিপি। ... তোমাদের, আই মিন, ছাত্রদের সে খুব ভালোবাসত। না! বোধহয় জানত, প্রথম বাচ্চা প্রসব করার মতো স্টুডেন্টদের প্রথম বই— ডক্টরেট থিসিস— বিয়োনোটা শক্ত ব্যাপার। আবার সেই বাচ্চা, আই মিন, ওই অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিও যদি পুড়ে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। সে তো মারাত্মক গর্ভপাত। প্রফেসরদের তো সে ভাবনা নেই। তাঁদের কেউ কেউ তো শুনেছি, বছরবিয়েনি— বছরের এ মোড়ে একখানা কেতাব, ওই মোড়ে আরেকখানা।'

জ্বলন্ত কেতাব-পুঁথির আগুনে পুড়ে মারা গেল উইলি।

আমার মনে পড়ে গেল আরব পণ্ডিত বহ্র উল জাহিজের কথা।[১]

মৃত্যুর তিন-চার দিন পূর্বে তাঁর স্বাস্থ্যের একটুখানি উন্নতি দেখা দেওয়াতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করেন, তাঁকে যেন ধরে তাঁর কাজ করার তক্তপোশে নিয়ে যান। স্ত্রী আপত্তি জানালে তিনি অনুনয় করে বললেন যে, তাঁর বইখানার আর মাত্র কয়েকখানি পাতা লিখলেই বইটি সমাপ্ত হয়।

জাহিজ যে জায়গায় বসে কাজ করতেন তার চতুর্দিকে থাকত দু-চার গজ উঁচু বইয়ের 'মিনার'।[২] তারই নিচের একখানা টেনে বের করার চেষ্টাতে সে মিনার তো ভেঙে পড়লই, তার ধাক্কাতে আর কটা মিনারের বিস্তর বইয়ের তলায় চাপা পড়লেন জাহিজ। বই সরানো হলে দেখা গেল, বইখানা সমাপ্ত করতে গিয়ে তিনি জানটি খতম করে দিয়েছেন।

তাঁর জীবনীকার বলেছেন, 'পণ্ডিতের পক্ষে পুস্তকস্তূপের নিচে গোর পাওয়ার চেয়ে শ্লাঘনীয় সমাধি আর কী হতে পারে!'

উইলি পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতদের সেবক, পুস্তক সংরক্ষণের একনিষ্ঠ সাধক। পুস্তক সহমরণে সমাধি লাভ করল— এর চেয়ে শ্লাঘনীয় শেষকৃত্য আর কী হতে পারে।

---

১. যাঁরা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নামে অজ্ঞান, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন, সে কেতাবে তাঁর মৃত্যুর সন দেওয়া হয়েছে ১৮৬৯। আসলে তাঁর মৃত্যু ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।

২. 'বঙ্গীয় শব্দকোষের' লেখক ঈশ্বর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তাঁর পাণ্ডুলিপির এক ক্ষুদ্র অংশ তিনি তাঁর কাঁচা ঘরে রেখে বিদ্যালয়ে পড়াতে যান। ঘরে আগুন লাগাতে তিনি অর্ধোন্মাদ উইলির মতো জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পান। হরিচরণের প্রতি নিয়তি— অন্তত উপরের দুই বিষয়ে— সদয় ছিলেন। তাঁর পরলোকগতি জাহিজ বা উইলির মতো হয়নি। তিনি অন্ধ হয়ে যান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবতরণিকা

১

এই নয় মাসে যা ঘটেছে সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন। পাঠক সাধারণ যেন না ভাবেন এটা একটা কথার কথা মাত্র। ঠিক দু মাস পূর্বে ১৫ জানুয়ারিতে আমি এখানে এসেছি। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে আমার অগণিত আত্মীয় আত্মজনের আপন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা দিনের পর দিন শুনে গিয়েছি। এমন একটি মাত্র প্রাণী পাইনি যার কোনও কিছু বলার নেই। মাত্র চার বছরের শিশুরও তার আপন গল্প আছে। সে আদৌ বুঝতে পারেনি ব্যাপারটার কারবার জীবন-মৃত্যু নিয়ে। আমাকে বললে, 'মা আমার হাত চেপে ধরে চানের ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বললে, 'চুপ করে থাক, কথা বলিসনি, টুঁ শব্দটি করবিনি।" সমস্তক্ষণ কানে আসছে বোমা ফাটার শব্দ। আমি ভেবেছি, একসঙ্গে অনেকগুলি বিয়ের আতশবাজি ফাটছে। মা এত ভয় পাচ্ছে কেন?' ...প্রাচীন দিনের এক বন্ধু তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন— তাঁর আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। গিয়ে দেখি, প্রাচীনতর দিনের সখা আমার প্রিয় কবি আবুল হোসেন বৈঠকখানার তক্তপোশে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন। আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'এই যে।' যেন ইহসংসারে এই ন-মাসে বলার মতো কিছুই ঘটেনি। আর পাঁচজন আশ-কথা পাশ-কথা বলছিলেন। বর্বর না-পাকদের সম্বন্ধে মামুলি কথা। আমি কেন জানিনে কবির দিকে একবার তাকালুম। তাঁরই পাশে আমি একটি কৌচে বসেছিলুম। অতি শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ আব্বা গাঁয়ের বাড়ির বৈঠকখানায় চুপচাপ বসেছিলেন। জানতেন না-পাকরা গাঁয়ে ঢুকেছে। তিনি ভেবেছেন, আমি চুয়াত্তর বছরের বুড়ো। আমার সঙ্গে কারওরই তো কোনও দুশমনি নেই।... না-পাকরা ঘরে ঢুকে তাঁকে টেনে রাস্তায় বের করে গুলি করে মারল।'

আমি কোনও প্রশ্ন শুধোইনি। কোনওকিছু জানতে চাইনি।

আমার নির্বাক স্তম্ভিত ভাব দেখে আর সবাই আপন আপন কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে জড় নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্য আমিই প্রথম কথা বলেছিলুম। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে এনে প্রার্থনা করছি, 'হে আল্লাতালা, এ সন্ধ্যাটা তুমি আমাকে কাটিয়ে দিতে দাও, কোনও গতিকে।'

আমার বিহ্বলতা খানিকটে কেটে গিয়েছে ভেবে—আল্লা জানেন, এ বিহ্বলতা কালধর্মে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হবে কিন্তু এটাকে সমূলে উৎপাটিত করার মতো যোগীশ্বর আমি কখনও

www.pathagar.com

হতে পারব না— এক দরদি শুধোল, 'আপনারও এ ন-মাস নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় কেটেছে। আপনার স্ত্রী আর দুটি ছেলে তো ছিল ঢাকায়।'

আমি বললুম, 'আপনাদের তুলনায় সে আর তেমন কী? সেকথা না হয় উপস্থিত মুলতুবি থাক।'

নানা জাতের আলোচনা ভিড় জমাল। তবে ইয়েহ্ইয়ার আহাম্মুখী, ভুট্টোর বাঁদরামি, পাকিস্তানের (বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হওয়াতে পাকিস্তানের যে অংশটুকু 'বাকি' আছে তাই নিয়ে এখন 'বাকিস্তান') ভবিষ্যৎ মাঝে মাঝে ঘাই মেরে যাচ্ছিল। কথাবার্তার মাঝখানে আমার মনে হল, এঁরা যেন আমাকে স্পেয়ার করতে চান বলে আপন আপন বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা চেপে যাচ্ছেন।

এমন সময় গৃহকর্তা আমার সখা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার ছোট বোনটি আপনাকে দেখতে চায়।' আমি একগাল হেসে বললুম, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমি যে অত্যন্ত গ্যালান্ট সে তো সবাই জানে।

সাদামাটা গলায় বন্ধু যোগ করলেন, 'এঁর উনিশ বছরের ছেলেটিকে পাকসেনারা গুলি করে মেরেছে।'

পাঠক ভাববেন না, আমি বেছে বেছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়ে ন-মাসের নির্মমতার ছবি আঁকছি। তা নয়। এ মন্বন্তর এ মহাপ্রলয় এমনই সর্বব্যাপী, এমনই কল্পনাতীত বহুমুখী, প্রত্যেকটি মানুষের হৃৎপিণ্ডে এমনই গভীরে প্রবেশ করেছে, এক একটা শাণিত শর, যেন এক বিরাট প্লাবন সমস্ত দেশটাকে ডুবিয়ে দিয়ে সর্বনরনারীর হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি রন্ধ্র কর্দমাক্ত জলে ভরে নিরন্ধ্র করে দিয়ে এই দুখিনী সোনার বাংলাকে এমনই এক প্রেত-প্রেতিনী গৃধ্রশৃগালের সানন্দ হুহুঙ্কার ভূমিতে পরিণত করে দিয়ে গিয়েছে, যে তার সর্বব্যাপী সর্বাত্মক বহুবিচিত্র রূপ আপন চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে সংহরণ করতে পারেন এমন মহাকবি মহাত্মা কোনও যুগে জন্মাননি। এরই খণ্ডরূপ আয়ত্ত করে প্রাচীনকালে কবি-সম্রাটগণ মহাকাব্য রচনা করেছেন। আমার মনে হয় একমাত্র মধুসূদন যদি এ যুগের কবি হতেন তবে তিনি 'মেঘনাদ-বধ' না লিখে যে মহাকাব্য রচনা করতে পারতেন তার তুলনায় 'মেঘনাদ' ঝিল্লিধ্বনির ন্যায় শোনাত।

হয়তো বহুযুগ পরে, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে, চক্রনেমির পূর্ণাবর্তন সম্পূর্ণ হলে মানুষ পুনরায় মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম হবে। যদি হয়, তবে সে মহাকাব্যের সম্মুখে অন্য সর্ব মহাকাব্য নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। একমাত্র মহাভারতই তখনও ভাস্বর থাকবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে বলি সম্পূর্ণ নিরর্থক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় বাংলাদেশের সে মহাকাব্য পরবর্তী সর্ব মহাকাব্যের অগ্রজরূপে পূজিত হবে।

জানি, ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপান করেছিলেন। কিন্তু সেটা প্রতীক। এস্থলে পাকসেনারা নিরীহ বালকের আধখানা গলা কেটে ছেড়ে দিয়েছে। বালক ছুটেছে প্রাণরক্ষার্থে, হুমড়ি খেয়েছে, পড়েছে মাটিতে, আবার উঠেছে আবার ছুটেছে। বধ্যভূমি অতিক্রম করার পূর্বেই তার শেষ পতন।

খান সেনারা প্রতি পতন, প্রতি উত্থানে খল-খল করে অট্টহাস্য করেছে।

www.pathagar.com

শুনেছি কে কজনকে এ পদ্ধতিতে নিধন করা হয়েছে তার রেকর্ড রাখা হত এবং পদোন্নতি তারই ওপর নির্ভর করত।

মহাকাব্য লেখা হোক, আর না-ই হোক, এদেশের দাদি নানী এখনও রূপকথা বলেন। মরণোন্মুখ রাক্ষসী পাগলিনী প্রেতিনীপারা, দক্ষিণে বামে সর্ব লোকালয় জনপদ বিনাশ করতে করতে ছুটে আসছে যে-ভোমরাতে তার প্রাণ লুক্কায়িত আছে সেটাকে বাঁচাতে। এসব রূপকথা ভবিষ্যতের 'রুদ্রূপ-কথা'র সামনে নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হবে। যে চার বছরের মেয়েটির কথা বলেছিলুম সে যেদিন দাদি নানী হবে— ইতোমধ্যে সমস্ত জীবন ধরে বিকট বিকট দুঃখ-দুর্দৈবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান যার জীবনে জমে জমে হয়ে উঠবে পর্বতপ্রমাণ— সে যে রাক্ষসীর বর্ণনা দেবে সে রাক্ষসী সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান অগণিত। মান্ধাতার আমলের সাদা-মাটা রাক্ষসী রাস্তায় দাঁড়াত না— এসব রাক্ষস ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের আধখানা গলা কেটে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, গ্রামের মসজিদ দেউলের সামনে ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ভস্মশয্যায় গড়াগড়ি দেবে। অঋতুপ্রাপ্তা শিশুকন্যাকে পাশবিক অত্যাচারে অত্যাচারে নিহত করে প্রেতার্চনার থালা সাজাবে নরখাদক পিশাচরাজ ইয়েহিয়ার পদপ্রান্তে।

অন্তরীক্ষে শঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে তাণ্ডবনৃত্য বন্ধ করবেন।

লক্ষ বিষাণে ফুৎকারে ফুৎকারে কর্ণপটহবিদারক ধ্বনিতে ধ্বনিতে আহ্বান জানাবেন লক্ষ লক্ষ চক্রপাণিকে— এবারে মাত্র একটি সতীদেহ খণ্ডন নয়।

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পিশাচ বহির্গত বন্দিশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারি উড়ায়ে চলে পথে—

সে নিধন ভবিষ্যতের পুরাণে কী রূপ নেবে সে তো এ যুগের নরনারীর দৃষ্টিচক্রবালের বহু সুদূরে।

পুরাণের উপাদান যখন নির্মিত হয়েছিল তখন কি সেকালের মানুষ জানত ভবিষ্যতের মহাকবি পুরাণে তাকে কীভাবে বর্ণাবেন?

পুরাণ পড়ে একদা আমার মনে হত এসব সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। শুধু প্রশংসা করেছি পুরাণকারের কল্পনাশক্তির। আজ জানি, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্য কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

আগামী দিনের রূপকথার প্রসঙ্গে এসে গেল পুরাণের— নব-'ভবিষ্যপুরাণের' স্বরূপ-কাহিনী। কিন্তু এ দুই ইতিহাস কাব্যের সংমিশ্রণ একই উপাদানে নির্মিত হয়। একটি সম্মান পায় সাহিত্যের সিংহাসনে, অন্যটি আদর পায় ঠাকুরমার কোলে।

সাধারণজনের বিশ্বাস, মুসলমানদের পুরাণ নেই। আছে :—

'রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরাণ।
নাকের শোয়াস যেন বৈশাখী তুফান ॥
দুধে জলে দশ মণ করি জলপান।
আশী মণী খানা ফের খায় সোনাভান ॥
শৃঙ্গার করিয়া বিবি বামে বান্ধে খোঁপা।
তার 'পরে গুঁজে দিল গন্ধরাজ চাঁপা।'

www.pathagar.com

যে রানির শ্বাস কালবৈশাখীর মতো, যিনি নাশ্‌তা করেন দশমণ ওজনের দুধ-জল দিয়ে এবং মধ্যাহ্নভোজনের ওজন যাঁর আশি মণ, তিনি যদি পুরাণের নায়িকা না হন তবে কিসের? তাই সোনাভানের পুঁথি কেচ্ছা-সাহিত্যের অনবদ্য কুতুবমিনার।

আর রূপকথা?— তার তো ছড়াছড়ি। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি!

গালেবুতুরুম্ বাশ্‌শা (বাদশাহ)— পাঠক, 'গালেবুতুরুম্' নামটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি— অবশ্য বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'গালেবুতুরুম্ গাল-ভরা নাম; এটা শোনার জিনিস, দেখার নয়— অতএব পাঠকের কর্ণ আকর্ষণ কর।' কিন্তু করি কী প্রকারে? ব্যাকরণসম্মত বাক্যই যে সুজনতাসম্মত কর্ম হবে শাস্ত্রে তো সেরকম কোনও নির্দেশ নেই।

'গালেবুতুরুম্ বাশ্‌শা; মক্কাশ্‌শর (মক্কা শহরে) তার বারি (বাড়ি)।' পাঠক সাবধান, আরবভূমির প্রামাণিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে যেয়ো না। এ বাশ্‌শা, এ মক্‌কাশ্‌শর বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে চিন্ময় দ্যুলোকের চিরঞ্জীব আকাশকুসুম রূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

এবং এ ন-মাসের কাহিনী তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ পাবে ভাটিয়ালি গীতে। কত বিচিত্র রূপ নেবে সে আমার কল্পনার বাইরে। একটা মোতিফ যে বার বার ঘুরেফিরে আসবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই।

মুক্তিফৌজে ডাকে মোরে,
থাকুম্ ক্যাম্‌নে কও!
গামছা দিয়া পরানডারে
বাইন্‌ধা তুমি লও।

পাঠক আমার অনধিকার চর্চা ক্ষমা কর।

কিন্তু যেসব সমসাময়িক সাহিত্যস্রষ্টা এ যুগের ক্ষুধা এ যুগের চাহিদা মেটাতে পারতেন তাঁদের অনেকেই তো আজ আর নেই। হায়দার কোথায়, কোথায় মনির? আমি শুধু আমার অন্তরঙ্গজনের কথাই বলছি। এসব বাংলাদেশী-সাহিত্যিকদের প্রতিই তো ছিল ইয়েহিয়ার বিকটতম আসুরিক জিঘাংসাবৃত্তি।

আমার পিঠ্‌য়া ছোট বোনের ছেলে একটি চাটগাঁয়ে ব্যবসা করত। ভালো ব্যবসা করত। সে যত না সাহিত্য সৃষ্টি করত, তার চেয়ে বেশি করত সাহিত্যসেবা। ব্যবসা থেকে দু পয়সা বাঁচাতে পারলেই বের করত ত্রৈমাসিক— 'প্রাচী'।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে না-পাকরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারে।

২

না-পাক অফিসারদের ভিতর এক ধরনের চটি ত্রৈমাসিক বিলি করা হয়। আষ্টেপৃষ্ঠে কড়া পাঠনাই জবানে ছাপা থাকে 'অনধিকারীর হস্তে এ কেতাব যেন কস্মিনকালেও না পড়ে; ফালতো কপি যেন ফলানা ঠিকানায় পাঠানো হয়।' কিন্তু প্রাণের ভয়ে যখন মোগল পাঠান তুর্ক আফগান (অবশ্য পাকিস্তানিরা) মুক্তকচ্ছ হয়ে 'বাপ্পো-বাপ্পো' রব ছেড়ে পালাচ্ছেন তখন

www.pathagar.com

টপসিক্রেটই হয়ে যায় বটমলেস। শুনেছি, শেষ খালাসি লাইফবোটের শরণ না পাওয়া পর্যন্ত মাল জাহাজ এমনকি আধা-বোটের কাপ্তেন তক্ জাহাজ ছাড়ে না— মানওয়ারি জাহাজের কথা বাদ দিন। আর এসব 'কাপ্তেন'-রা জোয়ানদেরও না জানিয়ে রেতের অন্ধকারে, অ্যারোপ্লেন হেলিকপটার যা পান তাই চুরি করে বর্মা বাগে পাড়ি দেন— এগুলো যুদ্ধের কাজে এমনকি আহত সৈন্যদের সরাবার জন্যও যে দরকার হতে পারে সেকথা মনের কোণেও ঠাঁই না দিয়ে। জোয়ানরা তাই টপসিক্রেট চোখের মণি এইসব বুলেটিন ঠোঙাওলাদের কাছে বিক্রি করেছিল কি না জানিনে[১] কিন্তু পাকেচক্রে এরই দু চারখানা আমার হাতে ঠেকেছে। 'যে খায় চিনি তাদের যোগায় চিন্তামণি।'

যেমন আপিসরকে উপদেশ দেওয়া সেই টপসিক্রেট চোখের মণিতে 'তুমি যদি কোনও নদীপারে পোস্টেড হও তবে জোয়ানদের সাঁতার শেখাবে।' ওহ্! কী জ্ঞানগর্ভ উপদেশ!

এক ওকিবহাল গুণী ব্যক্তিকে সাঁতার কাটা সম্বন্ধে সেই সদুপদেশের উল্লেখ করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'অইছে, অইছে— জানতি পারেন না। এই যে আপনাদের বাড়ির পিছনে ছোট একটি নালা এসে ঝিলের মতো হয়ে গিয়েছে ওইটে ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের হেড-কোয়ার্টার। ২৫ মার্চের গভীর রাত্রে না-পাকরা কেন্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাঙ্ক মর্টার মেশিনগান কামান দিয়ে আক্রমণ করে বাঙালি জোয়ানদের। ওরাও রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ওরা পারবে কী করে? ওদের ফায়ার পাওয়ার কোথায়? আট আনা পরিমাণ কচুকাটা হয়— ভাগ্যিস বাকিরা পেছন বাগে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে বুড়িগঙ্গা সাঁতার কেটে পেরিয়ে—'

'সাঁতার কেটে?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ। তার থেকেও না-পাকদের শিক্ষে হয়, এদেশে সাঁতার না-জানাটা কত বড় বেকুবি— রীতিমতো বেয়াদবি!!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'তা বটেই তো, তা বটেই তো! তবে "ভাগ্যিস চলে গিয়েছিল" বললেন কেন?'

গুণী বিরক্তির সুরে বললেন, 'ঝকমারি! ঝকমারি— আপনাকে এ ন মাসের ইতিহাস শেখানো। এ বি সি দিয়ে তাবৎ বাৎ আরম্ভ করতে হয়। এদেশের শিশুটি পর্যন্ত জানে, এরা এবং (দুই) পুলিশের যে কটি লোক ওই একই ধরনের কিন্তু অনেক মোক্ষমতর হামলা থেকে গা

১. সেবারে (১৯৭১-এ) ঈদ পড়েছিল ২০/২১ নভেম্বরে। সেই বাহানায় পাঞ্জাবি মহিলারা স্বদেশে 'প্রত্যাবর্তন' করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছু অফিসারও সময় থেকে গা-ঢাকা দেবার প্র্যাকটিস রপ্ত করতে থাকেন। ১৬ ডিসেম্বর না-পাক জাঁদরেলরা আত্মসমর্পণ করেন। আপিসরেরা তার আগের থেকেই দুই দল নারায়ণগঞ্জ খুলনা থেকে জেলেনৌকোয় করে, তৃতীয় দল প্লেনে করে পালাতে শুরু করেছেন দেখে তাঁদের বাড়ির পাহারাওলা সেপাইরা হুজুরদের মালপত্র বিক্রি করতে থাকে। পরে আত্মসমর্পণ করার প্রাক্কালে কেউ কেউ গাদা গাদা নোট বাঙালিদের সামনে পোড়ায়— 'বরঞ্চ যমকে সোয়ামি দেব, তবু সতীনকে না'— ভাবনা অনেকটা ওই। অন্যরা গোপন জায়গায় পুঁতে রেখে গেছে। শান্তি তো একদিন ফিরে আসবেই; তখন কাবুলিওলার ছদ্মবেশে কিংবা তীর্থযাত্রী রূপে— মরে যাই, কী ধর্মপ্রাণ!— এদেশে এসে উদ্ধার করবে।

www.pathagar.com

বাঁচাতে পেরেছিল, (তিন) বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে যারা এসে জুটল— এরাই ট্রেনিং দিল ছাত্রদের— তারাও ইতোমধ্যে এসে জুটে গিয়েছে এদের সঙ্গে, খুঁজে বের করেছে ওদের। আর কস্মিনকালেও চাষাভূষো, জেলে-হেলেদের কথা ভুলবেন না। ওদের সাহায্য না পেলে— ওই যে তেসরা ডিসেম্বরে মরণকামড় দিলে তিন দল, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনা, পেছনে-সামনে চাষাভূষোর মদত— সেটা না থাকলে সেটা তেরো দিন না হয়ে কত দিন ধরে চলত কে জানে!'

আমি সোল্লাসে বললুম, 'বর্ হক্ বর্ হক্! একদম খাঁটি কথা। এটা মেনে নিতে আমার রত্তিভর অসুবিধা হচ্ছে না। এই ফেব্রুয়ারিতে দেখা হয় আমাদের সিলটা কর্নেল রব-এর সঙ্গে। ইনি ছিলেন জেনারেল ওসমানির চিফ অব্ স্টাফ। এঁর ওপর ছিল চাটগাঁ-নোয়াখালি-সিলেটের ভার। প্রধান কাজ ছিল, চাটগাঁ বন্দরে না-পাকরা জাহাজ থেকে যেসব জঙ্গি মাল-রসদ নামাবে সেগুলো যেন ঢাকা না পৌঁছাতে পারে। সে কর্মটি এঁর নেতৃত্বে সুষ্ঠুরূপে ন-মাস ধরে সুসম্পন্ন হয়। বিদেশি সাংবাদিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছে, মার্চ থেকে ডিসেম্বর না-পাকরা জখমি রেল-লাইন মেরামত করতে না করতেই এঁরা উড়িয়ে দিতেন আবার রেলের ব্রিজ।... তিনি আমাকে বলেছিলেন, ২৬-২৭ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত গেছে সবচেয়ে সঙ্গিন সময়। 'স্বাধীন-বাংলাদেশ সরকার' তখনও তৈরি হয়নি। দেশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে, প্রত্যেকের আপন কর্তব্য কী সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সেই দিনাজপুর থেকে সিলেট চাটগাঁ বরিশালের লোক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যদি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জান কবুল করে শয়তানের মোকাবেলা না করত তবে পরিস্থিতিটা কী রূপ নিত কে জানে?'

'তা সে কথা থাক। আপনি বলছিলেন—'

'হুঁ! সেকথা থাক। তবে এ বিশ-বাইশ দিনের ইতিহাস তার পরিপূর্ণ সম্মান তার পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য দিয়ে লেখা উচিত। আমি বিশেষ করে জানতে চাই, তারা এ মনোবল পেল কী করে, কোথা থেকে?'

'না, না। সাঁতারের কথা বলছিলুম। হারামিরা স্পষ্ট চোখে দেখতে পেল, বাঙালি সমুচা বন্দুক হাতে নিয়ে গপাগপ ডুবসাঁতার দিয়ে বুড়িগঙ্গার জল পেরুল তথাপি বাবুদের কানে জল গেল না। কে জানে, কে বোধহয় হুকুম দিয়েছিল— ব্যবস্থা করা হল, জোয়ানরা সাঁতার কাটা শেখবেন! আরে মশয়, কাঁচায় না নুইলে বাঁশ—! তদুপরি আরেক গেরো। যে আপিসর হুজুররা ডেঙায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম কপচাচ্ছেন, তেনারাই যে জলে নাবলে পাথরবাটি। বাঁজি ছুঁড়ি পয়লা পোয়াতিকে শেখাচ্ছে বাচ্চা বিয়োবার কৌশল।

তদুপরি আরেক মুশকিল, জল পদার্থটা বড্ড ভেজা।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আইরিশম্যান রবারের দস্তানা দেখে বলেছিল, খাসা ব্যবস্থা। দিব্য হাত ধোওয়া যায় জলে হাত না ভিজিয়ে।'

গুণী বললেন, 'আইরিশম্যানের "হেড-আপিসে" বিস্তর ঘিলু। এদের আণ্ডা সাইজের মাথাভর্তি ঠকঠকে ঘুঁটে। এদের বেশ-কিছু জোয়ান অনেকদিন ধরে এদেশে আছে কিন্তু কোনওপ্রকারের কৌতূহল নেই। শোনেননি বুঝি সেই কুট্টি রসিকতা? ওদিকে কখন যে গুলির ঘায়ে ঘায়েল হবে সে খেয়াল আছে ন সিকে, এদিকে কিন্তু মশকরা না করতে পারলে পেটের ভাত চালভাজা হয়ে যায়।... কুট্টির গণিভাই বাড়ি থেকে বেরুতে ভয় পাচ্ছে। মোগলাই কণ্ঠ বললে, পাঠানগো অত ডরাইস ক্যান— বুদ্দু, বুদ্দু, বেবাক গুলাইন বুদ্দু। হোন্ কথা। কাইল

www.pathagar.com

আমাগো আটকাইছে ইস্‌কাটনের ধারে। একেক জনরে জিগায়, নাম কিয়া হ্যায়? হিন্দু নাম অইলেই সর্বনাশ— তার লাইগ্যা সাক্ষাৎ কিয়ামৎ (মহাপ্রলয়)। পয়লা তারে দিয়া কবর খোরাইবো। তার বাদে একডা গুলি। যদি না মরে— বাবুগো হাতের নিশানা, হালা আইনুধারে তেলা হাতে বিল্লির নেঙ্গুর ধরার মতো— তো বন্দুকের কোন্দা দিয়া ঠ্যাঙাইয়া ঠ্যাঙাইয়া মারে, নাইলে হালা জিন্দা মানুষ কবরে পুত্যা দেয়।... আমার পিছে আছিল আমাগো মহল্লার বরজো। মনে মনে কই, ইয়াল্লা, এর তো কিয়ামৎ আইয়া গেল আইজই। আন্দিশা করলুম, দেহি, না, হালা, আমাগো পাঠান সম্বন্ধী কোন পয়লা নম্বরি পাক মুসলমান— হিন্দু মাইরা দাবরাইয়া বেরাইতাছে?— আমাকে যে ওক্তে জিগাইল "তুমারা নাম কিয়া হ্যায়?" আমি কইলাম— "কিয়ামৎ মির্জা" বুক চিতাইয়া! হোনো কথা— কিয়ামৎ বুঝি নাম অয়? কইল, "বোহৎ ঠিক হ্যায়। যাও!" তার বাদে আইল বরজো— বিবি শিরনির পাঁঠিটার মতোন কাঁপতে কাঁপতে। আমি তার চেহারার বাগে মুখ তুল্যা চাইতা পারলাম না। ক্যা নাম হ্যায়? আরে মুসলমান নাম কইলে কী হয়? না ডরের তাইশে আচম্বিতে কইয়া ফালাইছে ব্রজবিহারী বসাক। খান সায়েব খুশি অইয়া কইল, বিহারি হ্যায়? তো যাও, যাও। বাচ্যা গেল বরজো হালা। তারে কইলাম, আ মে বরজা, বিহারি হইয়া বাচ্চা গেল।...' গল্প শেষ করে গুণী বললেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদও আসে প্রদেশের নামে। সাঁজের ঝোঁকে মসজিদে ঢুকছে এক মোল্লাজি। পাশের পকেটটা বড্ড ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে বলে খানের মনে হল সন্দেহের উদয়। হাঁক ছেড়ে শুধোল, 'জেবমে ক্যা হ্যায়।' থতমত খেয়ে বললে, 'কুছ নহি হুজুর, একঠু পাঞ্জাবি হয়।' খান তো রেগে খান খান। 'কী! তোর এত গোস্তাকি! পাঞ্জাবের খানদানি একজন মনিষ্যিকে তুই পুরেছিস জেবে!' মসজিদের ইমাম তখন ছুটে এসে এক হ্যাঁচকা টানে বের করলেন পাঞ্জাবিটা। খানকে বললেন, 'হুজুর, আপনারা— পাঞ্জাবিরা— প্রথম আমাদের কুর্তা পরতে শিখিয়েছিলেন কি না, তাই আমরা সব কুর্তাকেই পাঞ্জাবি বলি— আপনাদের ফখরের তরে।'

গুণী বললেন, 'আপনি খবর নিন, জানতে পারবেন, শুধু যে পাঠানরা, পাঞ্জাবিরা, বেলুচরা এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানত না তা নয়, এদেরকে দিনের পর দিন শেখানো হয়েছিল, বাঙালিরা পাকিস্তানি নয়, এবং তার চেয়েও বড় কথা মুসলমান নয়। এরা হিন্দুদের জারজ সন্তান। এরা আল্লা-রসুল মানে না, নামাজ-রোজার ধার ধারে না—'

আমি বললুম, 'বা রে! এ আবার কী কথা! শুধু বললেই হল। পাঞ্জাবি-পাঠান কি মসজিদও চেনে না। গম্বুজ রয়েছে, মিনার রয়েছে, ভিতরে মিহরাব রয়েছে, বাইরে ওজু করার জন্য জলের ব্যবস্থা রয়েছে, জানি, ওদের দেশে বাংলার তুলনায় মসজিদ অনেক কম। তাই বলে মসজিদ চিনবে না।'

বললেন, 'মসজিদ চেনার কী বালাই ওরা শুনেছে, এককালে এগুলো মসজিদ ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ানদের পাল্লায় পড়ে ওসব জায়গায় এখন নামাজটামাজ আর পড়া হয় না। শুধু কী করে পাকিস্তান ধ্বংস করতে হবে তাই নিয়ে ইন্ডিয়ান এজেন্টদের সঙ্গে আলোচনা হয় ওইখানে। উত্তর বাংলার এক টাউনে এক প্রৌঢ়া মহিলা সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে বেরিয়েছেন তাঁর কিশোরী কন্যার সন্ধানে। পাড়ার মসজিদ পেরিয়ে কিছুটা যেতে না যেতেই— সামনে খান সেনা, জনা পাঁচেক! মহিলা পিছন ফিরে ছুটলেন বাড়ির দিকে। মসজিদের পাশ দিয়ে ছুটে

www.pathagar.com

যাবার সময় করলেন চিৎকার। মুসল্লিদের নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা ছুটে এল বাইরে। খান সেনাদের বাধা দেবার চেষ্টা করতেই তারা চালাল গুলি। কয়েকজন পড়ে গেল রাস্তার উপর। বাকিরা দৌড়ে ঢুকল মসজিদের ভিতর। না-পাকরা সেখানে ঢুকে সবাইকে খতম করল। ইমাম সাহেবও বাদ যাননি।'

আমি বললুম, 'আমার কাছে তো এসব কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকছে।'

গুণী বললেন, 'কিন্তু এত শত বজ্র-বাঁধন দিয়ে বাঁধা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরত।

গাঁ থেকে জোয়ান জোয়ান চাষাদের ধরে আনা হচ্ছে একসঙ্গে গুলি করে খতম করে না-পাকরা "গাজি" হবেন। একটি ছোকরাকে ধরে এনেছিল, সঠিক বলতে গেলে, প্রায় তার মায়ের আঁচল থেকে। সে কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করেনি। শুধু যখন তাকে না-পাকরা দাঁড় করাতে যাচ্ছে, গুলি করার জন্য, তখন ফিসফিস করে সেপাইটাকে বললে, আমার আম্মাকে বল, আমার রুহ্ (আত্মা)-র মগফিরাতের (সদ্‌গতির) জন্য দোয়া (প্রার্থনা) করতে।" রুহ্, মগফিরাত, (যেমন 'সাধনোচিত ধামে প্রস্থান') এগুলো প্রায় টেকনিকাল কথা, সব ধর্মেই থাকে। সেপাই 'আম্মা', 'রুহ্', 'দোয়া' কথাগুলো বুঝতে পেরে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সামনে অতিশয় পাষণ্ডও তো ঝুটমুট ঝুট কথা বলে তার পরকাল নষ্ট করতে চায় না। আবার জিগ্যেস করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে গেল অফিসারের সামনে। বললে, 'এ তো মুসলমান।' অফিসার সরকারি নির্দেশমতো ইসলামের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর তোতার বুলি কপচাবার পূর্বেই হই হই রব উঠেছে, 'মুক্তি (গ্রামের লোক 'মুক্তি-ফৌজ' 'মুক্তিবাহিনী' বলে না, বলে 'মুক্তি') এসে গেছে, মুক্তি এসেছে।' সঙ্গে সঙ্গে— 'ভাগো ভাগো' চিৎকার। আর ধনাধন একই সাথে সে কী সাম্যবাদ। আপিসরকে ধাক্কা মেরে জোয়ান দেয় ছুট, জোয়ানকে ঠেলা মারে অল্‌-বদর, তাদের ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে অশ্‌শম্‌স্। এস্থলে রণমুখো বাঙালি আর ঘর-মুখো সেপাই।

ছোঁড়াটাকে আখেরে অফিসার মুক্তি দিত কি না সে সমস্যার সমাধান হল না বটে কিন্তু সে যাত্রায় সে সুদ্ধ বেঁচে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন।

এ তো গেল মামুলি উদাহরণ।

আরেক জায়গায় না-পাকরা মেরেছে গাঁয়ের কয়েকজন মুরুব্বিকে। তার পর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য শেষ উপাসনা (জানাজা) করার সাহস কার? মৃতদেহগুলো সামনে রেখে সারি বেঁধে সে জানাজার নামাজ পড়তে হয়। খানেরা তৈরি, জড় মাল পটপট গুলি করে ঝটপট গাজি হয়ে যাবে। কিন্তু তবু জনাদশেক সার বেঁধে নামাজ আরম্ভ করে দিল।

পাঞ্জাবি, পাঠান, বেলুচে পাঁচ ওকতো দৈনন্দিন নিত্য নামাজের বড় একটা ধার ধারে না। চোদ্দ আনা পরিমাণ নামাজের সংক্ষিপ্ততম মন্ত্রও জানে না। বাঙালি মুসলমান ওদের তুলনায় কোটিগুণে ইনফিনিটি পার্সেন্ট আচারনিষ্ঠ। কিন্তু পাঠান-বেলুচ আর কিছু জানুক আর নাই জানুক, মৃতের জন্য শেষ উপাসনায় সে যাবেই যাবে। তার মন্ত্র জানুক আর না জানুক। ইহসংসারে সর্ব পাপকর্মে সে বিশ্বপাপীকে হার মানায়। তাই এই নামাজে তার শেষ ভরসা। নামাজিদের দোওয়ায় সে যদি প্রাণ প্রায়।

www.pathagar.com

গুলি করার আগেই তারা লক্ষ করল, এ নামাজ তো বড্ড চেনা লাগছে। এ নামাজ নিয়ে তো কেউ কখনও মশকরা করে না। জানের মায়া ত্যাগ করে যারা এ নামাজে এসেছে তারা তো নিশ্চয়ই মুসলমান। মৃতের জন্য মৃত্যুভয় ত্যাগ!

এরা সেদিন গুলি করেনি।

কিন্তু তাই বলে ওরা যে সেদিন থেকে প্রহ্লাদপালে পরিণত হল সেটা বিশ্বাস করার মতো অতখানি বুড়বক আমি নই। এটা নিতান্তই রাঙা শুক্কুরবারের, ওয়ান্‌স্ ইন এ ব্লু মুনের ব্যত্যয়।

লুটতরাজ খুন-খারাপির সময় কে হিন্দু কেবা মুসলমান!

কাশ্মিরে ঢোকার পূর্বেই তো পাঠানরা আপন দেশে লুটতরাজ করেছে। আর কাশ্মিরের মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের তো কথাই নেই। ওদিকে লেট জিন্নাহ্ তো ওদের দিব্যি দিলিশা দিয়েছিলেন, কসমফতোয়া ঝেড়েছিলেন— পাঠানরাই দুনিয়ার সবচেয়ে বঢ়হিয়া মুসলমান, তাদের ওপরই পড়ল নিরীহ কাশ্মিরিদের জান-মান বাঁচাবার দায়িত্ব। আমেন! আমেন!!

৩

মার্চ থেকে ডিসেম্বরের কাহিনী এমনই অবিশ্বাস্য, এমনই অভূতপূর্ব যে সে কালটা বুঝতে গেলে তার পূর্বেকার ইতিহাস পড়ে খুব একটা লাভ হয় না। কারণ এটা তো এমন নয় যে তার পূর্বে দু বছর হোক পাঁচ বছর হোক বেশ কিছু কাল ধরে পূর্ব বাংলায় মোতায়েন পাঞ্জাবি-পাঠান পাক সেনা আর সে-দেশবাসী বাঙালিতে আজ এখানে কাল সেখানে হাতাহাতি মারামারি করছিল এবং একদিন সেটা চরমে পৌঁছে যাওয়াতে এক বিরাট বিকট নরহত্যা নারীধর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। বস্তুত যে দু তিন হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশে বাস করত তাদের সঙ্গে কখনও কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল বলে শুনিনি। আমি এদেশে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে একবার 'পূর্ব পাকিস্তান' দেখতে আসি এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৭০ অবধি পারিবারিক কারণে প্রতি বৎসর দু একবার এসেছি এবং প্রতিবারই একটানা কয়েক মাস কাটিয়ে গিয়েছি। আমার গুষ্টিকুটুমে তাবৎ বাংলাদেশ ভর্তি। তাই রাজশাহী থেকে চাটগাঁ-কাপ্তাই, সিলেট থেকে খুলনা অবধি মাকু মেরেছি। মাত্র একবার দু জন পশ্চিম পাকিস্তানি জোয়ানকে রাজশাহীতে পদ্মার একটা খাড়ির পারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি— অতি অবশ্য পাড় থেকে হাত দশেক দূরে জল থেকে খুব সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে; একটি কিশোর সেখানে জলে ডুবে মরেছে শুনে সে 'তামাশা' দেখতে এসেছিল।

আরেকবার ট্রেনে ঢাকা থেকে মৈমনসিং যাবার সময় ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে দু জন সুবেদার উঠেছিল। তার একজন মৈমনসিংহ-এর লোক, অন্যজন বেলুচ। এটা ১৯৬৬ সালের কথা। মৈমনসিংহি আর পাঁচজনের সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিল এবং স্বভাবতই '৬৫-র যুদ্ধের কথা উঠল। 'বাঙালরা' তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কীরকম জোর লড়াই দিয়েছিল সে কাহিনী সে যেমন-যেমন দফে দফে বলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেলুচ 'ঠিক বাত, বিলকুল সহি বাত' 'ম্যায় ভি তো থা, ম্যায় নে ভি দেখা' মন্তব্য করে। এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, ওই যুদ্ধে বাঙালি রেজিমেন্টই আর সব রেজিমেন্টের চেয়ে বেশি মেডল ডেকরেশন পায়। এবং

www.pathagar.com

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করি, ১৯৭১-এর গরমিকালে রাজশাহীতে বেলুচ জোয়ানদের এক বাঙালি প্রসেশনের উপর গুলি চালাবার হুকুম হলে অগ্রবর্তী জোয়ানরা শূন্যে গুলি মারে, আর জনতাকে বার বার বলতে থাকে, 'ভাগো, ভাগো।'... সে যাত্রায় বিস্তর লোক বেঁচে গিয়েছিল।

মোদ্দা কথা সেপাইদের সঙ্গে এদেশবাসীর কোনও যোগসূত্র ছিল না। কোনও প্রকারের মনোমালিন্যও ছিল না। সেটা হয়েছিল মার্চ মাসের গোড়ার দিকে— সে কাহিনী যথাস্থানে হবে।

আর আর্মি অফিসারদের তো কথাই নেই। যে সামান্য কজন আপন মিলিটারি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এদের সিভিলিয়ান অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তারা ছিলেন ভদ্র, খামোখা গায়ের জোরে যেখানে কমন ল্যাঙুজ ইংরেজিতে কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে 'উর্দু ভাষা চালিয়ে উঁচু ঘোড়া চড়তে যেতেন না।'

অভদ্র ইতর ছিল পাঞ্জাবিরা এবং তৎসঙ্গে যোগ করতে হয় দম্ভ, অহংকার, গায়ে পড়ে অপমান করার প্রবৃত্তি। বেহারিদের— এরা অসামরিক। ভাবখানা, এনারা খানদানি মনিষ্যি, কুরানশরিফের আরবি, রুমি-হাফিজের ভাষা ফার্সি এগুলোকে প্রায় ছাড়িয়ে যায় তেনাদের নিকষ্যি কুলীন উর্দু ভাষা। পাটনা, বেহারে এনাদের অন্য রূপ! ঢাকাতে একদা এক বাঙালির ড্রইংরুমে যখন উর্দু নিয়ে এনাদের এক প্যাকম্বর বড্ড বেশি বড়ফাট্টাই করতে করতে থামতেই চান না তখন আমি তাঁর নভলোকে উড্ডীয়মান বেলুনটিকে চুবসে দেবার জন্য মাত্রাধিক মোলায়েম কণ্ঠে শুধুলুম, 'আচ্ছা আপনার সঠিক মাতৃভাষাটি কী? ভোজপুরি মৈথিলি না নগ্‌হই?' আর যাবে কোথায়? ছাতুখোর তো ফায়ার! হাজার দুই ফারেনহাইট।... উপস্থিত সেটা থাক।

তাই পঁচিশের 'পিচেশিমির' পয়লা নম্বরি মদ্দি ছিলেন এঁরাই। অল-বদর, অশ-শমস এবং প্রধানত রাজাকরদের সম্মানিত সভ্য ছিল এরাই। পঁচিশের পিচেশিমির পটভূমি অধ্যয়ন করলে মাত্র এইটুকু আমাদের কাজে লাগে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এহ বাহ্য। কারণ গণনিধনের প্রধান পাণ্ডা-পুরুত না-পাক সেনা এবং ইসলামবাদ-নশিন ফৌজি জাঁদরেলরা।[১] এঁরা যদি পুরো মিলিটারি তাগদ খাটিয়ে নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের কচু-কাটা (কৎল-ই-আম) কর্মে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করতেন তবে এ দেশের নুন নেমক খেয়ো পোস্টাইপেট জারজ বিহারিদের (আমি বিহার বাসিন্দা, বিহারি বা কলকাতাবাসী বিহারিদের কথা আদৌ ভাবছি না, এবং বাংলার বিহারিদের ভিতরও যে আদৌ কোনও ভদ্রসন্তান ছিলেন না সেকথা বলছিনে) কী সাধ্য ছিল বাংলাদেশীর সঙ্গে মোকাবেলা করে!

এটা নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে, যে জোয়ান, যে অপিসারদের সঙ্গে বঙ্গজনের কোনও দুশমনি ছিল না তারাই নাচল তাণ্ডব নৃত্য, বেহারিরা শুধু বাজাল শিঙে। বেঙ্গল অর্ডিনেনস বঙ্গদেশের ওপর চাপানোর সময় রবীন্দ্রনাথ শিখেছিলেন :

'হিমালয়ের যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।

১. এঁদের নাম টুকে রাখলে পশ্চিমবঙ্গীয় পাঠক রেসকোর্সে না গিয়ে, রক-এ বসেই বাজি খেলতে পারবেন শ্রীযুত ভুট্টোর পর কোন বাজিরাজ পাকিস্তানের গদিতে সোওয়ার হবেন— বাংলাদেশে এঁদের নাম ডাল-ভাত, থুড়ি!— ছাইভস্ম। লেফ-জেনারেল পিরজাদা হামিদ খান টিক্কা খান (এর গৌরবার্জিত খেতাব 'বমর অব বেলুচিস্তান'), ('বুচর অব বেঙ্গল) মেজর জেনারেল আকবর খান, মেজর জেনারেল উমর খান, লেফ-জেনারেল গুল হাসান।

www.pathagar.com

এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা!
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে।'

এই অগ্নিগর্ভ মৃত্যুঞ্জয় কবিতাটি থেকে এ প্রবন্ধে আরও উদ্ধৃতি দিতে হবে। কিন্তু এটি এতই অনাদৃত যে আমি— অভিমানভরে তার নির্দেশ দিই না। রচনাবলি থেকে খুলে বের করুন।

পটভূমি নির্মাণের জন্য একাধিক চিন্তাশীল লেখক অন্যান্য কারণ দেখান। সেগুলো একটা জাত একটা দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, এমনকি ক্ষেপিয়ে তুলতেও যথেষ্ট। প্রত্যুত্তরে দমননীতি বরণ করে শোষকরা। এমনতরো কাণ্ড তো বার বার সহস্রবার হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে পিচেশিমির যে উলঙ্গনৃত্য হল তার হদিস তো বড় একটা পাওয়া যায় না— আমি কোথাও পাইনি। মাত্র একবার একজন একটা প্ল্যান করেছিলেন যার সঙ্গে ইয়েহিয়ার প্ল্যান মিলে যায় কিন্তু সেই পূর্বসূরিও সেটা কার্যে পরিণত করার জন্য এতখানি পিচেশিমি করার মতো বুক বাঁধতে পারেননি। কিন্তু সে প্ল্যান এ ভূমিকার অঙ্গ নয়। সেটা ঘটনাবলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে এমনই অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত যে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে এস্থলে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করার মতো শক্তি আমার নেই— সহিষ্ণুতম পাঠক পর্যন্ত বিরক্ত হবেন। সেটি যথাস্থলে নিবেদন করব।

পূর্ব বাঙলাকে পশ্চিম পাকের একুশটি কোটিপতি পরিবার কী মারাত্মকভাবে শোষণ করেছে সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দু জন লোক অসীম সাহস দেখিয়ে আইয়ুব-ইয়েহিয়ার আমলেই সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করে যেসব রচনা প্রকাশ করেন সেগুলো পড়ে আমার মনে ভয় জেগেছিল এঁদের ধরে ধরে না ইয়েহিয়ার চেলা-চামুণ্ডারা ফাঁসি দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁদের প্রকৃত মূল্য উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলে ভণ্ড ইয়েহিয়া যখন আলাপ-আলোচনার নাম করে— আসলে টিক্কা খান যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও না-পাক সেনা ঢাকায় আনতে পারার ফুরসত পায়— মার্চের মাঝামাঝি ঢাকা আসেন, তখন বঙ্গবন্ধু জনাব তাজউদ্দীনের সঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সুব্হান ও ড. কামাল হুসেনকে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

এই ভণ্ডামির চমৎকার বয়ান বহুল প্রচারিত একখানি জর্মন সাপ্তাহিক নির্ভয়ে প্রকাশ করে। 'নির্ভয়ে' এই কারণে বললুম, এই প্রবন্ধের জন্য যে জর্মন লেখক জিম্মাদার তার নাম, ইসলামাবাদে তার বাসস্থান, ফোন নম্বর ইত্যাদি সবই ভালোভাবে দেওয়া ছিল। ভাবখানা অনেকটা এই : 'ওহে হেইয়া খান। আমার মতে, তুমি রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যে ভণ্ডামির ভেল্কিবাজিটি দেখালে তার হাঁড়িটি আমি হাটের মধ্যিখানে ফাটালুম। যে ভণ্ডামিটি তুমি করলে সেটা কোনও কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতও ইজ্জতের ভয়ে করত না— কারণ দু-দিন বাদেই তো ভণ্ডামিটা ধরা পড়ে যেত। আর কেউ না হোক, আমি তো বাপু এ ব্র্যান্ডের ফক্কিকারি বিলক্ষণ চিনি। মাত্র আরেকজন রাষ্ট্রপ্রধান এ ধরনের ত্যাঁদড়ামি করতেন তিনি আমারই দ্যাশের লোক— নাম তার হিটলার। তা অত সব ধানাই-পানাই ক্যান? করো না আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা, না হয় তাড়িয়ে দাও আমাকে তোমার সাতিশয় পাক মুল্লুক থেকে। হই হই পড়ে যাবে দুনিয়ার সর্বত্র। দেখি, তোমার কতখানি মুরদ!'

www.pathagar.com

'অতি অবশ্য ভারিক্কি ওজনের ইয়েহিয়া অনভ্যাসের (ফোঁটা) অসামরিক ড্রেস পরে উড়োজাহাজে করে পৌঁছলেন পুব-দেশের রাজধানী ঢাকায় (সে আরেক মিনি ধাপ্পা; ভাবখানা, আমি মিলিটারি ডিকটেটর নই, আমি সাদামাটা নাগরিক মাত্র।)— শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য, ওই আসাটাই ছিল দীর্ঘসূত্রতার কৌশল। পূর্ব প্রদেশ কেটে পড়তে চায়; তাকে তখনকার মতো কোনও গতিকে ঠেকিয়ে পরে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা।

'কারণ, পাঠান জাঁদরেল (ইয়েহিয়া পাঠান নন। তিনি জাতে কিজিলবাশ্ এবং সুন্নিবৈরী শিয়া সম্প্রদায়ের লোক[২] কিন্তু তিনি পাঠানদের ভাষা পশতু অনর্গল বলতে পারেন বলে অতি অল্প লোকেই জানেন যে, তিনি পাঠান নন— অনুবাদক) যে কটা দিন জেনেশুনে তিনি হাবিজাবি এ-প্যারাগ্রাফ ও-প্যারাগ্রাফ নিয়ে বাংলার জননেতার সঙ্গে বেকার আলোচনা চালাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে বেসামরিক 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনালের' উড়োজাহাজ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বাংলাদেশে নিয়ে আসছিল উচ্চদেহ বাছাই বাছাই যুবক— পরনে একদম একই ধরনের বেসামরিক বেশ।'

(এদের ভুয়ো পাসপোর্টও দেওয়া হয়েছিল; কারণ সিংহলে উড়োজাহাজে তেল নেবার সময় পালের পর পাল জঙ্গি-ইউনিফর্ম পরা সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে দেখলে সিংহল কর্তৃপক্ষ 'যুদ্ধের প্রস্তুতি' বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু না-পাক জাঁদরেলদের আজব হস্তীবুদ্ধি দেখে তাজ্জব মানতে হয়! সক্কলেরই একই কাপড়ের একই কাটের একই জামা-জোড়া যদি হয় তবে সেটাও তো একটা ইউনিফর্ম। হোক না সে সিভিল। বস্তুত যে ঢাকার লোককে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করা হয় তারা— 'খানদানি' উর্দু ভাষায়— ফৌরনকে পাঁচ মিনিট পহলে অর্থাৎ তদ্দণ্ডেই বিলক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে যায় এসব ভেড়ার-ছাল-পরা নেকড়ের পাল)।

শেখ সাহেব চাণক্য মাকিয়াভেল্লির স্কুলে-পড়া কূটনৈতিক নন। কিন্তু গাঁয়ের লোক— ক-সের ধানে ক-সের চাল হয় অন্তত সে হিসাবটুকু তাঁর আছে। পাঞ্জাবি পাঠানদের এই হাতি-মার্কা স্থূল প্যাঁচটি বোঝবার জন্য তাঁকে মার্কিন কমপ্যুটারের শরণ নিতে হয়নি। কিন্তু

---

২. পাকিস্তানের সৌভাগ্য বলুন, দুর্ভাগ্যই বলুন, তার জন্মদাতা মরহুম জিন্না শিয়া, ইসকন্দর মির্জা ও ইয়েহিয়াও শিয়া। ইসকন্দর মির্জা ও ইয়েহিয়া পীরিত করতেন শিয়া ইরানের সঙ্গে এবং তাচ্ছিল্য করতেন সুন্নি আফগানিস্তানকে। ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে যখন পশ্চিম পাকবাসী জেনে গেল, পুব পাক যায়-যায়, তখন ইয়েহিয়ার চরিত্র-দোষ, কুলদোষ এসবের সন্ধান অকস্মাৎ আরম্ভ হল। তখন— যদিও ইয়েহিয়া কখনও সেটা গোপন করেনি— সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'ব্যাটা ইয়েহিয়া শিয়া। তাই— আমাদের আজ এই দুর্গতি।' সে 'পাপ' স্খালনের জন্য তিনি এক শুক্কুরবারে 'জাতধর্ম' খুইয়ে সুন্নিদের মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাজ পড়লেন। এ যেন কোনও পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব রক্ষাকালীর মন্দিরে পাঁঠা বলি দিলেন! কিন্তু হায়, সবাই জানেন জাত গেল, পেটও ভরল না।...ভুট্টো সুন্নি, তাই তিনি 'ক্ষুদে হিটলার দি থার্ড' হয়েই ছুটলেন সুন্নি কাবুল বাগে।

পাকিস্তানের ফরেন পলিটিকস অধ্যায়ে এর সবিস্তার বয়ান দেব। এই শিয়া, সুন্নি, কাদিয়ানি (স্যর জফরুল্লা কাদিয়ানি এবং সাধারণ কাদিয়ানিজন সুন্নি-শিয়া উভয়কে কাফির বিবেচনা করে) বোরা, খোজা, মেমনদের মতবাদ সম্বন্ধে কি দিশি কি বিদেশি সর্ব রিপোর্টার উদাসীন। এ যেন আইয়ার, আয়েঙ্গার, ব্রামিন, ননব্রামিন সম্বন্ধে খবর না নিয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি আলোচনা করা।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর দিকটা সাফসুৎরো রাখতে চেয়েছিলেন; ঘরে বাইরে কেউ যেন পরে না বলে তিনি অভিমানভরে গোসাঘরে খিল দিয়েছিলেন।

তাই তিনি দুই অর্থশাস্ত্রবিশারদ সুবহান, কামালকে তাজউদ্দীনের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁদের কাজটি খুব কঠিন ছিল না। কারণ 'ক্ষুদে হিটলার দি সেকেন্ড' হওয়ার কয়েক মাস পরেই ইয়েহিয়া সর্বজন সমক্ষে (বেতার ও টেলিতে) দরদি গলায় স্বীকার করেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানিদের অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। রাষ্ট্রের যে উচ্চ পর্যায়ে মীমাংসা গ্রহণ করা হয় এবং আরও কতকগুলি জাতীয় কার্যকলাপে তাদের পুরো সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি।' এখন তা হলে দাঁড়াল এঁরা পিণ্ডির চেলাচামুণ্ডাদের হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে দফে দফে বোঝাবেন শিল্পে-বাণিজ্যে সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরও কী মারাত্মকরকম পঙ্গু হয়ে আছে।

কী কথাবার্তা হয়েছিল, বস্তুত তাঁরা আদৌ সে সুযোগ পেয়েছিলেন কি না, জানিনে। তবে আজ আমি এ প্রসঙ্গ তুলছি কেন?

হ্যাঁ, আজই তুলছি। আজ জষ্টি মাসের পয়লা তারিখ আপনি যান ঢাকার নিউ মার্কেটে। সেখানে জলজ্যান্ত পষ্ট দেখতে পাবেন এই দুই পণ্ডিতের গভীর গবেষণা কীভাবে জলজ্যান্ত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। শুনেছি, বিলেতের কোন এক কোম্পানি ছুঁচ থেকে আরম্ভ করে হাতি পর্যন্ত বিক্রি করে। এখানে করে না। একদা করত। আজ কোনওকিছু চাইলেই সে এক পেটেন্ট উত্তর 'পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি হত : এখন আর আসছে না।' বিশ্বাস করবেন পকেট সংস্করণ শোভন 'গীতাঞ্জলি' হাতে নিয়ে বললুম ইটি একটু ধুলোমাখা। তাজা হলে ভালো হয়। বলল এই শেষ কপি; লাহোরে ছাপা, আর আসবে না।' পাঁচমেশালির দোকানেও 'নেই, নেই' শুনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আরে মিঞা মধু— মধু চাইছি। সে তো আসত সোঁদর বন থেকে, বোতলে পোরা হত ঢাকায়... লালবাগ না কোথায় যেন?' কাঁচুমাচু উত্তর, 'জি, ঠিক বলেছেন। তবে না, কারখানার মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। তিনি হাওয়া। দোকানে তালা পড়েছে।' মনে মনে কাষ্ঠহাসি হেসে বললুম, পাট তো এদেশের ডাল ভাত। মশকরা করে এক গাঁট পাট চাইলে হয়তো বলবে, 'জী আদমজি দাউদ মিলের কর্তা তো ভাগ গিয়া;' গুদোম বন্ধ।'

শেষটায় খাস ঢাকায় তৈরি ঢাকাই মালিকানায়— কী পেলুম জানেন? ওটার আমার দরকার ছিল না। মার্কিং ইনক্। লনড্রিতে যে কালি দিয়ে কাপড়ে নম্বর লেখে। এদেশের ধোপানি যেটা আপন কুঁড়েঘরে বানায়। প্যোর কটিজ ইনডাসট্রি!

কান্না পেল।

হ্যাঁ, একদা এরাই দুনিয়ার সেরা মসলিন— যার তরে দুনিয়ার সবচেয়ে ডাঙর বাদশা— চীনের বাদশা এদেশে রাজদূত পাঠিয়েছিলেন!

৪

গোড়াতেই সরল সাধুতা ও সহজ ভাষায় পুনরায় স্বীকার করে নিই, বাংলাদেশের অনবিস্মরণীয় ন মাসের ইতিহাস লেখার মতো পাণ্ডিত্য, তথ্যানুসন্ধান করার মতো শক্তি, দূর তথা গভীর

www.pathagar.com

দৃষ্টিনিক্ষেপজনিত দার্শনিক বিজ্ঞতা আমার নেই। বস্তুত এদেশের স্কুলবয় পর্যন্ত হেন কর্ম করার মতো দুরাকাঙ্ক্ষী জনকে বলে দিতে পারবে, দিনাজপুর থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে রবিশাল জুড়ে ন মাস ধরে যে ভূতের নৃত্য হয়ে গিয়েছে তার সাক্ষ্যস্বরূপ মানুষের মনে, মাটির উপর-নিচে যেসব সরঞ্জাম-নিদর্শন সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলো আংশিকভাবে সংগ্রহ করাও কঠিন কর্ম। গুণীজন বলবেন, করতে পারলেও অতঃপর শিখাগ্রে আরোহণ করে তার প্রতি সিংহাবলোকন[১] নিক্ষেপ দ্বারা সেগুলো আপনার অন্তরে সংহরণ করে তার প্রতি ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক সুবিচার করা অসম্ভব— উপস্থিত। বলা বাহুল্য আমা দ্বারা কস্মিনকালেও এহেন কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। শতায়ু হলে না সহস্রায়ু হলেও না। তবু কেন যে যে-টুকু পারি লিখছি সেটা ধীরে ধীরে স্বপ্রকাশ হবে। উপস্থিত পাঠকের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এ বয়ান থেকে কেউ যেন প্রামাণিকতা প্রত্যাশা না করেন। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শুনেছি। খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকার কথা। সাজানো মিথ্যা সাক্ষ্যের বেলাতেই খুঁটিনাটিতেও কোনও হেরফের থাকে না। সত্য সাক্ষ্যে মূল ঘটনাতে নড়চড় হয় না; ডিটেলে বেশকিছুটা থাকবেই। এছাড়া যেসব কাহিনী-কেচ্ছা মুখে মুখে এখনও বিচরণ করছে তার অনেকগুলিই কবিজনের কল্পনাবিলাস বা আকাশকুসুম। কিন্তু তারও মূল্য আছে। ব্রজবিহারীকে সত্য সত্যই বিহারবাসী মনে করে রামপাঁঠা পাঠান ছেড়ে দিয়েছিল কি না তাতে বিন্দুমাত্র আসে-যায় না— আসল তত্ত্বকথা এই : গল্পটা ক্যারেক্‌টারিস্টিক কি না, অর্থাৎ গল্পটাতে পাঠান ক্যারেকটারের নির্যাস, তার রাম পণ্টকামি ফুটে উঠেছে কি না। কাঠবেরালি সত্য সত্যই সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে সেতুবন্ধের উপর সে-ধুলো ঝেড়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল কি না সেটা বিলকুল অবান্তর। গল্পটা বোঝাতে চায়, রাবণের ডিকটেটেরির বিরুদ্ধে তখন জনসাধারণ কী রকম উঠেপড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অবশ্য সেটা যদি সত্য হয় তবে তো প্ল্যাটিনামে ডায়মন্ড! নিয়াজির কোলে ফরমান আলী, পিছনে দাঁড়িয়ে পাখা দোলাচ্ছেন, যশোবন্ত শ্রীমান গভর্নর ড. (?) মালিক!

১৯৬৯ সালের ২৫/২৬ মার্চ সকালবেলা পূর্ব পশ্চিম উত্তর পাকিস্তানের জনসাধারণ শুনতে পেল 'ছোট হিটলার ডিনেস্টির' পয়লা চোট্টা-ওয়ালা হিটলার স্বপ্রশংসিত স্বনির্বাচিত উপাধি

---

১. গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে যেখানে ফুটনোট অবর্জনীয় সে স্থলেও ওই প্রতিষ্ঠানটি আকছারই পীড়াদায়ক। আমার আটপৌরে হাবিজাবির বেলা তো কথাই নেই। তাই সরল পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি আমার রচনার ফুটনোট না পড়লে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না— (আসল না পড়লেও হবেন কি না সেটাও বিতর্কাতীত নয়)। আসলে ফুটনোটে এমন কিছু থাকা অনুচিত যেটা না পড়লে পরের মূল লেখা বুঝতে অসুবিধা হয়। অবশ্য মূলে (টেকসটে) কোনও তারাচিহ্ন দেখে যদি পাঠকের মনে হয় ওই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আশকথা-পাশকথা শুনতে চান তবে সেটি সাধু প্রস্তাব। কিংবা আপনি রোক্কা একটি টাকা খরচা করেছেন বলে পত্রিকার বিজ্ঞাপন তক বাদ দিতে চান না তবে সেটা সাধুতর প্রস্তাব। কিন্তু পুনরপি হা— ফি— জ! ফুটনোট পড়ার বাধ্যবাধকতা নেই।
'সার্ভে' শব্দের গুজরাতি অনুবাদ 'সিংহাবলোকন'। সিংহ যেরকম পাহাড়ের উপরে উঠে মাথা এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সবকিছু দেখে নেয়। শব্দটি পর্যবেক্ষণজাত এবং সুন্দরও বটে, বাঙলায় চালু হলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

'ফিল্ড মার্শাল' বিভূষিত, পৃথিবীর অন্যতম কোটিপতি, মার্কিন প্রেসিডেন্টের দোস্ত, মহামহিম শ্রীযুত আইয়ুব খানের পশ্চাদ্দেশে একখানি সরেস পদাঘাত দিয়ে জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়েহিয়া খান সুবে পাকিস্তানের চোটা হিটলার দি সেকেন্ড রূপে গদি-নশিন হয়েছেন। কিন্তু বিসমিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)। 'আগা' উপাধি সচরাচর ধারণ করেন ইরানবাসী শিয়ারা— 'খান' উপাধিধারী হয় সুন্নি পাঠানেরা। এ যেন সোনার পাথরবাটি। কিন্তু 'খান' অনেক সময় সম্মানার্থে সকলের নামের পিছনেই জুড়ে দেওয়া হয়— কাবুলে আমার এক জনপ্রিয় সখা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নামের পিছনে কাবুলিরা খান জুড়ে দিত। সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। এই সোনার বাংলাতেই 'পশুপতি খান' গয়রহ্ আছেন।

আইয়ুবের পতনে পূর্ব বাংলায় যে মহরমের চোখের পানি ঝরেনি সেটা বলা বাহুল্য। একে তো তিনি আহাম্মুখের মতো কতকগুলি মিলিটারি ইডিয়টের পাল্লায় পড়ে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে একটা সম্পূর্ণ মনগড়া ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করার হুকুম দেন, তদুপরি বিশ্বাসভাজন এক মার্কিন পত্রিকা হাটের মধ্যিখানে একটি প্রকাণ্ড বিষ্ঠাভাণ্ড ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাশ করে দেয় যে মাত্র সাত বছর রাজত্বকালের মধ্যেই (১৯৬৫) তিনি কুল্লে পঁচিশ কোটি টাকার ধনদৌলত, ইতালির একটা দ্বীপে বিশাল জমিদারি (ওই অঞ্চলে ট্যুরিজম-এর জন্য ইতালীয় সরকারের বিস্তর কড়ি ঢালার মতলব ছিল যার ফলে ধূলি-মুষ্টি রেডিয়াম-মুষ্টিতে পরিণত হত) সাপটে নিয়েছেন আর ইওরো-মার্কিন ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে কত ডলার পাউন্ড, সুইস ফ্রাঁ জমা আছে তার হিসাব বের করা অসম্ভব। কোনও কোনও দেশের ব্যাঙ্ক সে-দেশের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ, অর্থাৎ স্বয়ং সার্বভৌম সরকার জানতে চাইলেও ঠোঁট সেলাই করে বসে থাকে।... ইয়েহিয়া রাজা হয়ে আইয়ুবের দৌলতের খোঁজে বেরিয়েছিলেন বলে কোনও খবর অন্তত আমি পাইনি। এটা পশ্চিম পাকের একটা সাদা-কালিতে লেখা আইন; ইসকন্দর মির্জাকে গদিচ্যুত করার পর আইয়ুব তাঁর ধনদৌলতের সন্ধান নেননি। ইয়েহিয়াও আইয়ুবের হাঁড়ির চাল হাঁড়িতেই রাখতে দিলেন। শুধু তাই নয়। আগাপাশতলা হাতের কব্জায় পোরা পাকিস্তানি প্রেসকে জবানি হুকুম দেওয়া হল, আইয়ুব খানের খেলাপে যেন উচ্চবাচ্য না করা হয়। ইনি মিলিটারির জাঁদরেল, উনিও মিলিটারি জাঁদরেল— কাকে কাকের মাংস খায় না— বাংলা কথা।

ইয়েহিয়া জাতে কিজিলবাশ। তিনি দাবি ধরেন, তিনি নাদিরের বংশধর। ওই নিয়ে গবেষণা করার মতো দলিল-দস্তাবেজ আমার নেই। তাঁর আদত পিতৃভূমি নাকি নাদিরের দেশে! ভুট্টোর বাস্তুভিটে লারখানাতে। তার অতি কাছে মোন-জো-দড়ো।[২] তিনি যদি আজ দুম করে দাবি জানান মোন-জো দড়োতে গলকম্বল দাড়িওলা যে রাজপানা চেহারার মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তিনি তাঁর বংশধর, তবে ওই মোন-জো দড়োর আবিষ্কর্তা স্বয়ং রাখালদাস বাঁড়ুয্যে কি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে বুক ঠুকে প্রমাণ করতে পারবেন তিনি আর পাঁচটা সিন্ধির মতো সাড়ে বত্রিশ ভাজার বর্ণসঙ্কর।

---

২. টীকা-পাঠ-নীতি উপেক্ষা করে যাঁরা এটি পড়ছেন তাঁদের জানাই, শব্দটা এমনি ভিন্ন ভিন্ন বিদকুটে ঢঙে উচ্চারিত হয় যে তার শুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। সিন্ধি ভাষায় 'মো'='মৃত' (সংস্কৃত 'মৃ' বাংলা 'মৃত') 'মোন'-এর 'ন' বহুবচন বোঝায়। 'জা'= '—দের' (S)। 'দড়ো'='টিলা'। একুনে 'মৃতদের টিলা'। এক অত্যুৎসাহী সংস্কৃতজ্ঞ এটা লিখেছেন 'মহেন্দ্রদ্বার' ॥

www.pathagar.com

কিন্তু কিজিলবাশ শব্দটি বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন, রাজা বসে আছেন; তাঁর চতুর্দিকে কিজিলবাশ। টীকাকার ভেবেছেন 'কিজিল' কথাটা 'কাজল' হবে— লিপিকারের ভুল। আর 'বাস' মানে তো 'কাপড়'। কালো পর্দার মাঝখানে রাজা বসে আছেন। আসলে কিজিল-বাশ মানে লাল টুপি (আমি যদ্দূর জানি, চুগতাই তুর্কি ভাষায়)। কিজিল-বাশরা লাল টুপি পরত এবং ভারতবর্ষে প্রধানত দেহরক্ষী বা দরোয়ানের কাজ করত। আজ আমরা যেরকম ভোজপুরি বা নেপালি দরওয়ান রাখি, বিদেশি বলে এ দেশের চোর-চোট্টারা চট করে এদের সঙ্গে দোস্তি জমাতে পারবে না বলে। কিজিল-বাশরা শিয়া। এ দেশের সুন্নিদের ঘেন্না করে। ষড়যন্ত্রকারী বা চোর-চোট্টাদের পাত্তা দেবে না।

ইয়েহিয়া বাপ-পিতেম-র ব্যবসাটি ডোবালেন। পাকিস্তানের রক্ষক ভক্ষক হলেন। বদহজমি হল। কবরেজ ভুট্টো তাকে প্যাঁজ পয়জারের জোলাপ বড়ি দিলেন ঠেসে। ইয়েহিয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র বয়ান একটু পরে আসছে।

ইয়েহিয়া অবতীর্ণ হলেন মূর্তিমান কল্কিরূপে। একহস্তে গণতন্ত্র অন্যহস্তে পুব বাংলার প্রতি বরাভয় মুদ্রা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তিনি স্বীকার করলেন, পুব বাংলার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। যেসব মিলিটারি পিচেশ তাঁকে গদিতে বসিয়েছিল তারা ঘেন্নার সুরে বললে, 'বটে'!

বহু লোকের বিশ্বাস ইয়েহিয়া সেপাই; সেপাই মাত্রই বুদ্ধু হয়, অন্তত সরল তো বটে। তদুপরি তিনি মদ্যপান করেন প্রচুরতম। একবার নাকি সন্ধ্যাবেলা তার একটা বেতার ভাষণ দেবার কথা ছিল। ইংরেজ বলে, গড্ মেড্ সিক্স ও ক্লক ফর হুইস্কি। সে সিক্স সন্ধ্যার ছটা। ইয়েহিয়া ঘুলিয়ে ফেলে সেটা সকাল ছটায় সরিয়ে এনেছেন। তদুপরি তখন বাস করেন পাঞ্জাবে এবং পঞ্চনদভূমি যে পঞ্চম-কারের পীঠস্থল সেকথা ক্রমে ক্রমে ঢাকা চাটগাঁর ধর্মভীরু মুসলমান পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল ক্লাবে ক্লাবে পাঞ্জাবি সিভিলিয়ান অফিসারদের মেয়েমদ্দে হইহই বেলেল্লাপনা করা দেখে। বিস্ময় মেনে একে অন্যকে শুধিয়েছে 'এরাও মুসলমান?' সেকথা উপস্থিত থাক। সাঁঝের ঝোঁকে ইয়েহিয়ার বেতার ভাষণ দেবার কথা। কিন্তু তিনি তখন এমনই বে-এক্তেয়ার যে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুলতবি করা হল ঘণ্টা দুয়েকের তরে। তখনও অবস্থা তদবৎ। শেষটায় রাত দশটা না বারোটায়, বার দুই মুলতবি রাখার পর— আমি সঠিক জানিনে— মাই-ডিয়ার-মাই-ডিয়ার জড়ানো গলায় তিনি লিখিত ভাষণের পঠন কর্মটি সমাধান করে পাক বেতার কর্তৃপক্ষকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করলেন।

অথচ লোকটা অতিশয় ঘড়েল, কুচক্রী, বিবেকহীন এবং পাশবিকতম অত্যাচারের ব্যবস্থা করাতে অদ্বিতীয়। আমি ভেবে-চিন্তেই 'অদ্বিতীয়' বললুম। একাধিক ফ্রয়েডিয়ান ঐতিহাসিকের মুখে আমি শুনেছি— আর নিজে তো পড়েছি ভূরি ভূরি— তাঁদের জানা মতে, কিংবদন্তীর ওপর বরাত না দিয়ে, কেবলমাত্র প্রামাণিক ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে বলতে গেলে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় হাইনরিষ হিমলার অদ্বিতীয়। ১৯৭১-এর পর এঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, এখন তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন ইয়েহিয়ার তুলনায় হিমলার দুগ্ধপোষ্য— শিশু— শিশু— শিশু।

www.pathagar.com

কারণ হিমলারের বিরুদ্ধে কি ন্যুর্নবের্গ, কি হল্যান্ড বেলজিয়ম বা অন্যত্র এ অভিযোগ কস্মিনকালেও উত্থাপিত হয়নি যে তার চেলাচামুণ্ডারা নারীধর্ষণ করেছে। তাদের স্তনকর্তন, দেহে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা লাঞ্ছন-অঙ্কন এবং অবর্ণনীয় অন্যান্য অত্যাচারের কথাই ওঠে না।

ইয়েহিয়ার পৈশুন্য প্রগ্রামে এ আইটেম ছিল। এবং সর্বপ্রকার পৈশাচিক ক্রূরতায় দক্ষতা লাভের জন্য কোনও এক দেশে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ইয়েহিয়া তার জোয়ান এবং অফিসারের বাছাই বাছাই স্যাডিস্টদের সেখানে পাঠায়।

কিছুদিন পূর্বে ভুট্টো প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, 'বাংলাদেশে ইয়েহিয়ার মিলিটারি বলপ্রয়োগে আমার সম্মতি ছিল তবে অ-ত খানি না।'

ইস্তের

পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের পয়লা নম্বরি নটবর ছিলেন— এখানে সীমিতভাবে আছেন— ইয়েহিয়া খান। তিনি তাঁর হারেমের জন্য জড়ো করেছিলেন দেশ-বিদেশ থেকে হরেক রকম চিড়িয়া। এরকম একটা আজব কলেকশন কে না একবারের তরে নয়ন ভরে দেখতে চায়? ইয়েহিয়ার কাবেল ব্যাটাও দেখলেন, এবং একটিতে মজেও গেলেন। কুলোকে বলে বাপ-ব্যাটাতে নাকি তাকে নিয়ে রীতিমতো ঝগড়া-কাজিয়া হয়। আখেরে বাপই নাকি জিতেছিলেন। এই নিয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশ উভয় মুল্লুকের সংবাদপত্রে মেলা রগরগে কেচ্ছা বেরোয়। আমাকে এক সাংবাদিক শুধোলেন, 'মেয়েটা এ লড়ায়ে নিল কোন পক্ষ?' আমি বললুম, 'দুটো কুকুর যখন একটা হাড্ডির জন্য লড়ে তখন হাড্ডিটা তো কোনও পক্ষ নেয় না। এটা আপ্তবাক্য; আমার আবিষ্কার নয়।' সাংবাদিক তখন আরও বিস্তর নয়া কেচ্ছাকাহিনী শোনালেন।

তবে হ্যাঁ, একথা নাকি কেউই অস্বীকার করেনি যে তাঁর হারেমের মুকুটমণি নাকি পুব বাঙলার একটি মেয়ে। তিনি শ্যামা। তাই তাঁর পদবি 'ব্ল্যাক বিউটি'— 'কালো মানিকও' বলতে পারেন। তাঁর স্বামী একদা পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং ইয়েহিয়া একবার সে শহর পরিদর্শন করতে গেলে তাঁর গৌরবে চিরপ্রথানুযায়ী বিরাট এক পার্টি দেওয়া হয়— কিংবা তিনিই দেন। সে পার্টির 'প্রাণ' ছিলেন ব্ল্যাক বিউটি। বর্ণনাতীত স্মার্ট। ইয়েহিয়া মুগ্ধ হলেন। উভয়কে ইসলামাবাদে বদলি করা হয়। পুলিশম্যানকে অস্ট্রিয়া না কোথায় যেন রাজদূতরূপে পাঠানো হল। এটা কিছু নতুন পদ্ধতি নয়। তিন-চার হাজার বছর পূর্বে ইহুদিদের রাজা ডেভিড এক বিবাহিত রমণীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে গর্ভদান করেন। এবং যে রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধ চলছিল সেখানে (বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি) 'দায়ূদ যোয়ারের নিকটে (সেনাপতিকে) এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের (ওই রমণীর স্বামীর) হাতে দিয়া পাঠাইলেন। পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে।' (শমুয়েল ১১, ৮-২৪)।

ইয়েহিয়া উপরে উল্লিখিত চালের দ্বিতীয়ার্ধ সুসম্পন্ন করেননি, তবে এস্থলে কালো মানিক কাহিনীর কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশ ছিন্ন করে পরবর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করলে কাহিনীটির

www.pathagar.com

পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকে : ভুট্টো রাজা হয়ে ইয়েহিয়ার চরিত্রদোষ নিয়ে গবেষণা করার জন্য পরশ্রীকাতরদের যে সময় লেলিয়ে দিলেন ঠিক সেই সময়ে ব্ল্যাক বিউটির কাবিন-নামা-সম্মত স্বামী অস্ট্রিয়ার পদস্থলে অকস্মাৎ হার্টফেল করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। বিবির ওপর সে ঘটনা কী প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে সমসাময়িক ইতিহাস নীরব।

তবে তিনি তার বহু পূর্বেই ইয়েহিয়ার গৌরবসূর্যের মধ্যগগনকালে মাদাম পম্পাদুরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন।

যে বাড়ির উপরের তলায় বসে ইয়েহিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতেন তার নিচের তলায় বসতেন আর্মির হোমরা-চোমরারা। তাঁরা সরকারি তাবৎ কাগজপত্র, বিশেষ করে সরকারি বেসরকারি স্পাইদের রিপোর্ট পড়তেন, আপসে আলোচনা করে সিদ্ধান্তগুলো পেশ করতেন হুজুরের কাছে দোতলায়, তাঁর শেষ হুকুমের জন্য— সে বাবদে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিচের তলায় জাঁদরেলদের মোড়ল ছিলেন ইয়েহিয়ার সর্বোচ্চ পদধারী স্টাফ অফিসার লেফটেনেন্ট-জেনারেল পিরজাদা। ইনিই ছিলেন রাজা ইয়েহিয়ার চাণক্য— কদর্থে।

কিন্তু যে-ই হোন, আর যা-ই হোন, সব্বাইকে প্রথম যেতে হত কালো মানিকের খাস-কামরায়— এস্তেক পিরজাদাকেও। সে যাওয়াটা নিতান্ত একটা লৌকিকতা ছিল বলে মনে হয় না। তবে কি তিনি ইয়েহিয়াকে ততখানি গ্রাস করতে পেরেছিলেন, যতখানি সেক্রেটারি বরমান নাটকের শেষাঙ্কে হিটলারকে কব্জায় এনেছিলেন? এ বিষয়ে আমার অসীম কৌতূহল। কারণ যে বাইবেল থেকে আমি অল্পক্ষণ আগে একটি উদাহরণ দিয়েছি সেই বাইবেলেই আরেকটা উদাহরণ আছে সেটা কালো মানিকের সঙ্গে টায় টায় মিলে যায়। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু আমি নিরুপায়। রগরগে কেলেঙ্কারি কেচ্ছার কাহিনী লেখার জন্য আমার চেয়ে যোগ্যতর অনেক গুণী আছেন। অধম সর্বক্ষণ সর্ব ঘটনার পূর্ব উদাহরণ খোঁজে ধর্মের তুলনাত্মক ইতিহাসে।

ইরানের দিগ্বিজয়ী সম্রাট অহশ্বেরশ— Artaxerxes— আপন রানির ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য রানির সন্ধানে রাজপ্রাসাদে অসংখ্য সুন্দরী সমবেত করলেন তাঁর বিশাল রাজত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে। এঁদেরই একজন ইহুদি তরুণী সুন্দরী ইস্তের। নম্র স্বভাব ধরে ও অল্পে সন্তুষ্ট। রাজা স্বয়ং বিশুদ্ধ আর্য বংশীয়; পক্ষান্তরে ইহুদিদেরও জাত্যাভিমান কিছুমাত্র কম নয়— তারা 'সদাপ্রভু য়েহোভার স্বনির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ জাত।' ইস্তেরের সৌন্দর্যে ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে রাজা স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন।

রাজার প্রধানমন্ত্রী হামন ইহুদিদের প্রতি এতই বিরূপ ছিলেন যে, সে জাতকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে রাজার সম্মুখে নিবেদন করলেন :

(বাইবেলের ভাষায়) 'আপনার রাজ্যের সমস্ত প্রদেশস্থ জাতিগণের মধ্যে বিকীর্ণ অথচ পৃথককৃত এক জাতি আছে ('বাঙালরা' সর্বত্র 'বিকীর্ণ' না হলেও তারা যে অত্যন্ত 'পৃথককৃত' সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই— লেখক); অন্য সকল জাতির ব্যবস্থা হইতে তাহাদের ব্যবস্থা ভিন্ন (পাঞ্জাবি পাঠান বেলুচদের 'ব্যবস্থা' থেকে বাঙালির ব্যবস্থা যে ভিন্ন সে-কথা তারাও জানে, আমরাও জানি। হামন বলেননি, কিন্তু এস্থলে আমরা, বাঙালিরা বলি, এবং তাই নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি— লেখক); এবং তাহারা মহারাজের ব্যবস্থা পালন করেন না।' হামনের মতে এইটেই তাদের সর্বপ্রধান পাপ। আমরা বাঙালিরা বলি, 'পালন করেছি, পালন করেছি— সাধ্যমতো পালন করেছি, ঝাড়া তেইশটি বছর ধরে। নিতান্ত যখন সহ্যের

www.pathagar.com

সীমানা পেরিয়ে গিয়েছে তখন আপত্তি জানিয়েছি অত্যন্ত অহিংসভাবে; খানরা যখন নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়েছে।'

হামন তাই সর্বশেষে সম্রাট অহশ্বেরশের সামনে নিবেদন করলেন :

'যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লেখা হউক।'

সম্রাট সেই আদেশ দিলেন। এবং যেহেতু তিনি সম্রাট তাই লুকোচুরির ধার ধারেন না। তাই তাঁর লিখিত আদেশ— 'ধাবকগণ দ্বারা রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইল যে একই দিনে, অদর মাসের ত্রয়োদশ দিনে যুবা ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী সুদ্ধ সমস্ত ইহুদি লোককে সংহার, বধ ও বিনাশ এবং তাহাদের দ্রব্য লুট করিতে হইবে।'

ইয়েহিয়া রাজা নয়। দারওয়ান বংশের দাস। সে ২৫ মার্চ শেখ মুজিব এমনকি তার ইয়ার ভুট্টোকে না জানিয়ে— ভুট্টোকেও বিশ্বাস নেই, পাছে সে ফাঁস করে দেয়— ঢাকা থেকে পালিয়ে যাবার সময় তার কসাই টিক্কা খানকে আদেশ দিয়ে যায়, 'আমি নির্বিঘ্নে করাচি গিয়ে পৌঁছই— বলা তো যায় না, "দ্যাট উয়োমেনের" হুকুমে ইন্ডিয়ানরা আমার প্লেনে বঙ্গোপসাগরে বা আরব সাগরে হামলা করতে পারে। করাচি গিয়ে মাত্র তিনটি শব্দের একটি কোড রেডিয়োগ্রাম পাঠাব— "সর্ট দেম আউট"— টেনে টেনে বের কর বাছাই বাছাই মাল।' বাকিটা যথাস্থানে হবে। ইস্তেরের কাহিনীতে ফিরে যাই।

বলা বাহুল্য, ইহুদিদের ভিতর হাহাকার পড়ে গেল।

ইস্তেরের পিতৃব্য তখন রাজার কঠোর আদেশ তাঁকে জানালেন এবং 'তিনি যেন রাজার নিকটে প্রবেশ করিয়া তাহার কাছে বিনতি ও স্বজাতির জন্য অনুরোধ করেন, এমন আদেশ করিতে বলিলেন।'

ইস্তের রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রাজা বললেন, 'ইস্তের রানি, তোমার নিবেদন কী? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ করা যাইবে।' ইস্তের বললেন, 'যদি মহারাজের ভালো বোধ হয় তবে ইহুদিদিগকে বিনষ্ট করণার্থে যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছে সে সকল ব্যর্থ করিবার জন্য লেখা হউক। কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা দেখিয়া আমি কীরূপে সহ্য করিতে পারি? আর আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের বিনাশ দেখিয়া কীরূপে সহ্য করিতে পারি?"

রাজা তদ্দণ্ডেই ইহুদিদিগকে অভয় দিলেন। তাঁর সে পত্র 'অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল, পরে দ্রুতগামী বাহনারূঢ় অর্থাৎ বড়রাজার রাজকীয় অশ্বে আরূঢ় ধাবকগণের হস্তদ্বারা সেই সকল পত্র প্রেরিত হইল।' (ধর্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন নিয়ম, *এস্টের*, ১— ৮; ২— ১৩)।

দুষ্ট মন্ত্রীর চক্রান্ত বুঝতে পেরে রাজা গণনিধনের মতো মহাপাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের এই ন মাস-জোড়া গণনিধন প্রচেষ্টা বিশ্বজন শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল— সাহায্য করল একমাত্র ভারত। সে তার ধর্মবুদ্ধি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করে না। শুনেছি, রাষ্ট্রপতি নিকসন খ্রিস্টান; তাই বিবেচনা করি তিনি বাইবেল পড়েননি। কিন্তু এহ বাহ্য।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ইয়েহিয়া যখন ব্ল্যাক বিউটির স্বজাতি, 'জ্ঞাতি কুটুম্বের' সর্বনাশ করেছিলেন তখন তিনি কি একবারের তরেও ভাবেননি— ইস্তেরের আপন ভাষায়— 'আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের বিনাশ দেখিয়া কী করিয়া সহ্য করিতে পারি?'

www.pathagar.com

এ কাহিনীর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এতক্ষণ করিনি।

পিতৃব্য যখন ইস্তেরকে আদেশ দেন 'তিনি যেন রাজার নিকটে প্রবেশ করেন', তখন ইস্তের প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলেন, কারণ, 'প্রজারা সকলেই জানে, পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ আহূত না হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার নিকট যায়, তাহার জন্যে একমাত্র ব্যবস্থা এই যে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।'

পিতৃব্য ইস্তেরের ভীতির কথা শুনে তাঁকে জানান :

'সমস্ত ইহুদির মধ্যে কেবল তুমি রাজবাটিতে থাকাতে রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করিও না। ফলে যদি তুমি এ সময়ে সর্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক তবে অন্য কোনও স্থান হইতে ইহুদিদের উপকার ও নিস্তার ঘটিবে (বাংলাদেশের বেলা তাই হল— লেখক), কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলের সহিত বিনষ্ট হইবে; আর কে জানে যে, তুমি এইপ্রকার সময়ের জন্যই রাজ্ঞীপদ পাও নাই (এস্থলে রাজবল্লভা হও নাই?)'

বাঙালির 'উপকার ও নিস্তার' ঘটেছে, এখন প্রশ্ন ব্ল্যাক বিউটি কি নিস্তার পেয়েছেন? কিন্তু এই সর্ব বাক্য বাহ্য।

ব্ল্যাক বিউটি গৌণ, তাঁর বৈধব্যপ্রাপ্তি গৌণ, তাঁর সর্বৈব গৌণ।

পৃথিবীর গণনিধন ইতিহাসে 'ইস্তেরে' তার প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ।

অধম যখন তার প্রথম অবতরণিকায় বলেছিল, এ ন মাসের বহু বিচিত্র ঘটনা থেকে সৃষ্ট হবে পুরাণ, এপিক, রূপকথা, লোকগীতি তখন সে ক্ষণতরে বিস্মৃত হয়েছিল যে রচিত হবে সর্বোপরি নবীন শাস্ত্রগ্রন্থ।

শেখের জয়

সাধারণ নির্বাচন তথা গণতন্ত্রের আশ্বাস দিয়ে পরে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কেউ যে কখনও, এমনকি এ যুগে, ডাঁটে রাজত্ব করেননি এমন নয়। কিন্তু ইয়েহিয়া জানতেন, রাজত্ব তিনি করতে পারবেন তবে সে রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না— অতখানি দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। তদুপরি উভয় পাকিস্তানের লোক ঝাড়া সাড়ে দশটি বচ্ছর ধরে স্বাধিকারপ্রমত্ত ডিকটেটরি শাসনের চাবুক খেয়ে খেয়ে হন্যে হয়ে উঠে আইয়ুবের পতন ঘটিয়েছে; ইয়েহিয়াও যদি ডিকটেটরি করতে চান তবে তাঁকেও মোটামুটি আইয়ুবের প্যাটার্নই বুনতে হবে এবং জোলাপ দিতে হবে আরও বড়া এবং কড়া ডোজে। কারণ ইতোমধ্যে জনসাধারণ ডিকটেটরি ফন্দিফিকির খাসা বুঝে গিয়েছে এবং সেগুলোকে কী কৌশলে বানচাল করতে হয় সেটাও বিলক্ষণ রপ্ত করে নিয়েছে। একটি সামান্য সরেস উদাহরণ দিই। যারা সুদ্দুমাত্র আলা ভিনসেন্ট স্মিৎ এবং তাঁর গুরুকুল মোগল অ্যাডমিনিসট্রেশনের ওয়াকেআ-নবিস (waknis) পর্চা-নবিস সম্প্রদায়ের নিছক সন তারিখসহ ঘটনার ফিরিস্তি সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যবস্তু বলে বিশ্বাস করেন আমি তাঁদের সেবা করার মতো এলেম পেটে ধরিনে। আমি বরঞ্চ সেইসব মোগল লেখকেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করি যাঁরা ইতিহাসের বাহানায় গালগল্প শোনাতেন, মাঝেমিশেলে গুল তক্ মারতেন! অর্থাৎ ঘুমন্ত ইতিহাসের হাত দিয়ে গাঁজা খেয়ে নিতেন।

www.pathagar.com

লোকটি আমার ভায়রা। গান্দাগোব্দা ইয়া লাশ! রসবোধ প্রচুর। তিনি তখন মৈমনসিংয়ের সিভিল সার্জন। কী একটা ছোট্ট চাকরি খালি পড়েছে। এমন সময় আইয়ুবের প্যারা গবর্নর মোনেম খান করলেন ডাক্তারকে ট্রাঙ্ক-কল। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'অমুককে চাকরিটা দেবে।' পরিচয় যৎসামান্য কিন্তু সুবেদার মোনেম বাপের বয়সী লোককেও তুমি তুই করতেন।

ডাক্তার ফোনের ক্রেডলকে বাও বাও করতে করতে সবিনয় বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

পরের দিনেই ফাইনাল ডিসিশন। ডাক্তার গবর্নরের প্যারাকে নোকরি দিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ঢাকা থেকে ফের ট্রাঙ্ক-কল।

'কী, তোমার এত আস্পদ্দা! আমার হুকুম অমান্যি করলে? জানো, আমি তোমার চাকরি খেতে পারি—'

এইটে ছিল তাঁর হট্‌ফেভ্‌রেট হুমকি! জাতে ছিলেন মাছি-মারা বটতলীয় সিকি কড়ির উকিল। কাজ ছিল আদালতকে 'হুজুর হুজুর'-এর প্রচুর তৈলমর্দন করে দু চারটে জামিন মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে হুমা গাঁয়ের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানো কড়ি কামানো। এসব আমার শোনা কথা। তবে মোনেম সম্বন্ধে দশের মুখ যা বলছে তার থেকে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, স্বয়ং হিটলারও এমন তাঁবেদার খিদমৎগার মোসায়েব কপালে নিয়ে ডিকটেটর হননি— আইয়ুবের কপালে যা নেচেছিল।

সুবেদারের হুঙ্কার শুনে ডাক্তার বললেন, 'একশো বার পারেন, স্যর, একশত বার পারেন। কিন্তু লোকটা—'

'আমি কিছু জানতে চাইনে—'

'আমার কথাটা শুনুনই না, স্যর। ছেলেটাকে আমি শুধালুম, "আমাদের লাট সায়েবের নাম কি?" বলে কী না, "মুহম্মদ মুফিজ চৌধুরী!" তার পর—'

ডাক্তার বললেন, 'দড়াম করে শব্দ হল। ডেড্ কট্ অফ্‌ফ!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আপনার বুকের পাটা তো কম নয়!'

ডাক্তার অতিশয় সবিনয় : 'কী যে বলেন, ভাই সায়েব। আপনি জানেন না যে যত ছোটা হিটলারের ক্ষুদে বাচ্চা হয় তার দেমাক-রওয়াব তত টনটনে। সেখানে মোকা মাফিক খোঁচা মারতে পারলেই তিনি বন-ফায়ার! কী! আমার নামটা পর্যন্ত জানে না যে বুড়বক— ইত্যাদি।'

এরকম আরও বিস্তর কায়দা রপ্ত করে নিয়েছিল বাংলাদেশের অতিশয় নিরীহজনও— তবে হিউমার দিয়েও যে হিটলারি হুকুম বানচাল করা যায়, আমার কাছে এই তার প্রথম ও শেষ উদাহরণ।

তাই ইয়েহিয়া স্থির করলেন, ভিন্ন মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করতে হবে। দাও গণতন্ত্র, হাতে রাখ কলকাঠি।

বয়স্ক পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ইংরেজের কাছে স্বরাজের কথা তুললেই সে বলত, 'আলবাৎ স্বরাজ দেব। হিন্দু চায় অখণ্ড ভারত, মুসলমান চায় পাকিস্তান, আর নেটিভ স্টেটের মহারাজারা চান যেমন আছে তেমনি থাক, তোমাদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত ছিল, আমরা তোমাদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার স্বার্থে হাত দেব না, আর তোমরা আমাদের রক্ষা করবে। তোমরা চলে গেলে আমাদের রক্ষা করার জিম্মেদারি নেবে কে? তাই তোমরা তিন দল একমত হয়ে এক গলায় বল, কোন ঢঙের, কোন সাইজের কোন রঙের স্বরাজ চাও তোমরা। একমত হলেই আমরা খালাস।'

www.pathagar.com

এটা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নয়, এটা 'ডিভাইড অ্যান্ড ডোন্ট কুইট ইন্ডিয়া'।

ইয়েহিয়া সেই মতলবই আঁটলেন। ইংরেজ তাঁর ফাদার মাদার গর্ভস্রাব জারজ-সন্তানও প্রকৃত পিতার হদিস পেলে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর কে না জানে, তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ একবাক্যে বলেন, ইয়েহিয়ার যে অঞ্চলে জন্মভূমি সেখানে বিস্তর জাত-বেজাত এসে মিশেছে— দেদার বর্ণসঙ্কর।

ইয়েহিয়া হিসাব করে দেখলেন, গণনির্বাচনে কোনও দলই সংখ্যাগুরু হবে না। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান তো এক হতেই পারে না। এক পশ্চিম পাকিস্তানি ওয়াকিফহাল সজ্জন বলেছেন, 'পাকিস্তানের দুটো ডানা (উইং)— পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। আমি দুটো পাখাই দেখেছি, কিন্তু পাখিটাকে কখনও দেখতে পাইনি।' তাই যে পাখিটা আদৌ নেই তার দুটো ডানা পলিটিকাল পার্টি মাফিক টুকরো টুকরো করতে কোনও অসুবিধা তো নেই। ইংরেজের মতো তিনিও বহুধা বিভক্ত উভয় পাকিস্তানের ওপর বহুকাল ধরে রাজত্ব করে যাবেন। ইনশাল্লা সুবহানাল্লা!

গুপ্তচরদের শুধোলেন, 'পাকা খবর নিয়ে বল দেখি, কোন পার্টি কত ভোট পাবে বলে অনুমান করা যায়।'

এস্থলে ওয়াকিফহাল মহলে নানা মত প্রচলিত। এক দল বলেন, ডিকটেটরদের সঙ্গে যারাই কাজকারবার করেছে তারাই জানে, ডিকটেটররা শুনতে চান সেই রিপোর্ট যেটা আপন মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে যায়। ডিকটেটররা চিরকালই দাবি করেন তাঁরা এক অলৌকিক ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা দেখতে পান। গুপ্তচরের রিপোর্ট যদি সেই ভবিষ্যৎকে সায় দেয় তবে উত্তম, নইলে সেটা গডড্যাম অবজেকটিভ, বাস্তব— কিন্তু বর্তমানের বাস্তব। আখেরে ভোটের ফলাফল কী হবে সেটা এ রিপোর্ট প্রতিবিম্বিত করছে না। তবে গুপ্তচরদের কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়ার প্রয়োজনটা কী? সেটা শুধু সন্দেহপিচেশ দু একটা মূর্খ জেনারেলদের বোঝাবার জন্য যে কোনও পার্টিই মেজরিটি পাবে না।

১৯৭০-এর মাঝামাঝি— আমার মতো— কিংবা হেমন্তে-শীতে যাঁরাই এদেশে বেড়াতে এসেছেন তাঁদের মনে কোনও সন্দেহ হয়নি যে শেখ না-ও জিততে পারেন। তবে তিনি যে আখেরে গণতন্ত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব— এরকম একটা থান্ডারিং মেজরিটি পেয়ে যাবেন সেটা বোধহয় কেউই কল্পনা করতে পারেননি। তৎসত্ত্বেও ইয়েহিয়ার টিকটিকিরা নির্বাচনের শেষ ফল কী হবে সে সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ— রাশি গণনা পাঠালেন সেটা ইয়েহিয়ার দোস্ত-দুশমন উভয়কেই আজ অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে বেকুব বানিয়ে দেবে।

অ্যাসেমব্লিতে সিট ৩০০টি। তদুপরি আরও তেরোটি সিট বেগমসায়েবাদের জন্য সংরক্ষিত; ইয়েহিয়ার স্টাটিসটিশিয়ান বা বৈজ্ঞানিক গণৎকার টিকটিকিরা নিম্নের ছক কেটে দিলেন। উভয় পাকিস্তান মিলে সিট পাবেন—

আওয়ামী লীগ	৮০
কয়ুমের মুসলিম লীগ	৭০
মুসলিম লীগ (দৌলতনা দল)	৪০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি দল)	৩৫
পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (ভুট্টো)	২৫

www.pathagar.com

বাদবাকি সিটগুলো মোটামুটি এই হারেই হবে— আভাস দিলেন ফলিত জ্যোতিষীরা।

ইয়েহিয়া উর্দু বলার সময় হনুকরণ[১] করেন যুক্তপ্রদেশের (সেটা ইন্ডিয়ায়— তওবা, তওবা!) উর্দুভাষীদের। সেই উচ্চারণে সানন্দে হুঙ্কার ছাড়লেন ইয়েহিয়া 'ইয়েহু!' নামের সঙ্গে আনন্দসূচক বিস্ময়বোধক ধ্বনি হুবহু মিলে গেল।

কিন্তু হায়, কাশীরাম দাস এই গৌড়ভূমিতেই আপ্তবাক্য বলে গিয়েছিলেন :

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে?
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যে মারিলে?

ভোটাভুটির শেষ ফল যখন বেরুল তখন দেখা গেল :

আওয়ামী লীগ	...	১৬০
ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি	...	৮১
কয়ুমের মুসলিম লীগ	...	৯
মুসলিম লীগ (দৌলতনা দল)	...	৭
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি দল)	...	৬
পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পার্টিতে সর্বসাকুল্যে	...	২১
ইনডিপেনডেন্ট	...	১৬
		৩০০

দুই হিসাব মেলালে কার না চক্ষু স্থির হয়!

মহিলাদের সংরক্ষিত তেরোটি সিট থেকে আওয়ামী লীগ পেল আরও সাতটি সিট— একুনে ১৬৭। পূর্ব বাঙলায় সিট ছিল সর্বসমেত ১৬৯; অর্থাৎ মাত্র দুটি সিট আওয়ামী লীগ পায়নি।

বিগলিতার্থ অ্যাসেমব্লিতে ভুট্টোকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সব দল এক গোয়ালে ঢুকলেও আওয়ামী লীগকে হারাতে পারবে না।

লেগে গেল ধুন্দুমার। ইয়েহিয়া স্পষ্ট দেখতে পেলেন অ্যাসেমব্লিতে এখন তিনি গোটা পাঁচেক দলকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে আপন ডিকটেটরি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের সঙ্গে 'হাজার বছর ব্যাপী মোকাবেলা' করে যেতে পারবেন না।

আইনত ভুট্টো কেবলমাত্র বিরোধী দলের নেতৃত্ব করতে পারেন। কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াতে লাগলেন, মুজিব যে রকম পূর্ব পাকিস্তানের নেতা, তিনিও তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা। এখন এসে গেছে দুই পাকিস্তানের মোকাবেলার লগ্ন।

এস্থলে প্রথমেই বলতে হবে, উভয় পাকিস্তানের মোকাবেলা বা সংঘর্ষের আশা বা আশঙ্কার কথা শেখ সাহেব কখনও তোলেননি। ভোটাভুটিতে বিরাট সংখ্যাধিক্য পাওয়ার পরও তিনি কখনও বলেননি— এইবারে আমরা তাবৎ সমুচা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর রাজত্ব করব— যদিও সেটা বলার আইনত ধর্মত সর্ব হক্ক আওয়ামী লীগের ছিল। ভুট্টো যদি এখনও বলেন 'পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়নি, জিন্দাবাদ অখণ্ড পাকিস্তান' তবে আওয়ামী লীগের এখনও সেকথা বলার হক্ক আছে।

---

১. রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্র একদা লেখেন : টু ইমিটেট = অনুকরণ : টু এপ্ (ape) = হনুকরণ। ইংরেজি ধ্বনি-তাত্ত্বিকরা এই ককনি H হ-টি লক্ষ করবেন।

www.pathagar.com

বস্তুত জনাব ভুট্টো যদি নিজের জীবন্ত-সমাধির তামাসা নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে চান, তবে অখণ্ড পাকিস্তান সরকারের কানুন অনুযায়ী তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির অধিবেশন ডাকুন ঢাকায়, যেটা ৩ মার্চ ১৯৭১ হওয়ার কথা ছিল। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কি না সেটা সাংবিধানিক আইনে যদিও বিতর্কাধীন— আমরা— না হয় তাঁকে আবু হোসেনের মতো একদিনের তরে খলিফে বানিয়ে দিলুম। ভয় নেই পাঠক, পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তর মেম্বরও গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আসবেন— সে ব্যবস্থা সেই হারাধনের একুশটি পরিবার পরমানন্দে করে দেবেন। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ৩ মার্চের অধিবেশনে পশ্চিম পাক থেকে কোনও সদস্য যদি ঢাকা আসার চেষ্টা করেন, তবে ভুট্টো তাদের 'ঠ্যাং ভেঙে দেবার' হুমকি দেন। তৎসত্ত্বেও বেশ কয়েকজন অক্ষত ঠ্যাং নিয়েই এসেছিলেন। বাকিরা আসতে পারেননি— প্লেনে সিট পাননি বলে। বস্তুত বঙ্গবন্ধু ওই সময়ে, ৩ মার্চ ১৯৭১-এ বলেন, 'এটাকে ট্র্যাজিক বলতে হয় যখন প্লেনগুলো (মিলিটারি প্লেন নয়— লেখক) পশ্চিম পাকের সদস্যদের নিয়ে আসার কথা তখন সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মিলিটারি আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসাতে।' আসবেন আসবেন, মেলা সদস্য আসবেন। ওখানে তো প্রাণের ভয়ে কাঁপছেন। এখানে সদস্য হিসেবে অন্তত জান-মাল সেফ্। চাকরির তরে তদ্বিরও করা যাবে। সত্য বটে বন্ধুবন্ধু বলেছেন, 'এখন আর তদ্বির চলবে না।' অধম সক্কলের কাছে মাপ চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে একটি সমসাময়িক নীতিবাক্য স্মরণ করে : 'একদা বসুন্ধরা ছিলেন বীরভোগ্যা— এখন তিনি তদ্বির-ভোগ্যা।'

এবং বিশেষ করে দর্শক হিসেবে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে 'বমার অব বেলুচিস্তান' 'বুচার অব বেঙ্গলকে'। তার যথেষ্ট কারণ আছে। মুক্তিযুদ্ধ যখন চরমে, তখন টিক্কা খান ফরমান জারি করে স্বাধীন বাংলাদেশের কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল আতা-উল্ গনী মুহম্মদ ওসমানীকে তাঁর সম্মুখে ঢাকাতে উপস্থিত হবার হুকুম ঝাড়েন। ওসমানী সাহেব ভদ্রসন্তান। অতিশয় ভদ্র ভাষায় উত্তর দেন— যদ্দূর মনে পড়ে— 'কে কাকে ডেকে পাঠাবে সেটা না হয়... (অর্থাৎ বিতর্কাধীন, কিংবা ওসমানীরই বেশি, কিংবা উপস্থিত সেটা মুলতুবি থাক; আমার সঠিক মনে নেই বলে দুঃখিত— লেখক)। তবে আমি ঢাকা আসছি, কিন্তু প্রশ্ন, মহাশয় কি সে সময় ঢাকায় থাকবেন?'

এই উত্তরটি গেরিলারা ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেয়।

বলা বাহুল্য জেনারেল ওসমানী এক কথার সেপাই। তিনি ঢাকা এসেছিলেন, কিন্তু টিক্কা তখন সেখানে নেই।

বেধড়ক মার খেয়ে ইংরেজ সৈন্য যখন ডানকার্ক থেকে নিম্নপুচ্ছ হয়ে সবেগে পলায়ন করে তখন বিবিসি-র পাঠান সংবাদদাতা বুখারি বলেন, 'হমারে সিপাহি বাহাদুরিকে সাথ হট গয়ে।' 'বাহাদুরির সঙ্গে হটনা'— সোনার পাথরবাটি।

টিক্কা খান বাহাদুরিকে সাথ হট্‌তে হট্‌তে পৌঁছে গেলেন রাওয়ালপিণ্ডি।

রাঁদেভুটা মিস্ করার জন্য টিক্কার ক্ষোভ থাকতে পারে। যাদের নিমন্ত্রণ করা হবে তার মধ্যে টিক্কা একজন মাস্ট্ বইকি!

অধিবেশনের কর্মসূচি (আজেন্ডা) এবং সেটা কীভাবে রূপায়িত হবে তার ভার, কল্পনাবিলাসী পাঠক, তোমার হাতে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এটা শুধু কল্পনা-বিলাসই হবে না। পাঠক পরের সংখ্যায় দেখতে পাবেন, ভুট্টো সাহেব এই যে মুসলিম জগতে সফর করে এলেন সেখানে কোন পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে শেখ সাহেবের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

একদিকে নিদারুণ হাহাকার, আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র নষ্ট করেছে; অন্যদিকে নিদারুণতর হাহাকার যে বাইশটি ধনপতির অর্থানুকূল্যে তিনি ছোটা হিটলার দি থার্ড হলেন তাদের দোকানপাট বন্ধ। তারা যে রদ্দিমাল পূর্ব বাঙলায় চড়া দরে ডাম্প্ করত সেগুলো এখন করাচির পেভমেন্টে নেমেছে; আরবরা যদি দয়া করে কেনে।

যে অধিবেশনে ভুট্টো শেষের আইটেম না বললেও প্রথমটা বলবেনই বলবেন। তা তিনি যা-বলুন যা-করুন কোনও আপত্তি নেই। শুধু একটা শর্ত যেন থাকে। তিনি গত বছর ইউনাইটেড নেশনে যেরকম গোসসাভরে কাগজপত্র ছিঁড়ে দুমদুম করে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন, এখানে যেন সেরকমটা না করেন।

ইয়েহিয়া-ভুট্টো

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩১শে। কাজেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবস বলতেও বাধা নেই। অন্তত আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বর্ষা আগমনের যেসব লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হয় আজ ঢাকাতে সেই বর্ষা এসেছেন প্রাবৃষ্য সর্বলক্ষণসম্পন্না শ্যামা সুন্দরীর ন্যায়। তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াকত থেকেই শুনতে পাচ্ছি বাড়ির পাশের নিমগাছ, বাংলাদেশ রাইফেলসের চাঁদমারি ঘিরে যে ঘন বাঁশবন, গ্রীষ্মের অত্যাচারে ফিকে বেগুনি রঙের পুষ্পরিক্ত জারুল এবং কৃষ্ণের চূড়ার পর অবিরল রিমঝিম রিমঝিম বারিপতনের মৃদু মর্মরধ্বনি। আর

'মেঘের ছায়া অন্ধকারে
রেখেছে ঢেকে ঢাকা-রে—'

এতদিনে ঢাকা ছিল খোলা— রৌদ্রতপ্ত বিবর্ণ আকাশের নিচে। আজ ক্ষীণ বরিষণে জলকলকলে নাম তার সার্থক হল।

এমন দিনে নমো ইলিশায়
খিচুড়ি তার সাথে এ ঢাকায় ॥

গত বৎসর এইদিনে কার সাধ্য ছিল এ বাড়িতে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে 'কবিত্ব' করে? বাড়ির বাগানের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি নালা বয়ে গিয়ে একটু দূরে একটা ঝিলের রূপ নিয়েছে। গজ তিনেক চওড়া নালার পরেই খাড়া উঁচু টিলার উপর বাঁশবন ঘেরা চাঁদমারির পাঁচিল। এ বাড়ি থেকে ধানমণ্ডি নিবাসিক অঞ্চলের আরম্ভ। ধানমণ্ডির ঘন বসতিতে 'মুক্তির' দু পাঁচজন হেথা-হোথা সর্বত্রই আত্মগোপন করে থাকত। চাঁদমারি ঘিরে টিক্কার না-পাকদের অহরহ ছিল ভয়, রাতের অন্ধকারে মুক্তি-রা হঠাৎ কখন না পাকিস্তানের রাইফেলসের হেড-কোয়ার্টারের ওপর হামলা চালায়। নালার পাশেই তাই খুঁড়েছিল বিরাট এক বাঙ্কার। তার ভিতরে বিজলিবাতি ফ্যান রেডিয়ো, রমণী, উত্তম উত্তম শয্যা সবকিছুই ছিল। আর টিলাটার সানুদেশে বাঁশবনের ভিতরে আড়ালে সুবো-শাম রাইফেল হাতে পাহারা দিত না-পাকরা। সামান্যতম প্রদীপ-রশ্মি দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার! এমনকি দূরের

www.pathagar.com

কোনও মিলিটারি জিপের হেড-লাইট বাড়ির কোনও শার্সির উপর অতি সামান্য চিলিক মারলেই জাস্ট টু বি শ্যোর, চালাও ধনাধন গোলি— কাপুরুষের লক্ষণ ওই, বুকের ভিতর 'বলা তো যায় না; ক্যা মালুম ক্যা হ্যাঁয়-এর' ধুপুস-ধাপুস ছুঁচোর নৃত্য, ঘামের ফোঁটায় দেখে সোঁদরবনের কেঁদো কুমির!

এই বাড়ির ঘরের ভিতরে দুটো বুলেটের ইঞ্চি তিনেক গভীর ফুটো। জানালার শার্সি পর্দা ফুটো করে থানা গেড়েছে। আরেকটা জানালার চৌকাঠে লেগে সেটার ইঞ্চি দুয়েক উড়িয়ে টাল খেয়ে কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে গিয়েছে।

কোথায় গেল সেসব রোয়াব, বড়-ফাট্টাই!

এ বাড়ির বাগানের কোণে কিন্তু নববরিষণের সঙ্গে সঙ্গে ফুটছে লাজুক জুঁই!

ইংরেজের অত্যাচারের সময় রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

'টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি রইবে না কিছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।'

মাত্র তিন গজের তফাৎ। এদিকে ফুটছে লাজুক জুঁই। ওদিকে কোথায় 'রঙিন কুর্তি সঙিন মূর্তি হেইয়া খানের ভুঁই?'

অবিরত বৃষ্টিধারা ঝরছে।

এ বাড়ির নিচের তলাটা জোরদখল করেছিল এক পাঞ্জাবি মেজর। আমার ছোট ছেলে বললে 'মেজর হুজুর বাড়ি ফিরবেন কখন ঠিক নেই। তার ব্যাটমেনের মাথার টুপিতে পড়েছিল প্রথম আষাঢ়ের আড়াই ফোঁটা জল। কোঁকাতে কোঁকাতে চারপাইয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়ে বলে তার বহুৎ জুকাম (সর্দি) হুয়া, জোরসে খাসি হুই এবং জবরদস্ত বুখার চড়হা। কিন্তু তখনও তিনি এদেশের রাজা। পুনর্মূষিক হলেন কী প্রকারে সে কাহিনী অন্য অনুচ্ছেদে আসবে এ 'ইতিহাসের' শেষ অধ্যায়ে— ততদিন এ পরিবারের সসর্প-গৃহে বাস, সে কাহিনী তার সঙ্গে বিজড়িত।

আমার পরিকল্পিত এসেমব্লির সেশনটা উপস্থিত মুলতুবি আছে। কারণ ভুট্টো এখন অন্তত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। শুনলুম, হিটলার ডিনেস্টির চতুর্থ ছোটা হিটলার তাঁকে যখন গদিচ্যুত করবেন তখন তাঁর কপালে অবশিষ্ট রইবে শুধু ওই এসেমব্লির সদস্যপদ। তারই হক্কে তিনি দাবি জানাবেন তখন এসেমব্লির সেশন। এখনও তিনি রাজা। তবে হিটলার নাটকের সর্বশেষ অঙ্ককে যেমন বলা হয়, 'দি কিং উইদাউট হিজ রোব্‌স্'। সেই যে হুলুধ্বনি মুখরিত জনতার মাঝখান থেকে পুঁচকে একটা ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কিন্তু রাজামশাইয়ের পরনে যে কিচ্ছুটি নেই!'

পূর্বেই বলেছি, ডিসেম্বরের গণ-নির্বাচনের ফলে ইয়েহিয়া যখন দেখতে পেলেন যে এসেম্‌ব্লিতে তিনি গোটা পাঁচ-সাত দলকে একে অন্যের বিরুদ্ধে নাচাতে পারবেন না তখন

www.pathagar.com

তিনি লক্ষ করলেন যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও সিট পায়নি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনও সিট পায়নি।

অতএব পাঁচ-সাতটা পার্টি না নাচিয়ে তিনি নাচাবেন— দুই পার্টিকে নয়— দুই উইংকে। দুই পাকিস্তানে লাগিয়ে দেবেন মোষের লড়াই। অতএব তাঁর হাতের কাছে আছে যে পশ্চিম পাকিস্তান সেটাকে তৎপূর্বে বেশ ভালো করে তাতাতে হবে।

দুই পাক-এর সাধারণজন ইয়েহিয়ার কূটবুদ্ধির খবর রাখত না। তাই তারা অবাক হল যখন গণনির্বাচনের পরই ইসলামাবাদ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন শীতের মরসুমি হিমালয় সাইবেরিয়াতে হংসবলাকা নিধনে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রাজসিক শিকারে তিনি জনসাধারণের সংস্রবে আসবেন না— তা তিনি চানও না। তাঁকে আপ্যায়িত করবেন বড় বড় জমিদার যেন জ্যাক অব কেন্ট বা নবাব খঞ্জা খাঁ এবং কেঁদো কেঁদো টাকার কুমির আদমজি ইস্পাহানিদের পাল— এঁদের একজনের নাম আবার ফাঁসি! ইয়েহিয়া বাগাবেন এঁদের।

পয়লা প্রেমের শিকার ছোঁড়াটা যেরকম নাক-বরাবর প্রিয়া-রাঁদেভু পানে সবেগে ধাওয়া করে না, এদিকে টুঁ ওদিকে টক্কর খাওয়ার কামুফ্লাজ করে মোকামে পৌঁছয়, ইয়েহিয়া শিকারি সেই রীতিতে হেথা-হোথা শিকার করতে করতে পৌঁছলেন তাঁর বল্লভ ভুট্টোভবনে। সেখানে তিনি যা খাতিরযত্ন পেলেন সে শুধু হলিউডেই হয়ে থাকে। কিংবা আইয়ুব যেরকম প্রফুমো সকাশে মিস 'কিলার' সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন। আইয়ুব তখন গদিতে; তাই সে সময়ে সদাশয় ব্রিটিশ সরকার আইয়ুবের সেই নিশাভিসারও বার্থডে-সুট পরে মধ্যযামিনীতে হুরীপরীদের সঙ্গে সন্তরণকেলি তার পরিপূর্ণ বাহার অসদ্‌ব্যবহারসহ প্রকাশ করেননি।

ইয়েহিয়া-ভুট্টোতে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু খবরের কাগজে সেটা কামুফ্লাজ করে প্রকাশিত হল, 'নিতান্ত যোগাযোগবশত উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভাবের আদান-প্রদান হয়।' তা সে যে ভাষাতেই প্রকাশ করা হোক, গণনির্বাচনের পরই রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগুরু আওয়ামী নেতার সঙ্গে সর্বপ্রথম আলাপ-আলোচনা না করে নিজের থেকে প্রথম গেলেন সংখ্যালঘুর বাড়িতে। এটা কূটনৈতিক জগতে সর্ব প্রটোকলবিরোধী, সখৎ বেআদবি। এতে করে আওয়ামী লীগের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হল না, তিনি হলেন হাস্যাস্পদ এবং বিড়ম্বিত। বলা বাহুল্য, এ মশকরাটা আওয়ামী লীগের দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু লীগজন যে বিচলিত হয়েছেন সেরকম কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

একটা বিষয়ের প্রতি আমি কিন্তু পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পূর্ববঙ্গের সুদীর্ঘ ইতিহাসের এই অধ্যায়ের প্রধান নায়ক তিন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের তিনজন লোক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, (বর্তমান) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত, লাঞ্ছিত আগা মুহম্মদ ইয়েহিয়া খান।

১৯৭১ আগস্ট/সেপ্টেম্বরে জনাব ভুট্টোর আপন জবানেই পূর্ববঙ্গের অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্কটজনক, অখণ্ড পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয় তখন তিনি একখানি চটি বই লেখেন।[১]

এই বইখানি কত শত বৎসর ধরে ঐতিহাসিক মাত্রেরই গবেষণার প্রামাণিক কাঁচামালরূপে গণ্য হবে, আজ সেকথা বলা কঠিন।

---

১. ZULFIKAR ALI BHUTTO, *The Great Tragedy*, Sept. 71, pp. 107, Karachi.

www.pathagar.com

আগস্ট মাসেই ভুট্টো বুঝে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে আর বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। ওদিকে পশ্চিম পাকে আরও বহু লোক, বিশেষ করে ধনপতিরাও সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিলেন এবং সেই সঙ্কটের জন্য ইয়েহিয়া এবং তাঁর দুষ্টবুদ্ধিদাতা ভুট্টো যে তাঁর চেয়েও বেশি দায়ী সে অভিমত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

তখন আপন সাফাই গাইবার জন্য ভুট্টো এ বই লেখেন।

আজ পর্যন্ত এমন কোনও সাংবাদিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বলতে কসুর করেননি যে, ভুট্টোর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, তাঁর ধ্যানে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে সদাজাগ্রত থাকে মাত্র একটি রিপু— উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেটাকে প্রায় নীতিবিগর্হিত জনসমাজ বিনাশী পাপাভিলাষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

তাই সাফাই গাইতে গিয়েও আগা-পাশ-তলা জুড়ে বার বার তাঁর একই আবদারের ধুয়ো, একই সদম্ভ জিগির :

'এখনও সময় আছে। এখনও ত্রাণ আছে। আমাকে রাজ্যচালনা করতে দাও। মন্ত্র উচ্চারণ কর হে প্রতি পাপী তাপী পাকী :

"ভুট্টোং শরণং গচ্ছামি" ॥

ভুট্টাঙ্গ পুরাণ

রবীন্দ্রনাথ মূলটা বাংলায় না ইংরেজিতে লিখেছিলেন, সেটা এস্থলে না জানলেও চলবে, কারণ ইংরেজিটাও অটোগ্রাফের খাতাতে লেখা, 'স্ফুলিঙ্গটি' উতরেছে অত্যুৎকৃষ্ট রূপ নিয়ে।

'হোয়াইল দি রোজ সেড টু দি সান "আই শ্যাল রিমেন ইটার্নেলি ফেৎফুল টু দি", ইটস পেটালস ড্রপ্‌ট্‌!'

ইতোমধ্যে আপনাদের আশীর্বাদে বাংলাটাও মনে পড়ে গেল—

"চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমারে চিরকাল মনে'
বলিয়া পড়িল টুটে।"

সমসাময়িক প্রায়-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার বেলা ওই একই বিপদ! কালি শুকোতে না শুকোতেই অন্য আরেকটা ঘটনা এসে সেটাকে বাতিল করে দেয়— গোলাপবালার অনন্তকালীন প্রেমাঙ্গীকার বলা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঝুরঝুর করে পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে গেল।

'ভুট্টোং শরণং গচ্ছামি'

বলা শেষ করতে না করতেই তাঁরই কণ্ঠে শুনি, 'উহুঁ! হল না। তার চেয়ে বরঞ্চ বল,

'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি ইন্দিরাজির সঙ্গে যদি কোনও ফৈসালা করে ফেলেন (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস তিনি কোনও ফৈসালাই চান না, কারণ 'অবগাহি কল্পনার সীমান্ত অবধি' আমি এমন কোনও সামান্যতম ফৈসালার সন্ধান পাচ্ছিনে যেটা যুগপৎ পাকিস্তানের জনগণমন প্রসন্ন করবে এবং তিনিও গদি-নশিন থাকবেন) তবে তিনি সেটি 'এসেমব্লির' সম্মুখে পেশ করবেন। ওদিকে আসন্ন মুলাকাতের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের জিগির লাগাতার গেয়ে যাচ্ছেন।

এসেমব্লি শব্দের সংস্কৃত বলুন, পালি বলুন, প্রতিশব্দ সজ্ঞ।

ওদিকে তিনি গত এপ্রিলে যে একটা টেম্পরারি জো-শো সংবিধান নির্মাণ করেছেন সেটাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্রাংশের হাওয়ার কোমরে রশি বেঁধে সেটাকে আটকে রেখেছেন। আমি সে 'একটিনি' সংবিধান পড়িনি; তাই আন্দেশা করে ঠাওরাতে পারছিনে সে এসেমব্লিতে আওয়ামী লীগের সাবেক ১৬৭ জন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না, এবং রাঁদেভু হবে কোথায়? ঢাকার রোকেয়া হল হস্টেলে, যেখানে ইয়েহিয়ার পিশাচরা মিলিটারি অ্যাকশন নিয়ে, যে অ্যাকশনে ভুট্টোর সম্মতি ছিল, অসহায় ছাত্রীদের নির্যাতিত ও পরে নিহত করে? না ইসলামাবাদের সেই 'আইয়ুব-হল'-এর বারান্দায় যেখানে গণতান্ত্রিক জুলফিকার আলী সুবো-শাম ডিকটেটর প্রভু আইয়ুবের কলিংবেলের সুমধুর টিংটিংয়ের জন্য টুলে বসে ঢুলতেন?

গত সপ্তাহে আমি এসেমব্লি নাকচ করতে না করতেই আমার পাপড়ি খসে গেল! আবার সেই এসেমব্লি! সমস্ত রাত, এস্থলে পুরো পাক্কা একটি হপ্তা— নৌকা বেয়ে ভোরে দেখি সেই বাড়ির ঘাটে! খুঁটি থেকে বাঁধা নৌকোর দড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

আবার ভুট্টো সায়েবের কেতাবখানার কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই। সে পুস্তিকা এমনই তুলনাহীন যে খুদ বইয়ের তো কথাই নেই, আমার অক্ষম লেখনী মারফত তার সামান্য যেটুকু আমি প্রকাশ করতে পারব সেটা পড়ে পাঠক রোমাঞ্চিত হবেন, তাঁর দেহ মুহুর্মুহু শিহরিত হবে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দিশেহারা হবেন এবং সর্বশেষে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কোনটা গণ্ডমূর্খের জড়ত্ব, কোনটা অতি ধূর্তের কপটতম ধাপ্পা সেগুলো বুঝতে গিয়ে কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হবেন— হয়তো-বা অর্ধোন্মাদ হয়ে যাবেন। ঈশ্বর রক্ষতু!

আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এ পুস্তক একাধিকবার অধ্যয়ন না করে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও 'ছাব্বিশ (মার্চ) থেকে ষোল (ডিসেম্বর)র' খতিয়ান লিখতে পারবেন না। দুই শরিক ইয়েহিয়া এবং ভুট্টো। কার পাপ কোন খাতে লিখবেন সঠিক ঠাউরে উঠতে পারবেন না। সান্ত্বনা এইটুকু : পুণ্যের মূল তহবিলে স্রেফ ব্ল্যাঙ্কো! সেখানে তিনি নিশ্চিন্দি!

পূর্বেই নিবেদন করেছি, কেতাবের ধুয়া 'ভুট্টোং শরণং গচ্ছামি'। (এদানির : 'সংঘং শরণং গচ্ছামি'), তাই এ কেতাবের বৃহদংশ নিয়েছে ভুট্টোদেবের গুণ-কীর্তনে বা সাফাই গাওয়াতে। বস্তুত এটা পড়ে সরল বিদগ্ধ তাবজ্জন তাজ্জব মেনে মাথা চুলকোবেন : 'তাই তো! এমন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, আত্মত্যাগী, পুরদুঃখকাতর দয়ার সাগর, যিনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারেন না তাঁকে নিয়তি রাজনীতিতে নামালেন কেন? কূটনীতির দাবা খেলা তো তাঁর জন্য নয়— তাঁর কথা বিশ্বাস করলে তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই প্রাপ্ত বয়সেও তিনি যদি

www.pathagar.com

লারকানার রাস্তার ছোঁড়াদের সঙ্গে মার্বেল খেলতে নাবেন তবে তারা তাঁকে বেমালুম বোকা বানিয়ে পকেটের সব কটা মার্বেল গ্যাঁড়া মেরে দেবে।'

তবে কি না, নিতান্ত আপন-ভোলা সজ্জন এই লোকটি। মাঝে-মিশেলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য কথা বলতে তিনি ভুলে যান— ইস্তক ইতি গজঃটুকু। পূর্ববর্তী সংখ্যায় বলেছিলুম কী কৌশলে এদিক-ওদিক বুনোহাঁস শিকার করতে করতে ইয়েহিয়া তাঁর রাঁদেভু ভুট্টোর মোকামে পৌঁছে সেখানে তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতের প্ল্যান কষলেন। এই 'পিয়া মিলনকো' অবশ্যই হানিমুন অব দি টু— 'দু জনার মধুচন্দ্রমা' বলা যেতে পারে। 'হানিমুন অব্ দি টু' বাক্যটি আমি শ্রীভুট্টোর গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। তিনি লিখেছেন 'আমাতে-মুজিবেতে (ঢাকাতে, পরবর্তীকালে— লেখক) বারান্দায় কথাবার্তা বলার পর আমি যখন ইয়েহিয়াকে সেটার রিপোর্ট দিতে গেলুম তখন তিনি সবিস্ময়ে আমাদের ভেটকে হানিমুন বিটউইন দি টু অব ইউ বলে উল্লেখ করলেন।' কিন্তু এহ বাহ্য।

আসল কথা এই : ভুট্টো তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন লেট জিন্নার পাকিস্তান স্থাপনা করা থেকে! তার পর অনেকানেক ঘটনার কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট তথা বিবৃতি দেওয়ার পর তিনি বলছেন 'তেসরা জানুয়ারি ১৯৭১-এ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেওয়ার অল্প কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীসহ ঢাকা গেলেন। ঢাকা থেকে ফেরার পর প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া ও তাঁর কিছু উপদেষ্টা ১৭ জানুয়ারি তারিখে আমার হোম টাউন লারকানাতে এলেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে মুজিবের সঙ্গে ঢাকাতে তাঁর আলোচনার বিষয় জানালেন... ইত্যাদি।'

আশ্চর্য এই সত্য গোপন! ইয়েহিয়ার সঙ্গে প্রায় মাসখানেক পূর্বে, অর্থাৎ ইয়েহিয়ার সঙ্গে ঢাকাতে মুজিবের মোলাকাত হওয়ার পূর্বেই যে তিনি (ভুট্টো) ইয়েহিয়ার সঙ্গে ওই লারকানাতেই দুহুঁ দুহুঁ কুহুঁ কুহুঁ করেছেন সেটা একদম চেপে গেলেন।

কেন চেপে গেলেন?

কারণ ওই সময়েই সেই শয়তানি প্ল্যান আঁটা হয়, কী পদ্ধতিতে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রচেষ্টা (অটোনমি— স্বাধীনতা নয়) নস্যাৎ করা যায়। (কে কাকে কতখানি দুষ্টবুদ্ধি যুগিয়েছিলেন সেটা আজও আমরা জানিনে— একদিন হয়তো প্রকাশ পাবে) এই প্রাথমিক প্ল্যান নির্মাণকাহিনী যাতে করে ধামাচাপা পড়ে যায় তার জন্যই এই সত্য গোপনের প্রয়োজন।

ওদিকে ইয়েহিয়াই তার তিন দিন পূর্বে, ১৪ জানুয়ারিতে ঢাকা শহরে ফাঁস করে বসে আছেন যে মুজিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম মোলাকাতের পূর্বেই ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলাপচারি হয়ে গিয়েছে!

ঘটনাটি এইরূপ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, নানাবিধ হাঁস, তন্মধ্যে ভুট্টো চিড়িয়া শিকার করার পর তিনি রওনা হলেন ঢাকা। এ সম্বন্ধে ভুট্টো মন্তব্য করেছেন, গণ-নির্বাচনের পর মুজিবকে বার বার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও যেতে রাজি হননি। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'গেলে ভালো হত। তিনি অতি অবশ্য সেখানে বিস্তর লোকের চিত্তজয় করতে সমর্থ হতেন ও ফলে ডবল জোরে ভুট্টো-ইয়েহিয়া-আঁতাৎ-এর মোকাবেলা করতে পারতেন।' আমি নগণ্য প্রাণী, আমার মতের কিবা মূল্য! তবু বলি

www.pathagar.com

(আহা, বেড়ালটাও কাইজারের দিকে তাকাবার হক্ক ধরে) না গিয়ে ভালোই করেছেন। শেখ সাহেবেরও জান মাত্র একটি!

তা সে যাই হোক— শেখ-ইয়েহিয়া ভেটের পর পিণ্ডি প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ১৪ জানুয়ারি তারিখে, ঢাকা অ্যারপোর্টে সাতিশয় সদাশয় চিত্তে ইয়েহিয়া সাংবাদিকদের নানাবিধ প্রশ্নের দিল-দরিয়া উত্তর দিলেন।

তন্মধ্যে সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আছে : 'শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

এ উত্তরে কতখানি আন্তরিকতা ছিল বিচার করবে ইতিহাস! কিন্তু এহ্ বাহ্য।

এক সাংবাদিক শুধালেন, 'আপনি কি এবারে (দিস টাইম) মি. ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করবেন?' এই 'দিস টাইম'টি পাঠক লক্ষ করবেন। যেন ইঙ্গিত রয়েছে, 'আমরা তো ভালো করেই জানি, একবার তার সঙ্গে আপনার কথাবর্তা হয়ে গিয়েছে। এখন যখন শেখ সায়েবকে প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন, এ বা—রেও কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?'

উদার-হৃদয় ইয়েহিয়া বললেন— 'আমি প্রত্যেক জনের সঙ্গে দেখা করি। তার (ভুট্টোর) সঙ্গে আমার অলরেডি একবার দেখা হয়ে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি পাখি শিকার করতে যাচ্ছি সিন্ধু দেশে— ওটা ভুট্টোর এলাকায়। তিনি সেখানে থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

ন্যাকরা! 'তিনি সেখানে থাকলে—'। ইয়েহিয়া তো ওয়াইলড ডাক খ্যাদাতে বেরুবেন না। এবং ভুট্টোও একদম সিটিং ডাক।

আগস্ট মাসে বই লেখার সময় ভুট্টো আশা করেছেন, ডিসেম্বরের ভেট লোকে স্মরণে না-ও আনতে পারে। এ বাবদে সর্বশেষ মন্তব্য এই করা যেতে পারে যে, ভুট্টো উকিল। তিনি জানেন, আসামি তার সাফাই গাইবার সময় এমন কিছু বলতে বাধ্য নয় যা তার বিরুদ্ধে যেতে পারে!

এ ধরনের বিস্তরে বিস্তরে সত্যগোপন, মিথ্যাভাষণ, গুজবের আড়াল থেকে কুৎসা রটনা অনেক কিছু আছে এই মহামূল্যবান ভুটাঙ্গ-পুরাণে। এবারের মতো শেষ একটি পেশ করি :

'(শেখ মুজিবের) ছয় দফার নির্মাতা কে, সে নিয়ে প্রচুর কৌতূহল দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ কোনও বুরোক্রেট এই ফরমুলাটি বানিয়ে দেন (ফ্রেমড দ্য ফরমুলা)। উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে দুইভাগে বিভক্ত করে আইয়ুবকে বাঁচানো তথা জনগণের দৃষ্টি তাশখন্দ প্রহসন থেকে অন্যদিকে সরানো।'

দুই পাকিস্তানকে লড়িয়ে দিয়ে ইয়েহিয়া গদিচ্যুত হলেন, আর আইয়ুব বাঁচতেন এই পন্থায়? এ যুক্তি শুধু উকিলের 'উর্বর' মস্তিষ্কেই স্থান পেতে পারে!

এবং তার পর ভুট্টো বলছেন, 'একটা জনরব এখনও প্রচলিত আছে যে, ওই ছয় দফা মুশাবিদা করাতে একটা বিদেশি হাতও ছিল।'

দুষ্টবুদ্ধি প্ররোচিত প্যাঁচালো দলিলের মুশাবিদা করার জন্য ঘড়েল নায়েব ঝানু উকিলের শরণাপন্ন হয়। আওয়ামী লীগের ছয় দফাতে আছে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মৌলিক সরল দাবি। এর মুশাবিদা করতে পারলেন না জনাব তাজউদ্দীন বা রেহমান সুব্হান? এই

www.pathagar.com

সাদামাটা দাবির কর্মসূচি তৈরি করার জন্য দরকার হল 'ফরেন হ্যান্ড'! 'পেটের ভাত আর গায়ের কাপড় চাই' এ কথা কটি তো গাঁয়ের চাষাও জমিদারের সামনে আকছারই বলে— আপন সরল গাঁইয়া ভাষায়। তবে কি মি. ভুট্টো বলতে চান, এ দুটো যে তার চাই-ই চাই সেকথাটা পূর্ব বাঙলার লোকের মাথায় খেলেনি? সেটা টুইয়ে দেবার জন্য কুটিলস্য কুটিল 'ফরেন হ্যান্ডের' প্রয়োজন হয়েছিল? আল্লায় মালুম, মি. ভুট্টোর মাথায় কী খেলে?

হিটলার ডিকটেটর হওয়ার পর একাধিকবার আপসোস করেছেন, তাঁর 'মাইন কাম্‌প্‌ফ' প্রকাশ না করলেই সুবিবেচনার কাজ হত। মি. ভুট্টো ছোটা হিটলার দি থার্ড হওয়ার পর সে আপসোস করেছেন কি না, বলা যায় না। তবে ভবিষ্য যুগের কাষ্ঠরসিক পাঠক হয়তো বইখানার নাম 'দি গ্রেট ট্র্যাজেডি' পাল্টে 'দি স্মল কমেডিয়ান' নয়া নামকরণ করতে পারে।

'বিচিত্র ছলনাজাল'

মৃগয়া সমাপনান্তে প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সুবাদে একটি প্রাচীন চুটকিলা পুনর্জীবন পেল।

জনৈক পেশাদার শিকারি হুজুরকে শিকারের ফন্দি-ফিকির বাৎলাবার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল। তাকে তার এক চেলা শুধাল, শিকারি হিসেবে হুজুর কীরকম? ওস্তাদ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাশাল্লা! একদম উম্‌দাসে উম্‌দা, বেনজির। কিন্তু হুজুরের ব্যাগ খালি রইল, আল্লা পাখিদের প্রতি মেহেরবান ছিলেন।'

প্রচুরতম মদ্যপান করার পর উষস্‌দেবীর প্রথম আলোয় চরণধ্বনির শুভলগ্নে হস্তযুগল নিষ্কম্প প্রদীপ শিখাবৎ ধীর স্থির অচঞ্চল থাকে না।

প্রেসিডেন্ট ঢাকা যাত্রা করলেন।

এদিকে পুব বাঙলা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চঞ্চলিত হয়ে উঠেছে। দেশের লোক দলে দলে শেখ সায়েবের পতাকার তলে জমায়েত হচ্ছে কিন্তু ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যুরোক্রেসি ধনপতির গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি মিলিটারি জুন্টা উঠেপড়ে লেগেছে, কী করে আওয়ামী লীগের সর্বনাশ করা যায়, গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হয়। কাঁড়া কাঁড়া টাকা আসতে লাগল সোনার বাংলায় স্পাই, গুণ্ডা এবং ভ্রষ্ট রাজনৈতিক কেনার জন্য। অবাঙালিরা তাদের সাহায্য করেছে প্রকাশ্যে। গায়ের জোরে বাহানা তৈরি করে পেটাচ্ছে আওয়ামী লীগের কর্মীদের। আওয়ামী লীগের পাবনার এমএলএ এবং খুলনার একজন লীগ কর্মীকে গুমখুন করা হল। স্বয়ং শেখকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করা হল— সে চেষ্টা চালু রইল।

অবাঙালিদের জিঘাংসা চরমে উঠল। গণনির্বাচনে তাদের 'ইসলামি' লিডারদের শোচনীয় পরাজয় তারা ভোলবার, ঢাকবার চেষ্টা করছে তাদের দম্ভ ঔদ্ধত্য চরমে চড়িয়ে, প্রকাশ্যে নিরীহ বাঙালিমাত্রকেই মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে। উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছে, 'দেখি তোমরা কী করে তোমাদের স্বায়ত্তশাসন পাও। মিলিটারি আমাদের পিছনে। তোমাদের ঠেঙিয়ে লম্বা করে

www.pathagar.com

ছাড়বে পয়লা, তার পর অন্য কথা।' ওদেরই প্ররোচনায়— ওনারাও তৈরি ছিলেন— পশ্চিম পাকের একাধিক কাগজে শেখ সায়েবের প্রচুর কুৎসাসহ 'খবর' বেরুতে লাগল— শেখ এমনই দম্ভী, ছলেবলে নির্বাচনে জয়লাভ করে এমনই উদ্ধত হয়েছে যে, সে বলে বেড়াচ্ছে যে, সে পশ্চিম পাকে তো আসবেই না, এমনকি আমাদের সদর-উস-সদর জিল্লুল্লা (এ দুনিয়ায় আল্লার ছায়া) সুলতান-ই-আজম (কাইদ-ই-আজম জিন্নার পদবি মিলিয়ে তিনি 'সর্বশক্তিমান সুলতান') নিতান্ত যদি কর্তব্যের দায়ে অখণ্ড পাকিস্তানের একখানা ডানা যাতে কাটা না যায় যে, 'ইসলাম ইন ডেনজার' সে ইসলামকে ত্রাণ করতে এবং সর্বোপরি জান্-কা দুশমন ইন্ডিয়াকে প্রাণের ভয়ে থরহরি কম্পমান করার জন্য তিনি যদি সেই রদ্দি ওচা ঢাকা শহরে যান (আল্লাতালার অসীম করুণা যে সুবুদ্ধিমানের মতো অধুনা প্রলয়ঙ্কর বন্যাবিধ্বস্ত পুব পাকের না-পাক অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করতে গিয়ে তার দূষিত বায়ু এবং বিষাক্ত পানি সেবন করে অকালমৃত্যু বরণ করে শহিদ হননি), তবে নাকি ওই গুমরাহ শেখ তাঁর পূর্ণেন্দু-বদন দর্শন করে অক্ষয় বেহেশত হাসিল করার জন্য জনাব ইয়েহিয়ার বাসস্থল লাটভবনে যাবে না। সে বলেছে, প্রেসিডেন্টকে তার বাড়িতে যেতে হবে, তবে সে কথা কইবে। ওয়াস্তাগফিরুল্লা!

মিথ্যা নিন্দা প্রচার করার নানাবিধ পন্থা বিশ্বের ইতিহাসে ভূরি ভূরি মেলে। এ যুগের দুই ওস্তাদ দুটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে যশস্বী হয়েছেন। একজন ড. গ্যোবেলস। তিনি ধূলিপরিমাণ সত্যকথা নিয়ে তার ওপর নির্মাণ করতেন অভ্রংলিহ 'অকাট্য' মিথ্যার অ্যাফেল-স্তম্ভ। এক্ষেত্রেও তাই : গণনির্বাচনের পর থেকেই পশ্চিম পাকের সর্বত্র শেখের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করা হয়েছিল তার থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে সেখানে যেতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল। ধরে নেওয়া যাক এটুকু সত্য, কিংবা তিনি সত্যই সেখানে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার ওপর মিথ্যা গড়ে তোলা কঠিন নয়, ইয়েহিয়া স্বয়ং যদি ঢাকা আসেন তবে শেখ তাঁর সঙ্গে আদৌ দেখা করবেন না। সে মিথ্যার ওপর আরেকটা মিথ্যা চাপানো মোটেই কঠিন নয়; ইয়েহিয়াকে শুধু-পায়ে দাঁতে কুটা কেটে যেতে হবে শেখ-ভবনে (এস্থলে দুই প্রকারের প্রোপাগান্ডা করা যায় (ক) জরাজীর্ণ জলঝড় দুর্গন্ধময় বস্তিঘরে খেতে হবে মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে কিংবা (খ) প্রাসাদোপম রাজসিক বিরাট অট্টালিকা ভবনে— যেটা নির্মাণের অফুরন্ত ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছেন ইন্দিরা-বিড়লার কাছ থেকে)। শেষোক্ত অংশটি পশ্চিম পাকবাসীর জন্য : সেখান থেকে কে ঢাকায় এসে যাচাই করতে যাচ্ছে, সত্য কোন হিরণ্ময় কিংবা মৃন্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন?

তাই বোধহয় কবি বায়রন গেয়েছিলেন :

"শেষ হিসেবেতে তবে
মিথ্যাই বা কী?
মুখোশ পরিয়া সত্য
যবে দেয় ফাঁকি।'
And, after all, what is a lie?
'Tis but
The truth in masquerade'

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে হিটলার 'মারি তো হাতি—' পন্থায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *মাইন কাম্‌প্‌ফে* তিনি বলেছেন :

'ক্ষুদ্রাকার মিথ্যার চেয়ে বিরাট কলেবর মিথ্যাকে জনসাধারণ অনেক অনায়াসে মেনে নেয়।'

তার আড়াই হাজার বছর পূর্বে রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মচিন্তা করতে গিয়ে প্লাতো প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, 'এমন একটা জাজ্বল্যমান মহৎ মিথ্যা কী কৌশলে নির্মাণ করা যায় না যেটা এমনই স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে যে সমাজের তাবজ্জন সেটা মেনে নেবে।'

ইয়েহিয়া ডিকটেটর। হিটলারের তুলনায় যদিও তাঁর উচ্চতা 'ব্যাঙের হাতে সাত হাত'। তাই তিনি হিটলারি পন্থায় গণনিধন পর্ব আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর নীতির সাফাই গাইতে গিয়ে একাধিক কারণের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেন যে, তিনি ঢাকাতে থাকাকালীন শেখ মুজিব তাঁকে বন্দি করার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণজন এ বাক্যটি লেখার পর অতি অবশ্যই বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবেন। আমি দিইনি কারণ বুদ্ধিমান না হয়েও নিতান্ত যোগাযোগবশত আমি হিটলারি কায়দা-কেতার সঙ্গে সুপরিচিত। এমনকি এরকম একটা প্লীহাচমকানিয়া বম্‌বশেল ফাটানোর পর আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে ইয়েহিয়া যে আধুলি দামের টিকটিকির উপন্যাসকে টেক্কা মারার জন্য বলেননি, 'তার পর আওয়ামী লীগের কসাইরা আমাকে নিয়ে কী করত সেটার কল্পনাতেই আমার গা শিউরে উঠে; আমি অতিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই, শেখ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হিন্‌ডু গডেস-এর সামনে কিরে কেটেছে সে আপন আঙুল দিয়ে আমার চোখ দুটি ওপড়াবে, বেঙ্গলি উয়োমেনস মাছকাটার বিগ নাইফ দিয়ে আমার কলিজা বের করে গয়রহ, ইয়াল্লা আল্লা বাঁচানেওলা'— এসব যে বলেননি তাতেও আমি বিস্মিত হইনি। কারণ আমি জানি, ইয়েহিয়া নিতান্তই একটা ছ্যামড়া ডিকটেটর, এবং সে-ও নির্জলা ভেজাল ডিকটেটর। হত হিটলার, হত মুসসোলিনি তবে জানত কী করে মিথ্যের পুরা-পাক্কা মনোয়ারি জাহাজ বোঝাই করতে হয়, আলিফ বে থেকে ইয়া ইয়ে তক।

সন্দেহপিচাশ পাঠক এস্থলে আপত্তি জানিয়ে বলবে, 'এ-ও কখনও হয়? ঢাকাতে তাঁর লোক-লশকর গিসগিস করছে। কমপক্ষে ষাট হাজার খাস পশ্চিম পাকের সেপাই রয়েছে। সর্বোপরি টিক্কা খানের পাক্কা পাহারা।'

ঘড়েল সব-জান্তা : 'ওইখানেই তো সরল রহস্য। এত শতের মধ্যেখান থেকে যদি ইয়েহিয়া হাওয়া হয়ে যান তবে সন্দেহটা অর্সাবে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র মিলিটারি জুন্টার ওপর। ওরা মুজিবের সঙ্গে ইয়েহিয়ার ঢলাঢলিতে তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মার্চের পয়লা থেকে পঁচিশ অবধি পূর্ব পাকের রাজা ছিল কে? ইয়েহিয়া, না টিক্কা না— রাজা তখন কে? মুজিব।'

কিন্তু বৃথা তর্ক। মোদ্দা কথা এই, পশ্চিম পাকের লোক ইয়েহিয়ার রহস্য-লহরি সিরিজের নবতম অবদান বিশ্বাস করেছিল।

বস্তুত ব্যাপারটা ছিল ঠিক উল্টো। প্লট করা হয়েছিল ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর মুজিব-ভুট্টোতে মোলাকাত হবে আলাপ-আলোচনার জন্য। পরদিন ২৬ মার্চ সকালে তাঁরা দু জন যাবেন গভর্নর ভবনে ইয়েহিয়ার সঙ্গে সে আলোচনার ফলাফল জানাতে। ভুট্টোর 'শকুনি মামা' মি. Khar[১]

১. শব্দটার উচ্চারণ যদি 'খার্' হয় তবে অর্থ 'কাঁটা'; যদি 'খর্' হয় তবে অর্থ 'গর্দভ'। বাংলা 'খড়' হওয়ার সম্ভাবনা কম।

www.pathagar.com

নানা অজুহাতে শেখকে রাজি করাবেন, এবারের (শেষবারের মতো?) তিনি যেন ভুট্টোর আস্তানা ইন্টেরকন্টিনেনটলে আসেন। পথমধ্যে টিক্কার গেরিল্লা স্কোয়াডের গুপ্তঘাতকরা তাঁকে খুন করবে। ওদিকে ইয়েহিয়া বেলা পাঁচটায় সঙ্গোপনে প্লেনে উড়বেন করাচি বাগে। যদি প্ল্যানটা উৎরে যায় তবে ইয়েহিয়ার নিষ্ক্রমণক্ষণ সাড়ম্বরে প্রচার করে তাঁর জন্য নিরন্ধ্র 'এলিবাই' স্থাপনা করা যাবে। ওদিকে বলা হবে মুজিব-বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দল তাঁকে খুন করেছে।

এ প্ল্যান তো খাঁটি হিটলারি প্ল্যানের ঝাঁ চকচকে পয়লা কার্বন কপি।

গ্যোরিং হিটলারে মিলে পোড়ালেন রাইষসটাগ। পুরো দোষটা চাপালেন কম্যুনিস্টদের স্কন্ধে।

গ্যোরিং হিটলার হিমলারে মিলে র‍্যোম, এর্নস্ট আর্দি, ব্রাউনশার্টকে করলেন খতম। প্রচার করলেন ব্রাউন শার্টরা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেছিল, হিটলার এবং নাৎসি পার্টিকে খতম করে চতুর্থ রাইষ প্রতিষ্ঠা করার।

তবে কিজিলবাশ দারওয়ান আর অস্ট্রিয়ান করপরলে পার্থক্য কোথায়? করপরল হিটলার দুশমনকে ঘায়েল করে, তার পর কেচ্ছা রটায়। দারওয়ান সেটা আদৌ করে উঠতে পারেনি। কেন? কারণ সে প্রোমোশন পেয়ে ডিকটেটর হয়। ক্লিনার যেরকম প্রোমোশন পেয়ে হ্যান্ডিমেন হয়। আইয়ুবের শূন্য গদিতে জুন্টা তাকে প্রোমোশন দিয়ে ডিকটেটর বানিয়েছিল। হিটলার, মুসোলিনি, স্তালিন বিস্তর যুঝে, প্রচুর আত্মত্যাগ করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তবে তারা ডিকটেটর হয়েছিল। আর্ম-চেয়ার পলিশিয়ানের মতো ইয়েহিয়া আর্ম-চেয়ার ডিকটেটর। কদু কুমড়ার কুরবানি হয় না।

ভেজাল, ভেজাল, কুল্লে মাল ভেজাল। ইয়েহিয়া ভেজাল হিটলার, টিক্কা ভেজাল হিমলার, পিরজাদা ভেজাল গ্যোরিং।

কিন্তু কি ভেজাল কি খাঁটি মাল এদের পরমাগতি একই;

ওই হেরো, ঘৃণ্য শব
    পাপাচারী দুরাত্মার
রোস্ট করে শয়তান
    খাবে তার গোস্তের ডিনার!

Here lies the carcass
    of a cursed sinner.
Doomed to be roasted
    for the Devil's dinner.

'বীরের সবুর সয়।'

মহাড়ম্বরে প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া খান ঢাকায় পৌঁছলেন।

শেখ সাহেব ইতোপূর্বেই প্রকাশ্যে একাধিকবার বলে রেখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট পুব বাঙলায় আসছেন সম্মানিত মেহমান রূপে।

www.pathagar.com

কাজেই উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় এবং ছয় দফা নিয়ে আলোচনা হার্দিক বাতাবরণের ভিতর দ্রুতগতিতে একদিনের ভিতর সুসম্পন্ন হল। এস্থলে স্মরণ রাখা ভালো যে এ মোলাকাতের প্রায় দু মাস পর ইয়েহিয়া যখন ফের শেখের সঙ্গে 'আলোচনা' করার জন্য ৮/৯ মার্চে ঢাকা আসেন তখন 'আলোচনার' সময় লেগেছিল প্রায় ষোল দিন। পুরো পাক্কা পক্ষাধিক কাল। এই বৈষম্যের কারণটি অতি সরল। প্রথম ভেটে ইয়েহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবকে মাত্র একটি সরল ধাপ্পা দেওয়া : 'আমি আপনার ছয় দফা কর্মসূচিতে আপত্তিকর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে তবে কি না ভুট্টোর সঙ্গে... ইত্যাদি।' অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে ভুট্টোর সঙ্গে একটা ফয়সালা করে নিলে ভালো হয়।

এটা ১৩/১৪ জানুয়ারি ১৯৭১-এর ঘটনা।

১৪ তারিখে ইয়েহিয়া রওনা দিলেন পিণ্ডিপানে। ঢাকা অ্যারপোর্টে তিনি যে, 'খোলাখুলি দিলদরিয়া' মেজাজে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন তার একটুকরো— ভুট্টো সংক্রান্ত— পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাকির আরও কিছুটা এস্থলে কীর্তনীয়। যথা :

ইয়েহিয়া : 'শেখ সাহেব আমাদের আলোচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে (এবসল্যুটলি) সত্য। তিনিই এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

জনৈক সাংবাদিক : 'আপনি এখন দেশের প্রেসিডেন্ট। শেখ মুজিবের সঙ্গে আপনার যে আলোচনা হল, সে সম্বন্ধে আপনার ধারণার কিছুটা আমরা শুনতে চাই।'

ইয়েহিয়া : 'শেখ সাহেব যখন কর্মভার গ্রহণ করবেন (টেক্‌স্ ওভার) আমি তখন থাকব না (আই উন্‌ট্ বি দ্যার)। শিগগিরই এটা তার গভর্নমেন্ট হবে।'

জনৈক রিপোর্টার : 'শেখ মুজিব বলেছেন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সন্তুষ্ট। আপনিও কি সন্তুষ্ট?'

ইয়েহিয়া : 'হ্যাঁ।'

এ সখী-সংবাদ পড়ে যে কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। তাই বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন যে পুব বাঙলার লোক তখন উল্লাসে আত্মহারা। দু-শো বছরের পরাধীনতা শেষ হতে চলল। জয় বাংলা, জয় আওয়ামী লীগ।

এই উদ্দাম আনন্দনৃত্য দেখে কেমন যেন মনে হয়, আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিরা যেন ঈষৎ বিচলিত হন। তাঁরা তো রাতারাতি ভুলে যাননি, পশ্চিম পাকের শকুনি মামারা কী প্রকারে শের-ই-বাংলা ফজলুল হককে পর্যন্ত বিড়ম্বিত করেছে। আর আজ? হঠাৎ?

পরবর্তীকালে এটা পরিষ্কার হল। ইয়েহিয়া পঁচিশে মার্চ তার মুখোশ খুলে উৎকট প্রেতনৃত্য আরম্ভ করার পর যে 'বাংলাদেশ' সরকার নির্মিত হল তার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সেদিনই, ১৭ এপ্রিল এক প্রেস কনফারেনসে ইয়েহিয়া-মুজিব ভেট বাবদে যা বলেন তার একাংশের মোটামুটি সারমর্ম এই :

লীগের ছয় দফা বাবদে ইয়েহিয়ার যে বিশেষ কোনও গুরুতর আপত্তি আছে তার আভাসও তিনি দেননি। লীগ কিন্তু প্রত্যাশা করেছিল, (ছ-দফাতে ইয়েহিয়া যখন কোনও আপত্তি তুলছেন না, এবং এই ছ-দফার ভিত্তির ওপরই লীগ অ্যাসেমব্লিতে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান নির্মাণ করবেন তখন) ইয়েহিয়া ভবিষ্যৎ সংবিধানের স্বরূপ সম্বন্ধে আপন ধারণা

www.pathagar.com

প্রকাশ করবেন। তা না করে তিনি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লীগ যেন ভুট্টোর পার্টির সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নেয়।

তাজউদ্দীন সাহেবের এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকরা স্থির করবেন, 'হে আওয়ামী লীগ, ভুট্টোর সঙ্গে একটা সমঝোতা কর— ' ইয়েহিয়ার এই নির্দেশের মধ্যে 'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'-র মারণাস্ত্রটা লুকিয়ে রেখে গেলেন কি না?

কারণ মোটামুটি ওই সময়েই, খুব সম্ভব ১২ জানুয়ারি, জনৈক সাংবাদিক ইয়েহিয়াকে জিগ্যেস করেন, পুব পাকিস্তান যদি অ্যাসেমব্লিতে এমন একটা সংবিধান নির্মাণ করে সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হয় তবে ইয়েহিয়া কি সে সংবিধানে সম্মতি দেবেন? ইয়েহিয়া উত্তরে বলেন, এটা একটা কাল্পনিক (হাইপথেটিকাল) প্রশ্ন; এর উত্তর তিনি দেবেন না।

মোটেই হাইপথেটিকাল প্রশ্ন নয়।

আজ যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কেউ প্রশ্ন শুধোয়, 'কাল যদি রাশা বিনা নোটিশে ব্রিটেন আক্রমণ করে তবে প্রধানমন্ত্রী তার জন্য কোন কোন প্রস্তুতি কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন' তবে প্রধানমন্ত্রী স্মিতহাস্য সহকারে বলবেন, 'এটা কাল্পনিক প্রশ্ন; কারণ বিশ্বসংসার জানে, রাশার সঙ্গে ব্রিটেনের এমন কোনও দুর্বার শত্রুতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, বা রাশার কি দোস্ত কি দুশমন কেউই হালফিল ঘুণাক্ষরে একথা বলেননি যে রাশা গোপনে গোপনে এমনই প্রস্তুতি করেছে যে দু একদিনের ভিতর বিলেতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব এ প্রশ্নটা অবাস্তব— হাইপথেটিকাল।

কারণ যদিও মি. ভুট্টো তখন পর্যন্ত তাঁর সবকটা রঙের তাস টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে হুমকি ছাড়েননি যে যারা অ্যাসেমব্লিতে যাবে তিনি তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন তথাপি কোনও রাজনৈতিক, বিশেষ করে ইয়েহিয়া জানতেন না যে ভুট্টো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তীব্রতম বৈরীভাব অবলম্বন করেছেন? নইলে স্বয়ং ইয়েহিয়াই বা কেন ওই সময়েই লীগকে নির্দেশ দিতে গেলেন, ভুট্টোর সঙ্গে একটা ফয়সালা করে নিতে? তা হলে পূর্বোক্ত প্রশ্নটি হাইপথেটিকাল আকাশকুসুম গোত্র লাভ করল কী করে?

তবু যদি ইয়েহিয়া জেদ ধরে বলেন, না, তিনি ভুট্টোর কোনও বৈরীভাবের কথা জানেন না, তা হলে তো জনাব তাজ অনায়াসে বলতে পারেন, 'তবে তো হুজুরের নির্দেশ একদম খাঁটি "হাইপথেটিকাল নির্দেশ"। আপনি যখন বলতে পারবেন না, ভুট্টো দুশমনির অমুক অমুক স্টেপ নিয়েছেন (পূর্বের উদাহরণ অনুযায়ী কেউ যখন আদৌ কোনও খবর পায়নি যে রাশা কাল ব্রিটেন আক্রমণ করবে) তা হলে আমরা, মেজরিটি পার্টি অযথা কান-না-লেনেওয়ালা চিলের পিছনে ছুটে ছুটে শেষটায় মিনরিটির হাওয়াই কোমরে রশি বাঁধতে যাব কোন হাইপথেটিকাল ত্রাসের তাড়নায়? ও করে কাল আমার চারখানা হাতও গজাবে না, তার জন্য আজ চারখানা দস্তানাও কিনব না।'

ওদিকে বাংলাদেশের যুব-সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে— বিশেষ করে যখন বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ইয়েহিয়া ঢাকাতে কখন অ্যাসেমব্লি ডাকবেন সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর দিতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। ওদের বক্তব্য তাদের ছয় পয়েন্টের বিরুদ্ধে ইয়েহিয়া যখন

www.pathagar.com

কোনও আপত্তি তোলেননি— আর এ-খ-ন তুললেই বা কী— তবে অ্যাসেমব্লি ডাকতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে বার বার এ ঘটনা ঘটেছে। জনতা অসহিষ্ণু; নেতারা দেখছেন, আঘাত করার মতো সময় এখন আসেনি। বিকল্পে : নেতা আহ্বান করছেন, ওঠো, জাগো; জনতা তন্দ্রাচ্ছন্ন।

মূল কথা, মূল তত্ত্ব টাইমিং। বহু ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পরিষ্কার ধরা পড়ে, সমস্ত পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল টাইমিঙের গোলমালে।

ইংরাজিতে তাই বলে :

লোহা গনগনে থাকতে থাকতেই মারো হাতুড়ির ঘা।

সংস্কৃত সুভাষিত বলে :

যৌবন থাকতেই কর বিয়ে। পিত্তি চটিয়ে খেয়ো না।

কিন্তু যে নেতার মনে দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে তাঁর কাছে অগ্নি নির্মাণের যথেষ্ট সামগ্রী সঞ্চিত আছে, যদৃচ্ছ লৌহখণ্ডকে তপ্তাতিতপ্ত করতে পারেন তাঁর তন্মুহূর্তেই হাতুড়ির আঘাত হানবার কী প্রয়োজন?

এবং বিজ্ঞজন মৃদু হাস্য করে বলেন, তড়িঘড়ি মামেলা খতম করাই যদি সবচাইতে ভালো কায়দা হত তবে (বাইবেলে) সদাপ্রভু সৃষ্টি নির্মাণে পুরো ছটি দিন খর্চা করলেন কেন? তিনি তো আঁখির এক পলকে শতলক্ষ গুণে বৃহত্তর লক্ষ কোটি সৃষ্টি নির্মাণ করতে পারতেন।

কিন্তু প্রবাদ, ঐতিহাসিক নজির, গুণীজনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীর ওপর নির্ভর করেই তো জননেতা সবসময় আপন পথ বেছে নেন না। তবে এ স্থলে আমরা একটি উত্তম 'কাব্য-কমপাস' পাচ্ছি।

যাকে বলে 'ডে টু ডে পলিটিকস', তার কোনও গাইড-বুক শেখ-গুরু কবিগুরু রেখে যাননি। তবে যখন চিরন্তন রাষ্ট্রনীতিতে বাহুর দম্ভ, ক্রুদ্ধ প্রভু, রাজার প্রতাপ চিৎকার করে দুঃখ দেবার বড়াই করে তখন তিনি তাঁর সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, তাঁর 'গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথকে 'বেঙ্গল অর্ডিনেনসের' জুলুম মদোন্মত্ত জনের আস্ফালনের মতো কত যে হেয়-বিড়ম্বিত ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে সত্য যে 'নিত্যকালের সোনার রঙের লিখা তিলক ধারণ করে আছেন' সে বাণী ছন্দে প্রকাশ করে বলেন :

'জানি, তুমি বলবে আমায়
থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়,
শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগবো মনে,
করো না সেই ভয়,
সময় আমার কাছে বলেই
এখন সময় নয়।'

তাই দেখতে পাই,

www.pathagar.com

'সময়েরে ছিনিয়ে নিলে
হয় সে অসময়
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর
প্রেমের সবুর সয়।
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো
এক দমকের বায়ু
সবুর করতে পারে এমন
নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া
ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায়
বেড়ায় ছুটে ছুটে।'

ইয়েহিয়া আর তার জুন্টা জানে পুব বাঙলায় তাদের আয়ু প্রায় শেষ,

'আজ আছে কাল নাই বলে তাই
তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায়
বাড়াবাড়ির চালে!
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে
দুঃখীর বুক জুড়ি[১]
ভগবানের ব্যথার পরে
হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।'

পুব বাঙলার লোকের সঙ্গে তারা তো কখনও মৈত্রীর ডোর বাঁধতে চায়নি, তারা চেয়েছিল পলে পলে তিলে তিলে রক্তশোষণ করতে :

"তাই তো প্রেমের মাল্যগাঁথার
নাইকো অবকাশ।
হাতকড়ারই কড়াক্কড়ি,
— দড়াদড়ির ফাঁস।
রক্ত রঙের ফসল ফলে
তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায়
বোঝাই করে নিজে।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,

১. এ যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির বাণী : ঢাকার রাস্তায় নিরীহজনের বুকের উপর দিয়ে পিশাচপাল ট্রাঙ্ক চালাবে।

www.pathagar.com

অনন্তদেব শান্ত থাকেন,
ক্ষণিক অপচয়ে।'

আদি কবি বাল্মীকি রাবণের রাক্ষস-রাজ্যের বীভৎসতা মূর্তমান করার জন্য কাব্যলোকের প্রথম প্রভাতে কাঠবেড়ালি মোতিফ অবতারণা করেছিলেন, কবিগুরু তাই সেই পন্থায় চললেন 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে'।

কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় যার আছে সে আত্মসংযম করতেও জানে বলে, শেখজি একমাস সময় দিলেন ইয়েহিয়াকে। একমাস পরে ডাকো এসেমব্লির অধিবেশন।

যক্ষ রক্ষ গুপ্ত

এইবারে সেই বিষয়টির অবতারণা করতে হয় যেটি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমরা পাইনি।

কোনও সন্দেহ নেই, ভবিষ্যৎকালের ঐতিহাসিকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি করবেন। খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য ইহুদিরা দায়ী, না অন্য কেউ, সে নিয়ে যেরকম দু হাজার বছর ধরে শব্দার্থে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে পণ্ডিতে পণ্ডিতে অকৃপণ মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এবং হবে, তথা পরোক্ষভাবে হিটলারের গ্যাস চেম্বার নির্মাণে যার পরিণাম। এস্থলে সমস্যা, একাত্তরের মধু ঋতুতে বাংলাদেশকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দায়ী কে? এস্থলে লক্ষণীয় প্রায় ওই একই ঋতুতে খ্রিস্টকে হত্যা করা হয়। এবং চরম লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশটাকে জবাই করা হয় মহরম মাসে— যে মাসে তেরশো বছর পূর্বে, হজরত ইমাম হুসেনকে ইয়েজিদের জল্লাদরা কারবালাতে জবাই করে। বস্তুত আমার আচারনিষ্ঠ ছোটবোনকে ২৫ মার্চের উল্লেখ করতে বললে, 'আমাদের মধ্যে তখন বলাবলি হয়েছিল, ইয়েহিয়া শিয়া। শিয়ারা আপ্রাণ চেষ্টা দেয় পাক মহরমের চাঁদে যেন কোনওপ্রকারের অপকর্ম, গুনাহ্ না করে আর ইয়েহিয়া শিয়া হয়ে এই পবিত্র মাসেই যে কবিরা গুনাহ (মহাপাপ) করলেন সেটা যে সুন্নি ইয়েজিদকেও নৃশংসতায় ছাড়িয়ে গেল।'

অবশ্য সে সময়ে সামান্যতম মুষ্টিমেয় বাঙলাবাসী জানত যে ইয়েহিয়া শিয়া এবং ভিতরে ভিতরে কট্টরতম শিয়া।

কিন্তু '৭১-এর মার্চে ওই বৎসর সূর্য ও চন্দ্রের এক বিপরীত যোগাযোগের ফলে উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সে সংঘাতের কাহিনী অতি সংক্ষেপে এই :

ধর্মকর্মের পালপার্বণ, তাবৎ অনুষ্ঠান ইরান-তুর্কমান মাত্রই চান্দ্রমাস পঞ্জিকা অনুযায়ী সুন্নিদের মতোই পালন করে। কিন্তু নিত্যদিনের ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন সমস্যার সমাধান করে সৌর গণনা অনুসারে। ফলে চান্দ্রমাস, শোকাশ্রুসিক্ত মহরম, বছর তিরিশেকের মধ্যে একবার না একবার মোটামুটি একই সময়ে হাজির হবেন ইরানিদের জাতীয়, দ্বিসহস্র বৎসরাধিক কালের ঐতিহ্য-সম্বলিত নওরোজ = নববর্ষ পর্বের সময়। সেটা আসে মোটামুটি

www.pathagar.com

২১ মার্চ নাগাদ। সেদিন ইরান তুরানে যা আনন্দোৎসব হয় তার সঙ্গে বড়দিন বা হোলি পাল্লা দিতে পারে না। বিশেষ করে তামাম দেশটা জুড়ে সেদিন যে শরাবের বান জাগে তার মুখে দাঁড়ায় কোন পরবের সাধ্যি!

সর্বশেষে, প্রকাশ থাকে যে— ইয়েহিয়ার চেলাচামুণ্ডা টিক্কা নিয়াজি, এস্তেক তেনার এক ভাঁড়ের ইয়ার মিস্টার ভুট্টো জগঝম্পসহ হুহুঙ্কারে যেটিকে ঘোষণা করতেন সর্বপ্রথম— ঠিক ২৫ মার্চ তারিখে, দু-বৎসর পূর্বে ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের স্থলে 'কাফির' নিধনার্থে কল্কিরূপে ইসলামাবাদ সিংহাসন আরোহণ করেন শিয়া পোপ ইয়েহিয়া। অকৃপণ প্রসাদপ্রাপ্ত ওয়াকিফহাল মহল আজও সে মহালগনের স্মরণে বলেন, 'সেদিন পাক ইসলামাবাদে যে পাকনাপাকাতীত শ্যামপেন বুদ্বুদ উত্থিত হয়ে আসমান-জমিন ত-র্-র্-র্ করে দিয়েছিল তারই ফলে রাওয়ালপিণ্ডির আবহাওয়া দফতর সবিস্ময়ে প্রচার করে যে নর্মাল ১০% থেকে সে রাত্রে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ৯৯%-এ পৌঁছেছিল এবং পূর্বাভাসে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে শ্যামপেন-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এটা অবশ্য ১৯৬৯-এর মার্চের কথা।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চে কিন্তু ইয়েহিয়া খান যখন পিণ্ডি যাবার জন্য বেলা পাঁচটায় ঢাকা বিমানবন্দরে প্লেনে ওঠেন, তখন সে প্লেনের দরজা বন্ধ হতে না হতেই প্লেন টেক্-অফের কড়া কানুন হেলা-ভরে উপেক্ষা করে অ্যার হোসটেস প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিলেন হুইস্কি সোডা। ঝটপট দ্বিতীয়টা। এবারে শ্যামপেন নয়। সে সুধা মোলায়েম। এবারে রুদ্রাগ্নি হুইস্কি।

শুনেছি, রোম ভস্মীভূত করার আদেশ দেবার সময় নিরোর এক হাতে ছিল বেহালা অন্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পদনিম্নের ভূমির দিকে অবনত করে প্রচলিত রুদ্রমুদ্রা দেখান, যার অর্থ 'ভস্মীভূত কর রোম'!

কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটা শোনা কথা নয়। নিরেট সত্য।

ইয়েহিয়ার এক হাতে ছিল হারাম শরাব, অন্য হাত দিয়ে কৃতান্ত মুদ্রা দেখালেন জল্লাদকে— 'কৎল-ই-আম্ চালাও বাঙ্গালমে। সট দেম আউট।'

কোথায় গেল শোকাশ্রুসিক্ত মহরমের অশৌচ, কোথায় গেল ধর্মের বিধিনিষেধ? হে হবু পলিটিশিয়ান, শিখে নাও তবে দক্ষযজ্ঞের উচাটন মন্ত্রারম্ভের পূর্বে ইয়েহিয়ার নর্ম ললিতা গীতি।

বিধিবিধানের শীত-পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন কর
বিহঙ্গযানে মোরা দুই জান্
ফাগুন আগুন দহন কর।

ইরানের শীতকালে প্রকৃতি অতিশয় অকরুণ— অসংখ্য প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। তাই ধর্মের 'বিধিবিধানকে' দুর্বিষহ শীতবস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার পর আসে নবজীবনদায়িনী 'ফাগুন আগুন'। তাই নিবন্ধারম্ভে চিন্তা করেই বলেছি, 'মধু ঋতুতে বাংলাদেশকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।'

বাংলাদেশের ৯৯% নরনারীর দৃঢ়বিশ্বাস এই ক্রুশপর্বের কাপালিক ইয়েহিয়া এবং তার মিলিটারি জুন্টা। পাকিস্তানের ওয়াকিফহাল মহলের এক নাতিবৃহৎ অংশ ভিন্নমত পোষণ করেন।

নিরপেক্ষ জনৈক ভারতীয় চিন্তাশীল সেনাপতি গত এপ্রিলে পরলোকগত লেফটেনেন্ট জেনরেল ব. ম. কল (B. M. Kaul) সদ্যোক্ত ওয়াকিফহালদের মতোই ভিন্নমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন জুলাই ১৯৭১-এ প্রকাশিত তাঁর উত্তম গ্রন্থ ‘কনফ্রনটেশন উইদ পাকিস্তান’-এ। পিণ্ডি ইসলামাবাদের মিলিটারি জুন্টার বহু সিনিয়ারতম শিকরে পাখিকে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। তিনি বলেন :

১৯৭০-এর গণনির্বাচনের পর একাধিক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেল শেখ মুজিব এবং ইয়েহিয়া খানের মধ্যেই এই মর্মে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়ে গিয়েছে যে, শেখ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করবেন এবং ইয়েহিয়া পূর্বের ন্যায় প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

সেনাপতি কল তার পর বলছেন, ‘কিন্তু যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন দুই নেতার কেউই ভুট্টোর দুষ্ট চক্রান্ত করার সামর্থ্য যে কতখানি সেটা হিসাবে ধরেননি (মেক এলাওয়েন্স্ ফর দি মিস-চিফ-মেকিং কেপাসিটি অব ভুট্টো।)’

কী সে মিসচিফ বা নষ্টামি? তার পটভূমি কী?

গণনির্বাচনের প্রায় দুই মাস পূর্বে, অক্টোবর ১৯৭০ সালেই পশ্চিম পাকবাসী অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তান অ্যারফর্সের প্রধান, অ্যার মার্শাল নূর খান লাহোরের নিকটে এক জনসভায় বলেন, ‘মি. ভুট্টো দীর্ঘকাল ধরে সরকারি মহলের সঙ্গে দহরম মহরম জমিয়ে এখন চেষ্টা করছেন পাকিস্তানে যেন ডিক্টেটরি শাসন কায়েম থাকে এবং চালবাজি মারফত তিনি যাতে করে খিড়কির দরজা দিয়ে ক্ষমতা লাভ করে ফেলেন।’ একদম খাঁটি কথা। কিন্তু এর পর নূর খান যে প্রশ্ন শুধোচ্ছেন সেটির দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

‘ “ভূতপ্রাপ্ত” এক ডিক্টেটরের এই শাগরেদ ভুট্টো যবে থেকে তাঁর প্রভুকে গুত্তা মেরে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হল সেই থেকে নাগাড়ে ঝাড়া আঠারোটি মাস ইয়েহিয়া শাসনের সবকিছু ধৈর্যসহ বরদাস্ত করার পর এখন আচমকা কেন আর কুছভি বরদাস্ত করতে চাইছেন না? এ প্রশ্ন শুধোবেন যে কোনও স্থিতধী জন।’

নূর এ-প্রশ্নের উত্তর জানতেন।

আমরাও কিছুটা জানি।

আইয়ুবের পতনের পর এক পশ্চিম পাকি কাষ্ঠরসিক ঠোঁট-কাটা মন্তব্য করেন, বহুবার কোটিপতি, সার্ডিনিয়ার গোপন গহ্বর— ধনপতি ‘আলিবাবা তো গেল, কিন্তু চল্লিশটে চোর রেখে গেল যে।’ এরা ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র। ব্যুরোক্রেট ব্যাঙ্কপতি সদাগর ইত্যাদি করে করে খুদ আর্মি তক্। এই গেল পয়লা নম্বর।

দোসরা : সর্বদেশ-প্রেমী দ্বারা অভিশপ্ত বাইশটি শোষক পরিবার।

হরেদরে গলাজল হয়ে একুনে দাঁড়ায় কিন্তু এক বিকট ত্রিমূর্তি।

যজ্ঞ (ধনপতি— বিশেষ করে সেই ২২), রক্ষ (আর্মি) এবং চিত্রগুপ্ত (আমরা পাল)।

ইয়েহিয়া আসনে বসামাত্রই ভুট্টো মারলেন ডুব। তাঁর লক্ষ্য ছিল দুটি : আয়ুবকে সরিয়ে জিন্না দিয়ে সেকেন্ড হওয়ার পথ সুগম করা। দুই : কিন্তু জিন্না ছিলেন পুব-পশ্চিম দুই পাক-ডানার উপর সওয়ার ফাদার অব দি নেশন। এর একটি ডানা অটনমি পেয়ে গেলে তিনি হয়ে যাবেন এজমালি জুনিয়ার ফাদার অব দি নেশন। অতএব ঘায়েল করতে হবে আওয়ামী লীগকে। মূলত ভুট্টো-পার্টির একটা শাখা পূর্ব পাকেও ছিল। তার চেয়ারম্যান ছিলেন মুসলিম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বাঙালি মৌলানা নুরজ্জমান। ভুট্টো দেখলেন, বাংলাদেশের সর্বনাশ করে তাকে পশ্চিম পাকের চিরন্তন ক্রীতদাস বানাতে হলে তাঁর পার্টিতে পুব পাকের কোনও সদস্য

www.pathagar.com

রাখলে সে তাঁর হুকুমমতো নেমকহারাম কুইজলিং সাজতে রাজি না-ও হতে পারে। তাই তিনি তাঁর পার্টিকে নবরূপে দিলেন— আপন প্রদেশ সিন্ধুর কোনও নগরে নয় তাঁর আরাধ্যা, বল্লভা নগরী পাঞ্জাবি লাহোরে। মৌলানা নুরজ্জমান তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ভুট্টো লাহোরে তাঁর পার্টিকে নবরূপ দেবার সময় পুব পাকের কোনও নেতা বা সাধারণ জনকে আহ্বান জানাননি; তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা।

ভুট্টোর যে নিষ্ক্রিয় আঠারো মাস সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ কুটিল প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন অ্যার মার্শাল নূর খান সে আঠারো মাস ভুট্টো ছিলেন 'নীরব কর্মী'; তিনি তখন ষোড়শোপচারে পূর্বোক্ত ত্রিমূর্তির পূজার্চনায় নিরতিশয় নিমগ্ন। ভুল করলুম, ষোড়শ নয়, সপ্তদশ— বোতলবাসিনী তরলা-ভৈরবী। আর কে না জানে, সপ্তদশেই বঙ্গজয় সম্ভবে।

প্রথমেই নমো যক্ষায়। ধনপতিদের বোঝাতে রত্তিভর সময় লাগল না— 'পুব পাক হাতছাড়া হয়ে গেলে তুমি খাবে কী? কা তব কান্তা নয়— কা তব পন্থা হবে তখন?'

যে অর্থপ্লাবন ধেয়ে এল ভুট্টো ব্যাঙ্কের দিকে, কোথায় লাগে তার কাছে হিমাদ্রি শৃঙ্গ থেকে নেবে আসা পঞ্চনদের বন্যা!

এখানে হিটলারের সঙ্গে ভুট্টোর একটা সাদৃশ্য আছে। এদিকে হিটলারের পার্টির নাম ওয়ার্কারস্ পার্টি, ওদিকে কড়ি ঢালল কলোনের যক্ষ ব্যাঙ্কাররা! ওয়ার্কারসদের বুঝিয়েছেন, তোমাদের বাঁচাব ধনপতিদের শোষণ থেকে, আর ধনপতিদের সমঝালেন, তোমাদের বাঁচাব শ্রমিকদের ইউনিয়ন-নামক নুইসেন্স্ থেকে। ভুট্টো কী দিয়ে না-পাক ধনপতিদের বাগালেন সে তো বলেছি, তাঁর পিপলস পার্টির 'পিপল'কে বোঝালেন হুবহু হিটলারি কায়দায় গরম গরম লেকচার ঝেড়ে। পিপলকে অবহেলা করা চলে না, কারণ তাঁর পার্টি— ইষ্টমন্ত্র।

'ইসলাম আমাদের ধর্ম।
গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রনীতি।
সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।
সর্বপ্রভুত্ব জনগণের।'

হায় রে পূর্ব বাংলার জনগণ!

ব্যুরোক্রেটদের বললেন, 'ইংরেজ আইসিএসের চেয়েও রাজার হালে আছ পূর্ব পাকে। পশ্চিম পাকের কড়িটাও আসে পুব পাক থেকে। বাঙালরা অটনমি পেলে যাবে কোথায়?'

আর্মিকে শুধোলেন, 'তোমাদের সৌরী-সেনীয় শ্বেতহস্তীর মিলিটারি বাজেটের টাকাটা যে পুবালি চিড়িয়া সোনার ডিম পেড়ে সামলায় তার যে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব! সে পালালে পট্টি মারবে কী দিয়ে?'

এবং এদের আরও মোলায়েম করার জন্য তাদের পদপ্রান্তে রাখলেন পঞ্চমকারের বঢ়হিয়া বঢ়হিয়া সওগাত। ধনপতিগণ প্রসাদাৎ পূর্বলব্ধ অর্থদ্বারা।

ঝাড়া আঠারোটি মাস ভুট্টো করলেন এই তপস্যা। এবারে অ্যার মার্শাল নূর (= জ্যোতি)-এর রহস্যান্ধকারময় বঙ্কিম প্রশ্নের উপর সরল জ্যোতি বর্ষিত হল।

তপস্যান্তে যক্ষ রক্ষ গুপ্ত সমন্বিত ত্রিমূর্তি বদ্ধমুষ্টিতে ধারণ করে তিনি বেরুলেন জয়যাত্রায়।

www.pathagar.com

যে সম্প্রদায় মনে করেন বাংলাদেশকে ক্রুশে চড়াবার চড়ক-বাদ্যে ইয়েহিয়া মূল গায়েন নন তিনি মাত্র দোহার, বিলিতি বাদ্যে সেকন্ড ফিড্‌ল্‌ তাঁরা বলেন ভুট্টো যখন আজ হেথায় ব্যুরোক্রেট হুতোমদের ব্যানকুয়েট খাওয়াচ্ছেন, কাল হোথায় জাঁদরেল কর্নেলদের নৃত্য সম্বলিত ককটেল পার্টি দিচ্ছেন, পরশু খোজা-বোরো-মেমন ধনপতিদের গোপন জলসাতে তাঁর পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টি পিপলদের কুরবানি দিচ্ছেন যক্ষদের দরগাহতে— ইয়েহিয়া তখনও এসব পূজা-আচ্চা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কারণ এসব গুণীনদের মতে ইয়েহিয়ার তখনও সঙ্কল্প আওয়ামী লীগকে তার ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ কূটনৈতিক ভুবনে তাঁর তরে তখন গভীর নিস্তব্ধ তৃতীয় যাম। তিনি গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত চতুর্দিকে অবশ্য হুরী পরীরা তাঁর সেবাতে লিপ্ত।

এহেন সময়ে ভুট্টো দেবের আবির্ভাব।

সংখ্যালঘুর অনধিকারমত্ততা

জেনারেল কল-এর পুস্তকখানি প্রধানত রণনীতি সম্বন্ধে। তাই সেখানে রাজনীতির উল্লেখ কম— নিতান্ত যেটুকু পটভূমি হিসেবে বলতেই হয়, আছে মাত্র সেইটুকু। কারণ রণপণ্ডিত ক্লাউজেভিৎস তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন, 'পলিটিকস যখন আর এগোতে না পেরে অন্য বস্তুর সাহায্যে এগিয়ে চলে তখনই তার নাম যুদ্ধ।'

কল বললেন ইয়েহিয়া-মুজিবে মিলে গণতন্ত্রের যে কচি কোমল চারাটি পুঁতলেন সেটাকে উপড়ে ফেললেন ভুট্টো। তিনি তখন পশ্চিমা সেনাবাহিনীর আদরের দুলাল। তাঁর আপন ক্ষমতার নেশা তখন মাথায় চড়েছে। তিনি এখন আর এসেম্বলিতে বিরোধী দলের পাণ্ডা সেজে মুজিব মূল গায়েনের পিছনে পিছনে দোহার গাইতে রাজি নন।

তবু তিনি এলেন ঢাকায়। তার একমাত্র কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, শেষটায় রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন তিনি— এদ্দিন যা ছিল, ঠিক তেমনি, পুব পাক থাকবে তাঁর তাবেতে কলোনি রূপে। ইংলন্ডের রাজা যে রকম 'সমুদ্রের ওপারের ডমিনিয়নসেরও সম্রাট'। এবং দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা যেরকম কখনও-সখনও ভারতে এসে রাজানুগ্রহ দেখাতেন, ভুট্টোকেও তো সেরকম ঢাকাতে আসতে হবে মাঝেমিশেলে। তখন যেন তাঁর পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বেয়াড়া প্রজা না বলতে পারে, তিনি মুজিবকে তাঁর মুখারবিন্দ দর্শন লাভ থেকে অকারণ তাচ্ছিল্যে বঞ্চিত করেছিলেন।

ভুট্টোদেব ঢাকা এলেন বিস্তর সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে। প্রিনস অব ওয়েলস যেরকম পাত্রমিত্র নিয়ে দিল্লি আসতেন।

ইয়েহিয়া যখন ভুট্টোর পূর্বে ঢাকা আসেন তখন তাঁর সে আসাটা আন্তরিক শুভেচ্ছাবশত ছিল কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভুট্টোর আগমনটা ছিল নির্ভেজাল ধাপ্পা। কোনওপ্রকারের সমঝোতাই তাঁর কাম্য ছিল না। তাই মারাত্মক রকমের সিরিয়াস কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ভড়ং চালালেন তিনি পাক্কা তিনটি দিন ধরে— যে আলোচনা তিন মিনিটেই শেষ হয়ে যাবার কথা। একবার তো তিনি

www.pathagar.com

সে থিয়েডারিটাকে প্রায় ফার্সের পর্যায়ে নাবিয়ে আনলেন একটানা ঝাড়া আটটি ঘণ্টা শুধু তিনি আর শেখ 'সলা পরামর্শ' করে। ও হো হো! সে কী টপমোস্ট সিক্রেসির ভান! মিঞা তাজ, নজরেরও সেখানে প্রবেশ নাস্তি। ভাবখানা এই, ভুট্টোদেব এমনই প্রলয়ঙ্করী প্রস্তাব প্রতিপ্রস্তাব পরিকল্পনা সুপারপ্ল্যানিং পেশ করবেন যে তার সামান্যতম রেশও যদি তৃতীয় ব্যক্তি শুনে ফেলে তবে ইন্ডিয়া সেই রেশের ওপর নির্ভর করে তদ্দণ্ডেই পাকিস্তান এটাক করবে, ওয়ালস্ট্রিট, ফট করে কলাপস করবে, ইংলন্ডের মহারানি তাঁর চাচা উইন্ডসরকে কোল-পাঁজা করে তুলে এনে তাঁর হ্যাটে কোহ-ই-নূরটি পরিয়ে দেবেন।

'কিবা হবে, কেবা জানে
সৃষ্টি হবে ফট্
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
হি টিং ছট।'

বিশেষ বিবেচনার পর আমি এস্থলে হি টিং ছটটি ব্যবহার করেছি কবিগুরু যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন ঠিক সেই অর্থে। আপাতদৃষ্টিতে অসাধারণ রহস্যময় কতকগুলি বুজরুকিকে যখন গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বময় তান্ত্রিক ধ্বনির মুখোশ পরানো হয় তখন সেটা হিং টিং ছট; সায়েবি ভাষায় আবরাকাডাবরা মাম্বোজাম্বো হাকাস পোকাস।

ভুট্টো শেখের এ রাঁদেভূতে লাভবান হলেন কে?

নিঃসন্দেহে ভুট্টো।

চাঁড়াল ভুট্টো শেখের সঙ্গে একাসনে বসতে পেয়ে পৈতে পেয়ে গেলেন।

ইয়েহিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবেন। তার প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করেছেন। তিনি স্বচ্ছন্দে একটি নিষ্কণ্টক সরকার নির্মাণ করতে পারেন। ইতোমধ্যে ময়দানের এক কোণ থেকে একটা লোক সার্কাসের ক্লাউন যেরকম ওস্তাদের কেরামতি খেল দেখে চেঁচাতে আরম্ভ করে, 'আমি পারি, আম্মো আছি— আমাকে ভুললে চলবে না', ঠিক সেইরকম একটা লোক হাত পা ছুড়ে বিকট চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করল, 'শেখের পরেই আমি, আমাকে ছাড়া চলবে না।' সার্কাসের ম্যানেজার সদয় মশকরার মুচকি হেসে হেসে 'তো, আও বেটা, বাতাও তুমহারা খেল।' ম্যানেজার ইয়েহিয়া বললেন, 'শাবাশ বেটা ভুট্টো।'

কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরে সর্বপ্রকারের অত্যাচার অবিচারের পর এই হয়েছে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন। তাই গোড়া থেকেই চলতে হবে অত্যন্ত সন্তর্পণে, আইনের পথে ন্যায়ের পথে— গণতন্ত্রের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যেসব উদাহরণ সৃষ্ট হয়েছে, নজির নির্মিত হয়েছে, সেগুলো প্রতি পদে সসম্ভ্রমে মেনে নিয়ে। এটা তো সার্কাস নয়। গণতন্ত্রে ভাঁড়ামির স্থান নেই— সে ছিল আইয়ুবের 'বেসিক ডেমোক্রাসিতে'।

'কে এই লোকটা?'

'আমি ভুট্টো; গণনির্বাচনে আমি দুই নম্বরের সংখ্যাগুরু। মুজিবের পরেই আমি। আমার সঙ্গে একটা রফারফি না করে সংবিধান বানালে চলবে না।'

'বা— রে—! এ তো বড়ি তাজ্জবকি বাত! মুজিবের পরেই তুমি! তা— সৃষ্টির ইতিহাস পড়লেই দেখি সদাপ্রভুর পরেই শয়তান। তাই বলে গড যখন সেরাফিম্ চেরাবিম্, গেব্রিয়েল

www.pathagar.com

নিয়ে ভগবানবাদে তাঁর ক্যাবিনেট নির্মাণ করলেন সেখানে তো শয়তানকে ডাকা হয়নি। এসব তাবৎ জঞ্জাল জড়ো করে তিনি বানাতেন কী? ঢাকা মিরপুরের চিড়িয়াখানা?

আর, বাই দি উয়ে, তোমার পর তো সংখ্যাগুরুতে ইনডিপেনডেন্ট ক্যানডিডেটস। তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়ে তার পর এখানে এসেছ তো? তুমি যেমন আমার ঠিক ঠিক নিচে বলে আমার সঙ্গে একটা রফারফির দাবি জানাচ্ছ, ঠিক তেমনি ওরাও তোমার উপর সেই দাবি চাপাচ্ছে না তো? করে করে তার পরের দলের দাবি তার উপরের দলের ওপর চাপাবে এবং লিস্টের সর্বনিম্নে যে চোরউল্ আমিন লিক্‌লিক্ করছে তাকে পর্যন্ত ভজতে পূজতে হবে। তার নামখানা থেকেই বুঝতে পারছ, ওর খাঁই মেটানো তোমার-আমার কম্ম নয়— থুড়ি, আমার কম্ম নয়, কিন্তু তুমি পারবে! তুমি যখন মহামান্য সুচতুর ইয়েহিয়াকে বোঝাতে পেরেছ যে, গণতন্ত্রের পয়লা আইন হচ্ছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরুর প্রথম কর্তব্য সে যেন সংখ্যালঘুর ন্যাকরা বয়নাক্কার তোয়াজ করে করে কাজকর্মের ভার নেয়, ক্লাসের ফার্স্ট বয় যেন সেকেন্ড বয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তার মর্জিমাফিক আসছে পরীক্ষায় (সংবিধান নির্মাণে) অ্যানসার বুক লেখে— এ রকম ভেল্কিবাজি যখন দেখাতে পেরেছ, তখন না হয় বলে দিয়ো চোর উল্ আমিনকে যে তুমি তাকে তোমার বাড়ির পাশের মোনজোদড়োর সুলতান বানিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তুমি এরকম হ্যাংলার মতো ট্যাংস ট্যাংস করে ঘন্টাতে ঘন্টাতে ঢাকা এলে কেন? ওই যে, তোমার হয় তো, বাপু, চেনা, শয়তান— সে-ও তো ভগবানবাদে গিয়ে গডের কাছে বায়না ধরেনি, আমাকে তোমার কেবিনেটে নাও। সে জানে হোয়াট ইজ হোয়াট। সে তার আপন শয়তান বাদে (মাস তিনেক পরের ঘটনা জানা থাকলে এস্থলে অক্লেশে বলা যেত, 'টিক্কা বাদে') দিব্য তার মিতা ডেভিল, ইবলিস, বি এল জেবাব্ নিয়াজি, ইরফানকে নিয়ে তার আপন সংবিধান বানিয়ে নিয়েছে এবং বললে নিশ্চয়ই পেত্যয় যাবে, তার সরকার তেমন কিছু মন্দ চলছে না। তুমি বানাও না তোমার সংবিধান তোমার প্যারা ত্রিমূর্তি নিয়ে— যক্ষ রক্ষ গুপ্ত দিয়ে। এরা এক-এক খানা আস্ত আস্ত চিজ। ওদের ঠেলায় দেখতে হবে না, শয়তান বাবাজিকে রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়ে লারকানার হাইকোর্টে দেউলে হওয়ার নোটিশ টাঙাতে হবে।'

মশকরাটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে? মোটেই না। পাঠক, একটু পরেই ঝুঝতে পারবেন! আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কতখানি জীবন-মরণ সিরিয়াস। আচ্ছা, তা হলে না হয় আমি একটা সিরিয়াস উদাহরণ নিচ্ছি। মনে করুন, বছর কয়েক পূর্বে উইলসনের পরিবর্তে মি. ভুট্টো ছিলেন বিলেতের প্রধানমন্ত্রী। উইলসন-ভুট্টো নির্বাচনে হেরে গেলেন মি. হিথের কাছে। বিশ্বসংসার জানে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে উইলসন প্রধানমন্ত্রী ভবন ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়লেন। ভুট্টো সে স্থলে কী করতেন? নিশ্চয়ই আবদার ধরতেন, 'হিথের পরেই আমার ভোটাধিক্য। ও পেয়েছে ইংলন্ডে সবচেয়ে বেশি ভোট, আমি পেয়েছি স্কটল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি ভোট (ইংলন্ড স্কটল্যান্ড আমি কথার কথা কইছি)। আমার সঙ্গে একটা সমঝোতা না করে দেখি হিথ কী করে ১০ নম্বরে ঢোকে? আমি বলছি কী, সে যদি নেয় ডাইনিংরুম আমি নেব ড্রইংরুম, তাকে দেব গাইয়ের মুখের দিকটা আমি বাঁটের দিকটা, সে নেবে কল্কে সাজানোর দিকটা আমি মুখে পুরব গড়গড়ার নলটা। সে কী! পূর্ব পাক কি আমার পর— একেই বলে সত্যকারের অনেস্ট্ ব্রাদারলি ডিভিশন।'

www.pathagar.com

ভুট্টো জানতেন, বিলক্ষণ জানতেন, গণতন্ত্রের কি আইনত (ডি জুরে) কি কার্যত (ডি ফাকটো) আওয়ামী লীগের গণদরবারে (ভিজা আ ভি) পয়লা সারিতে তাঁর কোনও আসন (লকাস স্টেন্ডি) নেই। তাই তাঁর ছিল আপ্রাণ চেষ্টা, কোনও গতিকে আওয়ামী লীগের দরবারের এক কোণেও যেন একটা আসন যোগাড় করে নিতে পারেন। তাই যদিও তিনি এলেন ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, ভিতরে ভিতরে তিনি এলেন আতুর ভিখিরির মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে।

পাঠক, আপনি যতই অতিষ্ঠ হয়ে থাকুন না কেন, আমি এই লিগেল, মরাল, সাংবিধানিক প্রতোকলীয় পয়েন্টটি কেচে ধুয়ে ইস্ত্রি চালিয়ে ভাঁজ করে পকেটে না ঢোকানো পর্যন্ত ছাড়ছিনে। কারণ এটা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অশিব মূর্তি নিয়ে বার বার দেখা দেবে। যাঁরা বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত। আমার অজানা নয়, বিষয়টি অত্যন্ত নিরস কিন্তু সে কারণে আমি যদি এটা এড়িয়ে যাই তবে উভয় বাঙলার যে দু-একজনের সঙ্গে আমি এ নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি করেছি তারা আমাকে 'আস্তো একটা এসকেপিস্ট, ভাঁড়ামি ভিন্ন অন্য কোনও সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় না' বলে আমাকে প্রাগুক্ত সার্কাসের ওই ক্লাউনের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তানে নির্বাসিত করবেন। আমি যে ভাঁড় ক্লাউন সেটা আমি অতীব শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করি, কিন্তু একটি নিবেদন এস্থলে আমাকে পেশ করতেই হল : সার্কাসের ক্লাউন তো এসকেপিস্ট হয় না— সে তো কুল্লে ওস্তাদের তাবৎ কেরামতি দেখাবার জন্যে সদাই শশব্যস্ত।

তা সেকথা থাক। আমি এ প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছি গুণীদের মুখ থেকে সুদ্ধমাত্র শোনবার জন্য, গণনির্বাচনে নিষ্কণ্টক সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করার পর বিজয়ী পার্টির কি কোনও দায় আছে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পার্টির সঙ্গে সলাপরামর্শ করার—জাহান্নমে যাক তাদের সঙ্গে সমঝোতা করার। অতি অবশ্য একথা সত্য, ভুট্টো যদি তাঁর পার্টির প্রতিভূ হিসেবে— 'আমি ভোটে দুই নম্বরি হয়েছি বা আমি সমুচা পশ্চিম পাকিস্তানের মোড়ল' সে হিসেবে নয়— আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছ থেকে একটা ইন্টারভিউর প্রার্থনা জানান তবে— শেখ-চরিত্র আমরা যতখানি চিনতে পেরেছি তার থেকে বলতে পারি— তিনি বদান্যতার সঙ্গে সেটা মঞ্জুর করবেন।

কিন্তু সেটা হবে শেখের ব-দা-ন্য-তা।

মি. ভুট্টোর হ-ক্ নয় ॥

পিণ্ডির পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

রোমান সেনাপতি কুইনটুস্ ফাবিয়ুস যখন হানিবালের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত তখন তাঁর রণকৌশল ছিল সম্মুখযুদ্ধে মরণ-বাঁচন লড়াই না লড়ে ক্রমাগত সুযোগের অপেক্ষায় দেরি করে করে যখন সুযোগ আসত তখন মুখোমুখি না লড়ে শত্রু-সেনার বাজুতে যেখানে সে দুর্বল সেখানে আঘাত হানা— কিন্তু সে আঘাতটা হত মোক্ষমতম। তাই সুযোগের অপেক্ষা করে আখেরে দুশমনকে ঘায়েল করার চাল বা স্ট্র্যাটেজিকে আজও বলা হয় 'ফেবিয়ান'

www.pathagar.com

পদ্ধতি। মারাঠারা হুবহু, ওই একই পদ্ধতিতে ঔরংজেবকে রণক্লান্ত ও পরবর্তীকালে মোগলবাহিনীকে পরাজিত করে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ওই নীতির অবলম্বন করে সফলকাম হন।

এস্থলে কিছুটা অবান্তর হলেও ইংলন্ডের 'ফেবিয়ান সোসাইটি'র উল্লেখ করতে হয়। মার্কস-এঙেল্‌স্ যখন আসন্ন 'রক্তাক্ত শ্রেণি-সংগ্রামের' প্রোপাগান্ডা করে যাচ্ছেন তখন তার শেষের দিকে বিলেতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে (১৮৮৪) ওই নাম নিয়ে। এঁদের নীতি নির্দেশ আছে : 'হানিবালের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সময় ফাবিয়ুস যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তোমাকে অসীম ধৈর্যসহকারে সুযোগের সেই শুভ লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে— যদিও বহু লোক তখন ফাবিয়ুসের সেই দীর্ঘসূত্রতাকে নিন্দাবাদ করেছিল; কিন্তু সে লগ্ন যখন আসবে তখন হানবে বেধড়ক মোক্ষম ঘা— নইলে তোমার সর্ব প্রতীক্ষা সবরের (সবুরতার) সমাপ্তি ঘটবে হাহাকার ভরা নিষ্ফলতায়।

আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তন থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত তার রণনীতি ছিল ফেবিয়ান— একথা বললে মোটামুটি ঠিক কথাই বলা হয়। বিশেষ করে ১৯৭০ ডিসেম্বরে নিষ্কণ্টক মেজরিটি পাওয়ার পর থেকে ১৯৭১-র ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

আরেকটি নীতিতে ফেবিয়ানরা দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন। 'গণতন্ত্রের গর্ভে থাকে সমাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপ সমাজতন্ত্র (সোশ্যালিজম)।'

আওয়ামী লীগ চিরকালই এ-নীতিতে বিশ্বাস করেছে— আজও করে। তবে সেখানেও সে ফেবিয়ান। আকস্মিক শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে সে সমাজতন্ত্র (অর্থ বণ্টনের সাম্য) রূপায়িত হবে না— হবে প্রগতিশীল সংবিধান নির্মাণ, আইনকানুন প্রণয়ন দ্বারা ক্রমবিকাশমান সমাজচেতনার শুভ বুদ্ধিকে উৎসাহিত করে, সমাজবিরোধী শোষণ নীতিকে পলে পলে নিষ্পেষিত করে।

সোশ্যালিস্ট মাত্রই বিশ্বাস করে মানবসমাজ ক্রমশ সর্বপ্রকার সাম্যের দিকে এগিয়ে চলেছে— ধনবণ্টনে সাম্য, রাষ্ট্রচালনায় সাম্য, ধর্মকর্মে সাম্য, ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে পদমর্যাদায় সাম্য (নেশনালিজম)— দুর্বল রাষ্ট্রকে যখন বৃহত্তর, বলীয়ান পশুরাষ্ট্র শোষণ-উৎপীড়ন করে, তাকে তার ন্যায্য সাম্য থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে দেওয়া তার রাষ্ট্রসাম্য—। প্রকৃত সোশ্যালিস্ট মাত্রই সেই আগ্রাসী গতিবেগকে সংবিধানসম্মত নিরস্ত্র পদ্ধতিতে সাহায্য করে।

আজকাল আমরা মোক্ষ, নিজাত, ফান-বাক্য, নির্বাণ ইত্যাদিতে বড় একটা বিশ্বাস করিনে। তবু একটা সমান্তরাল উদাহরণ দেখালে তথাকথিত 'সংস্কারমুক্ত ন-সিকে রেশনাল' জনও হয়তো কিঞ্চিৎ বিস্মিত তথা আকৃষ্ট হতে পারেন। খ্রিস্টান মিশনারি, যাঁরা প্রচার করেন, মুসলমান নারীর আত্মা নেই, তাঁরা বলেন, প্রভু বুদ্ধ নৈরাশ্যবাদী। আমরা বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আশাবাদী। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বমানব এগিয়ে চলেছে নির্বাণের দিকে। আখেরে নির্বাণ পাবে সর্বজন— সর্ব মানব থেকে আরম্ভ করে সর্ব কীটপতঙ্গ। এরা চলেছে যেন নদীর ভাটার স্রোত ধেয়ে। তাকে উজানে চালানো অসম্ভব। কিন্তু স্রোতগামী কাঠের টুকরোটাকে বৃহত্তর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যেরকম সেটাকে কিঞ্চিৎ ডাইনে-বাঁয়ে সরানো যায় কিংবা তার গতিবেগ বাড়ানো যায়, মানুষ ধর্মসাধনা দ্বারা ঠিক সেইরকম নির্বাণের দিকে তার

www.pathagar.com

গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে।' এককথায়, কি ফেবিয়ান, কি কম্যুনিস্ট, কি বৌদ্ধ সকলেই চরম গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে আশাবাদী।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শেখ সাহেব এবং আওয়ামী লীগের প্রধানগণ ফেবিয়ান ঘেঁষা সোশ্যালিস্ট। পক্ষান্তরে প্রকৃত বামপন্থি ছিলেন মৌলানা ভাসানী। ওদিকে লেফটেনেন্ট কমান্ডার মুয়াজ্জম হুসেন যে মতবাদ পোষণ করতেন সেটা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়— 'ছয় দফা বনাম এক দফা।' তিনি বলতেন, 'আমি পশ্চিম পাকিদের খুব ভালো করেই চিনি। ওদের সঙ্গে বাঙালির কস্মিনকালেও মনের মিল স্বার্থের ঐক্য হবে না। ছয় পয়েন্টের ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি এক দফায় বলে দাও, "চাই স্বরাজ, পুব বাঙলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন সবশক্তির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।" ' আইয়ুব এবং ইয়েহিয়া দু জনাই মুয়াজ্জমের এককাট্টা জাতীয়তাবাদের কথা ভালো করেই জানতেন। 'তাই কুখ্যাত আগরতলা মামলার' যে নথিপত্র আইয়ুবের আদেশে স্বয়ং ইয়েহিয়া তৈরি করেন তার আসামির ফিরিস্তিতে অন্যতম প্রধান ছিলেন মরহুম মুয়াজ্জম। টিক্কা খানও সেকথা ভোলেননি। তাই ২৬ মার্চ ভোরবেলা তাঁকে নৃশংসভাবে, তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে হত্যা করা হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। সে কাহিনী এমনই পাশবিক যে তার বর্ণনা দেবার মতো শক্তি আমার নেই। যেটুকু পারি যথাসময়ে দেব।

অথচ মি. ভুট্টোর বিবরণী মাফিক শেখ পয়লা নম্বরি ফ্যাসিস্ট। মনে হয়, ভুট্টো প্রথম একখানি প্রামাণিক অভিধান খুলে ফ্যাশিসমো শব্দটির অর্থ দফে দফে টুকে নিয়েছেন। তার পর মুসোলিনি এবং হিটলার দুই পাঁড় ফ্যাসির কর্মপন্থার তসবিরের নিচে রেখেছেন একখান আনকোরা কার্বন পেপার। উপরে বুলিয়েছেন একটা দড় বলপয়েন্ট। হো প্রেস্তো!— ভানুমতীকা খেল— তলার থেকে বেরিয়ে এল, মুজিবের ছবি।

যথা :

হিটলার ধনপতিদের কাছ থেকে পেতেন টাকা।

মুজিব পেতে লাগলেন অঢেল টাকা এবং অন্যান্য উপাদান। (ম্যাসিভ মানিটারি অ্যান্ড মেটিরিয়াল এসিসটেন্‌স্)— ব্যাঙ্কার এবং ধনপতিদের কাছ থেকে (ব্যাঙ্কারস অ্যান্ড বিগ বিজনেস)। উবাচ ভুট্টো।

এই একটিমাত্র বাক্য যেন একটি জুয়েল। ন্যাড়খানাগত উজ্জ্বল নীলমণি।

যেন এক্কেবারে খাঁটি যোগশাস্ত্রের সূত্রে বাঁধা আস্ত একটি কণকমঞ্জরী :

যক্ষকুবের প্রসাদাত অর্থং চ বিত্তং চ।

ন্-ন্-নাঃ। যে ভুট্টো মিঞা বাঙলা ভাষার নামেই ফ্যাকচুরিয়াস তাঁর পাক জবানে কাফেরি কালাম। তওবা, তওবা!

বরঞ্চ সিন্ধিভাষা ফারসির হনুকরণ করে। যেমন মি. ভুট্টোর সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় এমন এক সম্প্রদায়কে আহ্বান করতে গিয়ে ইরানি কবি যে চারিটি শব্দ ব্যবহার করেছেন সিন্ধি ভাষাতে সেগুলো সুবো-শাম— বিশেষ করে শাম সন্ধেবেলা— এস্তেমাল হয়— রিন্দ্, মস্ত্, দেওয়ানা, শরাবি। তাই ফারসিতেই না হয় দোহা গাঁথি :

www.pathagar.com

অম্‌দ জর্‌ ওরা আমদ সরঞ্জাম,
আজ সর্‌রাফ্‌ ওয়াজ নিমকহারাম।
ভাণ্ড ভাণ্ড স্বর্ণ আর সর্ব অবদান।
ঢেলে দিন সুদখোর আর বিত্তবান ॥
—পাঠান্তর
ঢেলে দিল ব্যাঙ্কার, নেমকহারাম ॥

এ তো হল সূত্র নির্মাণ কিন্তু এই আজব ভুটাঙ্গপুরাণের মল্লিনাথ হবার মতো পেটে এলেম ধরেন হেন জন তো এ ঘোর কলিকালে দেখতে পাচ্ছিনে। অতঃ মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ!

(ক) ব্যাঙ্করা নাকি টাকা দিত, আওয়ামী লীগকে— ভুট্টো বলেছেন, শেখকে পার্সনেলি।

এষ স্য অবতরণিকা : শেখের পূর্বপুরুষ সর্ব শুয়ুখ নিশ্চয়ই বহু পুণ্য সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন যে সিন্ধুর কল্কি ভুট্টাবতার শেখকে 'সিন্ধি' 'কলমা' পড়িয়ে ভুট্টো-ইয়েহিয়া গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করে এ আপ্তবাক্য ঝাড়েননি যে, তাঁরা যে কায়দায় পঞ্চমকারের সাধনায় পয়সা ওড়ান শেখও ওই প্রাণাভিরাম পদ্ধতিতে পার্টি ফান্ডের কড়ি উড়িয়েছেন!

বলা বাহুল্য, শেখের জেবে ক-কড়ি ক-ক্রান্তি ছুঁচোর নৃত্যের কেত্তন চালাচ্ছে সে তত্ত্ব ভুট্টো তাঁর ভুবন-জোড়া টিকটিকি প্রসাদাৎ উত্তমরূপেই জানতেন। সেখানে কানাকড়ির গড়বড় থাকলে ব্যারিস্টার ভুট্টো কি ছেড়ে কথা কইতেন? ঢাকার 'বাঙাল' হাইকোর্টের চিলকোঠায় উঠে চিল-চ্যাঁচানোর কর্কশ কণ্ঠে সে কেলেঙ্কারিটা প্রচার করতেন না?

মূল টীকা : 'ব্যাঙ্কারেরা শেখকে টাকা দিয়েছিল।' এস্থলে সেই প্রাচীন প্রবাদ মনে আসে 'মোটেই মা দ্যায় না খেতে— তার আবার কাঁড়া-আকাঁড়া।' উভয় পাকিস্তান মিলিয়ে বাঙালি ব্যাঙ্ক ছিল সর্বসাকুল্যে কটা? দুটো! তাদেরই-বা রেস্ত ছিল কতটুকু যে রাজনীতির ঘোড়দৌড় ব্যাক করতে যাবে? আওয়ামী লীগের মতো ডার্ক হর্সকে— বিশেষ করে সবজান্তা সরকারি মহল থেকে ফিসফিসেনি কানাঘুষো যখন চতুর্দিকে চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে 'শেখ মেরে-কেটে ৮০টা ভোট পায় কি না পায়'?... আর পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাঙ্কগুলো টাকা দেবে লীগকে? এর উত্তরে শুধু ঢাকাইয়া উত্তর একমাত্র সম্বল : 'আস্তে কয়েন কর্তা— ঘোরায় হাসব।'

কতকগুলো লোফার বোম্বেটে পিক-পকেট একদা কলকাতায় এসে নেমেছিল বাণিজ্যের নামে হয় মুর্শিদাবাদ-দিল্লিতে ভিখ মাঙতে নয় শান্ত সরল অতিথিবৎসল বাঙালির সর্বস্ব লুট করতে। তার পর কিস্মৎ, পতন-অভ্যুদয়ের অলঙ্ঘ্য বিধানই বলুন, পূর্বজন্মের কর্মফলেই বলুন,

'বণিকের মানদণ্ড
পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।'

যে দাঁড়িপাল্লার ঘামে ভেজা তেলচিটে ডাঁটটায় হাত দিতে গা ঘিনঘিন করে সেটা দেখি আঁধারে গুড়িগুড়ি সিংহাসন বেয়ে উঠে রাজদণ্ডরূপ ধরে বেনের 'পোলাডার' হাতে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

www.pathagar.com

যে বোহ্‌রার পো পরশুদিন তক্ বোম্বায়ের রাস্তায় রাস্তায় ভাঙা ছাতা মেরামত করে দিনগুজরান করত, যে খোজার ব্যাটা বটতলায় ইটের উপর খদ্দের বসিয়ে 'নোয়ার ড্যাটার' 'ইটালিয়ান' চশমা বেচত, যে যেমন উদয়াস্ত কেনেস্তরার তৈরি ঝাঁঝাঁরি বদনা ফেরি করে বেড়াত আর যে কচ্ছি ভৃগুকচ্ছের গলিতে গলিতে 'তালা কুঞ্জিনা ধান্দা' করে চাপাতি শাক খেত তারা ফাদার অব দি নেশনের কেরপায় ঢাকায় এসে রাতারাতি হয়ে গেল শেঠিয়া, মালিক, শিল্পপতি, আঁতরপ্রবর, চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারমেন এবং সর্বোপরি বিশ্বজুটের সর্বাধিকারী হর্তা-কর্তা বিধাতা। আর ছাপরা ইস্টিশানের বেহারি মুটে হল ট্রাফিক ম্যানেজার।

এবং এদের তুলনায় ইসপাহানি গোষ্ঠী তো রীতিমতো খানদানি মনিষ্যি, শরিফ আশরাফ। এদের ঠাকুর্দার বাবা এসেছিলেন ঘোড়া খচ্চর বিক্রি করতে ইরান থেকে শ্রীরঙ্গপট্টমে, টিপ্‌পু[১] সুলতানের আস্তাবলে।

তালাকুঞ্জির ফেরিওলা থেকে ইঁটে বৈঠানওলা পরকলা বেচনেওলার দাপট তখন দেখে কে?— নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গি জুড়ে! দম্ভে দেমাকে যব চার্নক থেকে গলস্টনকে তারা তখন তুড়ি দিয়ে নাচাতে পারে। সুবে পাকিস্তানের ফাদার মাদার পিএএস (সিভিল সার্ভিস) তাদের নাম স্মরণে এনে ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিট্যাল 'আইয়ুব নগরে' প্রবেশ করে।

সুবে পাকিস্তানের এইসব শাহ্-ইন্-শাহরা দাঁতে কুটো কেটে, ভেটের ডালি মাথায় করে যাবেন কোথাকার সেই ফরিদ-পুরা গাঁইয়া মছলিখোরকে পাস্?

আর এঁদের তল্পিদার, যদ্যপি জমিদার তথাপি মন্ত্রণাদাতা জুলফিকার ভাই-আলিজি-ভুট্টোওয়ালা তখনও কি তাঁদের হুশিয়ার করে দেননি, 'ওরে, তোরা যাচ্ছিস কোন বাগে? ওই লোকটাই তো কসম খেয়েছে, বাঙালিকে ফিন্ বাঙলার রাজা বানাবে।'

আর টাকা দিয়েই যদি দেশের দশের সম্মতি মহব্বত কেনা যেত তবে টাকার কুমির ভুট্টো তাঁর আপন দেশ সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চলের ভোটগুলো পাইকিরি হিসেবে কিনলেন না কেন? বেলুচিস্তানে ব্লাঙ্কো, আর সীমান্তে কুল্লে একটা ভোট পেলেন কেন?

গাঁয়ের ছেলে মুজিবের তরে ছিল দেশের দশের দরদ মহব্বত। তাঁকে তো 'কড়ি দিয়ে কিনলেম' রেওয়াজ নিরিখে শুঁটকি হাটের কায়দাকেতায় ভোট কিনতে হয় না।

মি. ভুট্টোর আরেক কুৎসা : সদাগরদের কাছ থেকে যে টাকা পায় তাই দিয়ে মুজিব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল।

হায়, হায়, হায়! মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে। তা হলে পশ্চিম পাকি পিশাচেরা এদের ন মাস ভূতের নাচ না নেচে ন দিনেই খতম হত।

কুৎসার কত ফিরিস্তি দেব? এ যে অন্তহীন।

ভুট্টো যে আজও ভুবনময় দাবড়ে বেড়াচ্ছেন সেটা বহু পূর্বেই উবে যেত যদি এই শেষ মেছোহাটার বদবোওলা গালটার এক কড়িও সাচ্চা হত : মুজিব ভাড়াটে গুণ্ডাদের মদদ দ্বারা ঘায়েল করতেন নিরীহ নাগরিককে।

---

১. ঢাকা শহরে একটা 'টিপু রোড' আছে উচ্চারণটা টিপ্‌পু।

www.pathagar.com

পুনরপি হায়, হায়। তাই যদি হত তবে স্বয়ং ভুট্টো সাহেব ২৬ মার্চ মুক্তকচ্ছ হয়ে, পড়িমড়ি করে, ইয়েহিয়ার পাইলটদের কোমর জাবড়ে ধরে ঢাকা থেকে পালিয়ে জানটি বাঁচাবার ছোটাসে ছোটা মোকাটা পেতেন কি?

এবং এটা যে কতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা সেটা আর সবার চেয়ে স্বয়ং ভুট্টোই জানেন সবচেয়ে বেশি। নইলে তিনি দু দুবার পা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে ঢাকা আসতেন না, নিছক মুজিবের উঠোনে কল্কেটা পেতে।... আসরে টাকাটা সাপটেছিলেন কোন গোঁসাই? ভুট্টো মিঞা। তাই লোকে বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকেরের বেলা গোবদ্দন।'

কিন্তু এ সবের সবকিছু ছাড়িয়ে যায় যে ঘৃণ্য, ন্যক্কারজনক আচরণ যেটা মানুষ জীবনভর ভুলতে পারে না সেটা :

সবাই জানত, ভুট্টো জানতেন মুজিব তখন পশ্চিম পাকে কারারুদ্ধ। তিনি কোনও কুৎসা, কোনও নিন্দা, কোনও অভিযোগ, কোনও অবমাননার উত্তর দিতে পারবেন না। তাঁর প্রাণবায়ু অনিশ্চয়।

নিতান্ত ইতরজনও এ অবস্থায় তার দুশমনকেও গাল দেয় না।

কিন্তু বিলেতের ব্যারিস্টার, ল' একস্‌পার্ট ভুট্টো জানেন আইনে সেটা বাধে না।

তাই ভাবি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে হলে কত না এলেমের প্রয়োজন।

'দুঃখ সহার তপস্যাতেই/ হোক বাঙালির জয়—'

মধুঋতু। ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে জমিদার ভুট্টো অবতীর্ণ হলেন ঢাকা নগরীতে।

নেমেই নাকি বললেন, 'আমি আমার বড়দার সঙ্গে কথা কইতে এসেছি।'

সুবে পুব পাকিস্তান পরিতৃপ্তিসহকারে উচ্চধ্বনি করলে, 'হো হো হো, কী বিনয়, কী বিনয়। জুনাগড় রাজ্যের পরম প্রতাপশালী ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর ঔরসে তথা বহু কলায়, বিশেষত সঙ্গীতে পারদর্শিনী অনন্যা প্রিয়দর্শিনীর গর্ভে যাঁর জন্ম তিনি কি না আমাদের গাঁয়ের সাদামাটা মুসল্লি মিয়া সাবের 'পোলাডারে' বড় ভাইসাব কইলেন! খানদানি ঘরের মনিষ্যি অইব না ক্যান?'

আসলে কিন্তু এটা কি সেই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র নায়েবজির উদয়াস্ত 'নারায়ণ নারায়ণ! হরি হে তুমিই সত্য' বুলি আওড়ানোর মতো নয়? দুটোই আগাপাশতলা নির্ভেজাল ভণ্ডামির প্রহসন।

এ তামাশার দশ-বারো বৎসর আগের থেকেই পশ্চিম বাঙলায় প্রকাশিত পুঁথি-কেতাব পুব বাংলায় আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে— মায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য। তাই সেই বহুল প্রচারিত কবিতাটির নীতিবাক্য যদি ঢাকাইয়ারা ভুট্টোর 'দাদা, দাদা' সম্বোধনের সময় স্মরণে না এনে থাকেন তবে উষ্মা প্রকাশ করা অনুচিত।

www.pathagar.com

কুটুম্বিতা বিচার

কেরোসিন-শিখা বলে
মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি
দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে
উঠিলেন চাঁদা—
কেরোসিন বলি উঠে,
এস মোর দাদা!

পূর্বেই বলেছি, মি. ভুট্টো আমাদের শেখের বর্ণে উঠতে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর ভাই হতে চান! তিনি এদানির আসমানে ওড়ান 'ইসলামি' ঝাণ্ডা; ইসলাম অনুযায়ী ভাইয়ে ভাইয়ে সমান বখরা। পশ্চিম পাকের জনসংখ্যা পুব বাংলার চেয়ে কম। অতএব ভুট্টো-ভাই পুব বাংলারও একটা হিস্যে পাবেন।

দীর্ঘ তিন দিন ধরে শেখ সম্প্রদায় আপ্রাণ চেষ্টা দিলেন ভুটো কী চান সেটা জানতে। বাংলাদেশ কী চায় সে তো জানা কথা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভুট্টোও তাতে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা হলে গেরোটা কোথায়?

ভুট্টোর মনের গভীরে দৃঢ়তর বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ ভিতরে ভিতরে শুধু তক্কে তক্কে আছে, কী করে আখেরে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারে। ভুট্টো তাঁর কেতাবে স্বীকার করেছেন যে, ওই সময়ের কিছু আগে ইয়েহিয়ার প্রধান উপদেষ্টা পিরজাদা যখন তাঁকে জিগ্যেস করেন 'আওয়ামী লীগ চায় কী?' তখন তিনি মাত্র একটি শব্দে তার উত্তর দেন, 'সিসেশন'। কেটে পড়তে চায়।... পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে না দেয় খেতে না দেয় পরতে, অথচ তিনি কিল মারার গোঁসাই। সেই খসমের কাছ থেকে সে চায় তালাক— এইভাবে বললে পুব পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলমান তত্ত্বটা স্পষ্ট বুঝতে পাবে।

এ কথা অতিশয় সত্য, সেই বখতিয়ার খিলজির আমল থেকে— এবং আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তার পূর্বে, বৌদ্ধ হিন্দুযুগে, এক কথায় অনাদি অনন্তকাল থেকে বাংলাদেশ কস্মিনকালেও দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি। বার বার স্বাধীন হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। বাজারে চালু ইতিহাসে কিন্তু পাবেন, বুদ্দু ঐতিহাসিকরা প্রতি অনুচ্ছেদে লিখছেন, 'এর পর বেঙ্গল রেবেলড্ এগেনস্ট দি (দিল্লি) এমপেরর।' যেন ঐতিহাসিক দিল্লি রাজদরবারের বেতনভোগী, হিজ মেজেস্টিজ মোস্ট অবিডিয়েন্ট স্লেভ, দিল্লির হুজুরের সাম্রাজ্যলোভী ইমপিরিয়ালিস্ট কলোনিয়ালিস্ট চশমা পরে সত্যমিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ইতিহাস লিখেছেন— ইংরেজ যেরকম ১৮৫৭-র স্বাধীনতা সংগ্রামকে যতখানি অপমান করতে পারে সেই বদ মতলব নিয়ে তার নাম দিয়েছে 'সিপয় ম্যুটিনি'। ইন্ডিয়ান রেবেলিয়ান নাম দিলেও যে আন্দোলনের খানিকটে ন্যায্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়!

মোটেই ধান ভানতে শিবের গীত নয়।

www.pathagar.com

এই বেলাই আমরা যেন এই ন মাসের দুঃখদহনের মূল তত্ত্বটি পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিই। এই তত্ত্বটি একমাত্র তত্ত্ব— অখণ্ড শাশ্বত সত্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র কলমা, একমাত্র ইমান। এটা সর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ না করলে কোনও দরকার নেই ওই ন মাস নিয়ে বিন্দুমাত্র কালির অপব্যয় করা। আমরা যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের আরামপিয়াসি মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই, এ ন মাস একটা দুঃস্বপ্ন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মাঝখানে একটা উটকো ব্যত্যয়— এটা গেছে, এখন থেকে আমরা চলব গোলাপের পাপড়ি বিছানো শস্যশ্যামল সোনার বাংলার জনপদভূমির উপর দিয়ে এবং পথের শেষে পাব কোরমা-পোলাওয়ের খুশবাই ভরা পদ্মাসাইজের ইয়া বিরাট দাওয়াত-বাড়ি, ভোজনান্তে তার চেয়েও বিরাট জলসাঘর, সেখানে অন্তহীন সঙ্গীত, নৃত্য, মধুচন্দ্রিকা।

না, না, না।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন তার চরমে তখন কে একজন জেনারেল আতাউল গনী ওসমানীকে শুধিয়েছিলেন, 'এ লড়াই আর কতদিন চলবে?' ক্ষণতরে চিন্তা না করে তিনি বলেছিলেন, 'ফর ডিকেডস',— দশাধিক বৎসর, দশং দশং বৎসর— তার পর তিনি 'মে বি' 'হতেও পারে' বলছিলেন কি না সেটা নিতান্তই বাহ্য।

কারণ জেনারেল (এর চেয়ে কত অল্পে কত সেপাই ফিল্ড মার্শাল হয়েছে!) ওসমানী বাংলাদেশের 'সামরিক ইতিহাস' উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি খাঁটি বাঙাল। তাই তিনি শুধু জর্মন ক্লাউজেভিৎসের 'রণনীতি', আউস্টরলিৎস, ওয়াটারলু, স্তালিনগ্রাদ, নরমান্দিই পড়েননি— তাঁর স্মৃতিতে আছে বাংলাদেশের পৌনঃপুনিক শতশত বর্ষব্যাপী মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। যে কারণে পশ্চিমপাকের মিলিটারি বড়কর্তারা তাঁকে সামনাসামনি বলেছেন তিনি শভিনিস্ট; পেরোকিয়াল।

তিনি জানতেন, যে দেশ সাতশো বছর ধরে— সেটুকুর ইতিহাস তো দিল্লিতে লেখা একচোখো ফারসি কেতাবেই আছে— ক্রমাগত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে তার পক্ষে 'এক ডিকেড, দু ডিকেড'-ই তো স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী। কে জানে, আরও বেশি হতে পারে।

আজ না হয় বাংলাদেশের দুঃখদৈন্য চরমে পৌঁছেছে কিন্তু এটা তো এমন কিছু নিত্যকালের তত্ত্বকথা নয়। প্রাচুর্য আর সৌন্দর্য এদেশের সর্বত্র। সেই তার চিরন্তন স্বরূপ। তাই তার দিকে সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। পাঠান মোগল বাদশাদের তোষাখানাতে দু পয়সা জমে গেলেই তাঁদের নজর যেত এই উপমহাদেশের পূর্বাচলের দিকে— সে রমণী সুজলা সুফলা। এস্থলে ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ করা ধর্মকে বিড়ম্বিত করা মাত্র। দিল্লির বাদশারা ছিলেন মুসলমান; গোড়ার দিকে না হোক, পরে বাংলার অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এদের কতল করতে তবু তাদের বাধেনি। তাদের কিন্তু কিছুটা শালীনতাবোধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর লাহোরি মোল্লাদের মতো দিল্লির মোল্লারা অতখানি জাহান্নমের অধঃপাতে যায়নি; তারা বাংলাদেশের 'বিদ্রোহ' দমনের সময় 'ইসলাম ইন ডেঞ্জার' জিগির তুলে বাঙালি মুসলমানকে 'কাফির' ফতওয়া দিয়ে, জাল 'জেহাদ' চালিয়ে নিজেদের পরকাল খোওয়ায়নি। রাজ্য বিস্তারে কলোনি শোষণের সময় ধর্ম অবান্তর,— দেশটার প্রাচুর্য বাস্তব সত্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ছিল। যেমন এককালে ইতালির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য দুই-ই ছিল বলে তার দিকে ছিল বহু জাতের লুব্ধ দৃষ্টি। তাই ইতালির কবি ফিলিকাজা একদা কেঁদেছিলেন :

ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও ললাটে
নিরাশায় কালিমায়!

নইলে কবিগুরুই-বা বাঙালির জন্য এমন মর্মান্তিক প্রার্থনা করতে যাবেন কেন?

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে
দুঃখ দেবার বড়াই,[১]
জেনো মনে, তখন তাহার
বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালির জয়!

কী বাঙালিকে চিরকাল করতে হবে দুঃখের তপস্যা! এ কী আশীর্বাদ, না অভিসম্পাত!

সাতশো বছরের ঐতিহ্য তোমার, হে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য বার বার বিদ্রোহ করা, রক্তাক্ত সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দেওয়া— না হয় তুমি সে ঐতিহ্য সম্বন্ধে আজ সচেতন নও, কিন্তু ওই যে নয় মাসের সংগ্রাম— মাতার অশ্রুজল, বধূর হাহাকার— সে কি তুমি কখনও ভুলতে পারবে?

তোমার কি মুহূর্তের তরে মনে হয়, অদ্বিতীয় এই পাশবিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করলেও চলত?

তোমার কি চিত্তদৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল কভু, ক্ষণতরে এ দুঃসহ সংগ্রাম আর কতকাল ধরে লড়ব?

তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?

না।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালির জয়।
ভয়কে যারা মানে
তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

আর সর্বোত্তম অমূল্য কী শিক্ষা তুমি লাভ করলে?

তোমার দেশকে যখন সর্বসমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করা হল তখন বিশ্বনায়কগণ ক্লীব নপুংসকের মতো কী ঘৃণ্য আচরণ করলেন! তাঁরা তোমার মৃত্যুযন্ত্রণা পলে পলে দেখলেন। কিন্তু তুমি যে প্রভু খ্রিস্টের মতো দুঃখ সহার তপস্যা দ্বারা নবজীবন লাভ করবে সে আশঙ্কা তাঁরা করেননি।

কিন্তু তুমি যে একেবারে হতভাগ্য মিত্রহীন নও সে অপ্রত্যাশিত বৈভবও তুমি লাভ করলে সংগ্রামের অপরাহ্নবেলা।

---

১. এস্থলে 'টিক্কা যখন চেঁচিয়ে করে/ দুঃখ দেবার বড়াই'
বললে 'টিক্কা' ও 'দুঃখ'-এর একটা/ মধ্যানুপ্রাস পাই।

www.pathagar.com

এইবারে মূল সত্য, শেষ সত্য।

আবার আসবে নব দুর্যোগ। ওইসব ক্লীব নপুংসকদের শবদেহেই সঞ্চারিত হবে প্রেতাত্মা বেতাল। আবার আসবে দুঃখের তপস্যা। তাই জয়ধ্বনি কর :

দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালির জয় ॥

আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে—

পলাশির যুদ্ধের পর বাংলাদেশের জীবন-মরণ সঙ্কট আসে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এ। তার পূর্বের দু মাস— ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ধরে— পুব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তান যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে দুর্বার গতিতে ধাবমান হল কোনও এক করাল অস্তাচলের দিকে। আবার সেই নিয়তিরই প্রসন্ন নির্দেশেই এক শুভপ্রভাতে জয়ধ্বনি উঠল,

হোক, জয় হোক
নব অরুণোদয়।
পূর্ব দিগঞ্চল
হোক জ্যোতির্ময় ॥

আর্য সভ্যতার পূর্বতম প্রান্ত, পূর্বাচল পূর্ব দিগঞ্চল বাংলাদেশ।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সর্বশেষ শ্লোকেও আছে :

রাত্রি প্রভাতিল,
উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব-উদয়গিরি ভালে—

বাংলাদেশই পূর্ব উদয়গিরি। সে তার ভালে কী টিকা এঁকেছে সেটি 'রবিচ্ছবি', কবি রবির আঁকা ছবি, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত— আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

কবি আরও বলছেন, 'ওরা বেরিয়ে পড়েছে; এদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনও ফুরোয়নি; ওদের জন্য পথের ধারের জানালায় জানালায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষে চেয়ে আছে : রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, 'তোমাদের জন্য সব প্রস্তুত।

ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরি বেজে উঠল।'

আর পশ্চিম পাকিস্তান? তার জন্য নিয়তি কী নির্ধারিত করছেন? আমি তো দেখছি, তাদের সম্মুখে অন্ধকার। বিপাকের বিভীষিকা রজনীর পরে ওদের জন্য কোনও শুভ্র উষার শুকতারা আমি তো দেখতে পাচ্ছিনে।

কবি যেন ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিচ্ছেন মাত্র—

www.pathagar.com

'এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষে পান্থশালার আঙিনায় কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ-বা একলা, কারও বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনে পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে।'

সেই দু মাসের কাহিনী; জানুয়ারি ২৯ থেকে মার্চ ২৫।

২৯-১-৭১ ভুট্টো ঢাকা থেকে বিদায় নেবার সময় 'গুডবাই' 'ফেয়ার-ওয়েল' না বলে যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সেটাকে ফরাসিতে বলা হয় 'ও-রভোয়া' অর্থাৎ 'আবার দেখা হবে'। আরও বললেন, 'আমাদের ডিফিকালটিজ আছে বইকি। ২৩ বৎসরের সমস্যাগুলো তো তিন দিনে সমাধান করা যায় না। তাই বলে আলোচনার দ্বার তো বন্ধ হয়ে যায়নি। যখন প্রয়োজন হবে আমি আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য আবার আসব।'

সাংবাদিক শুধোলেন, শেখ মুজিব যে এসেমব্লির তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারির জন্য প্রস্তাব করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কী? উত্তরে তিনি সোজাসুজি রামগঙ্গা কোনও কিছু না বলে (রিমেনড নন-কমিটল) মন্তব্য করলেন, 'অন্তত ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের সময় লাগে তবে তাতেও তো কোনও দোষ নেই।'

এবং বললেন, 'সংবিধান বাবদে সবকিছু আগেভাগে ফৈসালা করে নিয়ে তার পর সংবিধান এসেমব্লিতে প্রবেশ করব তার তো কোনও প্রয়োজন নেই। এসেম্বলির বৈঠক চালু থাকাকালীনও ওই নিয়ে আলোচনা (নিগোসিয়েশন) চলতে পারে।'

প্রশ্ন : 'আপনি কি এসেমব্লির বৈঠক-তারিখ পিছিয়ে দিতে চান?'

উত্তর : 'না।'

সাংবাদিকদের আরও বিস্তর প্রশ্নের বিস্তর 'উত্তর' দিয়ে আরেকটি মোক্ষম কথা কইলেন রাজনীতিক ভুট্টো।

'শেখ আমার দৃষ্টিবিন্দু বুঝতে পেরেছেন, আমিও তাঁর দৃষ্টিবিন্দু বুঝতে পেরেছি।'

ভুট্টো যে বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভুট্টো কেন, উভয় পাকের সবাই জানত শেখ এবং আওয়ামী লীগ কী চান, এবং আজও সেটা পড়ে শোনালে স্কুলবয়ও সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, শেখ-তাজ-নজর কি বুঝতে পেরেছিলেন ভুট্টোর দৃষ্টিবিন্দু কী? কারণ পাকা 'পোকার' জুয়াড়ির মতো তিনি তাঁর তাস চেপে ধরে রেখেছিলেন তাঁর টাইয়ের উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ছয় দফার এটা-ওটা সেটার মূল তাৎপর্য কী, এটা মানলে ওটার সঙ্গে যে তার দ্বন্দ্ব বাধে, ওই যে আরেকটা, সেটা— সেটা কি পশ্চিম পাকের লোক মানবে ইত্যাদি ইত্যাদি দুনিয়ার কুল্লে হাবিজাবি প্রশ্নতে আনুষঙ্গিক যতপ্রকারের সেই সনাতন হাইপথেটিকাল মার্কা অবাস্তব আকাশকুসুম সওয়াল!

কিন্তু তিনি একবারের তরেও তাঁর আপন দৃষ্টিবিন্দুর একটি মলিকুলও এক লহমার তরেও দেখতে দেননি। অন্য জনের বোঝা তো দূরের কথা। শেখের ঝানু ঝানু বিচক্ষণ জনেরা বার বার— যখনই ভুট্টো কোনও আপত্তি তুলেছেন তখনই— ভালো করে আগাপাশতলা বুঝিয়ে দিয়ে শুধিয়েছেন, বার বার শুধিয়েছেন, 'আচ্ছা এতেও যদি আপনার মনে ধোঁকা থাকে, এটা গ্রহণ করতে যদি আপনার কোনও আপত্তি থাকে তবে আপনি বলুন আপনি কী চান, আপনার প্রস্তাব কী? আমাদের ছ-দফা কাঠামোর ভিতর আমরা তো সর্বদাই রদবদল করতে প্রস্তুত

www.pathagar.com

আছি। নইলে আপনিই-বা এত তকলিফ বরদাস্ত করে আসবেন কেন এখানে আর আমরাই-বা বসতে যাব কেন বৈঠকের পর বৈঠকে?'

একদম হক কথা।

আওয়ামী লীগের ছ-দফা কর্মসূচি কেনার তরে লারকানার তালুকমুলুক ডকে তুলতে হয় না এবং সেগুলো বোঝার জন্যে ধানমণ্ডির গুরুগৃহে প্রবেশকরতঃ চতুর্দশ বর্ষব্যাপী কঠোর আত্মসংযমসহ ব্রহ্মচর্য পালনও করতে হয় না।

আলোচনার সময় নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে গেলে হরবকতই মি. ভুট্টোর পেটেন্ট উত্তর ছিল, 'হেঁ হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ বিলক্ষণ! আমি দেশে ফিরে গিয়ে পার্টি মেম্বারদের সঙ্গে সলাপরামর্শ না করে পাকা উত্তর দি কী করে?'

সেন্ট পিটারের স্বর্গ আর শয়তানের নরকের মধ্যিখানে ছিল একটি এজমালি পাঁচিল। চুক্তি ছিল পাঁচিল এ-বছর সারাবেন ইনি, ও-বছর সারাবেন শয়তান। ওই মাফিক পিটার তো সারালেন প্রথম বছর পাঁচিলটা তার পর এক বছর নেই নেই করে ঝাড়া তিনটি বছর শয়তানের আর দেখা নেই। পিটার তো শয়তানকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষটায় হঠাৎ একদিন পথিমধ্যে উভয়ের কলিশন। পিটার তো শয়তানকে চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দাও, পাঁচিল মেরামত করবে কবে?' শয়তান দণ্ডাধিককাল ঘাড় চুলকে শেষটায় বললে, 'তা-তা-তা আমি ঝটপট উত্তর দিই কী প্রকারে? আমি নরকে ফিরে যাই, আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করি, তবেই না পাকা উত্তর দিতে পারি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিটার খেদোক্তি করলেন, 'ওইখানেই তো তুই ব্যাটা মেরেছিস আমাকে। সাকুল্যে সব-কটাই যে পেয়ে গেছিস তুই।'

উকিলরা আমার ওপর গোস্‌সা করবেন না। আমি মুর্শিদমুখে যেভাবে আপ্তবাক্যটি শুনেছি হুবহু সেভাবেই নিবেদন করলুম। ... ভুট্টো যদিও স্বয়ং উকিল তবু তাঁরও তো এক্‌স্‌পার্ট অপিনিয়নের দরকার। মুর্দফরাস মরে গেলে থোড়াই আপন লাশ টানে।

কিন্তু মোদ্দাকথা এই যে ভুট্টো নানাবিধ কীর্তন গাইলেন, 'পূর্ব পাক-এর প্রতি অনেক অবিচার করা হয়েছে সে, বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, নীতিগতভাবে আমি শেখের অধিকাংশ দফাই মেনে নিচ্ছি, বাদবাকিগুলো দেশে ফিরে গিয়ে আলোচনা করে ফের আসব। আমাদের সলাপরামর্শের দোর তো আর বন্ধ হয়ে যায়নি (নো ডেডলক!)। তাবৎ বাতের ফৈসালা করে ধোপদুরস্ত একটা রেডিমেড সংবিধান বাটন্‌-হোলে না পরে যে সংবিধান-মনজিলে প্রবেশ করব না— এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি, এসেমব্লির বৈঠক চলাকালীনও তো লবি-তে আমরা বিস্তর কাচা কাপড় ইস্ত্রি করে নিতে পারব— রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না— এসেমব্লির বৈঠক কবে শুরু হবে? সে তো এমন কোনও একটা বড় কথা নয়। হতে হতে ধর, এই ফেব্রুয়ারির আখের তকই যদি হয়ে যায় তাতেই-বা দোষ কী?' —এগুলোর কতখানি আওয়ামী লীগের কর্তারা বিশ্বাস করেছিলেন? কারণ হয় মানতে হয়, তাঁরা ভুট্টোর ধূর্তামি ধরতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী এমন সব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন যাতে করে ম্যাজিশিয়ান ভুট্টো শেষমুহূর্তে যেন তাঁর হ্যাট থেকে এমন কোনও মারাত্মক পিচেশ না বের করতে পারেন যার বিষ্ঠা নিক্ষেপে এসেমব্লি সংবিধান নির্মাণ, স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর সবকিছু রসাতলে যায়। নয় বিশ্বাস করতে হয়, জেনারেল কল-এর রোগনির্ণয়ই ঠিক : ইয়েহিয়া এবং মুজিব যখন ক্ষমতা

www.pathagar.com

হস্তান্তর সম্বন্ধে একমত হচ্ছিলেন তখন তাঁদের কেউই মি. ভুট্টোর নষ্টামি (মিসচিফ) করার দক্ষতাটা হিসাবে নেননি। বাংলাদেশের এক অতিশয় উচ্চপদস্থ ফৌজি অফিসারও আমাকে সংক্ষেপে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইয়েহিয়া গোড়ার দিকে সত্যই গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই অফিসারও কল-এর মতো টিক্কা, পিরজাদা গয়রহ মিলিটারি হনুমানদের ব্যক্তিগতভাবে উত্তমরূপেই চেনেন।

এস্থলে আগামীকালের সন্দেহপিচেশ ঐতিহাসিক হয়তো বলবেন, 'ইয়েহিয়া মিলিটারির গণ্যমান্য ব্যক্তি। কল ও উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশের ফৌজি অফিসার দু জনাই আর্মির লোক। তাঁরা যে মিলিটারি রাষ্ট্রপতি ইয়েহিয়ার কলঙ্কভার যতখানি পারেন কমাতে চেষ্টা করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক।'

নিরপেক্ষ হরিপদ কেরানি তার স্বভাবজাত সরলতাসহ বলবে, 'পশ্চিমপাকের মিলিটারি কলঙ্কভার লাঘব করা কি আদৌ সম্ভব? হিটলারের ফৌজি জাঁদরেলরা বর্বরতায় ইয়েহিয়া ও তার পাষণ্ডদের তুলনায় "দানো মলি" শিশুখাদ্য। এবং তাঁর পূর্বেকার, স্বনামধন্য না বলে স্বনির্বাচিত স্বউপাধি "ফিল্ড মার্শাল" প্রাপ্ত। আইয়ুব যিনি মার্শাল ল চালিয়ে হলেন ফিল্ড মার্শাল, তিনি তো একটা আস্ত চোর। ক-কোটি টাকা জমিয়েছেন তার খোঁজ নিতে এক কাকের ভাই আরেক কাক ইয়েহিয়া কিছুতেই রাজি হল না। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি সম্বন্ধে যত কম কথা কওয়া যায় ততই বুদ্দু পাঠান-বেলুচ সেপাইদের ভক্তি তাদের প্রতি বাড়বে।'

এসব কেলেঙ্কারি ধূর্তামি ভণ্ডামির পাঁক কে ঘাঁটতে চায় অথচ না ঘেঁটেও উপায় নেই। হিমালয়ের বর্ণনা দিতে হলে শুধু গৌরীশঙ্কর আর কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রংলিহ সৌন্দর্য বর্ণনা করলে চলে না, তার গভীর উপত্যকা এমনকি কন্টকাকীর্ণ গুহাগহ্বর খানাখন্দেরও বয়ান দিতে হয়।

এ দু মাসের বয়ান দফে দফে না দিলে কোনও বাঙলার পাঠকই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, পূর্ব বাঙলার নেতারা ছাত্রসমাজ-বেঙ্গল রেজিমেন্ট-পাকিস্তান রাইফলস্ পুলিশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে চিন্তাশীলজন কতখানি ধৈর্য ধারণ করে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তাঁদের মোকাবেলা করতে হয়েছে মৌলানা ভাসানীর মতো প্রাচীন তথা জনপ্রিয় নেতার সঙ্গে। এঁরা কোনওপ্রকারের ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে সরাসরি যা বলতেন তার সারার্থ এই, '১৯১৯/১৯২০ থেকে আমরা ধূর্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছি কংগ্রেস-খিলাফতের সঙ্গে যোগ দিয়ে। সেই সময় থেকেই আমরা পরোক্ষভাবে পাঞ্জাবি সিন্ধি বেলুচ পাঠানকে চিনতে শিখেছি। আদর্শ এক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য ঘটেছে, এদের এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কখনও দোস্তি কখনও-বা দুশমনি হয়েছে এবং সর্বশেষে চিনেছি, হাড়ে হাড়ে চিনেছি আইয়ুবের আমল থেকে পাঞ্জাবি মিলিটারি জুন্টাকে। এদের মতো পাজির পা-ঝাড়া হাড়েটক হা— জা ইহসংসারে নেই। এদের সঙ্গে কস্মিনকালেও জয়গুরু দিয়েও রফারফি করতে পারবে না। কষে প্যাঁদানো ছাড়া এদের জন্য অন্য কোনও ওষুধ নেই। এবং যত তুরনৎ সেটা নির্মমতমভাবে প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। খুদ পশ্চিম পাকেই সুপ্রচলিত প্রবাদ আছে, একই গুহায় তুমি যদি দৈবাৎ সঙ্গ পাও, এক ব্যাটা পাঞ্জাবি আর একটা গোখরোর, তবে ক্ষণতরে চিন্তা না করে প্রথম গলা কাটবে পাঞ্জাবিটার তার পর ধীরেসুস্থে মারবে গোখরোটাকে।'

www.pathagar.com

পাঠান্তর : গোখরোটাকে ছেড়ে দিলে দিতেও পার।

এবং লীগের মধ্যেই ছিল একদল ফায়ার-ইটিং ছাত্রছাত্রী যারা কালবিলম্ব না করে চেয়েছিল সম্মুখসংগ্রাম। বিশেষ করে ছাত্রীদের যেন কেউ না ভোলে। গত সংগ্রামে স্বাধীনতার জন্য যে চরম মূল্য এরা দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর সভ্য অসভ্য প্রাচীন অর্বাচীন কোনও দেশে কোনও সমাজে পাবেন না। একমাত্র তারাই এখনও শব্দার্থে রক্তবিন্দু ক্ষরিয়ে ক্ষরিয়ে সে মূল্য শোধ করে যাচ্ছে— লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্বাসনে কোন দানবের অশোকবনে— কীভাবে?

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে ভয়াবহ অত্যাচারে জর্জরিতা জীবন্মৃতাদের যেমন দিব্যদৃষ্ট দিয়ে দেখতে পেয়ে ব্যথিত কবিগুরু নির্দেশ দিচ্ছেন কী দিয়ে তারা চরম মূল্য শোধ করছে সে উত্তর আসছে কোথা থেকে :

'শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে উত্তর আসছে, আব্রু দিয়ে ইজ্জৎ দিয়ে ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়েও।'

না, ইমান তাদের আছে। আর সবকিছু দিয়ে ইমান তারা বাঁচিয়েছে!

রক্ষী বনাম নর্তকী

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে যখন পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে কী পদ্ধতিতে পার্লামেন্টকেন্দ্রিক গণতন্ত্র স্থাপিত হবে সেই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল ওই সময় একদিন তিনটি বাজপাখি দুম দুম করে ঢুকল প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়ার খাস কামরায়। এই শিকরে পাখিগুলো পাকিস্তানি ফৌজের পয়লা কাতারের জাঁদরেলের পাল। লেফটেনেন্ট জেনারেল পিরজাদা, কার্যত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, লেফটেনেন্ট জেনারেল গুল হাসান এবং মেজর জেনারেল আকবর খান। টেবিল থাবড়াতে থাবড়াতে তাঁরা দাবি জানালেন, '৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়েহিয়া যে ঘোষণা দ্বারা ঢাকাতে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন সেটা অ-নি-র্দি-ষ্ট কালের অন্য মুলতুবি করে দিতে হবে।'

লিখেছেন জেনারেল কল জুলাই ১৯৭১ সালে তাঁর 'কনফ্রন্টেশন উইদ পাকিস্তান' পুস্তকে।

এবং এর পর কল যে মন্তব্যটি করেছেন, পাকিস্তানের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে সেইটে সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক ভাগ্য পরিবর্তন নিয়ে।

'এবং তিনটে শিকরেই ইয়েহিয়াকে বাধ্য করালে পুব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা মেনে নিতে।'

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ওই দিনই।

আকাশ বিদ্যুৎ বহ্নি
অভিশাপ গেল লেখি—

ওই দিনই মিলিটারি জুন্টা স্থির করলেন পুব বাংলাকে এমনই একটা শিক্ষা দিতে হবে, যে শিক্ষা আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির, এ যুগে হিটলার কেউই কখনও বাংলার যে কটা 'মানুষের

www.pathagar.com

নামে পশু' বেঁচে থাকবে তারা যেন 'এক হাজার বৎসরের ভিতর' মাথা তুলে খাড়া না হতে পারে। কারণ, জুন্টার মুনিব বলুন, চাকর বলুন, শিখণ্ডী বলুন মি. ভুট্টো একাধিকবার বলেছেন, তিনি এক হাজার বৎসর ধরে ভারতের সঙ্গে লড়াই করে যাবেন। কিন্তু ওই পুব বাংলাটার কোনওপ্রকারের রাজনৈতিক অস্তিত্ব যদি বজায় থাকে তবে 'বাঙালরা' নিশ্চয়ই সেই ভারত বিজয়ে বাধা দেবে বিশেষ করে তাদের ছ-দফা দাবি নামঞ্জুর করার পর।

এ স্থলে ভবিষ্যৎকালের ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলবেন, বাংলাদেশের সর্বনাশ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কি একমাত্র মিলিটারি জুন্টাই দায়ী?

আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একথা তবুও সত্য যে বাংলাদেশের সাধারণজন আজ আর এসব বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী নয়। এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমার ইতালির তথা জর্মন বন্ধুদের বিস্তর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডিকটেটরদ্বয় সম্বন্ধে খবর বের করতে হয়। ওরা কেটে যাওয়া দুঃস্বপ্নের প্রসঙ্গ তুলতে চাইত না। তবু বাংলাদেশের খবরের কাগজ মাঝে মাঝে যেসব রহস্য পশ্চিম পাকে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তার খবর দেয়।

জেনারেল কল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা যে প্রকৃত সত্যের অনেকখানি সন্ধান দেবেন এ তো জানা কথা, কিন্তু যখন কোনও নর্তকীও নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিঃস্বার্থ সেসব সত্যের সমর্থন জানায় তখন সত্য নিরূপণ অনেকখানি সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায়।

গত ১৫/২০ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সরকারি-বেসরকারি নেতারা এমনই বর্বর পশ্বাচারে লিপ্ত থাকাকালীন দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন যে সেসব পুরীষাবর্তের নিকটবর্তী হতে কোনও ঐতিহাসিক বা সত্যান্বেষীজন সহজে রাজি হবেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে নারীজাতি অনেক ক্ষেত্রেই যবনিকান্তরালে শিবাশিব রাজনৈতিক কর্ম সমাধান করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাদাম পঁপাদুর, লোলা মনতে (জ) বিদগ্ধা রোমান্টিক রমণী। এঁদের ললাটে পঙ্কতিলকের লাঞ্ছন আছে বটে কিন্তু সেখানে অশ্লীলতার নোংরামি নগণ্য। এঁদের বুদ্ধিমত্তা রাজনৈতিক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করে ঐতিহাসিক অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত হন ও শুষ্ক ইতিহাস কিঞ্চিৎ সরস হয়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিম পাকে নিছক নোংরামি। তাই সংক্ষেপে সারছি।

ইয়েহিয়া সিপাহসালার, প্রেসিডেন্ট হওয়ার বহু আগের থেকেই নর্তকী আকলিম আখতরকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে তিনি বেসরকারি 'জেনারেল' উপাধি দেন ও তিনি সুবে সিন্ধু পাঞ্জাবে 'জেনারেল রানি' রূপে সুপরিচিতা ছিলেন। সম্প্রতি লাহোরের শব্দার্থে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কিন্তু অল্প পরেই লাহোরের দায়রা জজ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন— মি. ভুট্টোর শাসন যে নিরন্ধ্র নয় একথাটা এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। আখতর সাংবাদিকদের বলেন, ইয়েহিয়ার উত্থান-পতন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করার জন্য তিনি এক প্রকাশকের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি করছেন; তিনি সে পুস্তকে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রকৃত কারণ উল্লেখ করবেন। তিনি আরও বলেন দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য সামরিক জুন্টারাই একমাত্র দায়ী নয়, এর পিছনে বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্র আছে; তাঁর কাছে এ ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আছে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সম্বন্ধে মন্তব্য উহ্য রেখে তিনি বলেন, তাঁকে গ্রেফতার করার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, সর্বোচ্চ সরকারি ক্ষমতায় আসীন কয়েকজনের আতঙ্ক ও ভয়ের জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁর কাছে তাঁদের অপকীর্তি ও গোপন কার্যকলাপের এমন সব তথ্য-প্রমাণ ও ছবি আছে যা প্রকাশিত হলে তাঁদের সুনাম নষ্ট হবে এবং দেশে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

উপসংহারে তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি যে, আমি তা প্রকাশ করব না। কারণ, তা প্রকাশিত হলে দেশের সম্মান বলতে আর কিছুই থাকবে না।'

এর পর মহিলাটি— আমি ইচ্ছে করেই 'মহিলা' বলছি, কারণ পাকিস্তানের অতিশয় অল্প 'ভদ্র' পুরুষও এ তত্ত্ব বলতে সাহস ধরেন, যা এ নর্তকী বলেছে—

'এমনিতেই দেশের সম্মানের আজ যা অবনতি ঘটেছে তাই যথেষ্ট।'

মি. ভুট্টো যে বেইমানি করেছিলেন তার ফল পরে শাপেবর হয়েছিল। বাংলাদেশ দু-শো বছর পর পুনরায় স্বাধীন হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তার যে রক্তক্ষয় হল 'আব্রু দিয়ে ইজ্জত দিয়ে' কোনও গতিকে ইমান বাঁচাল তারা, তার জন্য দায়ী কে? সে অনুসন্ধান আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করতেই হবে। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য। পাঠক যদি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তবে আমি নাচার। আমি আমার আইষমানকে চাই-ই চাই!

মি. ভুট্টো বিলক্ষণ অবগত ছিলেন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য তাঁর আপন দেশের লোক একদিন তাঁকে দায়ী করবে। বিশেষ করে এই কারণে যে, ডিসেম্বর ১৯৭০-এর গণনির্বাচনে তিনি পশ্চিম পাকে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়ার গৌরবে দু হাত দিয়ে কিং কং-এর মতো সর্বত্র বুক দাবড়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি তাবৎ পশ্চিম পাকের প্রতিভূ— ফরাসি রাজার মতো 'লেতা সে মোওয়া, (আমি যা, রাষ্ট্রও তা), পুব বাংলায় পরাজয়ের পর তিনি হঠাৎ করে চটসে পালাবেন কী করে? তাই তিনি স্থির করলেন, এখন আমি প্রেসিডেন্ট, এই বেলা একটা অনুসন্ধান কমিটি বসিয়ে আমি সর্বদোষ চাপাব ইয়েহিয়ার স্কন্ধে। দরকার হলে মিলিটারি জুন্টাকেও তার সঙ্গে জড়াব।

সতেরো বছরের স্বৈরাচারের পর দিনকে রাত, রাতকে দিন করা সবকিছুই সম্ভব। কিন্তু সতেরো বছর বলি কেন? পাকিস্তানের জন্মদিন থেকেই তো স্বৈরতন্ত্র। কু-ইদ-ই আজম মুহম্মদ আলি ভাই ঝিভাড়াই (জিন্নাহ) পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তির আধার। তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইংরেজ ক্যামবেল-জনসন বলেছেন, 'এখানে, এইখানে পশ্য, পশ্য, পাকিস্তানের রাজাধিরাজ ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ একাধারে পার্লামেন্টের সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী— সর্ব ভিন্ন ভিন্ন সত্তা এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করে বিরাটকার এই ক্বাইদ-ই-আজম।' 'Here indeed is Pakistan's King Emperor, Archbishop of Canterbury, Speaker and Prime Minister concentrated into one formidable Quaid-i-Azam.' পাকিস্তানের জন্মকালে ও মরহুম জিন্নার জীবিতাবস্থায় কোনওপ্রকারের পার্লামেন্টি 'বিরোধী দল' ছিল না, থাকলে অতি অবশ্যই তিনি আরও বড় নেতা হতেন।

সেই শুভ ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন থেকে সর্ব-মরহুম কি লিয়াকত আলী, কি ইসকনদার মির্জা সবাই ছিলেন এক-একটি চোটা হিটলার। এমনকি আইয়ুবের ন্যাজ, পূর্ব পাকের

www.pathagar.com

গবর্নর মোনায়েম খান পর্যন্ত সার্কাসের ক্লাউনের মতো মুনিবের কীর্তিকলাপের ভড়ং করে যেতেন রাত দুটো-তিনটে অবধি— তাঁর ছিল অনিদ্রা রোগ। আশ্চর্য! দুই প্রত্যন্ত— একসট্রিম কী জানি কী করে দোহাদুঁহু হয়ে যায়— হিটলারের ছিল ইনসমনিয়া, দু জনারই ছিল মদ্যে অনীহা।

এদের তুলনায় ভুট্টো কম যান কিসে?

বস্তুত তিনি প্রথম রাউন্ড তাঁরই আদেশমতো করিয়ে নিয়েছেন। পূর্বোক্ত কমিশন আগস্টের মাঝামাঝি নির্দেশ দিয়েছেন— অবশ্য প্রভু ভুট্টোর অনুমোদন সাপেক্ষে— ইয়েহিয়াকে আসামিরূপে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের সমুখে দাঁড়াতে হবে।

মিলিটারি ট্রাইবুনালের কাজকারবার হয় সাতিশয় গোপনে। জনসমাজে যেটুকু মি. ভুট্টোর ফেবারে যায় মাত্র ওইটুকুই প্রকাশ পাবে।

কিন্তু ভয় নেই পাঠক, আমরা আখেরে সবকিছুই জানতে পাব। মূল তত্ত্বগুলো 'নিশ্চয়ই বহুকাল' ধরে জানি। অবশ্য নর্তকী জানেন অনেক বেশি।

মুজিব আউট!

ভুট্টোর স্বগতোক্তি

যেথা যাই সকলেই
        বলে, 'রাজা হবে?'
'রাজা হবে?'— এ বড়ো
        আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি
        কে যেন বলিছে—
রাজা হবে? রাজা হবে?
        দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই
        টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু—
        রাজা হবে। রাজা হবে।
সেই ভালো বাপু, তাই হব।

কবিগুরুর 'বিসর্জন' থেকে। হ্যাঁ, বিসর্জন বইকি? এর তিনপক্ষ পরেই আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকার বিসর্জন দিল সর্ব আইন, জলাঞ্জলি দিল সর্ব ধর্মাচার, ন্যায়বিচার।

এস্থলে অবশ্য দুটি নিরীহ টিয়ে নয়। এখানে তিনটে ঘৃণ্য গৃধ্র— পিরজাদা, গুল আর আকবর। তাঁরা ভুট্টোকে বললেন, 'তুমিই রাজা হবে।'

এই 'ই'টার অর্থ কী?

www.pathagar.com

অর্থ এই : ইয়েহিয়া যখন সবরকমের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুজিবকে হাতে তুলে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন তার বিগলিতার্থ এই, তিনি ডিকটেটর রূপে অখণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে চান না। তিনি চান সুদ্দুমাত্র দুটি জিনিস— মদ্য এবং মৈথুন। এবং পাকেচক্রে নিতান্তই যখন ডিকটেটর হয়েই গিয়েছেন তখন অন্ততপক্ষে তিনি প্রেসিডেন্টরূপে বিরাজ করতে চাইবেন বইকি। কিন্তু ক্ষমতালোভী যখন নন তখন রাষ্ট্রচালনার ভার মুজিবকে দেওয়া যা তোমাকে দেওয়াও তা।

অতএব 'তুমিই রাজা হবে'।

জেনারেল কল-এর ভাষ্যে যারা বিশ্বাস করেন তাঁরা স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারেন যে উপরের সবকটি যুক্তিই দ্ব্যর্থহীন সত্য। বাদশাহ জাহাঁগির একাধিকবার বলেছেন, আমার কয়েক পাত্র মদ্য আর রুটি-মাংস মিললেই ব্যস— রাজত্ব চালান না মহারানি নূরজঁহা। বিস্তরে বিস্তরে এ হেন দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুত আমি জনৈক পাকিস্তানির মুখে শুনেছি, ১৯৬৮-৬৯-এর আইয়ুব যখন যমের (আজরাইলের) সঙ্গে যুঝছেন তখন জাঁদরেলকুল ইয়েহিয়ার সমুখে প্রস্তাব করেন, তিনি যেন তদ্দণ্ডেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন, পাছে আইয়ুব হঠাৎ গত হলে কোনও সিভিলিয়ান না প্রেসিডেন্ট হয়ে পুনরায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে মিলিটারি শাসনের অবসান ঘটায়, তখন ইয়েহিয়া স্রেফ কবুল জবাব দেন। ... তাই বলে পাঠক অবশ্য অন্য একসট্রিমে গিয়ে ভাববেন না যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার লোভ তাঁর আদৌ ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। আর কিছু না হোক, ওই পদে অধিষ্ঠিত হলে তাঁর যে দুটো জিনিসে শখ সেগুলো তিনি নির্ভাবনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আমৃত্যু উপভোগ করতে পারবেন।

১১/১২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পিণ্ডিতে উড়ে এসে ইয়েহিয়ার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিবেচনা করি তাঁকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা দিলেন মুজিবকে তার প্রস্তাবমতো সবকিছু যদি দিয়ে দাও তবে তোমার, আমার, পাকিস্তানের সর্বনাশ হবে। খুব সম্ভব এ প্রস্তাবও করেছিলেন, টাল-বাহানা দিয়ে অ্যাসেমব্লিটা অন্তত মুলতুবি রাখ।

অনুমান করা যেতে পারে ইয়েহিয়া তখন ভুট্টোকে কোনও পাকা কথা দেননি।

ভুট্টো নিশ্চয় তখন তাঁর নিষ্ফলতার কাহিনী মিলিটারি জুন্টার পিরজাদা, গুল ইত্যাদিকে বলেছিলেন।

১৩.২.৭২— ইয়েহিয়া ঘোষণা করলেন, ৩ মার্চ অ্যাসেমব্লির অধিবেশন হবে। সরকারি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বেরুল,

'The President, General A.M. Yahya Khan, has been pleased to summon the National Assembly of Pakistan to meet on Wednesday, March 3, 1971, at 9 a.m. in the Provincial Assembly Building, Dacca, for the purpose of forming a Constitution for Pakistan."

অনুমান করি ওইদিনই জুন্টা গিয়ে থাবড়ালেন ইয়েহিয়ার টেবিল! দাবি করলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাসেমব্লি মুলতুবি রাখতে হবে। ইয়েহিয়াকে সম্মতি দিতে হল বাধ্য হয়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো ঝটপট সে মত পরিবর্তন আরেকটা গেজেট একসট্রা-অরডিনারিতে রাতারাতি প্রকাশ করতে পারে না। তাই সে কর্ম করা হল ঠিক এক পক্ষ পরে।

সেইদিনই বিজয়গর্বে উৎফুল্ল জুন্টা মি. ভুট্টোকে জানালেন,

www.pathagar.com

'তুমি রাজা হবে।'

অর্থাৎ 'মুজিব আর লীগের নেতাদের জেলে পুরব। লীগ পার্টিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করার ফলে তোমার পার্টিই হবে সংখ্যাগুরু। তুমিই হবে প্রধানমন্ত্রী।'

ভুট্টো উল্লাসে নৃত্য করতে করতে ফ্লাই করলেন পেশোয়ারবাগে। এবারে পশ্চিম পাকের বাকি পার্টিগুলোকে বশে আনা যাবে অতি সহজে। তাঁর কেবিনেটে তিনি নেবেন অন্য পার্টি থেকে কিছু মন্ত্রী, উপমন্ত্রী গয়রহ, গয়রহ। সেই প্রলোভনই যথেষ্ট।

১৩.২.৭১—১৪.২.৭১ টেবিল থাবড়ানোর দিন সন্ধেবেলা পেশওয়ারের বিশ্ববিদ্যালয় নগরীর এক বাঙলোতে বসল জমজমাট জাঁদরেল ককটেল পার্টি। তিনি যে অখণ্ড পাকিস্তানের রাজা হতে চললেন সে সুসমাচার তিনি কি অত সহজে চেপে যাবেন— অতি অবশ্যই দু চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সে আনন্দের হিস্যেদার করেছিলেন। কিন্তু অল্পে সুখ কোথায়? সুখ ভূমাতে। ইতোমধ্যে পিপলস পার্টির রাজা হয়ে গিয়েছেন ককটেল পার্টির রাজা। পাকিস্তানের পলিটিক্যাল পার্টি এবং ককটেল পার্টিতে অবশ্য কোনওকালেই বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না এমন উপবাসের মাস রমজানের দিনে (!), লাঞ্চ পার্টিতেও না।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এন্টনি বলেছেন, গেলাস— পাঠক, নিম্বুপানির গেলাস ভেবে আপন কল্পনাশক্তিকে বিড়ম্বিত কর না— হাতে করে সে ককটেল পার্টির চক্রবর্তী হবু রাজা মি. ভুট্টো রসে নিমজ্জ সর্বজনকে ইলেকট্রিফাই করলেন মাত্র কয়েকটি ঐতিহাসিক লবজো মারফত 'ভুট্টো আবার ঘোড়ার জিনে সোয়ার। এ ঘটনা ঘটল যারা শক্তিধর তাদেরই মীমাংসা দ্বারা। মুজিব আউট (মুজিব ইজ আউট!)! আমি প্রধানমন্ত্রী হব।'

মুজিব আউট! লেগ বিফোর উইকেট? সেইটেই তো ধাপ্পার হেডাপিস। ইয়েস, অ্যান্ড নো। টসে (গণনির্বাচনে) জিতেছিলেন লীগের ক্যাপটেন শেখজি। তিনিই ওপনিং ব্যাটস্‌মেন। কী এ ক্রিকেট খেলাতে কুদরতে কী খেল! ফার্স্ট ইনিংসে নামবার পূর্বে পেভিলিয়নে যখন শেখ লেগিং পরছেন তখনই তিনি 'লেগ বিফোর উইকেট, ইন দি পেভিলিয়ন'।

বাকি খেলোয়াড়দের যে কটিকে আমপারার— বুচারের দু আঁসলা বেটা টিক্কা পাকড়াতে পেরেছিলেন তাদের নিয়ে সেই টিক্কা-এলেভন হানড্রেড-হানড্রেডের ব্লাডি ইনিংস-এ আমরা এখনও পৌঁছইনি।

অখণ্ড পাকের চাঁই/ ভুট্টো বিনে কেউ নেই

প্রেসিডেন্ট ইয়েহিয়া, জুন্টা আর ভুট্টোতে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এর মাঝামাঝি থেকে আর কোনও মতভেদ রইল না— ভুট্টো সামলাবেন সিভিলিয়ান দিক অর্থাৎ পশ্চিম পাকের যে-কটা রাজনৈতিক দল আছে তার যে কজন লিডারকে তিনি পারেন আপন দলে টানবেন, প্রলোভন দেখিয়ে।

পলিটিশিয়ান আর *স্টেটসমেনে* তফাত কী? পলিটিশিয়ান জনগণকে একত্র করে পার্টি বানিয়ে তাদের চালায় আর *স্টেটসম্যান* সেই ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন

www.pathagar.com

পলিটিশিয়ানকে একজোট করে রাষ্ট্র নির্মাণকর্মে অগ্রসর হয়। কাষ্ঠরসিকরা বলেন, পলিটিশিয়ান ম্যাস (জনগণকে) বুদ্ধু বানায় আর স্টেটসম্যান পলিটিশিয়ানদের বুদ্ধু বানায়।

এইবারে পলিটিশিয়ান ভুট্টো পরলেন স্টেটসম্যানের মুখোশ। সেটা যে কতখানি বেমানান বদখদ বেঢেপ হল সেটা জানেন মি. ভুট্টো সবচেয়ে বেশি। যাঁকে পশ্চিম পাকের জনগণ ডিকটেটর আইয়ুবের ডেমোক্রাটিক ন্যাজ খেতাব বহু পূর্বেই দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে, যাঁর কাজ— পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে ছিল পর্দার আড়ালে গুড়িগুড়ি হামাগুড়ি দিতে দিতে একে ভজা ওকে প্যার করা, মাঝে মাঝে চিত্রিতা গর্দভীর ন্যায় ক্ষণতরে আত্মপ্রকাশ করা, সে রাতারাতি পেয়ে গেল ডবল প্রমোশন (এদানির ঢাকার অটোপ্রমোশনের চেয়ে দু কাঠি সরেস); পলিটিশিয়ান না হয়েই সরাসরি স্টেটসমেন!

দিগ্বিজয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পয়লা মনজিলেই খেলেন পয়লা থাপ্পড়।

প্যাভিলিয়নে বসেই মুজিব এলবি ডাবলু হওয়ার ইলেকট্রিক শকসন্দেশ দেওয়ার পরদিন বীর ভুট্টা গেলেন ফ্রন্টিয়ার নেতা খান ওয়ালি খানের কাছে। তাঁকে খবর দিলেন, 'পাকিস্তান টাট্টুর পিঠে ভুট্টো আসওয়ার। এসো, ভাই, দুই বেরাদরে মিলে লঙ্কাটা ভাগ করে নিই।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝাণ্ডু সিন্ধু-পাণ্ডা ভুট্টো পোশতুভাষীর সঙ্গে কুস্তি লড়লেন জুডোর সর্ব প্যাঁচ চালিয়ে কিন্তু ওয়ালি খালি এক কথা বলে 'না'। পলিটিকস ব্যাপারটা ধোয়া তুলসীপাতা নয় সে তত্ত্বটা পেশাওয়ারেও অজানা নয়, কিন্তু এতখানি হীন হবার মতো পাঠান ওয়ালি খান নন। শেষটায় ভুট্টো সঙ্গোপনে ওয়ালিকে জানালেন, এসেমব্লি অধিবেশনে আমি ঢাকা যাব না। আমার এ সিদ্ধান্ত আমার পার্টি মেম্বাররা পর্যন্ত জানে না। এটা ১৪ ফেব্রুয়ারির কথা।

তার পরদিন ১৫/২-এ সর্বজনসমক্ষে বম ফাটালেন মি. ভুট্টো— ভাবার্থে। এরই ফলে ঠিক চল্লিশ দিন পরে হাজার হাজার বম ফাটল ঢাকাতে সশব্দে, শব্দার্থে রাত এগারোটায়। এ বমটা তিনি কেন ফাটালেন, কার নির্দেশে ফাটালেন তার আলোচনা হবে ১ মার্চের পরিপ্রেক্ষিতে, যেদিন ইয়েহিয়া জুন্টার আদেশমাফিক ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দিলেন।

পনেরো তারিখের তাঁর সেই দীর্ঘ বিবৃতি এতই পরস্পরবিরোধী, দ্ব্যর্থসূচক, ঝাপসা এবং ইংরেজিতে যাকে বলে বিটিং এবাউট দি বুশ যে তার সারমর্ম দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এতে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু যখন দেখি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (এর কার্যকলাপ পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল বেশি) নসরুল্লা খান, মি. ভুট্টোর বম মারার দু দিন পর নিম্নের বিবৃতিটি দিচ্ছেন তখন মন সান্ত্বনা মানে :

মি. ভুট্টোর পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত যে গণতন্ত্রবিরোধী সে মন্তব্য করার পর খান সাহেব বলেছেন : 'মি. ভুট্টোর পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে (এর ফলস্বরূপ— লেখক) কী হবে সে সম্বন্ধে কোনওকিছু একটা বলা শক্ত। কারণ পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যানের স্বভাবই হচ্ছে অতিশয় দ্রুতবেগে তাঁর মল্লভূমি পরিবর্তন করা (চেনজিং হিজ স্ট্যান্ডস উইদ গ্রেট রেপিডিটি)। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি বলেছিলেন যে, পরিষদ অধিবেশনে সভা মধ্যে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।'

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে আমরা ২ সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় মি. ভুট্টোর একটি বিবৃতি থেকে তার সারাংশ উদ্ধৃত করি। তিনি তখন (১৯.১.৭১) বলেছিলেন, 'ইট ইজ নট

www.pathagar.com

নেসারারি টু এনটার ইনটু দি কনসটিচুয়েন্ট এসেম্বব্লি উইদ অ্যান এগ্রিমেন্ট অন ডিফারেন্ট ইস্যুজ বিকজ নিগোসিয়েশন কুড কন্টিন্যু ইভন হোয়েন দি হাউজ ইজ ইন সেশন।'

তা হলে এক পক্ষকাল সময় যেতে না যেতে আজ (১৫.২.৭১) হঠাৎ ভুট্টোজি এ বোমাটা ফাটালেন কেন?— যে, আমার সঙ্গে আগেভাগে সমঝোতা না করলে আমরা এসেম্বব্লি করতে ঢাকা যাব না।

ঠিক এই প্রশ্নটিই শুধোলেন নসরুল্লার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো-বিবৃতি পাঠমাত্র পশ্চিম পাকের নেতা সলাহ উদ্দিন খান, 'ভুট্টো এসেমব্লি বয়কটের ঘোষণা করার জন্য যে সময়টা বেছে নিলেন সেটা ভারি হেঁয়ালিভরা (ভেরি ইনট্রিগিং)। তিনি ঢাকাতে যখন শেখ মুজিবের সঙ্গে দফে দফে চুলচেরা (থ্রেডবেয়ার) আলোচনা করেছিলেন তখনই তো শেখের মতিগতি তিনি অতি অবশ্যই বুঝে নিয়েছিলেন। কারণ শেখ তো তখন তাঁর সাকুল্যে তাস টেবিলের উপর রেখে সর্বসংশয় নিরসন করেছিলেন।'

এটা তো প্রহেলিকা (ব্যাফলিং) যে, মি. ভুট্টো সেই সময়ই তাঁর আপন মনের গতি বুঝিয়ে বলেননি কেন?

এই এক পক্ষকাল মধ্যে তো আওয়ামী লীগ তার প্রোগ্রামে কণামাত্র রদবদল, কাটাই-ছাঁটাই, ডলাই-মলাই কিছুই করেননি তবে কেন আজ মন্থরার মুখে যেন নবান্নের বিন্নে-ধানের খই ফুটতে আরম্ভ করল?

কিচ্ছু না। সেই টেবিল-থাবড়ানোর ফলশ্রুতি যেন জুন্টা কর্তৃক মি. ভুট্টোর পিঠ থাবড়ানোর শামিল। যেন পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি ফুঁকলেন— দুর্যোধনের মন থেকে সর্ব দ্বিধা অন্তর্ধান করেছে— কারণ সৈন্য পর্যাপ্ত, কারই-বা অপর্যাপ্ত, কে নেয় তার খবর!

জনাব ভুট্টোর বক্তব্য এতই দীর্ঘ যে, যে ছেলে তার প্রেসি লিখতে পারবে সে হেসে খেলে বিএ, এমএ-তে ফার্স্ট হবে। সংক্ষেপে যতখানি পারি তারই নিষ্ফল চেষ্টা দেব। না করে উপায় নেই। কারণ হিটলারের মতো মি. ভুট্টো ইতিহাসের বিচার-সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন। মি. ভুট্টোর কেতাবে আছে— 'একদা শেখ মুজিব আমাকে হুঁশিয়ার করে বলেন, আমি যেন মিলিটারিকে বিশ্বাস না করি। শেখ বলেন, মিলিটারি যদি তাঁকে (মুজিবকে) প্রথম বিনষ্ট করে তবে আমাকেও তারা বিনষ্ট করবে[১]। আমি বললাম, মিলিটারি বরঞ্চ আমাকে বিনষ্ট করে করুক, কিন্তু ইতিহাসের হাতে আমি বিনষ্ট হতে চাইনে।'

---

১. ১২.১২.৭১ নাগাদ শ্রীভুট্টো আমেরিকায় নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দেন। ইয়েহিয়া তাঁকে আমেরিকা পাঠাবার পূর্বে হুকুম দিয়েছিলেন তিনি যেন ফেরার পথে প্লেনে করে প্রথম কাবুল আসেন। সেখান থেকে মোটরে করে পেশাওয়ার। ইয়েহিয়ার প্ল্যান ছিল পথমধ্যে ভুট্টোকে গুমখুন করা, কারণ ইয়েহিয়ার সিংহাসন তখন টলমল। তিনি 'বিশ্বস্তসূত্রে' অবগত হয়েছিলেন, দেশে ফিরে ভুট্টো তাঁকে আসন থেকে সরাবেন।... কিন্তু ভুট্টোকে ডেকে নিয়ে নিকসন তাঁকে বলেন, ইয়েহিয়াকে দিয়ে আর কিছু হবে না। তিনি (নিকসন) হুকুম দিয়েছেন, ইয়েহিয়া যেন বিনাবাধায় ভুট্টোকে আসন ছেড়ে দেন। ভুট্টো তাই সরাসরি করাচি পৌঁছন। যাঁরা ভুট্টোর মহানুভবতায় পঞ্চমুখ তাঁরা শুনে বেজার হবেন, নিকসনের হুকুম মাফিক মি. ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন।

www.pathagar.com

উপস্থিত তিনি যতখানি পারেন ইতিহাস বিনষ্ট করছেন। অন্তত বিকৃত করছেন তাঁর আপন তাঁবেতে 'নিরপেক্ষ' কমিশন বসিয়ে। এ কর্মে তিনি 'বুচার অব বেঙ্গল'-এর পরিপূর্ণ সহায়তা পাবেন। তিনি এখন পাকিস্তানের জঙ্গিলাট। কু-লোকে বলে, যে টিক্কা প্রভু ইয়েহিয়ার আদেশে বাংলাদেশ দহন-ধর্ষণ করলেন তাঁকে খাস করে জঙ্গিলাট বানালেন মি. ভুট্টো, ওকিবহাল টিক্কা এক্‌স্‌-প্রভুর সর্বাঙ্গে যেন উত্তমরূপে কর্দম লেপন করতে পারেন।

তা তাঁরা ইতিহাস নিয়ে যা খুশি করুন, প্রামাণিক সমসাময়িক ইতিহাস বলেন :

( ) মুজিব আমার সঙ্গে সমঝোতা না করলে আমার পার্টি ঢাকা যাবে না।

সাংবাদিকের প্রশ্ন : আপনি কি তবে এসেমব্লি বয়কট করছেন?

ভুট্টো : (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

এ ঘটনার আট মাস পরে মি. ভুট্টো অক্টোবর ১৯৭১-এ আপন পুস্তিকা 'দি গ্রেট ট্র্যাডেজিতে' লিখেছেন, তিনি এসেমব্লিতে যাবার পূর্বে যে শর্ত দিয়েছেন সেটা না মানা হলে তিনি ঢাকা যাবেন না, জানালে পর, 'হুয়েন আস্কড বাই করেসপনডেনটস হুয়েদার পিপলস পার্টি উয়োজ বয়কটিং দি এসেমব্লি আই কেটেগরিক্যালি ডিনাইড ইট।[২]

পাঠক চিন্তা করে নিজেই মনস্থির করে নিন, এটাকে বয়কট না করলে বয়কট বলে কাকে?

এ তথ্য কি বলার প্রয়োজন আছে যে পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকের রাজনীতিক নেতারা— মি. ভুট্টোর দোস্ত-দুশমন দুই-ই— ভুট্টোর এই আচরণকে 'বয়কট' নাম দেন, কেউ কেউ এটাকে 'ব্ল্যাকমেল'ও বলেন।

কট্টর মুসলিম অখণ্ড পাকিস্তান বিশ্বাসী জমাৎ-ই-ইসলামীর আমির (খলিফা) মৌলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদি কড়া ভাষায় ভুট্টোর এই মনোভাবকে অসঙ্গত আচরণ বলে নিন্দা করেন। এমনকি এসেমব্লির বাইরে ভুট্টো-মুজিবে সংবিধান বাবদে সমঝোওতা করার প্রচেষ্টাকেও তিনি নিন্দনীয় মনে করেন। যা-কিছু হবার তা হোক এসেমব্লির ভিতরে— এই তাঁর সুচিন্তিত মত।

অথচ এর দু তিন দিন পূর্বেই স্বয়ং ভুট্টোই এই মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সর্বজনসম্মত সংবিধান নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন!

মওলানা ছাড়া পশ্চিম পাকের অন্যান্য নেতারাও একবাক্যে এই বয়কট-এ প্রতিবাদ নিন্দা অসম্মতি জানান— নিতান্ত সরকারের ধামাধরা কাইয়ুম জাতীয় দুটি দল ছাড়া। আর 'পূর্ব পাকের' আওয়ামী লীগবিরোধী নেতারাও ভুট্টোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকর বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান-প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট 'পুব পাকের' ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি নুরুল আমিন[৩] ভুট্টোর আচরণ 'হেস্টি' এবং 'আনহেলপফুল' আখ্যা দিয়ে পুব বাঙলার

---

২. দি গ্রেট ট্র্যাজেডি, পৃ. ২৮।

৩. অধুনা যে কয়েকজন বাঙালি পাকিস্তান থেকে কাবুল হয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা কাগজে প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে আমার এক আত্মীয় আমাকে বলেছেন, নূর মিঞা বন্দি বাঙালিদের জন্য কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তো তুলছেনই না, তদুপরি বাঙালিরা যাতে করে দেশে ফিরতে না পারে সে ব্যাপারে 'দারুণ' উৎসাহী। বস ভুট্টো সমীপে আপন কিমৎকদর বাড়াবার জন্য। ফোনে বাংলা শুনলে আঁতকে ওঠেন।

www.pathagar.com

প্রতি ভুট্টোর আচরণের নিন্দা করেন। তথা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন, ভুট্টো এসেমব্লি বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন পাকিস্তানকে দু খণ্ডে বিভক্ত করার জন্য!

এখনও মাঝে মাঝে কানে আসে ভুট্টোর স্তুতিগান— তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তান! তা হলে বলতে হয়, আওয়ামী লীগ থেকে আরম্ভ করে ওয়ালি খান, নসরুল্লা, সলাহ্ উদ্দিন, চোর উল আমিন এস্তেক মৌলানা মওদুদি— সব্বাই সব্বাই লিপ্ত হয়েছিলেন গভীর এক ষড়যন্ত্রে, পাকিস্তানকে কী প্রকারে দ্বিখণ্ডিত করা যায়! সামনে উজ্জ্বল উদাহরণ, লেট জিন্নাহ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেন।

'সাত জর্মন
এক জগাই
তবু জগাই লড়ে!'

গয়নার নৌকা চেনে না কে? বিশেষ করে পুব-বাঙলায়। বারোইয়ারি নৌকা, পাঁচো ইয়ারে ভাড়া করে গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে যে যার আপন মনজিলে নেমে যান। অবশ্য পাঁচো ইয়ার নৌকো ইশটিশন ঘাটে পৌঁছনো মাত্রই হুড়মুড়িয়ে একে অন্যের ঘাড়ে পড়ে চড়ে, নৌকোর ভেতর ঢোকেন— নৌকোর গর্ভ থেকে আগের যাত্রীদের নামবার পূর্বেই। অবশ্য তখনও তারা পাঁচো ইয়ার নয়, বরঞ্চ পঞ্চভূত বলতে পারেন। জায়গা দখল করার তরে তখন ভূতের নৃত্য। তার পর ধীরেসুস্থে জিরিয়ে-জুরিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়। যথা :

'মহাশয়ের নাম?'

'এজ্ঞে, নেতাই হালদার। মহাশয়ের?'

'এজ্ঞে, হরিপদ পাল।... ওই যে কত্তা, আপনার?'

'আমার নাম? নেপালচন্দ্র গুণ।'

তার পর নানাবিধ অভিজ্ঞান জিজ্ঞাসা। এমন সময় একজনের খেয়াল গেল, ছইয়ের বাইরের ওই ঠা ঠা রোদ্দুরে একটা লোক উদাস মুখে বসে আছে। চাষাভূষা হবে। এর তো পরিচয় নেওয়া হয়নি। উনিই গলা চড়িয়ে মুরুব্বি মেকদারে জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমার পরিচয়টা তো জানা হল না হে।' অতি বিনয়নম্রকণ্ঠে লোকটি, 'আইগা, আমার নাম আব্দুর রহিম বৈঠা।' গয়নার পাঁচো ইয়ার তাজ্জব। তার পর কলবর। "বৈঠা! সে কী, হে? মুসলমানের এ পদবিও হয় নাকি?'

সবিনয় উত্তর : 'আইগা, অয় না, অখন অইছে। ঠেকায় পইড়া আপনারা কেউ হালদার, কেউ পাল, কেউ গুণ। বেবাক গুলাইন যদি ছইয়ের মধ্যে বইয়া থাহেন তয় নাও চলব কেমতে? তাই আমি "বৈঠা" অইয়া একলা একলা নাও বাইতেছি।'

তা সে একা একাই 'নাও বাইয়া যাউক' কোনও আপত্তি নেই, কারণ কবিগুরুও গেয়েছেন,

'হেরো নিদ্রাহারা শশী
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া
একলা চালায় বসি।'

www.pathagar.com

তবে কি না আব্দুর রহিম বৈঠা না হয়ে লোকটার নাম জুলফিকার (দুলফিক্কার) আলি বৈঠা হলেই ১৫/১৬/১৭ ফেব্রুয়ারির হালটা বিম্বিত হয়ে মানাত ভালো।

এই সুবাদে 'জুলফিকার' অর্ধসমাসটির কিঞ্চিৎ অর্থনিরূপণ করলে সেটাকে বহু পাঠক দীর্ঘসূত্রতারূপে অগ্রাহ্য করবেন না। কারণ যত দিন যাচ্ছে, ততই দেখতে পাচ্ছি, বহু হিন্দু প্রতিবেশী মুসলমানদের কায়দা-কানুন রীতিরেওয়াজ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। কেচ্ছা-সাহিত্যে আছে,

আলীর হিম্মৎ দেখ্যা
নবী চমৎকার।
আদরে দিলাইন তানে
তেজি জুলফিকার ॥
হজরত আলীর দস্তে
ঠাটা[১] তলওয়ার।
আসমানে বিজুলি পারা
নাচে চারিধার ॥

পয়গম্বর হজরত আলিকে যে জুলফিকার নামক তরবারি দেন সেটি খুব সম্ভব সিরিয়া দেশের দিমিশকে (ডামাস্কস নগরে) তৈরি। কিন্তু অতখানি এলেম আমার পেটে নেই যে তার পাকা খবর সবজান্তা পাঠকের পাতে দিতে পারি।

তা সে যাই হোক, ১৫/১৬/১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে জুলফিকার আলি বৈঠা সগর্বে তথা সকরুণ কণ্ঠে প্রচার করলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকার নেশনেল এসেমব্লি অধিবেশনে যে যাক সে যাক, তিনি যাবেন না, তিনি জুলফিকার আলি বৈঠা নিমজ্জমান পশ্চিম পাকিস্তানের তরণি একাই বৈঠা চালিয়ে অগ্রগামী হবেন। কারণ তিনি পাকা খবর পেয়েছেন, উত্তর কাশ্মিরের হিন্দুকুশ থেকে আরম্ভ করে কচ্ছের রান অবধি দুশমন ইন্ডিয়া সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সেটা 'বেইমান' ইন্ডিয়ানরা এমনই সুচতুরতাসহ সমাধান করছে যে অতি অল্প লোকই তার খবর রাখে। এখানে বরঞ্চ সুচতুর ভুট্টো এমন একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিলেন যার ভাবার্থ 'তোমাদের কেউ কেউ তো অন্তত জানো, মিলিটারির সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ দোস্তি হেঁ হেঁ— হেঁ হেঁ' অর্থাৎ তিনি, ভুট্টো, খবরটা পেয়েছেন নিতান্তই মিলিটারি প্রসাদাৎ। কিন্তু প্রশ্ন, ইন্ডিয়া ঠিক এই সময়ই সৈন্য সমাবেশ করছে কেন? কারণ ধুরন্ধর ইন্ডিয়া জানে, পশ্চিম পাকের বিস্তর রাজনৈতিক নেতা মার্চের পয়লা সপ্তাহে ঢাকা গিয়ে জড়ো হচ্ছেন। সেই সুযোগে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আক্রমণ করলে তাঁরা সবাই আটকা পড়ে যাবেন ঢাকায়। দেশের জনগণকে লিডারশিপ দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার্থে 'জিহাদ' লড়বার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারবেন না।

এই ইন্ডিয়া জুজুর বিভীষিকা দেখানো— যখন তখন, মোকা-বেমোকায়— ওইটেই মি. জুলফিকার আলি ভুট্টোর জুলফিকার তলওয়ার। তাঁর সম্মানিত নামে (ইসমে শারিফে) 'আলি' যখন রয়েছে তখন এই জুলফিকার তলওয়ারে তাঁরই হক্ক সর্বাধিক। এই বেতাল-অসিতে ভানুমতী মন্ত্র আউড়ে ইন্দ্রজাল-রাজ ভুট্টো দিবা দ্বিপ্রহরে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম।

১. ঠাটা ডাট্টা দৃঢ় = বজ্র

www.pathagar.com

সাতিশয় মনস্তাপের বিষয়, এই পোড়ার সংসারে আর যে অভাব থাক থাক, সন্দেহপিশাচের অভাব হয় না। তাদেরই দু-একজন মৃদুকণ্ঠে আপত্তি জানালে পর ভুট্টো যে উত্তর দিলেন সেটি পরশুরাম ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

'তারিণী (স্যান, কবরেজ)। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, Zানতি পার না।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এরপর মি. ভুট্টো যে ভয় দেখালেন সেটা আরও প্রাণঘাতী। তিনি বললেন, 'আমি আমার পার্টি সদস্যদের ঢাকা পাঠিয়ে সেখানে ওদেরকে ডবল হস্টেজে পরিণত করতে পারিনে।' একদিকে তাঁরা পশ্চিম পাকে ফিরতে পারবেন না (ইন্ডিয়া ফিরতে দেবে না)— অতএব তাঁরা হয়ে যাবেন ইন্ডিয়ার হস্টেজ, এবং তাঁরা আওয়ামী লীগের ছ'দফা মানতে পারবেন না বলে তাঁরা হয়ে যাবেন লীগেরও হস্টেজ। অর্থাৎ ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে কতকগুলি অপমানজনক দাবি তুলবে পাকিস্তানের কাছে এবং সেগুলো না মানা পর্যন্ত সেই 'আমানতি' সদস্যদের জলপথে, শূন্যমার্গে পশ্চিম পাকে ফিরতে দেবে না। আর আওয়ামী লীগও তাদের পুব পাক থেকে বেরুতে দেবে না।

সর্বনাশ! তা হলে এই দুধের ছাওয়ালদের হালটা হবে কী?

সব জেনেশুনে সদস্যরা যদি ঢাকা যান তবে, তবে কী আর হবে— এসেমব্লি হল কসাইখানাতে (মি. ভুট্টোর আপন জবানিতে 'স্লটার হাউস'-এ) পরিবর্তিত হবে!

সাংবাদিকরা যে সাতিশয় বিদগ্ধান্ত (হার্ড বয়েলড এগস্) সে তত্ত্বটি বিশ্বজন সম্যকরূপে অবগত আছে। তথাপি তাঁরাও নাকি আঁতকে উঠেছিলেন। শকটা সামলে নিয়ে সমস্বরে তাঁরা নানান প্রশ্ন শুধালেন। কিন্তু মি. ভুট্টো চুপ মেরে গেলেন। 'হি ডিড নট এলাবরেট অন দিস পয়েন্ট'— সবিস্তর স্বপ্রকাশ হতে সম্মত হলেন না।

কী জানি? কে জানে? হয়তো তিনি তখন বৃহত্তর ব্যাপকতর স্লটার-ভূমির স্বপ্ন দেখছিলেন।

বুড়িগঙ্গা

ঢাকা শহরের সৌন্দর্য আর মাধুর্য শুধু এ শহরের আপনজনই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। ঢাকার আবহাওয়ার সঙ্গে, ধরুন বর্ধমানের কণামাত্র সাদৃশ্য নেই— যদিও দুটিই বিশাল বঙ্গের দুই নগর। বর্ধমান-বীরভূমের সৌন্দর্যে রুদ্রের প্রচণ্ড প্রখরতা— ঢাকার সৌন্দর্য তার লাবণ্যে।

ঢাকা, মৈমনসিং, সিলেট খাঁটি বাংলা কিন্তু তার আস বাঁশ তার আমজাম তার রিমঝিম বারিপাত তার একান্ত নিজস্ব। অথচ এ-ও জানি এ দেশের লতা-পাতা ফল-ফুল পশু-পক্ষী কেমন যেন মণিপুর, আরাকান, বর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ধরে বেশি। এসব দেশের সঙ্গে ঢাকা-চাটগাঁর পরিচয় বহুদিনের কিন্তু আমার মনে হয় মাত্র এক শতাব্দী হয় কি না হয় ঢাকার শৌখিন লোকের খেয়াল গেল, বর্মা-মালয় থেকে অচেনা গাছপালা, তরুলতা এনে এখানে

www.pathagar.com

বাঁচানো যায় কি না। কারণ এতদিন এরা পশ্চিম থেকেই এনেছে এসব, এবং এদেশের বড্ড বেশি স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতে সেগুলোর অনেকেই মারা যেত কিংবা মুমূর্ষুরূপে মানুষের হৃদয়ের করুণা জাগাত মাত্র। পক্ষান্তরে আশ্চর্য সুফল পেল ঢাকার তরুবিলাসী জন বর্মা-মালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করে। তার পর এল আরও নানান দেশ থেকে নানান রকমের গাছ।

বসন্তকাল মিটফোর্ড পাড়ার বারান্দায় বসে আছি সন্ধেবেলা। বাঁশের ফ্রেমে লতিয়ে উঠেছে পল্লবজাল। ম্লান গোধূলিটি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে না দিতেই অচেনা এক মৃদু গন্ধ যেন ভীরু মাধবীর মতো 'আসিবে কি থামিবে কি' করে করে হঠাৎ সমস্ত বারান্দাটায় যেন জোয়ার লাগিয়ে দিল। হায়, আমি বটানির কিছুই জানিনে। গৃহলক্ষ্মী ক্ষণতরে বাইরে এসেছিলেন। নামটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলুম।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বুড়িগঙ্গার জল আর দেখা যাচ্ছে না। ওপারে একটি-দুটি তারাও ফুটতে আরম্ভ করেছে— যেন সমস্ত রাত ধরে এপারের ফুলকে সঙ্গ দেবে বলে। একমাত্র ওই তারাগুলোই তো সব দেশের উপর দিয়ে প্রতি রাত্রে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি পাড়ি দেয়। তারা চেনে সব ফুল, সব গাছ, সব মানুষ। মনে পড়ল, একদা বহু বহু বৎসর পূর্বে কাবুলের এক পান্থশালায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রায় প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে, একবুক অচেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখেছিলুম অচেনা গাছ, অজানা পল্লব, বিচিত্র ভঙ্গির ভবন অলিন্দ, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাখির কুহু কেকার অনুকরণ। আমার অধঃচেতন একাধিক ইন্দ্রিয়ের ওপর অচেনার এই আকস্মিক অভিযান যেন বিহ্বল বিকল করে দিয়েছিল আমাকে। দেশের কথা মায়ের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে এল। ঠিক এই সময়ে দেশের বাড়িতে ঘুম ভাঙলে শুনতে পেতুম মা আঙিনায় গোলাপঝাড়ের নিচে জলচৌকিতে বসে বদনার পানি ঢেলে ঢেলে ওজু করছে। কখনও-সখনও চুড়ির ঠুংঠুংও শুনেছি। একেবারে অবশ হয়ে গেল সমস্ত দেহমন।

এমন সময় আল্লার মেহেরবানিতে চোখ দুটি গেল ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। দেখি, অবাক হয়ে দেখি, সেই পরিচিত অতিপরিচিত এ জীবনে আমার প্রথম কৈশোরের প্রথম পরিচয়ের নক্ষত্রপুঞ্জ— কৃত্তিকা। সেটা কিন্তু তোলা নাম। তার আটপৌরে ডাকনাম সাত ভাই চম্পা। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পেয়েছি সে জনপদবধূর প্রিয় নাম,

'— ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে
পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা'—

সাত ভাই চম্পা চলেছে ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গার পিছে পিছে— তারই উল্লেখ করলেন কবি 'তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথ" বর্ণনা দিয়ে। আর এই যে-দেশে এসেছি গ্রহ তারকার যোগাযোগে, সে দেশের রাজা আমানুল্লার রানির নাম সুরাইয়া, কৃত্তিকার আরবি নাম। তাঁকে ধরবে বলে পিছনে ছুটেছে রোহিণী, আরবদের জ্যোতিষশাস্ত্রে আল্-দাবরান। কাবুলে সে দেখা দিল দু বৎসর পরে।

www.pathagar.com

সাত ভাই চম্পা আমাকে চেনে আর বুড়িগঙ্গার পারে নির্বাসিতা ওই বিদেশি ফুলকেও চেনে।

না, ভুল করেছি। দু-একটি তারা যে নড়তে-চড়তে আরম্ভ করেছে। এগুলো ওপারের নৌকোর আলো। অথচ ওই আলোগুলোর একটু উপরের দিকে তাকালেই দেখি, আকাশের তারা। অন্ধকার এত নিবিড় যে এই মাটির আলো আর আকাশের আলোর মিতালি ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়ে না।

এ পাড় থেকে মাঝে মাঝে কানে আসছে কে যেন কাকে ডাকছে। সাড়াও পাচ্ছে। রাত ঘনিয়ে আসছে। হাটবাজার শেষ হতে চলল। এইবারে বাড়ি ফেরার পালা। চারদিকে গভীর নৈস্তব্ধ্য।

'দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে
হৃদয়তলে।'

কবি এখানে 'ঢাকা' অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নগর অর্থে নিলেও কোনও আপত্তি নেই। কারণ তার পরই কবির কথামতো।

'রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে।'

ওই তো হচ্ছে, ওই ওপারে, তারা প্রদীপের মালার বদল। স্বর্গের দেয়ালির গন্ধে পৃথিবীর দেয়ালিতে মিলে আলোক শিখীর আলিম্পন।

নিবিড় অন্ধকারে যখন মানুষ ভরা চোখ টাটিয়েও কিছুই দেখতে পায় না, এমনকি পাকা মাঝির ছুঁচের মতো ধারালো চোখও হার মানে, তখন নদীর ঘাটে-অঘাটে একে অন্যকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ক্ষণে ক্ষণে যে ডাকাডাকি কানে আসে সেটা ছেলেবেলা থেকেই আমার কাছে অত্যন্ত অকারণে অজানা রহস্যভরা রূপে ধরা দিত। তার সঙ্গে থাকত কিছুটা অহেতুক ভীতির ছোঁয়াচ। যদি এরা একে অন্যকে খুঁজে না পায়। ওই যে মাঝির গলা মিলিয়ে যাবার আগেই যেন কাতর এক নারীকণ্ঠ— তবে কি মা তার ছেলেকে ডাকছে? তাকে যদি না পায়!

পরবর্তীকালে বুঝেছি ওই একই ডাক অন্যরূপে :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
পিছিয়ে পড়েছি আমি,
যাব যে কী করে ॥
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি—
সাড়া দাও, সাড়া দাও
আঁধারের ঘোরে ॥

এই তো বুড়িগঙ্গার পাড়। এখানে জলরেখা গেছে মিশি। কতজন কাতর কণ্ঠে বার বার মিনতি জানাচ্ছে, 'সাড়া দাও, সাড়া দাও।'

তার পর একদিন আসে যখন আর সে সাড়া দেয় না।

www.pathagar.com

কতশত নিরীহ্ প্রাণী অকালে এই বুড়িগঙ্গায় তলিয়ে গেল— মাত্র সেদিন।

এখনও কত শত পাগলিনী মাতা, 'সাড়া দাও, সাড়া দাও' রবে ডাকছে।

আরও কত মাতা গৃহকোণে বসে আশায় আশায় আছে, একদিন সাড়া পাবে।

আমি খুব ভালো করেই জানি, কোন দিন কোন প্রহরে তাকে গুলি করে মেরে বুড়িগঙ্গার গভীরে তাকে জানাজার নামাজ না শুনিয়ে গোর দেয়।

কিন্তু কী করে সেকথাটা তার মাকে বলি?

আর না বলে কী করে প্রতিদিন তার সাড়ার আশাটা মায়ের বন্ধ চোখে দেখি?

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা— রিপ ভান উইঙ্ক্‌ল

হুস করে দুটো মাথার উপর দিয়ে পঁচিশটি বছর কেটে গেল। উভয়েই তন্দ্রাতুর, নিদ্রামগ্ন। কিন্তু নিদ্রাভ্যাস রিলেটিভ— কোনও কোনও ক্ষেত্রে। গীতাও বলেছেন, 'যা নিশা— ইত্যাদি।' পুব বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলা দু জনাই ছিলেন একে অন্যের সম্বন্ধে অচেতন সুষুপ্তি-দুঃস্বপ্ন মিশ্রিত নিদ্রাতুর অবস্থায়। অথচ যে যার আপন কাজকর্ম করে গিয়েছে আপন মনে। পঁচিশ বৎসর ধরে।

ঘুম ভেঙেছে। রিপ ভান উইঙ্ক্‌লের ঘুম ভেঙেছিল এক মুহূর্তেই কিন্তু তাঁর ঘরবাড়ি আত্মজন এবং গোটা গ্রামকে চিনে নিতে তাঁর সময় লেগেছিল অনেকটা। কিন্তু তাঁর বিচরণক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। যতটা সময়ই লাগুক সেটা ছিল মাত্র একজনের সমস্যা।

দুই বাঙলা বিরাট দেশ। জনসংখ্যা প্রচুরতম। একে অন্যের চেনবার জানবার জিনিস বিস্তর! সুতরাং সে কর্ম সমাধান করতে ক বৎসর লাগবে সেটা বলা কঠিন। এবং সেটাও যে রুটিনমাফিক মসৃণ পন্থায় অগ্রসর হবে সে সত্যও শপথ গ্রহণ করে বলা চলে না। আমরা প্রতিবেশী। খ্রিস্ট আদেশ দিয়েছেন, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস।'

কারণ তিনি জানতেন, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারাটা দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে সহ্য করাটাই সুকঠিন। দূরের জন আমার বাড়ির শখের বাগানটাকে ডিমের খোসা কাঁঠালের ভূতি ফেলে ফেলে তাঁর প্রাইভেট আঁস্তাকুড়ে রূপান্তরিত করতে পারে না, আমার অর্ধাঙ্গিনীর দ্বিপ্রহরাধিক স্বতশ্চল বিকট বেতারের উৎকট চিৎকার দূরজনের পরীক্ষার্থী পুত্রের অধ্যয়ন প্রচেষ্টাকে লণ্ডভণ্ড করতে পারে না। প্রতিবেশীর ঝি পারে, গৃহিণীর বেতার পারে। অতএব গোড়ার থেকেই কিঞ্চিৎ সচেতন সমঝোতা মেনে নিয়ে পুনঃপরিচয়ের ভিত্তিস্থাপনা করতে হবে। আর এ-ও তো জানা কথা।

'নূতন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ'।

একেবারে সর্বক্ষেত্রে যে হারিয়েছিলুম তা নয়। এখানকার বিশেষ সম্প্রদায় এই পঁচিশ বৎসর ধরে যে কোনও সময়ে বলে দিতে পারতেন নারায়ণগঞ্জে এই মুহূর্তে শেয়ারবাজারে জুট মিলের তেজিমন্দির গতিটা কোন বাগে। এ-পারের বিশেষ সম্প্রদায়ও তদ্বৎ বলতে পারতেন এ-পারে টেণ্ডুপাতার চাহিদা রফতানির ওজনটা কোন পাল্লায় বেশি।

কিন্তু হায়, 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক, ১০০% পাঠককুলের ৯৯% পাট ও টেণ্ডু সম্বন্ধে উদাসীন। বহু গুণীন তাই বলেন বাঙালির এই উদাসীনতাই তার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

যতদিন সে শুভবুদ্ধির উদয় না হয় ততদিনও কিন্তু বর্তমান সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। 'দেশ' পত্রিকার পাঠক চায় জানতে ওদেশে উত্তম উত্তম উপন্যাস গল্প কী বেরুল এই পঁচিশ বৎসরে? যদিও তারা লেখে বাঙলাতেই তবু তাদের সুর ভিন্ন, সেটাতে নতুন কিক থাকে, বীরভূমের খোয়াইডাঙা গরুর গাড়ি, ওদিককার নদী-বিল নৌকো দুটোর রঙ তো এক হতে পারে না। এক রবীন্দ্রনাথে ব্যত্যয়। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ কাটে জলচরের দেশে নদীপাড়ে, শেষাংশ কাঁকড়ধুলোর দেশে খোয়াইয়ের পাড়ে। কিন্তু তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা দিয়ে করেছেন দুটোরই সমন্বয়। অন্য লেখকদের বেলা দুটোর রঙ আলাদা আলাদা থাকে।

অন্যরা চান ওপারের কাব্য নাট্য ও বিভিন্ন রসসৃষ্টি। পণ্ডিতরা চান প্রাচীন কবিদের ছাপাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো জিনিস যা পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য বিতরণ করে। বললে পেত্যয় যাবেন না, কলকাতারই এক যুবা আমাকে একদা জিগ্যেস করছিল, পুব বাঙলায় যে 'ইরি' (ইন্টারনেশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটুট না কী যেন পুরো নাম) ধান ফলানো হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমার কাছে মুদ্রিত কোনও কিছু আছে কি না? (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু একটা খবর অনেককেই রীতিমতো বিস্মিত করবে : বাংলাদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞজন বলছেন, 'বর্ষাকালের আউশ ধান আমাদের বৃহত্তম পরিমাণে উৎপন্ন খাদ্য। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল অতিবৃষ্টি বন্যা এবং অনাবৃষ্টির ওপর। পক্ষান্তরে হেমন্তের আমন যদিও আউশের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম তবু তার একটি মহৎ গুণ যে পূর্বোক্ত ওইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর নির্ভর করে না। অতএব আমাদের উচিত আউশের তুলনায় প্রচুরতম আমন ফলানো— এককথায় পূর্ব ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ পাল্টে আমন হবে আমাদের প্রধান চাষ ও আউশ নেবে দ্বিতীয় স্থান। অবশ্য তার জন্য দরকার হবে লক্ষ লক্ষ ট্যুবওয়েল।' শেষ পর্যন্ত তাই যদি হয়, তবে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা মানুষ দেবে পাল্টে— সেটাতেই জাগে আমাদের মতো অজ্ঞজনের বিস্ময়!)

বাংলাদেশের লোক কী পড়তে চায়, তার ফিরিস্তি অবশ্যই দীর্ঘতর।

যে ক মাস ঢাকায় কাটালুম তার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সে দেশে সবচেয়ে বেশি কাটতি 'দেশ' পত্রিকার। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা ভালো যে, বিশাধিক বৎসর কাল তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় সর্ববাবদে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে 'দেশ'-এর গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী আধুনিক কবিতা, কিছুটা খেলাধুলোর বিবরণ এবং এদিক-ওদিক দু-একটি হালকা লেখা ছাড়া অন্যান্য রচনা, বিশেষ করে গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতি নবীনদের চিত্তাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। তার প্রধান কারণ বাংলাদেশেই খুঁজতে হয়। এই বিশাধিক বৎসর ধরে তাদের আপন দেশেই সিরিয়াস রচনা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে অত্যল্প। কাজেই এসব বিষয়ে নবীনদের রুচি সৃষ্টি ও অভ্যাস নির্মিত হবে কোথা থেকে? যুবজনের জন্য 'দেশ'-এর মতো একটি পাঁচমেশালি পত্রিকা তাদের ছিল না যাতে করে কথাসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সাময়িক কৌতূহলবশত দু-একটি তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি পড়ে ধীরে ধীরে ওদিকে রুচি বৃদ্ধি পেত এবং শেষ পর্যন্ত দু পাঁচজন প্রবন্ধ-পাঠক অবশেষে নিজেরাই গবেষক হয়ে যেত।... 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধ-পাঠক একেবারেই নেই সে ধারণা ভুল। কিন্তু যাঁরা পড়েন তাঁদের বয়স ৫০/৫৫-র উপরে। এঁরা কলেজে, পরে পূর্ণ যৌবনে তাঁদের চিন্তার খাদ্য আহরণ করেছেন 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও পরবর্তীকাল থেকে পার্টিশেনের পরও কয়েক বৎসর

www.pathagar.com

'দেশ' থেকে। এঁরা আবার নতুন করে পশ্চিম বাঙলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঝালিয়ে নিচ্ছেন। আশা করা যায় যুবক-যুবতীরা ধীরে ধীরে এ দলে ভিড়বেন।

বলা একান্তই বাহুল্য 'রঙ্গজগৎ' অংশটি তরুণ-তরুণীরা গেলে গোগ্রাসে এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অতুষ্ণ্য তাদের মনস্তাপ— 'হায় কবে আসবে সে সুদিন যখন এ ফিল্মগুলো দেখব?' যেসব স্টার গান গাইতে পারেন এবং প্লে-ব্যাক গাইয়েদের নাড়ি-নক্ষত্র তারা নিজেদের হাতের চেটোর চাইতে বেশি চেনে— কলকাতা বেতারের কল্যাণে।

বস্তুত বলতে গেলে ঢাকা ও কলকাতা বেতার এই দুটি প্রতিষ্ঠান মাত্র দুই বাঙলাকে একে অন্যের খবর দিয়েছে, গল্প গান কথিকা শুনিয়েছে নানাপ্রকার ব্যানের ওপর দিয়ে, হাওয়ায় হাওয়ায় পঁচিশটি বছর ধরে।

তার পূর্ণ ইতিহাস লিখতে গেলে পুরো একখানা কেতাব লিখতে হয় ॥

উভয় বাঙলা— বিস্‌মিল্লায় গলদ

গত পঁচিশ বৎসর ঢাকা এবং কলকাতা কে কতখানি রসসৃষ্টি করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ করেছে সে নিয়ে তুলনা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব বাঙলাকে একসঙ্গে চালাতে হয়েছে লড়াই এবং পুস্তক লেখন। অদ্ভুত সমন্বয় বা দ্বন্দ্ব। সেপাই কলম জিনিসটাকে বিলকুল বেফায়দা জানে বলে টিপসই দিয়ে তনখা ওঠায়, আর কবি, যদিও-বা তিনি বীররস সৃষ্টি করার সময় তরবারি হস্তে বিস্তর লম্ফঝম্প করেন তবু তিনি জানেন, ও জিনিসটা একদম বেকার— ওটা দিয়ে তাঁর পালকের কলম মেরামত করা যায় না। বাংলাদেশের লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, এমনকি পাঠককেও লড়াই করতে হয়েছে অরক্ষণীয়া বাঙলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে, এবং প্রথম দুইশ্রেণির লোককে সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হয়েছে পাঠ্যপুস্তক থেকে আরম্ভ করে হিউ এন সাঙ বর্ণিত ময়নামতি-লালমাই সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তক— পূর্ব পাকিস্তান জন্ম নেবার প্রথম প্রভাত থেকে। একই ব্যক্তি কভু রণাঙ্গণে, কভু গৃহকোণে।

প্রথম দিন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান শ্লোগান তুলেছে, এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক প্রভু (কাঈদ্‌-ই-আজম = জিন্নাহ)। অর্থাৎ পুব বাঙলায় চালানো হবে উর্দু এবং বাঙলাকে করা হবে নির্মূল। আমেরিকার নিগ্রোরা যেরকম তাদের মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজি গ্রহণ করেছে, পূর্ব বাঙলার তাবল্লোক হুবহু সেইরকম বাঙলা সর্বার্থে বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করবে। জানিনে, পুব বাঙলার মাঝির প্রতি তখন পশ্চিম পাক থেকে কী ফরমান জারি হয়েছিল— তারা ভাটিয়ালি সুরে উর্দুভাষায় গীত গাইবে, না 'কির্সুদ্দ উর্দু গজল কাসিদা' গাইবে উর্দু ঢঙে?

কিন্তু মাঝির উর্দুই হোক, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলারের উর্দুই হোক, সে উর্দু শেখাবে কে? নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে? কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু কই?

বাঙালি পাঠক এস্থলে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হবেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ বুঝতে পারছি, পুব বা পশ্চিম পাকের এসব ইতিহাসের প্রতি আমার নিত্যদিনের সরল পাঠকের

www.pathagar.com

বিশেষ কোনও চিত্তাকর্ষণ নেই। কিন্তু তবু আমাকে বেহায়ার মতো এসব রসকষহীন কাহিনী শোনাতেই হবে। (যতদিন-না সম্পাদক মহাশয়ের মিলিটারি হুকুম আসে হ-ল্-ট্। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি এ-ফরমান কখনও জারি করেননি, কিন্তু তাঁরও ধৈর্যের সীমা আছে, তিনি হল্‌ট হুঙ্কার ছাড়া মাত্রই আমি হুস করে আমার জীবনব্যাপী সাধনার ধন গাঁজা-গুল কেচ্ছার ঊর্ধ্বস্তরে পুনরপি উড়তে আরম্ভ করব)। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস : দুই বাঙলা ক্রমে ক্রমে একে অন্যের কাছে আসবে। পঁচিশ বৎসরের বিচ্ছেদের পর নতুন করে একে অন্যকে চিনতে হবে। এই দীর্ঘকালব্যাপী তারা যে দুঃখ-দুর্দৈবের ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার কাহিনী আমাদের জানতে হবে। নইলে ব্যাপারটা হবে এই : আমার যে বাল্যবন্ধু পঁচিশ বৎসর ধরে আমার অজানাতে অর্থাভাবে অনাহারে অল্পাহারে অকালবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাকে পথমধ্যে হঠাৎ পেয়ে যতই-না দরদি গলায় শুধোই, তবু শোনাবে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো, 'হ্যাঁ রে, আদ্দিন ধরে স্বাস্থ্যের কী অবহেলাটাই-না করেছিস? একবার ঘুরে আয় না দার্জিলিং।' ঠিক তেমনি হবে, আজ যদি বাংলাদেশের কোনও সাহিত্যসেবীকে বলি, 'কী সায়েব, পঁচিশ বৎসর পাঞ্জাবিদের সঙ্গে দোস্তি দহরম মহরম করে বাঙলা ভাষাটাকে করলেন বেধড়ক অবহেলা। এইবারে শুরু করে দিন বাঙলার সেবা কোমর বেঁধে। গোটা দুই "সাহিত্য পরিষদ" গড়ে তুলতে আর ক মাস লাগবে আপনাদের? গোটা তিনেক "দেশ"— একটাতে আপনাদের হবে না। আর আনন্দবাজারের বিক্রি-সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারেন আপনারা তুড়ি মেরে। আপনাদের দেশ বিরাট, জনসংখ্যা এন্তের।'

পূর্বেই প্রশ্ন করেছি, পশ্চিম পাকে উর্দু কই? এটার উত্তর দফে দফে বয়ান করি।

পুব বাঙলার বেদনা আরম্ভ হয় পয়লাই জিন্না সায়েবকে নিয়ে। স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং এলেন বাংলাদেশে, ওই 'বেকার; বরবাদ' বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য— সেটি তখনও অঙ্কুরে। ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে তাদের চক্ষু স্থির হতে স্থিরতর হতে লাগল। ভাষা বাবদে এ-হেন বেকুব (কটু বাক্যার্থে নয় : ওকিবহালের বিপরীত শব্দ বেকুবহাল বা বেকুব) তাঁরা উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কস্মিনকালেও দেখেননি। বাংলা ভাষা ক্রমবিকাশের পথে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, বাংলাভাষা কতখানি সমৃদ্ধ, ওই ভাষা ও সাহিত্য দিয়েই পুব বাংলার মুসলমানের হাড়মজ্জা মগজ হিয়া নির্মিত হয়েছে এবং এর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলমান এখন পূর্ণ যুবক— এ সম্বন্ধে জিন্নার কণামাত্র ধারণা নেই। তিনি ধরে নিয়েছেন, ভাষা ও সাহিত্য বাবদে বাঙালি মুসলমান ছ মাসের শিশু; তাকে নিয়ে যদৃচ্ছ লোফালুফি করা যায়। তাঁর চোখের সামনে রয়েছে মার্কিন নিগ্রোদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় স্বয়ং জিন্নার এবং তাঁর পরিবারে ভাষা বাবদে কোনওপ্রকারের পটভূমি বা ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। তাঁর পরিবারের মাতৃভাষা কাঠিওয়াড়ি— সে উপভাষা গুজরাতির বিকৃত উপচ্ছায়া। তাঁর বাল্যকাল কাটে করাচিতে। সেখানকার ভাষা যদিও সিন্ধি তবু রাস্তাঘাটের ভাষা বহুভাষা মিশ্রণে এক বিকট জগাখিচুড়ি। তদুপরি করাচিবাসী কাঠিওয়াড়ি গুজরাতি, খোজা, বোরা, মেমনরা পঠন-পাঠনে সিন্ধিকে পাত্তাই দেয় না। জিন্না ছেলেবেলা থেকেই তাই দেখে আসছেন এই বত্রিশ জাতের যে কোনও

ছেলেকে যে কোনও স্কুলে পাঠিয়ে যে কোনও ভাষা শেখানো যায়। যেরকম কলকাতার যে-কোনও মারওয়াড়ি বাচ্চাকে তামিল স্কুলে পাঠিয়ে দিব্য তামিলাদি শেখানো যায়। ভাষাগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ছবি এ হেন পরিস্থিতিতে জিন্নার চোখের সামনে ফুটে উঠবে কী করে? সর্বোপরি তিনি বুদ্ধিমান; কিশোর বয়সেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ যে-ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সে-ভাষা ইংরেজি। তিনি মনপ্রাণ ওতেই ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সে-ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন।

ছেলেবেলায় করাচির আর পাঁচটা মুসলমান ছেলের মতো তাঁরও খানিকটে উর্দু শেখার কথা। কিন্তু তিনি কট্টর শিয়া, খোজা-পরিবারের ছেলে। উর্দুর প্রতি খোজাদের কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই। কাজেই বলতে পারিনে ছেলেবেলায় অন্তত কিছুটা উর্দু শিখেছিলেন কি না। তাঁর পরিণত বয়স কাটে বোম্বাইয়ে। বলা বাহুল্য, কি করাচি, কি বোম্বাই উভয় জায়গারই উর্দু সাতিশয় খাজা মার্কা।

বেতার মারফত তাঁর একটি উর্দু ভাষণ আমি শুনি পাকিস্তান জন্মের পর। সেটা শুনে আমি এমনই হতবুদ্ধি বিমূঢ় হই যে আমি তখন শেল্-শক্-খাওয়া সেপাইয়ের মতো নিজের আপন মাতৃভাষা ভুলে যাই যাই, সে-হেন অবস্থায় এমনেজিয়া অর্থাৎ আচম্বিতে স্মৃতিভ্রংশতা রোগে। শেষটায় বিস্ময় বোধ হয়েছিল, যে লোক এতখানি ইংরেজি শিখতে পেরেছেন তিনি মাত্র ছ মাস চেষ্টা দিলেই তো অল্পায়াসে নাতিভদ্র চলনসই উর্দু শিখে নিতে পারেন। ইনি এই উর্দু নিয়ে উর্দুর প্রপাগান্ডা করলে বাংলাপ্রেমী মাত্রই বলবে, 'উর্দু এদেশে চালানোর বিপক্ষে আরেকটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।' উর্দুপ্রেমী পশ্চিমা পূরবীয়া উভয়ই তখন লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন।

ঢাকা, সিলেট সর্বত্রই তাঁর উর্দু ভাষণের ফল হল বিপরীত।

ঢাকা, সিলেটের লোক অত্যুত্তম উর্দু জানে না, মেনে নিচ্ছি। পাঠক, রাগ কর না, আমি যদি ধরে নিই, তুমি অক্সফোর্ডের ইংরেজি অধ্যাপকের মতো সর্বোচ্চাঙ্গের ইংরেজি জানো না; কিন্তু যদি ধরে নিই, তুমি এদেশের ক্লাস সিক্সের ছোকরার ইংরেজি আর অক্সফোর্ড অধ্যাপকের ইংরেজিতে তারতম্য করতে পার না তবে নিশ্চয়ই তুমি উষ্মাভরে গোস্সা করবে। ন্যায়ত, ধর্মত ॥

উভয় বাংলা— বর্বরস্য পূর্বরাগ

পূর্ব-পাক পশ্চিম-পাকের কলহ যখন প্রায় তার চরমে পৌঁছেছে তখন পশ্চিম-পাকের জনৈক তীক্ষ্ণদ্রষ্টা বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুব-পাক পশ্চিম-পাক দুই উইংই দেখেছি কিন্তু গোটা পাখিটাকে এখনও দেখতে পাইনি।'

এরই সঙ্গে একই ওজনে তাল মিলিয়ে আরেকটি পরস্পর-বিরোধী নিত্য ব্যবহারযোগ্য প্রবাদপ্রায় তত্ত্বটি বলা যেতে পারে :

'উভয় পাকেরই রাষ্ট্রভাষা উর্দু। কোনও পাকেই, এমনকি পশ্চিম পাকেরও কোনও প্রদেশবাসীর মাতৃভাষা উর্দু নয়।'

www.pathagar.com

পাঠকমাত্রই অন্তত বিস্মিত হবেন। কথাটা গুছিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিম পাকের চারটি প্রদেশের বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচ, ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের ভাষা পশতু (বা পখতু), সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধি। সিন্ধি ভাষা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ধারণ করে।

বেলুচ ও পশতু ভাষায় ছাপা বই বা/এবং পাণ্ডুলিপি শতাধিক হবে না। কারণ এর অধিকাংশই আছে, লোকগীতি। শুধুমাত্র লোকগীতি দিয়ে একটা সম্পূর্ণ সাহিত্য তৈরি হয় না। এবং এগুলোও ছাপা হয়েছিল ইংরেজি নৃতত্ত্ববিদ-ঘ্যাঁষা অফিসারগণ দ্বারা— কৌতূহলের সামগ্রীরূপে। মধ্য ও উচ্চশিক্ষিত বেলুচ, পশতুভাষী পাঠান এগুলোকে অবহেলা করে, বেশিরভাগ এসব সংকলনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন। নিতান্ত পাঠশালার পড়ুয়া পড়ে কি না বলতে পারব না। আমাদের বটতলার সঙ্গে এদের কোনও তুলনাই হয় না। বটতলা শতগুণ বৈচিত্র্যধারী ও সহস্রগুণ জনপ্রিয়।

তাই ফ্রন্টিয়ার বেলুচিস্তানের নিম্ন ও মধ্যস্তরের রাজকার্য ব্যবসাদি হয় উর্দুতে। সেই কারণে উভয় প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দু, এ বাক্য বদ্ধ উন্মাদও বলবে না। পাঠানকে শুধু প্রশ্নটি মাত্র শুধোলে তার মাতৃভাষা উর্দু কি না, সে রীতিমতো অপমানিত বোধ করবে, মোকা পেলে রাইফেল তুলবে। বেলুচের বেলাও মোটামুটি তাই। তবে বেলুচ জাত অপেক্ষাকৃত নম্র এবং শান্ত। লোকমুখে শুনেছি ১৯৭১ সালে পুব বাঙলায় যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল তাতে পাঞ্জাবি-পাঠানের তুলনায় বেলুচরা ছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। পশ্চিম-পাক বর্বরতার প্রধান পুরোহিত টিক্কা খান একবার বা একাধিকবার বেলুচিস্তানে শান্ত জনতার উপর প্লেন থেকে বোমা ফেলেছিলেন বলে তিনি লোকমুখে যে উপাধি পান সেটা টিক্কাজাতীয় অফিসারকুলের পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘার খেতাব— 'বমার (বম্বার) অব বেলুচিস্তান'। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তিনি পান লক্ষগুণে উচ্চ পর্যায়ের খেতাব 'বুচার অব বেঙ্গল'।

এছাড়া বেলুচিস্তানের একটা ক্ষুদ্র অংশের লোক ব্রুহি উপভাষা বলে থাকে। ভাষাটি জাতে দ্রাবিড়। সুদূর দ্রাবিড়ভূমি থেকে এ ভাষার একটা পকেট এখানে গড়ে উঠল কী করে এ নিয়ে ভাষাবিদরা এখনও মাথা ঘামাচ্ছেন। এরা উর্দু শেখে ঢাকাবাসীর চেয়েও শতাংশের একাংশ।

সিন্ধিদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভাষা বিকশিত, সাহিত্য-সমৃদ্ধ। উত্তর ভারতের উর্দুর সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। তাই উর্দু শেখার জন্য তারা কখনও কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি— নিতান্ত কয়েকজন মোল্লা মৌলবি ছাড়া এবং যেহেতু বহুকাল পূর্বে আরবদের সঙ্গে সিন্ধুবাসীর সমুদ্রপথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধি ভাষা সোজাসুজি বিস্তর আরবি শব্দ গ্রহণ করেছিল (পক্ষান্তরে উর্দু তার তাবৎ আরবি শব্দ গ্রহণ করেছে ফারসি মারফত, অতএব কিছুটা বিকৃতরূপে) তাই মোল্লামৌলবিরাও উর্দুর নামে অযথা বে-এক্তেয়ার হতেন না— গুজরাতি, মারাঠি, এমনকি কোনও কোনও বাঙালি মুসলমান যেরকম হয়ে থাকেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, নাতিবৃহৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর ওই সিন্ধিরাই একমাত্র ভদ্র, বিদগ্ধ, আপন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি।

এই যে ১৯৭১ নয় মাসব্যাপী পশ্চিম-পাকের সেপাই অফিসার রাজকর্মচারী পুব বাংলাকে ধর্ষণ করে গেল এর ভিতরে কোনও সিন্ধি ছিল বলে আমি শুনিনি। বিস্তর পূর্ববঙ্গবাসীদের আমি এ প্রশ্ন শুধানোর পরও। বস্তুত গত পঁচিশ বৎসর ধরে আমি প্রায়ই রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট,

www.pathagar.com

চাটগাঁ, যশোর, খুলনা গিয়েছি কিন্তু কোনও সিন্ধি আর্মি অফিসার দূরে থাক, ছোট বা বড় কোনও চাকুরের সঙ্গে পরিচয়তক হয়নি। পুব বাঙলাকে সিন্ধিরা কস্মিনকালেও কলোনির মতো শোষণ করেনি।

সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল এবং এখনও আছে পাঞ্জাবিরা।

ব্যত্যয় নিশ্চয়ই আছে, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলব, এরকম তথাকথিত শিক্ষিত অথচ বর্বর জাত বহুদেশ ভ্রমণ করার পরও আমি কোথাও দেখিনি।

এদের সবাই বলবে তাদের মাতৃভাষা উর্দু। বরঞ্চ আমি যদি বলি আমার মাতৃভাষা ঋগ্বেদের ভাষা তবু আমি ওদের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি থাকব।

উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ করে উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও তার সংলগ্ন দিল্লিতে। ওই সময়কার পাঞ্জাবের বৃহৎ নগর লাহোর বা অমৃতসর উর্দুর কোনও সেবা করেনি। এবং এস্থলে এ তথ্যটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে উর্দুতে হরিয়ানা অঞ্চলের দিল্লির প্রাধান্য, সেটা রাজধানী ছিল বলে। সর্বোত্তম উর্দু এখনও উত্তর প্রদেশের মলিহাবাদ অঞ্চলে উচ্চারিত হয় এবং সাহিত্য গড়ে উঠেছে দিল্লি এবং লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ফলে। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ উর্দুর অন্যতম পীঠভূমি হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পিতামহ উর্দু সাহিত্যের যে সেবা করে গিয়েছেন সেটা অবিস্মরণীয়।

উর্দু জন্ম নেয় উত্তর প্রদেশের প্রাকৃত মায়ের কোলে। পাঞ্জাবে যে প্রাকৃত প্রচলিত সে এ প্রাকৃতের অনেক দূরের। লাহোর অঞ্চলে সে প্রাকৃতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে ডাকতে হয়। সিলেটি বাঙলা এবং রাঢ়ের বাঙলা একই প্রাকৃত থেকে। তাই সিলেটি উপভাষা সাধু বা চলিত বাঙলার ডায়লেক্ট। লাহোরের আচণ্ডাল নিজেদের মধ্যে যে 'পাঞ্জাবি' বুলিতে কথা বলে সেটা উর্দুর ডায়লেক্ট নয়।

লাহোর অমৃতসর অঞ্চলগত প্রাকৃতের প্রকৃত মূল্য দিয়েছিলেন মাত্র একটি মহাজন। উত্তর প্রদেশে যে যুগে হিন্দি রীতিমতো উন্নত সাহিত্য ধারণ করত, উর্দুর ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সেই যুগে আমাদের এই মহাত্মা এসব কিছু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আপন পাঞ্জাবের প্রাকৃত দৃঢ়ভূমির উপর নির্মাণ করলেন অজরামর 'গ্রন্থসাহেব'।

তাবৎ পাঞ্জাবভূমি, পাকিস্তানি পাঞ্জাব হিন্দুস্থানি পাঞ্জাব সব মিলিয়ে দেখি যে এখানে মাত্র একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আছে। শিখ সম্প্রদায়। আপন মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ। শুনে বিস্মিত হয়েছি, শিখদের প্রতি বিরূপ বাদশা ঔরঙ্গজেব নাকি 'গ্রন্থসাহেব' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন।

মোদ্দা কথা : পশ্চিম পাঞ্জাববাসীর মাতৃভাষা উর্দু তো নয়ই, তাদের মধ্যে যে ভাষায় কথাবার্তা হয় সেটা উর্দুর ডায়লেকট্ও নয়। অর্থাৎ তাদের 'মাতৃভাষা' এখনও সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি। বরঞ্চ মার্কিন নিগ্রোদের অবস্থা ঢের ভালো, ইংরেজি ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা বা উপভাষা তারা আদৌ জানে না, নিজেদের মধ্যেও ইংরেজি বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, মাতৃভাষাহীন সদম্ভস্ফীত, অজ্ঞতামদমত্ত এই একটা বর্বর জাত রাজত্ব করার ছলে শোষণ করতে এসেছিল পুব বাঙলায় এমন একটা জাতকে যার ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সে সাহিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে নোবেল প্রতিষ্ঠান যাকে বিশ্বস্বীকৃতিও বলা যায় ॥

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা— পুস্তকসেতুভঙ্গ

বঙ্গভূমিতে যদি কস্মিনকালেও সংস্কৃতের কোনও চর্চা না থাকত, তবে আজ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে গদ্য-সাহিত্য, নিশ্চয়ই এতখানি বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারত না। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সর্ব গদ্যলেখকই অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন এবং ওই সাহিত্য থেকে কী যে গ্রহণ করেননি, তার নির্ঘণ্ট দেওয়া বরং সোজা। বস্তুত এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দ্বিতীয় শ্রেণির লেখকও মধ্যম শ্রেণির সংস্কৃত জানতেন। এবং একালেও একাধিক সাহিত্যিক অনায়াসে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে পারেন। এবং বঙ্গসাহিত্যসেবী সংস্কৃত অধ্যাপকদের কথা তোলাই বাহুল্য। সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশ আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

উর্দু ঠিক সেইরকম নির্ভর করেছে প্রধানত অতিশয় সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্য ও অল্পবিস্তর আরবির ওপর। তাই উর্দুর লীলাভূমি উত্তরপ্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি মাদ্রাসা বহুকালের ঐতিহ্য নিয়ে, ও প্রধানত ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষাদান করেছে। এদের আরবি-ফারসি চর্চা উর্দুর জন্মকাল থেকে সে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। মাইকেল যেরকম অত্যুত্তম সংস্কৃত জানতেন, গালিবও তদবৎ উচ্চাঙ্গের ফারসি জানতেন। এমনকি পাঞ্জাবের সবে-ধন নীলমণি কবি ইকবালও ফারসি দিয়ে আপন ঈষৎ কষ্টসাধ্য উর্দুকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু তাবৎ পাঞ্জাবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি, এমনকি যে লাহোর পাঠান-মোগল আমল থেকে সমৃদ্ধিশালিনী নগরী, পাঞ্জাবের মুকুটমণি, মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল সেখানেও কস্মিনকালেও পূর্ণাঙ্গ একটি মাদ্রাসা ছিল না— উর্দুকে রসদ-খোরাক যোগাবার জন্য, কারণ পূর্বেই বলেছি, পাঞ্জাবির মাতৃভাষা উর্দু নয়। পার্টিশেনের সঙ্গে সঙ্গে যেসব মৌলবি-মৌলানা উত্তর প্রদেশ থেকে শরণার্থীরূপে লাহোর পৌঁছলেন তাঁরা লাহোরের মাদ্রাসাটি দেখে বিস্ময়ে নৈরাশ্যে মূক হয়ে গেলেন। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলি, সে মাদ্রাসাটি ক্লাস সিক্স্ অবধি পড়াতে পারে, অর্থাৎ মাইনর স্কুলের মতো মাইনর মাদ্রাসা! সম্পূর্ণ অবান্তর নয়, তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করি, পাঞ্জাবের তুলনায় যদিও পুব বাঙলা অতিশয় দীন, তবু সেই পুব বাঙলাতেই আছে, বহুকাল ধরে তিনটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা— ফের তুলনা দিয়ে বলি, পিএইচডি মান পর্যন্ত! ওদিকে মাইনর স্কুল এদিকে ডকটরেট! মাদ্রাসার সিক্স্ অবধি কতখানি ইসলামি শাস্ত্রচর্চা হওয়া সম্ভবে! উর্দুর সেবাই-বা করবে কতখানি? তারই ফলে পাঞ্জাবিদের কোনও দিক দিয়ে কোনও প্রকারের বৈদগ্ধ্যের ঐতিহ্য নেই।

তারই দ্বিতীয় বিষময় ফল, যে পাঞ্জাবে মাদ্রাসার অভাবে শাস্ত্রীয় ইসলামের কোনও আবহাওয়া নেই। সেখানকার পাঞ্জাবি সিভিল, মিলিটারি অফিসাররা, তিনটে সমৃদ্ধশালী মাদ্রাসা এবং অগুণিত মাইনর মাদ্রাসার ওপর দণ্ডায়মান, ইসলামি আবহাওয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত পুব বাঙলায় এসে দম্ভভরে সর্বত্র দাবড়াতে দাবড়াতে প্রচার করতে লাগল, তারাই পাক-ভারতের ইসলামি ঐতিহ্যের সর্বোত্তম মুসলমান, পুব বাঙলার মুসলমানরা মেরে-কেটে আধা-মুসলমান— কিংবা মুসলমানি নাম এরা ধরে বটে, কিন্তু আসলে কাফির!

www.pathagar.com

গত যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবি-পাঠান সেপাইদের লাহোর পেশাওয়ারে শেখানো হয়েছিল, 'পুব পাক-এ মসজিদের ঢঙে নির্মিত এমারত দেখতে পাবে। সেগুলো একদা মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে ওদেশের লোক ইসলাম বর্জন করে, এবং বর্তমানে নামাজের অছিলা ধরে ভারতাগত কাফের এজেন্টদের সঙ্গে ওইসব এমারতে মিলিত হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করে।'

এসব তথ্য তত্ত্ব আমার মূল বক্তব্যের পক্ষে কিছুটা অবান্তর কিন্তু এগুলো থেকে বিশেষ করে হিন্দুপাঠকের বিস্ময় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতে পারে— মুসলমান সেপাই কী করে তাদেরও ধর্মালয় মসজিদে ঢুকে নামাজরত তাদের ধর্মভ্রাতা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মেশিনগান চালিয়ে মারল? নিশ্চয়ই কলকাতার বিস্তর হিন্দু স্বচক্ষে দেখেছেন পাঠান, পাঞ্জাবি, কাবুলি, বাঙালি সর্বদেশের মুসলমান চিৎপুরের একই নাখুদা মসজিদে ঢুকছে।

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য : পুব বাঙলায় পশ্চিম বাঙলার বই ব্যান হল কীভাবে? তার অবতরণিকাতেই যদি বলি, লাহোরের ওই যে ক্ষুদে মাদ্রাসাটি লিকলিক করছিল, সে-ই এ লড়াইয়ের পয়লা বুলেট ফায়ার করেছিল, তবে বাঙালি পাঠকমাত্রই বিস্মিত হবেন, সন্দেহ কি!

উত্তর প্রদেশ থেকে লাহোরাগত মৌলবি-মৌলানারা নিজের স্বার্থেই হোক— মাইনর মাদ্রাসার তনখা তাঁদের পক্ষে হাস্যাস্পদ— কিংবা ইসলামি চর্চা উচ্চতর পর্যায়ে তোলার জন্যই হোক, তাঁরা উঠেপড়ে লেগে গেলেন পুঁচকে ওই মাদ্রাসাটিকে উচ্চমানে তোলার জন্য।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক কোথায়? এস্থলে স্মরণে আনি, সুইটজারল্যান্ড দেশের বের্ন শহরে সর্বপৃথিবীর লেখকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমাগত বিভিন্ন দেশ কপিরাইট সম্পর্কে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যেসব দেশ এসব আইনে (সংক্ষেপে বের্ন কনভেনশন) দস্তখত দেবেন তাঁরা একে অন্যের কপিরাইট মেনে চলবেন। যেমন কোনও ভারতীয় প্রকাশক বিনানুমতিতে গত মাসে লন্ডনে প্রকাশিত, সর্বস্বত্বরক্ষিত কোনও পুস্তক ছাপতে পারবেন না। কত বৎসর পরে মূলগ্রন্থ, কত বৎসর পরে তার অনুবাদ বিনানুমতিতে ছাপতে পারা যায়, সে বিষয়ে মূল আইনকে কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ, প্রসারিত, সংশোধিত করা হয়েছে।

পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হল না। বাংলাদেশ হয়েছে কি না, জানিনে।

তার কারণ অতি সরল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু বই না হলে পাঞ্জাবের চলে না। সেগুলো ছাপা হয় ভারতে, কপিরাইট ভারতীয় লেখকের। কাঁড়ি কাঁড়ি ফরেন কারেনসি চলে যায় ভারতে, এগুলো কিনতে গিয়ে। সে বইগুলো যাতে নির্বিঘ্নে, ভারতীয়দের কোনওপ্রকারের রয়েলটি না দিয়ে লাহোরে ছাপানো যায় সেই মতলব নিয়ে পাকিস্তান বের্ন কনভেনশনের মেম্বার হয়নি।

কিন্তু বললেই তো আর হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লাহোর কোনওকালেই উর্দুর পীঠস্থান ছিল না। তাই ফাউন্ডারি ছাপাখানা, কাগজ নির্মাণ, প্রুফ রিডার ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিস এবং মানুষ লাহোরে আছে অতি অতি অল্প, বহু বস্তু আদৌ ছিল না। এগুলো তো আর রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না।

ঢাকাও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপদেই পড়ল। কিন্তু লাহোরের তুলনায় সে কিছুই নয়। কারণ ঢাকার ভাষা বাংলা, সাহিত্য বাংলা। লাহোরে বাস করে যদি একজন উর্দু লেখক, তবে

www.pathagar.com

ঢাকায় অন্তত দশজন বাঙলা লেখক। বর্ধমান যেমন কলকাতার আওতায় ছিল, ঢাকাও তাই ছিল। লাহোর সেরকম উর্দুভূমির আওতায় কোনও কালেই ছিল না। গোড়ার দিকে ঢাকার কুমতলব ছিল না, বের্ন কনভেনশনের পুটাশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ফাঁকি দিয়ে তাদের বই ছাপানো। তাদের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল, আপন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা, ছাপানো ইত্যাদি। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে প্রবন্ধ কবিতা সঞ্চয়নে ঢাকার ভাবনা অনেক কম। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মাইকেল, হেমচন্দ্র ইত্যাদি বিস্তর ক্লাসিক লেখকের কপিরাইট ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা যাব যাব করছে। বের্ন থাক আর না-ই থাক— ঢাকা তার পাঠ্যপুস্তকে এঁদের লেখা তুলে ধরলেই তো যথেষ্ট। উপস্থিত না-ই বা থাকলেন শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর। উঠেপড়ে লেগে গেল ঢাকা— পিছনে কবি, গল্পলেখক অসংখ্য না হলেও নগণ্য নয়, তদুপরি ঢাকা বিরাট পূর্ব পাকের রাজধানী। লাহোর পশ্চিম পাকের রাজধানী তো নয়ই, যে পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান নগর সে-ও তেমন কিছু বিরাট প্রদেশ নয়।

লাহোর কোনও উন্নতি করতে পারছে না দেখে তাকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার জন্য এক ঝটকায় ব্যান করে দেওয়া হল তাবৎ ভারতীয় পুস্তকের আমদানি। পাঞ্জাবি কর্তাদের অনুরোধে করাচির বড় কর্তারা অবশ্য ব্যান করার সময় ভেবেছিলেন উর্দু বইয়ের কথা। কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেল পশ্চিম বাঙলার বইও। অর্ডারটা অবশ্য খুব খোলাখুলি দেওয়া হয়েছিল কি না জানিনে।

কিন্তু সেটা ফাঁস হয়ে গেল সেই যে ছোট্ট মাদ্রাসাটির কল্যাণে। তারা পড়ল সমূহ বিপদে। তাদের আরবি-ফারসি পাঠ্যপুস্তক ছাপবার জন্য আরবি অক্ষরের ফাউন্ডারি, প্রেস, প্রুফরিডার কোথায়? যে উত্তর প্রদেশের সর্বোচ্চ মাদ্রাসাদ্বয় প্রচুর আরবি বই কিনত সেই উত্তর প্রদেশে মাত্র একটি আরবি প্রেসের নাম সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'নওলকিশোর প্রেসের' মালিক ছিলেন আরবি-ফারসি-উর্দুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল জনৈক হিন্দু। এ অধম শৈশবে ঈশ্বর নওলকিশোরের ছাপা পুরাণ দিয়েই পাঠারম্ভ করে। খুদ মক্কাশরিফে একদা তাঁরই কুরান বিক্রি হত।

আরবি পুস্তক ব্যান করার বিরুদ্ধে মোল্লারা করলেন তীব্র প্রতিবাদ। সেটা প্রকাশিত হল এক উর্দু সাপ্তাহিক-এ। করাচির ইংরেজি 'ডন' করল সেটার অনুবাদ। সেটা খবর হিসেবে প্রকাশিত হল কলকাতায়। তখন আমরা জানতে পারলুম, পশ্চিম বাংলার বই কেন ঢাকা যাচ্ছে না।

ইতোমধ্যে জুট-চা একসপ্লয়েটকারী লাহোরের চা-ব্যবসায়ীরা চিন্তা করছে, পুব বাঙলার বুক-মার্কেট কীভাবে একসপ্লয়েট করা যায়। সে-ও এক মজাদার কেচ্ছা।

উভয় বঙ্গে— আধুনিক গদ্য কবিতা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পাঠক গদ্য কবিতা (গবিতা ও গবি বিপ্রকর্ষণ অসৌজন্যবশত নয়) সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহলী না হলেও গবিকুল ও তাঁদের চক্র যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে গবিতা রচনা করেন, সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় ছয়লাপে ভাসিয়ে দেন, সর্ববিধ ব্যঙ্গ কৌতুক চরম

www.pathagar.com

অবহেলাসহ উপেক্ষা করে এলিয়ট, পাউন্ড নিয়ে গভীর আলোচনা, তুমুল তর্কবিতর্কে মত্ত হন, এসব গ্র্যান্ডমাস্টারদের গবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন এবং বহু ক্ষেত্রে কষ্টার্জিত কার্ষাপণ ব্যয় করে ওইসব মহামূল্যবান রত্নরাজি রসিক-বেরসিক সকলের সামনে তুলে ধরেন, এসব কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্ময়ে মন ধায় একাধিক সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তুলনীয় একটা বিরাট আন্দোলন আবিষ্কার করতে। বহুতর প্রচেষ্টার পর দেখি, পঞ্জিকার ভাষায় 'সর্বদিকে যাত্রা নাস্তি'। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ঝাঁকে ঝাঁকে কবি জমায়েত হতেন, গজনির মাহমুদ বাদশাহ ধনদৌলত লুট করার সময় দু-চারটে কবি লুট করতে লুণ্ঠিত হতেন না, মঙ্গোলদের সর্বনাশা দিগ্বিজয়ের ফলে হাজার দুত্তিন ইরানি কবি মোগল দরবারে আশ্রয় পান। একসঙ্গে একই দরবারে দু—ই তি—ন হাজার কবি। তৎসত্ত্বেও পরিষ্কার দেখতে পাই, এঁরা স্থায়ী-অস্থায়ী কোনওপ্রকার আন্দোলনের সূত্রপাতটুকু পর্যন্ত করতে পারলেন না। পক্ষান্তরে এই দীন পশ্চিমবঙ্গ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, পাঠক-সাধারণ কর্তৃক অবহেলিত গবিকুল কী প্রচণ্ড তেজে নয়া এক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তস্মাৎ প্রণমা-প্রণিধায় কায়ং। অতিশয় সত্য যে 'ন তৎসমোৎস্তৎ ভ্যধিকঃ কুতোৎনো।'

বাংলাদেশেও একই হাল। হয়তো পরিসংখ্যা বৃহত্তর। তবে তাঁদের চক্রটির পরিধি কতখানি বিস্তৃত সেটা জরিপ করা সুকঠিন কর্ম। অবশ্য একথা অতীব সত্য, ঢাকার অসংখ্য দৈনিকের প্রায় সব কটিই রবিবাসরীয় তথা সাহিত্য সংখ্যায় ভূরি ভূরি গবিতা ছাপে। যে কটি বিখ্যাত-অখ্যাত গবির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, গবিতার তরে কলিজার খুন দিয়ে শহিদ হবার জোশ পশ্চিমবঙ্গের গবিকুলকে দস্তুরমতো ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে। পুব বাঙলার বাজারে পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-মাসিকের নিদারুণ অনটন সত্ত্বেও ঢাকার গবি সম্প্রদায় এ বাঙলার গবিদের নাম জানেন, ও একাধিকজনের রচনা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন, এঁদের সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যসহ উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে পারেন এবং সহৃদয় পরিবেশ পেলে করেও থাকেন। এঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে তাঁরা আমাদের মতো গবিতাউদাসী এবং যাঁরা আগাপাশতলা গবিতাবৈরী 'কাফের' তাঁদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য অবলম্বনে একাধিক গবির ন্যায় 'তাচ্ছিল্যি' প্রকাশ প্রায় করেনই না এবং আমরা যে নিতান্তই হতভাগ্য গৈবলানন্দ থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষিত জড়ভরত সেকথা আভাসে-ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়েও দেন না। কলকাতা ফিরে সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম, এ বঙ্গের একাধিক গবিও ও-বাঙলার বেশকিছু গবি সম্বন্ধে ওকিবহাল এবং আশ্চর্যের বিষয় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ও-বাঙলার গবিতার বই বেশ কিছু পরিমাণে এদেশে এসে পৌছেছে। আমার মনে হয়, কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্মরণে রাখলে দেখা যাবে, গবিতার ন্যায্য হিসেবে যা পড়ার কথা তার চেয়ে ঢের বেশি গাব্য পুস্তিকা দুই বাঙলাই পাচার ও লেনদেন করেছে। অবশ্য গবিতার প্রতি কালাপাহাড়ি মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিশ্বনিন্দুকরা বলে, এই গদ্য কবিতা বিনিময় নির্ভেজাল গাব্য রসাসক্তি বশত নয়, এর মূল কারণ অন্যত্র ও সন্তর্পণে লুক্কায়িত। উভয় বঙ্গের গবিকুলের অনেকেই কমুনিস্ট এবং তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাব বিনিময় লেনদেনের সময় গবিতা-রস এপিটাইজিং ফাউরূপে এস্তেমাল করেন।

বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গবিদের এ বাঙলার অনেকেই চেনেন— আমাদের মতো অপাঙ্‌ক্তেয় অরসিকদেরও দু একজন। কবি আবুল হোসেনের শিক্ষা-দীক্ষা কলকাতায়। দেশ

বিভাগের পূর্বেই তাঁর প্রতিভা উভয় বাঙলার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষার ওপর দখল, স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিষয়বস্তু চয়ন, অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে সৃষ্ট রস পরিবেশন তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই যেন আধা-আলোতে লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ায়। সে যুদ্ধ তাঁর অন্যতম সংকলনে প্রকাশ পেয়েছে। নয়টি মাসের ইয়েহিয়া নৃত্য কিন্তু এখনও তাঁকে নব সৃষ্টির জন্য তাড়না লাগাতে পারেনি। কিংবা হয়তো তাঁর পিতার অকারণ, মর্মান্তিক পরলোকগমন তাঁর চৈতন্যলোকে ট্রাউমা হয়ে সেখানে সর্বরসধারা আসুরিক পদ্ধতিতে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আশা রাখি, এ ট্রাউমা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

রাজনীতির প্রতি পূর্ণ উদাসীন, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা খবর পেয়েছিলেন যে, খানসেনা তাঁদের গ্রামে প্রবেশ করছে। হয়তো ভেবেছিলেন— সেইটেই স্বাভাবিক— সর্বপ্রকারে রাজনৈতিক কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম এই অথর্ব বৃদ্ধের প্রতি কি খানসেনা, কি লীগ এমনকি পেশাদার খুনি গুণ্ডারও বৈরীভাব পোষণ করার মতো কোনও স্বার্থ, দ্বেষ বা অন্য হেতু থাকতে পারে না। গ্রামের সদর রাস্তা দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় খানরা তাঁকে দেখতে পেল বৈঠকখানায়। বাক্যব্যয় না করে তাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে।

আবুল হোসেনের সমসাময়িক আরও উত্তম উত্তম কবি আছেন। তাঁদের পরবর্তীকালের রচনা হাতে আসেনি— যোগাযোগ ছিল না বলে।

সর্বাধুনিক গবিদের ভিতর ব্যাহ্যত কিশোরসম, আমার তথা সর্ব বয়স্কজনের স্নেহের পাত্র মিঞা শম্‌সর্ রহমানের রচনা সরল ও সরস, ছত্রে ছত্রে যেন নতুন নতুন ডাক দিয়ে যায় বাঁকে বাঁকে, দেখায় অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ছবি; যদিও একাধিকবার আমার মনের কোণে জেগেছে একটি ধারণা : মিঞা শমস্-এর গবিতার বিষয়বস্তু এত বেশি রোমান্টিক যে এগুলো সাবেক পদ্ধতির কবিতায়— চিত্রাঙ্কন একাডেমিক স্টাইল নামে যে টেকনিক পরিচিত— রচিত হলে তাঁর বিচিত্র অনুভূতি সুডৌল নিটোল রূপে ব্যাপকতর আত্মপ্রকাশ করতে পারত।

মননশীল প্রবন্ধ, বিশেষত সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক তথা পূর্ববঙ্গীয় লেখিকাদের সৃষ্টি নিয়ে তাঁর রচনা কয়েক বৎসর পূর্বেই বানু সালমা চৌধুরীকে তথাকার সাহিত্য জগতে সম্মানের আসন দিয়েছিল। সম্প্রতি তিনি একখানি চটি গবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করে ইতোমধ্যেই তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী ধারা, বহুবিচিত্র বিদগ্ধ তথা জানপদ শব্দ চয়নদ্বারা সমৃদ্ধ ভাষা-শৈলী, ঐতিহাসিক নয় মাসের বিভীষিকাময়ী সুদীর্ঘ লক্ষ যামা করাল রজনী, সর্বোপরি লেখিকার আম্মা, নানী, বৃদ্ধা মাতৃসমা পরিচারিকাটির ভিন্নেৎসহ আচারনিষ্ঠ, শান্ত, নম্র পঞ্চোপাসনান্তে লব্ধ অবকাশে নিত্য চারু-কলারত একটি মুসলমান পরিবারের যে চিত্রটি লেখিকা দরদি হৃদয় দিয়ে এবং প্রধানত ব্যঞ্জন ও সুনিপুণ পরিচালনা দ্বারা অঙ্কন করেছেন, সে ছবিটির বৈচিত্র্যগুণ রসগ্রাহীজনের সপ্রশংস চিত্তাকর্ষণ করেছে। বস্তুত সদ্য প্রস্ফুটিত বুদ্ধিবৃত্তি তথা নীতি-বিকশিত স্পর্শকাতরতাসহ কিশোরীর প্রাগুক্ত সাহিত্যিক রচনার চেয়েও।

লেখিকার বড় মাসির সুফিতত্ত্বমূলক মারিফতি[১] গীতি (মিস্টিক্ সঙ্স্) তাঁর অকালমৃত্যুর পর জনগণের স্বীকৃতি লাভ করে ও ঢাকা বেতার কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সুফি পল্লিগীতি প্রচার করে আসছে। এই মাসির কনিষ্ঠপুত্র, লেখিকার অগ্রজ অক্লান্ত সাহিত্যসেবী, ভগ্নীর প্রতি সদা স্নেহশীল মরহুম অলির কাছ থেকে লেখিকা সাহিত্যের যাত্রাপথে পদার্পণের প্রথম

১. সালমা চৌধুরী, 'অংশীদার আমি', সিলেট, ১৩৭৯।

www.pathagar.com

উষাকাল থেকে অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অতিশয় নিরীহ, সত্যার্থে বিরলতম এই অজাতশক্র অলিভাইকে খানরা গুলি করে মারে তাদের বর্বর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই— চট্টগ্রামে। শোকাতুর লেখিকা তাঁর জনপদকল্যাণী মাসিকে স্মরণে এনে অশ্রুসিক্ত নয়নে পুস্তিকাটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রিয় দাদাভাই সাহিত্যসখা অলিকে। কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলোই অশ্রুশিশিরে সিক্ত।

শতাধিক বৎসর পূর্বে এই চট্টগ্রামেরই আরেক নারী, রহিমুন্নেসা তার ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে কাতর হৃদয়ে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিল :

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বার বার,
মোর জাদু চলি গেল ফিরিল না আর।

উভয় বাঙলা— সদাই হাতে দড়ি, সদাই চাঁদ

গত শতকের শেষের দিকে, এবং এ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ চিন্তামগ্ন ভারতবর্ষকে আর কোন কোন দ্রব্যে শোষণ করা যায়। একাধিক চতুর লোকের মাথায় খেলল বাঙলা মুল্লুকের মাছ। মৎস্যের প্রতি যে বাৎসল্য বাঙালির আছে, সেরকম উদাহরণ পৃথিবীর কোনও জাতের কোনও বস্তুর প্রতি আছে কি না সেটি গভীর গবেষণার বিষয়। অতএব ভারত সরকারের পুরো মদদ, পুলিশের কড়া শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় দুই ইংরেজ মাছের ব্যবসা খুলতে গেল, দুটি কলের জাহাজ নিয়ে। কথিত আছে অস্মদেশীয় নমস্য ভেড়িওয়ালারা (শব্দটি আমি হরি, জ্ঞান রাজ কারও অভিধানে পাইনি— মৎস্য উৎপাদনকারী অর্থে যে অর্থে অর্বাচীন লেখক এস্থলে সভয়ে ব্যবহার করছে) মহুরতের পূর্বরাত্রে দুটি জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন পুলিশকে বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করত এবং সরকারকে উভয় হস্তের। অতঃপর আবার ইংরেজ চেষ্টা দিল 'দুশমনদের' আওতার বাইরে চিল্কাহ্রদে। কথিত আছে, সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার প্রাক্কালে কে বা কাহারা চিল্কাপারের সরকারি বিশ্রামাগারে গভীর নিশীথে একাধিক ইংরেজ হনু মৎস্য ব্যবসায়ীকে পেঁদিয়ে লম্বা করে দিয়ে যায়। অবশ্য ভেড়িওয়ালাদের এহেন অপ্রশংনীয় আচরণের মধ্যে অন্তত একটি প্রশংসনীয় 'ভদ্রস্ততা' ছিল : উভয় প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই তাঁরা গোরারায়দের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ ধরনের প্রচেষ্টা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক না-ও হতে পারে... অর্বাচীন বঙ্গীয় ইতিহাসে এর চেয়ে বিস্ময়জনক ঘটনা আমার জানা নেই; কোথায় তখন 'স্বদেশী', ক্ষুদিরাম, গান্ধী— ইংরেজের সেই দোর্দণ্ডতম প্রতাপের মধ্যাহ্নে? যদি অনুমতি পাই তবে নির্ভয়ে নিবেদন, কম্যুনিজম ফ্যাসিজম সাংখ্যবেদান্ত মাকালী মৌলা আলি এঁদের কারওরই প্রতি আমার অখণ্ড বিশ্বাস নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে নিবেদন আমার সাতিশয় অবিচল দৃঢ়তম বিশ্বাস, ভারত এবং কিংবা বাঙলা সরকার এমনকি প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্য রপ্তানির আশ্বাসে বলীয়ান হলেও তাঁরা কস্মিনকালেও আমাদের ভেড়িওয়ালাদের আয়ত্তে এনে মৎস্য মূল্য ভদ্রজনোচিত স্তরে আনতে পারবেন না, না, না। নিতান্তই যদি শিলা জলে ভেসে যায় ধরনের

www.pathagar.com

অসম্ভব কল্পনাবিলাস করতেই হয়, তবে বলি, যদি কখনও পারেন, তবে সেই সন্ধ্যায়ই ভারতের তাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন করায়ত্ত হবে, আহমদাবাদি, অন্যান্য কোটিপতি তথা কালোবাজারিরা পড়িমরি হয়ে কিউ লাগাবেন গত পঞ্চাশ বছরের ঠকানো ইনকাম ট্যাক্স শোধ করতে, যাবতীয় কার্টেল মনপলিকে নিধন করতে সরকারের এক মাসও লাগবে না, গরিব চাষাকে দাদন দিয়ে তার সর্বনাশ সাধনরত সট্টাবাজার— এক কথায় এমন কোনও সংগঠনই তখন নির্বিঘ্নে আপন অসামাজিক আচরণে লিপ্ত থাকতে পারবে না। ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করেও সাধারণ পর্যটকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের ভেড়িওয়ালাদের ঐক্য ও তজ্জনিত শক্তির সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সমন্বিত শক্তি আমি কোথাও দেখিনি, পড়িনি, শুনিনি। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন এবং আমাকে যেন পরজন্মে ভেড়িওয়ালাকুলে স্থান দেন।

বোহরা, খোজা তথা পাঞ্জাবিরা যখন পুব বাঙলার পাট, চা, চামড়া থেকে আরম্ভ করে বিদেশির সহায়তায় নির্মিত আলপিন তক তার মারফত তাদের রসাল কলনিটির আঁটিতে কামড়াতে আরম্ভ করেছেন তখন কতিপয় উদ্যোগী পাঞ্জাববাসীর মনে একটি অতিশয় মৌলিক অভিযানচিন্তা উদিত হল। 'পূরব্ পাকিস্তানের মর্দ-লোগ তো বটেই ঔরৎলোগভি বহুৎ বহুৎ কিতাব পড়ছে। এই কিতাব-মার্কেটটাকে যদি কব্জাতে আনা যায় তবে কুল্লে পাকিস্তানে যে বাইশটি পরিবার দেশের অধিকাংশ ধনদৌলতের মালিক আমরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারব'। মাছের বেলা যেরকম ইংরেজ উদ্যোগী পুরুষদের পশ্চাতে আপন সরকার দাঁড়িয়েছিল তাদেরই বা মদদ দেবে না কেন পিণ্ডি-ইসলামাবাদ? পূর্ববঙ্গে তখন পুস্তকোৎপাদনে ভেড়ি দূরে থাক, কটা এঁদোপুকুর ছিল, এক আঙুলে গুনে বলা যেত।

ব্যাপারটার গোড়াপত্তন কিন্তু এক নতুন পরিস্থিতি এবং তারই ফলে এক নতুন প্রয়োজনীয়তা থেকে। পুব বাঙলাকে যথারীতি শাসনশোষণ করার জন্য পশ্চিম পাক বিশেষত পাঞ্জাব থেকে নিরবচ্ছিন্ন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পর্যায়ের কর্মচারী পাঠাতে হলে মুশকিল এই যে তারা 'ন-পাক' বাঙলা ভাষাটার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয় এবং যতদিন না সে ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়— সে পুণ্যকর্ম করার জন্য সরকার অবশ্যই সদাজাগ্রত ও যত্নবান— ততদিন এদের তো কাজ চালাবার মতো বাঙলা শিখতে হবে। ওদিকে কলেজের ছাত্ররাও হৃদয়ঙ্গম করেছে, সিন্ধি বেলুচি বা পশতু শিখে বিশেষ কোনও লাভ নেই। সিন্ধু দেশে তো যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত সিন্ধিজন আছেই, তদুপরি অর্ধবর্বর পাঠানভূমি, বেলুচিস্তান এমনকি সিন্ধু প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে সেখানে চাকরির সংখ্যা অতি অল্প। এবং এ কথাও সত্য বেলুচ-পাঠানের উপর ডাণ্ডা চালানো অতটা সহজ নয়। বেলুচিস্তানের উপর তো পরবর্তীকালের 'বুচার অব বেঙ্গল' টিক্কা খান বোমা ফেলে 'বমার অব বেলুচিস্তান' খেতাব পেয়েছেন— পুব বাঙলার উপর এখনও বোমা ফেলতে হয়নি। অতএব শেখো বাঙলা— প্রেমসে। করাচি, লাহোর এমনকি যে পাঠানের মাতৃভাষা পশতু, বলতে গেলে এখনও যে ভাষা লিখতে রূপ পায়নি সেই পাঠান উঠেপড়ে লেগে গেল পেশাওয়ার বিদ্যালয়ে বাঙলা শিখতে।

এ বড় মজার পরিস্থিতি। খুদ পশ্চিম পাকে বাঙলা শেখা হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে, আর সেই বাঙলা ভাষাকে নিধন করার জন্য পুব পাকে গোপনে প্রকাশ্যে দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে আইনকানুনও নির্মিত হল। তারই একটা ফরমান সম্পূর্ণ বেআইনি কায়দায় ঘোষণা করল পুব বাঙলা এলাকায়

www.pathagar.com

পশ্চিম বাঙলার জীবিত কি মৃত— মৃত লেখকের কপিরাইট তামাদি হয়ে গিয়ে থাকলেও— কোনও লেখকের বই ছাপানো চলবে না এবং পশ্চিম বাঙলার প্রথম প্রকাশিত যে কোনও বই পুব বাঙলায় ছাপানো যাবে না। এর ফলে পুব পাকিস্তানের অধ্যাপক ও কবি জসীম উদ্‌দীনের কাব্য 'নক্সি কাঁথার মাঠ' ইত্যাদি পূব বাঙলায় ছাপানো নিষিদ্ধ হল কি না স্মরণে আসছে না; কবির তাবৎ পুস্তকই তো কলকাতার ছাপাখানাতেই জন্ম নেয়, প্রথম প্রকাশ তো সেখানেই।

পশ্চিমবঙ্গের লেখকমণ্ডলী নিশ্চয়ই এ ব্যানের সংবাদ শুনে উল্লাস বোধ করতেন যদি তখন সেটা জানতে পেতেন। বিশেষ করে নীহার গুপ্তর মতো জনপ্রিয়, শঙ্করের মতো বহুদর্শী ও সমরেশের মতো নির্ভীক লেখক নিশ্চয়ই এ সংবাদ শুনে কথঞ্চিৎ শান্ত হতেন কারণ কালোবাজারের চোরাই সংস্করণের এঁরাই ছিলেন শিকারের প্রধান প্রধান বাঘসিঙি। কিন্তু ইতি গজটা এখনও বলা হয়নি। পশ্চিম বাঙলার বই পুব পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান হল বটে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ছাপানো ব্যান হল না।

কী কারণে কার স্বার্থে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঞ্জাবের উদ্যোগী পুরুষসিংহরা— যদিও সিংহগুলো কালোবাজারি পুস্তক ছাপানোর অনৈসর্গিক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত— যাতে করে পুব বাঙলার বুক-মার্কেট পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেন। বিধি বলুন, বিজ্ঞান বলুন তিনি/তাঁরা এঁদের প্রতি অকস্মাৎ সদয় হলেন। ফটো-ফ্ল্যাশ নামক পদ্ধতি ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে— যার প্রসাদে সরাসরি যে কোনও বই সস্তায় পুনর্মুদ্রণ করা যায়— নতুন করে কম্পোজ-প্রুফরিডিং ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে হয় না। প্রাগুক্ত পশ্চিম পাকের বাঙলাভাষা অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য এঁরা সর্বপ্রথম ছাপলেন তাঁদের বাঙলা পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ ও অভিধান। চট্‌সে প্রকাশিত হল চলন্তিকা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পশ্চিম পাকে বই বিক্রি হবে অল্প, পুব পাকের ভূমাতে শাস্ত্রসম্মত সুখম। ওদিকে উল্লেখ প্রয়োজন পশ্চিম পাক থেকে পুব পাক যে কোনও বই উর্দু হোক বাঙলা হোক, যে কোনও পরিমাণে আমদানি করতে পারে— তার ওপর কোনও ব্যান্ নেই। কাজেই পাঞ্জাবি উদ্যোগীরা ছাপতে লাগলেন, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বটতলা পর্যন্ত। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কালে বা তার কিঞ্চিৎ পূর্বে কলকাতায় প্রকাশিত গীতাঞ্জলির একটি শোভন পকেট সংস্করণেরও অত্যুত্তম ফটোফ্ল্যাশ সংস্করণ তাঁরা বাজারে ছেড়েছিলেন। সকণ্ঠে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলি, 'গুণীজনের মনোরঞ্জনার্থে'! বাজারটা কিন্তু খুব বেশিদিন বাঁচল না। ইতোমধ্যে লেগে গেল ১৯৬৫-র লড়াই। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় একাধিক প্রকাশক 'দুশমন মুল্লুকের তামাম মাল হালাল' অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত এই অছিলায় বেধড়ক ছাপতে শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রকারের পুস্তক। ইতোপূর্বে যে আদৌ করেননি তা-ও নয়, মি. ব্ল্যাক অনুচর স্মিথও অপাঙ্‌ক্তেয় রইলেন না।... পুব পাক স্বাধীন হওয়ার পর এখনও কী পরিমাণ 'পাইরেটেড' মুদ্রণের প্রচার ও প্রসার আছে তার অনুসন্ধান করিনি।

কী অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী পলিটিকস চালাল চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকের দণ্ডধরগণ। পুব বাঙলায় পলিসি ছিল তার সাহিত্য ও ভাষার যথাসাধ্য বিনাশ করা এবং দ্বিতীয়ত পুব বাঙলা যেন পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতে কোনও প্রকারের যোগসূত্র রক্ষা করতে না পারে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকে হবে বাঙলা বড় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের জন্য ছাপাতে দিল বাঙলা বই, অভিধান। ওদিকে কলোনি শোষণনীতি অনুসরণ করে পশ্চিম বাঙলার প্রকাশিত পুস্তক পাঞ্জাবে যদৃচ্ছ ছাপতে ও পুব বাঙলায় বে-লাগাম বিক্রয় করতে বাধা দিল না।

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা— নীলমণি

বিস্তর বিদগ্ধ পাঠক স্বভাবতই শুধোবেন, ইকবাল? ইকবাল তো পাঞ্জাবি! কবি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি আছে। তা হলে পশ্চিম পাঞ্জাবিদের সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, বলা যায় কী প্রকারে? তুলনা দিয়ে বলা যায়, জোসেফ কনরাডের মাতৃভাষা ছিল পোলিশ। তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যসৃষ্টি করে বিখ্যাত হয়েছেন। তাই বলে পোল্যান্ডবাসীর সঙ্গে ইংরেজির অন্তরঙ্গতা আছে, একথা বলা যায় না।

হেমচন্দ্রের স্থান বাঙলা সাহিত্যের কোন শ্রেণির আসনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করার অধিকার এ অর্বাচীন লেখকের আছে; আমার বিস্তর পাঠকের প্রভূত পরিমাণে থাকার কথা। কিন্তু উর্দু কাব্যের সঙ্গে আমার পরিচয় এতই সীমাবদ্ধ যে সে কাব্যে ইকবালের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার মতো কাব্যাধিকার আমার অত্যল্পের চেয়েও কম। তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধশ্রেণিকে সাধ্যানুযায়ী পূর্ণতর করার উদ্দেশ্যে সেটা অবর্জনীয়।

ইকবাল, আমার যতদূর জানা আছে, জর্মন কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে— খুব সম্ভব ম্যুনিক থেকে— দর্শন বিভাগে ডক্টরেট পান। কোনও কোনও পাঠকের কৃপাধন্য এ গর্দভও দর্শন বিভাগ থেকে ডক্টরেট পায়— জর্মনির অন্যতম বিখ্যাত বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং বললে পেত্যয় যাবেন নিশ্চিৎ মত্তুল্য এবং 'মদাপেক্ষা' সহস্রগুণে খঞ্জতর ভূরি ভূরি গর্দভ-গর্দভী জর্মনি থেকে— জর্মনি কেন, সর্বদেশেই— নিত্যি নিত্যি ডক্টরেট পেয়েছে ও পাবে। অতএব ইকবাল 'ভক্ত' মদোৎকট পঞ্চনদবাসী কবি ইকবালের ডক্টরেট নিয়ে যতই ধানাই-পানাই করুক, ঢক্কা-ডিণ্ডিম-নাদ ছাড়ুক তদ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। বিশেষত আমরা যখন বিলক্ষণ অবগত আছি, উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনার জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এবং ওই উদ্দেশ্যে ম্যুনিক পানে ধাবমান হওয়াও বন্ধ্যাগমন। বস্তুত কবি ইকবালের ঢক্কাবাদক পঞ্চনদ সম্প্রদায় তাঁর যেসব 'দার্শনিক কবিতা'র প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ সেগুলো না দর্শন না কবিতা। অবশ্য আমার এই ধারণার মূল্য না-ও থাকতে পারে। তাঁর বিশেষ ধরনের কবিপ্রতিভা ছিল, সে তথ্য সুবিদিত।

ইকবাল যেসব কবিতায় অতীতের মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির গুণ-কীর্তন করেছেন এবং তাঁর যুগে মুসলিম জাহানের সর্বত্র সে-সভ্যতা ও কৃষ্টির অস্তমিত অবস্থার যে কারণ বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইতিহাসের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখলে সেগুলোতে ভুল-ত্রুটি নগণ্য এবং স্থলে স্থলে কবিজনসুলভ অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।

এক-এক জলজন্তু পর্বতপ্রমাণ।
সাগর করিবে গ্রাস হয় অনুমান ॥

যে সাগরে জলজন্তু বাস করে সেই গোটা সাগরকে যদি সেই জলজন্তু গ্রাস করতে পারে তবে ইউক্লিডের মুখে ছাই দিয়ে স্বীকার করব, কোনও বস্তুর খণ্ডিত অংশ সেই বস্তু থেকে বৃহত্তর হতে পারে! কিন্তু কাব্য বিজ্ঞান নয়, দর্শনও নয়। যদিও আলঙ্কারিক দণ্ডিন তাঁর 'কাব্যাদর্শে' মত প্রকাশ করেছেন, এ জাতীয় অসম্ভাব্য বর্জনীয়।

www.pathagar.com

একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে আছিল সর্বজন
সে ভাবে থাকিত যদি
পার হয়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন?

রঙ্গলাল বঙ্গভূমে একদা এই শ্লোক ছন্দে প্রকাশ করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ইকবালের শোকপ্রকাশশৈলী অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের। কিন্তু যে মুসলিম কৃষ্টির ন্যায্য প্রশস্তি ইকবালের কাব্যে আছে তাতে পাঞ্জাবি মুসলিমদের 'অবদান' সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন কি না, আমার মনে পড়ছে না। তবে একথা স্পষ্ট মনে আছে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি বৎসর একটা জব্বর ডিবেট হয়। বিষয় : 'কে শ্রেষ্ঠতর কবি?— ইকবাল না গালিব?' এবং পাঞ্জাবিরা একদা দলে ভারী থাকত বলে ডিবেট শেষের ভোট-মারে গালিব প্রতি বৎসর মার খেতেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যই কবিতা কি না, এ নিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দেন কবি স্বয়ং তাঁদের নিয়ে মশকরা করেছেন। তদুপরি তাঁর কিংবা কোনও কবির কাব্য থেকে পছন্দমতো, যেটা লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সাহায্য করে সেটা গ্রহণ, যেটা করে না সেটা বর্জন করে করে কবির জীবনদর্শন নির্মাণ করাটা তিনি নেকনজরে দেখতেন কি না, রসিকজন দেখেন কি না, সে বিষয়ে আমি শঙ্কা পোষণ করি। ইকবাল যখন গাইলেন, 'চীন ও আরব আমাদের হিন্দুস্থান আমাদের' তখন এই 'আমাদের'-এর আমরা খুব সম্ভব একমাত্র মুসলমানগণ, কারণ চীন ও আরবে হিন্দু আছেন বলে শুনিনি। পক্ষান্তরে তিনি যখন বলেন, 'হিন্দুস্থান সর্ব বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম' তখন নিশ্চয়ই তিনি আপন মাতৃভূমিকে (সে যুগে ভারত ইসলামের জন্মভূমি আরবের চেয়ে) শ্রেষ্ঠতর আসন দিচ্ছেন। অতএব তিনি প্রথমে মুসলিম তার পর ভারতীয়, না প্রথমে ভারতীয় তার পর মুসলিম এ সমস্যা থেকেই যায়— অন্তত আমার কাছে। সর্বশেষ প্রশ্ন, দেশ, ধর্ম, ভগবান ইত্যাদির প্রতি রচিত কবিতা আজ পর্যন্ত বিশ্বকাব্যে কতখানি সফল হয়েছে, কোন পর্যায়ে উঠতে পেরেছে, সেটাও পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন।

রঙ্গলালের কবিতা বাঙালিকে অকস্মাৎ যবনবৈরী করে তুলেছিল বলে কখনও শুনিনি; ইকবালের কাব্য পাঞ্জাবি মুসলমানকে তার স্বধর্ম সম্বন্ধে শ্লাঘা অনুভব করতে সাহায্য করল। এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই স্বধর্মাভিমান যখন অন্য ধর্মকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে এমনকি বৈরীভাবে দেখতে আরম্ভ করে— বিশেষ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর— তখন প্রতিবেশী ভারতীয় হিন্দুর প্রতি পাঞ্জাবিদের রাজনৈতিক আচরণও যে বৈরীভাবাপন্ন হবে সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। এমনকি পাঞ্জাবে প্রচলিত ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবি মুসলিমও নিপীড়িত হয়। তবে এর মূলে আছেন ইকবাল— এ অপবাদ আমি কখনও শুনিনি।

দেশবিভাগের পর পাঞ্জাবিদের ভিতর দেখা দিল দুই প্রকারের আত্মম্ভরিতা। পাকিস্তান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র অতএব পাকিস্তানিরা বিশ্ব মুসলিমের প্রতিভূ, এবং যেহেতু তাঁরা প্রতিভূ, অতএব তাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান; বলা বাহুল্য, সেই সর্বশ্রেষ্ঠদের মুকুটমণি স্বভাবতই, অতি অবশ্যই পাঞ্জাবি মুসলমান। সূত্রটি সত্য কিন্তু তার থেকে যে দুতিনটি সিদ্ধান্ত হল সেগুলো যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত নয়। কামাল আতাতুর্ক স্বদেশ তুর্কির কর্ণধার হওয়ার পূর্বে সে দেশের সুলতান ছিলেন বিশ্বমুসলিমের অধিনায়ক— খলিফা।

www.pathagar.com

তুর্কির বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা চার কোটির মতো। খলিফার আমলে মোটামুটি ওই ছিল। সেকালে একাধিক দেশে ঢের ঢের বেশি মুসলমান বাস করতেন। আর সংখ্যাগুরুত্বই যদি সর্বক্ষেত্রে স্পর্শমণি বা কষ্টিপাথর হয় তবে পাকিস্তানিরা খলিফার শূন্য আসনে তাদের রাষ্ট্রজনক জিন্নাসাহেব, বা পরে জাতভাই পাঞ্জাবি গুলাম মহম্মদ কিংবা মদ্যপ লম্পট ইয়েহিয়াকে বসাল না কেন? অক্সফোর্ডের অধ্যাপক সংখ্যা ৮৭০, ছাত্র ৬৯০০; মার্কিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংখ্যা ২১৭৪, ছাত্র ১০২৩৮। (এই অধ্যাপক-ছাত্র-শুমারি ১৯৫০-১৯৫২-এর) তারই জেরে হার্ভার্ড তো কখনও প্রাধান্য বা তার ছাত্রাধ্যাপক অক্সফোর্ডের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এমনতরো দাবি করেনি! মানুষের মাথা একটা, সে মাথাতে যদি উকুন থাকে তবে সে উকুন অসংখ্য।

পাঞ্জাবি মুসলমানরা পাক-ভারতে শ্রেষ্ঠ— সর্বশ্রেষ্ঠ না— যোদ্ধা হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চাশাধিক বৎসর ধরে আমি সিভিল-মিলিটারি উভয় শ্রেণির পাঞ্জাবিকে চিনি এবং কস্মিনকালেও এই খ্যাতিতে বিশ্বাস করিনি। ইউরোপের বিখ্যাত যোদ্ধা য়ুঙ্কের (Junker) গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তাদের এক পরিবারে বেশ কিছুকাল আমি বাস করেছি, ফরাসি অফিসারদের স্যাঁ সির মিলিটারি অ্যাকাডেমির কয়েকজনকে আমি চিনতুম, এক ইংরেজ কর্নেলের কাছে প্র্যাকটিসহীন, পুস্তকে সীমাবদ্ধ অ্যামেচার রণনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়, আফগান অফিসারদের চিনতুম ঝাঁকে ঝাঁকে, আমারই এক ছাত্র বাচ্চা-ই-সকওয়ের 'আ র্মি তে' হয়ে গিয়েছিল রাতারাতি 'কর্নেইল' এবং এই সর্বাঙ্গ গোষ্ঠীর ভিতর সবচেয়ে দুর্দান্ত 'ডাকু' অফিসার ছিল জারের ফৌজে— ডুয়েল লড়া সামান্য অসম্মানে আত্মহত্যা করাটা যাদের ছিল নিত্যদিনের তুচ্ছ আচরণ। মত্তাবস্থায় শেষরাত্রে অন্ধকার ঘরে চেয়ার-টেবিলের আড়াল থেকে একজন ডাকলে 'কু— উ— উ', অন্যজন ছুড়বে সেদিকে পিস্তলের গুলি, এটা যাদের সর্বপ্রিয় খেলা (!) রাস্‌পাতিনহন্তা গ্র্যান্ড ডিউক ইউসপফ এদেরই একজন— এদের কয়েকজনকেও ভালো করেই চিনতুম।

যে নাৎসিরা ইহুদিদের পাইকারি হারে খুন করে, তাদের সঙ্গে সনাতন আর্মির কোনও যোগ ছিল বলে শুনিনি— ব্যত্যয়গুলো অন্যান্য অফিসার কর্তৃক তীব্রকণ্ঠে তিরস্কৃত হয়েছে; যাদের ছিল তারা হিটলারের স্বহস্তে নির্মিত, নাৎসি পার্টির সদস্য দ্বারা গঠিত, হিটলারের নিজস্ব আর্মি এসএস— ব্ল্যাক কোট পরিহিত। কি সনাতন আর্মি, কি এসএস কেউই ধর্ষণকর্মে লিপ্ত হয়নি। ন্যুরেনবের্গ মোকদ্দমায় অপরাধের দফাওয়ারি যে ফিরিস্তি পেশ করা হয় সেটাতে ধর্ষণ নেই।

ইয়েহিয়ার একাধিক সেপাই দ্বারা পরপর ধর্ষিতা অগণিত নারী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেছে। অফিসারদের জন্য প্রতি কেন্টনমেন্টে নির্মিত হয়েছিল ব্রথেল— অনেক মেয়েকেই লুঠ করে আনা হয়েছিল মেয়ে-বোর্ডিং থেকে। ঢাকাস্থ সাধারণ পাঞ্জাবি সেপাই ঢাকার সামান্য বাইরে মুক্তিফৌজের ভয়ে এমনই মুক্ত-পাজামা হয়ে গিয়েছিল যে আমার নিকটতম 'সৈয়দ' আত্মজনকে অনুরোধ করত, তারা যেন আল্লার কাছে প্রার্থনা করে ওদের যেন মফঃস্বলে বদলি না করা হয়। এবং পরাজয় অনিবার্য জানামাত্রই অফিসার গোষ্ঠী প্রাইভেটদের না জানিয়ে প্লেন, হেলিকপ্টার, লঞ্চ চুরি করে পালায়— এগুলো অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছিল আহত খান সৈন্যদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। এদের আমি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলি কী করে?

www.pathagar.com

উভয় বাঙলা— 'হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল'

'হুজ্জৎ' কথাটা ন সিকে খাঁটি আরবি এবং অর্থ 'যুক্তি', 'আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি', 'আপত্তি প্রকাশ করণ' ইত্যাদি। শব্দটির কোনও কদর্থ আরবিতে আছে বলে আমার জানা নেই। ইরানবাসীরা যখন শব্দটি তাদের ভাষা ফারসিতে গ্রহণ করল তখন তার স্বাভাবিক অর্থ তো রইলই, উপরন্তু শব্দটির একটা কদর্থ গড়ে উঠতে লাগল। মানুষের স্বভাব এই যে, সে বিপক্ষের যুক্তিতর্ক স্বীকার করতে চায় না। তদুপরি বিপক্ষ যদি নিছক 'যুক্তি' ভিন্ন অন্য কোনওপ্রকারের বিবেচনা না দেখায়, যেমন ধরুন প্রমাণ করা গেল যে, সমাজে বিশেষ কোনও রীতি বা অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে বিনা আপত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য, এমনকি সম্মানিত হয়েছে, যদ্যপি সে রীতি যুক্তিবিরুদ্ধ— এবং তখনও সে বার বার একই যুক্তির দোহাই দিতে থাকে, তবে মানুষ স্বভাবতই বিরক্ত হয় এবং ব্যঙ্গ করে তাকে তর্কবাগীশের স্থলে 'তর্কবালিশ', 'দ্বন্দ্বপ্রিয়', 'ঝগড়াটে' ইত্যাদি কটুবাক্যে পরিচয় দেয়। এবং মানুষের এই স্বভাবই তখন কটু থেকে কটুতর হতে হতে মূল 'যুক্তি' (হুজ্জৎ) শব্দটাকে 'অযথা তর্ক', 'ভণ্ডাচরণের অজুহাত' কদর্থেও ব্যবহার করতে থাকে। বাঙলা এই শব্দটা ফারসি থেকে গ্রহণ করার সময় এটাকে 'অহেতুক তর্কাতর্কি' অর্থে নেওয়ার দরুন সেটার ওই 'ঝাগড়াটে' অর্থটাই জনপ্রিয় হয়ে গেল। তাই কবি হেমচন্দ্র বাঙালি মেয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রচেছেন 'হুজ্জতে হারিলে কেঁদে, পাড়া করে জয়'।

এর সব কটা অর্থই আমি মেনে নিয়েছি, কিন্তু বাঙালি কোষকারগণ যদিও 'হুজ্জুতে' বলতে প্রধানত 'কলহপ্রিয়' অর্থেই ধরে নিয়েছেন তবু বহুক্ষেত্রে যেখানে 'হুজ্জুৎ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং হয় তার বাতাবরণ, পূর্বাপর, প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে আমার মনে হয়েছে, শব্দটার অর্থ 'ঝগড়াটের' চেয়ে ঢের ঢের ব্যাপকতর। কোনও স্থলে মনে হয়েছে এর অর্থ 'জেদি' 'একগুঁয়ে' 'অবস্টিনেট' 'দুর্দমনীয়', 'কিছুতেই বশ মানতে চায় না'। মূল আরবিতে লেখারম্ভে নিবেদন করেছি, শব্দটার একটা অর্থ আপত্তি প্রকাশ করা এবং 'দৃঢ় কণ্ঠে মতদ্বৈধ প্রকাশ করা'। সরল বাংলায় সহজ অর্থ 'বিদ্রোহ করা', দীর্ঘতর অর্থ 'অন্যান্য দাবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা'।

হুতোম যখন তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় নকশাতে একটি ফারসিপ্রবাদ আংশিক অনুবাদ করে লিখলেন 'সাধারণ কথায় বলেন, "হুনরে চীন" ও "হুজ্জুতে বাঙ্গাল" তখন তিনি 'হুজ্জুতে' কী বুঝেছিলেন বলতে পারব না, কারণ এই তুলনাহীন গ্রন্থখানার লেখক শ্রীতালাহুল ব্ল্যাক ইয়ারের অনুগত তাঁবেদার মোসাহেব এ অধম সে গ্রন্থখানা বটতলা থেকে শুরু করে অনবদ্য শোভন সংস্করণ পর্যন্ত কতবার যে কিনেছে এবং তার কাছ থেকে কতবার ধারের ছলে চুরি হয়েছে সেকথা স্মরণে আনলেই সে তৎক্ষণাৎ পরশুরামের মতো শপথ গ্রহণ করে, এই গৌড়ভূমিকে সে বার বার নিষ্পুস্তক-চৌর করবে— আমৃত্যু, এবং জন্মনি জন্মনি, প্রতি জন্মে।... এস্থলে কিন্তু লক্ষণীয় প্রবাদটির ফারসি মূলরূপ 'হুনর্-ই-চীন ওয়া হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল'। অস্যার্থ 'স্কিল অব চায়না অ্যান্ড রেবেঁলিয়াসনেস (অবসটিনেসি) অব বেঙ্গল'। কাজেই 'হুজ্জৎই-ই-বাঙ্গাল'-এর মধ্যবর্তী 'ই'টি 'হুজ্জুতে'-এর একার হয়ে বিশেষণে পরিবর্তিত হয়নি, যেরকম 'চাষাড়ে, ঝগড়াটে, তামাটে'। এস্থলে '— ই—' টির অর্থ অফ। যেরকম মরহুম ফজলুল হকের জনগণদত্ত উপাধি ছিল 'শের-ই-হিন্দ' 'টাইগার অব্ বেঙ্গল'। বাঙলায় লেখা হত 'শেরে হিন্দ'।

www.pathagar.com

এই সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত পার্থক্য না করলেও অর্থ দাঁড়ায়, চীন বিখ্যাত তার নৈপুণ্যের জন্য, বঙ্গদেশ তার পৌনঃপুনিক বিরোধিতার (একগুঁয়েমির) জন্য। নীচ ইতর অর্থে না নিয়ে 'ঝগড়াটে'ও বলা যেতে পারে। শান্তস্বভাব বিদ্যাসাগর যবে থেকে বিধবাবিবাহের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, সেই থেকে বড্ড ঝগড়াটে হয়ে গেছেন বললে তো 'ঝগড়াটে' শব্দটি এস্থলে উচ্চাঙ্গের প্রশস্তিসূচক।

অথচ সত্যার্থে বাঙালি বিদ্রোহী নয়— অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী অর্থে যদি সে শব্দ ব্যবহার করা হয়। পুনরায় দ্রষ্টব্য, 'বিদ্রোহী' শব্দটি কে ব্যবহার করছে তার ওপর এর সদর্থ, কদর্থ দুই-ই নির্ভর করছে। মাদজিনিকে ইতালির তৎকালীন 'সরকার', দ্য গলকে ভিশি 'সরকার' বিদ্রোহী, দেশদ্রোহী পদবি দিয়ে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দিয়েছে। ঠিক ওই একইভাবে কবে, কবেকার সেই গুপ্তযুগ থেকে যুগ যুগ ধরে বলা হয়েছে 'অতঃপর বঙ্গদেশ' 'বিদ্রোহ' করিল। পাঠান যুগের বঙ্গদেশ নিত্যনিয়ত বিদ্রোহ করে বলে দিল্লি সরকার দুটি শব্দে এদেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সে শব্দদ্বয় আমি ভুলে গিয়েছি কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রতিবারে যে অখণ্ড শ্লাঘা অনুভব করেছি সেটা ভুলিনি এবং অর্থটাও ভুলিনি; মোটামুটি 'বিদ্রোহী জনপদ' 'উৎপাত-ভূমি' 'জঙ্গিস্থান' এই ধরনের কিছু একটা নিন্দাসূচক— অধম 'গুষ্টিসুদ্দু' সে নিন্দা চন্দনের মতো শ্রীরাধার অনুকরণে সর্বাঙ্গে অনুলেপন করেছে। কিন্তু গভীর বিস্ময় ও ঘৃণা অনুভব করেছি এবং এখনও করি, যখন দেখি পাঠান-মোগল-ইংরেজ ঐতিহাসিকের দোহার গেয়ে বাঙালি— আবার বলছি বাঙালি প্রখ্যাত বাঙালি— ঐতিহাসিক অসঙ্কোচে মাছিমারা কেরানির মতো পুনঃপুন পুনরাবৃত্তি করেন, 'অতঃপর বঙ্গবাসী দিল্লির বিরুদ্ধে "বিদ্রোহ" ঘোষণা করল।' পাঠান-মোগল ঐতিহাসিকের মুখে এহেন বাক্য স্বাভাবিক! তারা দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস, দিল্লি সরকারের সঙ্গে তাদের একাত্মানুভূতি বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঙালি ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত বাঙালির দৃষ্টিবিন্দু থেকে বরঞ্চ দৃঢ় প্রত্যয়সহ বলি বিশ্বমানবের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই 'বিদ্রোহটার' রেজোঁ দেৎর স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব হেতুটার অনুসন্ধান না করে নিন্দাসূচক 'বিদ্রোহ' শব্দটা প্রয়োগ করেন কেন?

বার্ধক্যজনিত ভারবহনক্ষম 'বিদ্রোহী' স্মৃতিদৌর্বল্যের ওপর নির্ভর করে নিবেদন, বাদশাহ জাহাঁগির যখন শেষ 'বিদ্রোহী' বাঙালি পাঠানরাজ ওসমানকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আদেশ পাঠালেন তখন ওসমান অতিশয় ভদ্রভাষায় উত্তরে যা লেখেন তার সারমর্ম : আপনি ভারতেশ্বর, আপনার রাজ্য সুবিস্তৃত, আপনার ক্ষমতা অসীম। আমি পড়ে আছি ভারতের এক কোণে। আমার স্বাধীনতা আপনার কোনওপ্রকারের ক্ষতিসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। জঙ্গলের চিড়িয়াটাও স্বাধীন থাকতে চায়।

ওসমান বলতে চেয়েছিলেন, বনের পাখির স্বাধীনতা একান্তই স্বভাবজাত, নৈসর্গিক। সে স্বাধীনতা কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে না, পরধনলোভ সে স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত স্বধর্ম নয়। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম সত্য প্রকাশ করেছেন যখন বললেন, আমি ভারতের এককোণে পড়ে আছি। তার পূর্ণ অর্থ কী?

আর্যজাতি তার সর্বপ্রাচীন আদিবাস কেন্দ্র থেকে নির্গত হয়ে উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সঠিক কোন জায়গায় এসে আর অগ্রসর হল না সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু

www.pathagar.com

পূর্বদিকে বঙ্গদেশই যে তার সর্বশেষ অভিযান সীমান্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পূর্বদিগন্তে বাঙলাই শেষ আর্যভাষা।

এ বঙ্গদেশ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিরকাল নিরুদ্ধ নিশ্বাস। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আরাকান, দক্ষিণে সমুদ্র। অথচ পশ্চিম থেকে যুগ যুগ ধরে শক হূণ তুর্ক পাঠান মোগল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে হানা দিয়েছে দলে দলে। তাদের চাপ পড়েছে পাঞ্জাবের ওপর, সে দেশের লোক চাপ দিয়েছে উত্তর প্রদেশের ওপর— করে করে সর্বশেষ চাপ পড়েছে বাঙলার ওপর। সে হতভাগা উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ কোনও দিকেই চাপ দিতে পারে না, পালাবার পথ পর্যন্ত তার নেই। সে তখন রুখে দাঁড়াবে না তো কী করবে? সেটা বিদ্রোহ নয়— এমনকি সেটাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিলেও মোক্ষমতম তত্ত্বটি প্রকাশ পায় না। প্রতিবারেই তার রুখে দাঁড়ানোটা নিতান্তই, একান্তভাবে আপন জীবনরক্ষার্থে— ওসমানের সেই কোণ-ঠাসা ছোট্ট চিড়িয়াটিকে ধরতে গেলে সে-ও ঠোকর মারত। এ প্রচেষ্টাকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' 'মুক্তিযুদ্ধ' 'দেশাত্মবোধজাত আত্মাহুতি' ইত্যাদি গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী সদৃশ উচ্চনামে ডাকুন আর না-ই ডাকুন, ওটাকে কাশ্মির কান্যকুব্জ পাঠান মোগল রাজন্যবর্গের মুখপাত্র হয়ে 'বিদ্রোহী' নাম নিয়ে স্পর্শকাতর জনকে বিড়ম্বিত করবেন না। বলা বাহুল্য, সে পরাজিত হয়েছে একাধিকবার। সে তখন দেখেছে বিজয়ী 'বীরবৃন্দ' তার পুত্র-ভ্রাতাকে হত্যা করেছে, অবলাদের ধর্মনষ্ট করেছে, তার ক্ষেত ফসল কেড়ে নিয়েছে, তার শেষ রক্তবিন্দু শোষণ করার পর ক্রীতদাসরূপে তাকে বিদেশের হট্ট-পণ্যালয়ে নির্বাসিত করেছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হল বিলকুল একটা নয়া খেল। হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার বিহারি দারওয়ান, মিস্ত্রি বাবুর্চি ঢুকল তাদের দেশে। এদেশে তারা যুদ্ধে জয় করে ঢুকলে সেটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হত না। তার ওপর এল পাঞ্জাবি, পাঠান সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে, খোজাবোরা অতিদূর বোম্বাই-করাচি থেকে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আসতে হলে এদের যুদ্ধে পরাজয় করতে হত প্রথম হরিয়ানা, রাজধানী দিল্লি, তার পর উত্তরপ্রদেশ, তার পর বিহার, সর্বশেষ বঙ্গদেশ। এহেন স্ববীর্যে করায়ত্ত সমুদ্রে সেতু নির্মাণ না করে দুর্ধর্ষ রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ অজেয় জগতে বীরগণকে আত্মনাশা সর্বনাশা সংগ্রামে পর্যুদস্ত না করে হনুমান এক লম্ফে বসে গেলেন রাবণের রাজসিংহাসনে!

বিনা যুদ্ধে যারা এল, এরা এক-একটা আস্ত হনুমান— অবশ্যই ভিন্নার্থে অর্থাৎ মর্কটার্থে। না, মাফ চাইছি। মর্কটকুলকে অপমান করতে যাব কেন আমি? ওরা যারা এসেছিল তাদের যা বর্বর আচরণ তারা দেখাল কোনও মর্কট তো কস্মিনকালেও সে বর্বরতার সহস্র যোজন নিকটবর্তী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে জঙ্গিলাটের পদ অলঙ্কৃত করেনি।

উভয় বাঙলা— শত্রুর তূণীর মাঝে খোঁজো বিষবাণ

গভীর বনানীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এক কাঠুরে। হাতে একটা কুড়োল। সদ্য কিনে এনেছে গভীর বনের ওপারের গাঁয়ে, কামারবাড়ি থেকে। তাই কুড়োলে এখনও কাঠের লম্বা হাতলটা

www.pathagar.com

লাগানো হয়নি। জল্লাদের হাতে তলোয়ার দেখলে যার মুণ্ডু কাটার বাদশাহি হুকুম হয়ে গিয়েছে, সে যেরকম কাঁপতে থাকে, লম্বা লম্বা আকাশছোঁয়া গাছগুলোও কাঠুরের হাতে নয়া কুড়োলের ঝকঝকে লোহা দেখে তেমনি দারুণ ভয় পেয়ে শিউরে উঠল। সেটা প্রকাশ পেল তাদের বাতাসহীন আবহাওয়াতে। অকারণে ডাইনে-বাঁয়ে দোলা লাগানো থেকে। মর্মরধ্বনি জেগে উঠল শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়। এই এল এই পড়ল কালবৈশাখী যখন বেগে ধেয়ে আসে বনস্পতিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য তখন যেরকম প্রথম সবচেয়ে উঁচু গাছগুলো আসন্ন কালবৈশাখীর আভাস পেয়ে মর্মর রবে কিশোর গাছগুলোকে হুঁশিয়ারি দেয়, তারা কচিগাছগুলোকে ঠিক তেমনি বলে 'খবরদার', বিনা বাতাসে বনে বনে ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে মর্মরে মর্মরে আসমানে মাথা হেনে হেনে কাঠুরের হাতে যে কুড়োল সেটা একে অন্যকে দেখিয়ে দিল এবং তারা যে এত শত বৎসর ধরে শান্তিতে দিন কাটিয়েছিল তার যে সমাপ্তি আসন্ন সেটাও বুঝিয়ে দিল।

তখন এক অতি বৃদ্ধ সুদীর্ঘ, ঈষৎ ন্যুব্জদেহ তরুরাজ চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর মর্মরে সবাইকে বললে, 'বৎসগণ! আস্ত কুড়োলের ওই লোহার অংশটুকু মাত্র আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে না। হয়তো সামান্য একটু আঁচড়-জখম আমাদের গায়ে লাগতে পারে— তাতে করে কাঠুরের কোনও লাভ নেই— খামোখা সে মেহনত করতে যাবে কেন সে? মরণ আসবে আমাদের সেই কুক্ষণে যেদিন আমাদেরই একজন কাঠ হয়ে ওই লোহার টুকরোটিতে ঢুকে হাতল হয়ে তাকে সাহায্য করবে। তখন ওই কুড়োল হবে বলবান। কাঠুরের কঠিন পেশির সুপ্ত বল আমাদেরই একজনের মিতালিতে তৈরি হাতলের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দ্বিখণ্ডিত করবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে পুব পাকে নিযুক্ত পাঞ্জাবি-বেহারিরা উঠেপড়ে লেগে গেলেন পুব পাকের বাঙালি মুসলমান হাতলের সন্ধানে। এই পাঞ্জাবি বুদ্ধু ও বেহারি বিচ্ছেদের জন্য কুঠার-লৌহদণ্ড হয়ে এলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি চিফ সেক্রেটারি তাঁর প্রাতঃভর্ৎসনীয় গোধূলি কর্তনীয় নাম মি. আজিজ আহমদ। এঁকে রাজধানী পাঠিয়েছিল পূর্ব পাকে অখণ্ড পাকিস্তানের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের জন্য; তিনি পুঁতে গেলেন লক্ষাধিক টাইম-বম, সেগুলো ফাটল চব্বিশ বছর পর।

তাঁর কীর্তিকাহিনী দীর্ঘ। আজ যেরকম পুব পাকের 'সেবা করে' টিক্কা খান জঙ্গিলাটের আসন পেয়েছেন, ঠিক তেমনি ইনিও একদিন পুব বাঙলার বাঙালি সিভিলিয়ানদের সর্বনাশ করে ও পশ্চিমাদের সর্বানন্দ দিয়ে অখণ্ড পাকের ফরেন মিনিস্টার অ্যাডভাইজার আরও কত কী হন। সেসব থাক। আমার উদ্দেশ্য শুধু দেখানো— পার্টিশেন সত্ত্বেও উভয় বাঙলাতে যে চিন্ময়-বন্ধন ছিল সেটার সত্তানাশ মহতী বিনষ্টি কী প্রকারে করা যায় সেইটেই ছিল চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের গুরসম রাজধানী-দত্ত সাধনার চিন্তামণি। স্বদেশী আন্দোলনবৈরী পুলিশ কর্মচারী শামসুল (আলম? হুদা? হক) বন্দি দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে প্রথম দোস্তি জমিয়ে বিস্তর গোপন তথ্য বের করে ওইগুলো দিয়ে নির্মাণ করেন সরকার পক্ষের মারণাস্ত্র। তাই আসামিরা তাঁর উদ্দেশে বলত, 'ওহে শামসুল! তুমিই আমাদের "শ্যাম" তুমিই আমাদের "শূল"।' আজিজের বেলা অতখানি টায় টায় শিব্রামীয় পান তৈরি হল না বটে, তবু— আজিজ-এর অর্থ প্রিয় মিত্র; আহমদ-কে আমেদ, ইংরিজিতে 'ডি' অক্ষরযোগে

আমেডও লেখা হয়। দি ফ্রেন্ড— আমেড— Ah! mad! কারণ প্রবাদ আছে, মূর্খ মিত্রের চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো। এস্থলে মূর্খ মিত্র না, পুব বাঙলার উন্মাদ মিত্র।

তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিনাশ করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : পুব বাঙলার লোক এ চর্চাতে অনুপ্রেরণা প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে : বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বহুলাংশে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে। অতএব উভয় বাঙলার মাঝখানে নির্মাণ করতে হবে অভেদ্য লৌহ যবনিকা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : ওই রবীন্দ্রনাথ নামক লোকটির ইমেজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে হবে; সেস্থলে জাজ্বল্যমান করতে হবে পাঞ্জাবি কবি ইকবালকে, তাঁর ইসলামি জোশসহ।

কিন্তু তিনি সেই কাষ্ঠখণ্ড পান কোথায় যেটা দিয়ে তিনি কুঠারটি নির্মাণ করতে পারেন? উচ্চপদের বাঙালি মুসলমান সিভিলিয়ানদের সেক্রেটারিয়েট থেকে খেদিয়ে তাদের পাঠানো হল ডিস্ট্রিক্‌ট্‌গুলোতে— এঁদের বেশিরভাগ এসেছিলেন শিলঙ সেক্রেটারিয়েট থেকে, সিলেটের লোক, হেথাকার রাইটারস বিল্ডিং থেকে উচ্চপদস্থ গিয়েছিলেন অল্প পরিমাণ— ছিলেনই অত্যল্প। পাঞ্জাবি-বেহারিদের আধা ডজন প্রমোশন দিয়ে দিয়ে ভর্তি করা হল সেক্রেটারিয়েট— যতদূর সম্ভব। কিন্তু বাঙলার 'ক' অক্ষর দেখলেই এরা সামনে দেখে করালী। তদুপরি এদের যুক্তি 'বাঙলাকো জড়সে উখাড়নেকে লিয়ে (উৎপাটন করতে) আমরা এসেছি জিহাদ লড়তে, আর বলে কি না, শেখো বাঙলা!'... আজিজ দেখলেন, এরা সরকারি কাজই চালাতে অক্ষম, এদের দ্বারা সূক্ষ্ম প্রপাগান্ডা, রবীন্দ্রনাথের ইমেজ নাশ অসম্ভব। চাই বাঙালি।

মক্তবের মোল্লা, মাদ্রাসার নিম্নমানের মৌলবি ও ছাত্র এলেন এগিয়ে। এঁরা বাঙলা প্রায় জানেনই না। উর্দুজ্ঞান যৎসামান্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। এঁরাই ছিলেন উর্দুকে পুব পাকের রাষ্ট্রভাষারূপে চাপিয়ে দেবার তরে সবচেয়ে সরব। কলকাতা বা ঢাকার বিএ এমএ একবর্ণ উর্দু জানেন না। অতএব উর্দু চালু হলে মাদ্রাসার ম্যাট্রিক মানের পড়ুয়া হয়ে যাবে কমিশনার, ক্লাস সিক্সের ছোঁড়া হবে ডিএম! 'উর্দু জবান জিন্দাবাদ!'

এরা দিল পয়লা নম্বরি ধাপ্পা আজিজ এবং তাঁর প্যারা উর্দুভাষী ইয়ারদের। এরা কতখানি বাঙলা জানে, সে বাঙলা দিয়ে বাঙলা কৃষ্টি-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে কি না সেটা বোঝবার মতো বাঙলা এলেম তো আজিজ গোষ্ঠীর নেই। এদেরই অনেকে পরবর্তীকালে অল-বদরে দাখিল হয়ে দক্ষতার সঙ্গে খান অফিসারদের খবর যোগায়, কোথায় কোন বুদ্ধিজীবী বাস করে, কাকে কাকে খুন করতে হবে। আত্মসমর্পণের দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর সকালবেলা যখন যুদ্ধ সমাপ্তি তথা আত্মসমর্পণের দলিলাদি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে বলে আমারই পরিচিত দু জন বাঙলা-প্রেমী বুদ্ধিজীবী, এতদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকার পর নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন পরিবারে ফিরে এসে স্বস্তিতে ঘুমুচ্ছিলেন, তখন এই অল বদর্‌রাই মা, স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যার সামনে দুই হতভাগ্যকে বন্দুকের সঙ্গিন দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে চোখে পট্টি বেঁধে কোনও এক অজানা জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর তাঁদের গুলি করে মারে।

ওদিকে বাঙালি মুসলমান উঠেপড়ে লেগেছে, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। তারা এটা চায় ওটা চায়, সেটা চায়। মারা গেল কিছু প্রাণবন্ত তেজস্বী ছেলে বন্দুকের গুলিতে। আন্দোলন তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগল প্রতিদিন।

www.pathagar.com

অতিশয় অনিচ্ছায় পাক সরকার দুধের ছলে কিঞ্চিৎ পিটুলি-গোলা পরিবেশন করলেন 'বাঙলা অ্যাকাডেমী' নাম দিয়ে। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোটা কয়েক বিচ্ছু— বিসমিল্লাতেই। এঁরা সেই মোল্লা মুনসির মতো— যাদের কথা এইমাত্র নিবেদন করেছি— অত্যল্প শিক্ষিত নন। এঁরা বেশ কিছুটা শাস্ত্র জানেন, অল্পবিস্তর বাঙলাও লিখতে পারেন।

সরকার দিয়েছে টুইয়ে। এঁরা ধরলেন জেদ অ্যাকাডেমীর সর্বপ্রথম কর্তব্য রূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে (কে কখন স্বীকৃতি দিল, জানিনে) বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে আরবি ভাষায় লিখিত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করে! প্রতিবাদ করেছ কী মরেছ! তদ্দণ্ডেই তোমার নামে 'কাফির' ফৎওয়া জারি হয়ে যাবে। অথচ ভেবে দেখনি আমাদের সাহিত্য পরিষদ যদি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠত বেদ থেকে আরম্ভ করে ঘেরন্তসংহিতা আর খট্টাঙ্গ পুরাণের বাঙলা অনুবাদ করতে, তবে লুপ্তপ্রায় বাঙলা পাণ্ডুলিপি থেকে অমূল্য গ্রন্থরাজি উদ্ধার করে খাস বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত কে? কোন পাষণ্ড অস্বীকার করবে সংস্কৃত এবং আরবি প্রচুর গ্রন্থ বাঙলাতে অনুবাদ করা অতিশয় কর্তব্যকর্ম? কিন্তু প্রশ্ন, সেইটেই কি সাহিত্য পরিষদ বাঙলা অ্যাকাডেমীর সর্বপ্রধান ধর্ম?

পাঠক, তুমি বড় সরল। বিলকুল ঠাহর করতে পারনি কার ঘুমন্ত হাত দিয়ে কে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির তামাক চুপসে— না ভুল বললুম— সগর্বে খেয়ে গেল।

অ্যাকাডেমী পয়লা ধাক্কাতেই স্থির করলেন— একদম পয়লা ধাক্কাতে কি না আমার সঠিক মনে নেই— কোনও একাদশ ভলুমি আরবি কেতাব (হয়তো অত্যুত্তম গ্রন্থ) বাঙলায় বেরুবে বিশ ভলুমি কলেবর নিয়ে। খাস বাঙালি সাহিত্যিক দল তদ্দণ্ডেই হয়ে গেলেন অপাঙ্‌ক্তেয় খারিজ বাতিল ডিসমিস। কারণ তাঁরা তো আরবি জানেন না। কোনও এক মৌলবি সাহেব অনুবাদকর্মের জন্য দক্ষিণা পাবেন ষাট না সত্তর হাজার টাকা!

বেচারি ডিরেক্টর! সে আপ্রাণ লড়েছে। শেষটায় বোধহয় মৌলবিরাই তাঁর চাকরিটি খান।

আমি হলপ করতে পারব না বিশ ভলুমের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল কি না। ক-ভলুম এ তাবৎ বেরিয়েছে তা-ও বলতে পারব না। এ প্রতিবেদনে আরও ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মতলব কী ছিল সেটা বুঝিয়ে বলাটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

উভয় বাঙলা— গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ

বড় বড় শহরের লোক বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে বড্ডই বে-খবর। তাদের ভাবখানা অনেকটা যেন কুল্লে দুনিয়ার মেয়েমদ্দে যখন হুমড়ি খেয়ে আমাদের এই হেথায় জমায়েত হচ্ছে, তখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরাই ইনট্রেস্টিং, আমরাই ইমপর্টেন্ট। মা-কালী তো কালীঘাট ছেড়ে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে ট্রামে-বাসে আসেন না আমার বাড়িতে, কিংবা মহরমের তাজিয়া-তাবুদ তো লাটবাড়ির বৈঠকখানায় বসে হা-পিত্যেস করেন না হুজুরকে একনজর দেখবার তরে।... এ বাবদে সবচেয়ে বেশি দেমাক ধরে প্যারিস। আর ধরবেই না কেন? যে মার্কিন মুল্লুক দুনিয়ার যে দেশকে খুশি রুটিটা-আণ্ডাটা বিলিয়ে দেয়— মতলবটা কী সবসময় মালুম তক

হয় না— সেই দেশের লোক হন্দমুদ্দ হয়ে ছোটে ছুটি কাটাতে, প্যারিসের তাজ্জব তাজ্জব এমারত-তসবির দেখতে, কুল্লে জাতে ভর্তি নানান রঙের নানা ঢঙের খাপসুরৎ খাপসুরৎ পটের বিবিদের মোলায়েম-সে-মোলায়েম হাত থেকে সাকির ভরা-পেয়ালা তুলে নিতে আর তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে খৈয়ামের স্মরণে বেখাপ্পা খাদে গান জুড়তে—

বিধি-বিধানের শীত-পরিধান
প্যারিস-আগুনে দহন করো।
আয়ু বিহঙ্গ উড়ে চলে যাবে
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো। (অনুবাদক?)

এ বাবদে আমরা, কলকাত্তাইয়ারা ঘোড়ার রেসে মোটেই 'ব্যাড থার্ড' নই, 'অলসো র‍্যান' বললে তো আমরা রীতিমতো মান-হানির মোকদ্দমা রুজু করব।

আমরা তাই ঢাকা তথা পুব বাঙলার সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে চিরকালই কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলুম— দেশবিভাগের পর তো আর কথাই নেই। আর হবই না কেন— রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র সবাই তো শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই থানা গেড়েছেন। এস্তেক যশোরের 'বাঙাল' মাইকেল।

পার্টিশনের পরে অবস্থাটা খারাপ হল। কবি জসীম উদ্‌দীন, চিত্রকর জয়নুল আবেদিন, উদীয়মান কবি/সাহিত্যিক আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, গোলাম মুরশিদ, পণ্ডিত শহীদুল্লা— বোধহয় পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন— মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের শব্দতাত্ত্বিক আবদুল হাই যাঁর অকালমৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, একাধিক মহিলা কবি আরও বহু বহু সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাসেবক চলে গেলেন পুব বাঙলায়। এবং এঁরা যে পেনসেন নেওয়ার পর এবং/অথবা বার্ধক্যে, বিশেষ করে যাঁদের জন্মভূমি পশ্চিম বাঙলায়— তাঁরা যে সেসব জায়গায় বা কলকাতায় ফিরে এসে, মহানগরীর সুযোগ-সুবিধে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতর সেবা করতে পারবেন সে আশাও রইল না।...বলা বাহুল্য আমার দেওয়া সাহিত্য-সেবীদের এ ফিরিস্তি লজ্জাকর অসম্পূর্ণ।

পুব-বাংলার যেসব লেখক ও অন্যান্য কলাকার এখানে রয়ে গেলেন ও ওপার বাঙলা থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। কেউ কেউ পাঞ্জাবি-কণ্টকিত পাক সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে পুব বাঙলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু এঁদের সকলেই আপন আপন সহকর্মীদের প্রতি এবং মাতৃভূমি পুব বাঙলার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। ' ৭১-এর নয় মাসে সেদেশে বুদ্ধিজীবী নিধনে এঁদের অনেকেই ভ্রাতার চেয়ে প্রিয়তম আত্মজন হারিয়েছেন। দার্শনিক গোবিন্দবাবু এবং তাঁরই মতো একাধিক অধ্যাপকের নিষ্ঠুর হত্যা আমাকে ও তাঁদের অগণিত অনুরক্তজনকে কী গভীর বেদনা দিয়েছে, তা প্রকাশ করার ক্ষমতা বিধি আমাকে দেননি।

পূর্বোক্ত দুই পক্ষই— এ বাঙলা থেকে যাঁরা ও-বাঙলা গেলেন এবং ওদিক থেকে এদিক এলেন, এঁরাই ছিলেন উভয় বঙ্গের সর্বপ্রধান চিন্ময় বন্ধন, মূর্তিমান সেতু, পিণ্ডির পাশবিক বৈরী ভাব ছিল প্রধানত এঁদেরই প্রতি। তাই সে নির্মাণ করেছিল লৌহযবনিকা প্রস্তর-প্রাচীর। অতীতেও নির্মিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, নইলে নিউটন আক্ষেপ করলেন কেন—

www.pathagar.com

হায়রে মানুষ
বাতুলতা তব
পাতাল চুমি :—
প্রাচীর যত না
গড়েছো, সেতু তো
গড়োনি তুমি!

এই দুই পক্ষই সবচেয়ে বেশি খবর নিতেন উভয় বাঙলার সাহিত্যচর্চার। এঁদের কেউ কখনও অপর বাঙলায় যাবার দুরূহ অতএব বিরল সুযোগ পেলে সেখানে রাজমর্যাদায় আপ্যায়িত হতেন। পুববাঙলা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমি ১৯৭০-এ যাই ঢাকা। মরহুম শহীদুল্লাহ তখন হাসপাতালে। ঢাকায় প্রকাশিত পুস্তক ও কলকাতায় প্রকাশিত একাধিক পুস্তিকা তিনি '৬৯-এই মমাগ্রজের গৃহে সেই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং এসে আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদসহ উপহার দিয়ে যান। (তাঁর কৃতী পুত্রেরও একাধিক পুস্তক তিনি তার সঙ্গে যোগ দেন) আঞ্চলিক অভিধানের প্রথম খণ্ড, হাফিজের অনুবাদ, চর্যাপদের আলোচনা কী না-ছিল তাঁর ত্রিপিটকপূর্ণ সওগাতে! গুণী আবদুল কাদের যে কী পরিশ্রম, অন্বেষণ ও অধ্যয়নান্তে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পূর্ণ গদ্য-পদ্য সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, সেটা বর্ণনাতীত। অনবদ্য এই মণিমঞ্জুষা। সম্প্রতি কাগজে দেখলুম, বাংলাদেশে প্রকাশিত তাবৎ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য এখানে একাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ত্বরা করুন, ত্বরান্বিত হোন, গৌড় সাহিত্যামোদীগণ! সর্বশেষে অঙ্গবস্ত্রটি অকাতরে চক্রবৃদ্ধিহারে কুসীদার্পণ প্রতিশ্রুতিসহ সমর্পণ করে প্রয়োজনীয় কার্ষাপণ সংগ্রহ করুন— অমূল্য এই গ্রন্থাবলি ক্রয়ার্থে। 'বিলম্বে হতাশ হইবেন'— বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জিত অত্যুক্তি নয়, সকল শাস্ত্রবিচারদক্ষের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী।

মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে, বিজ্ঞানের রাজ্যে এমন একখানা পুস্তক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন বই উভয় বাঙলায় পূর্বে বেরোয়নি, আগামী শত বৎসরের ভিতর বেরুবে কি না সন্দেহ। পণ্ডিত আব্দুল জব্বর রচিত এই 'তারা পরিচয়' গ্রন্থখানিকে 'শতাব্দীর গ্রন্থ' বলে তর্কাতীত দার্ঢ্যসহ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। এ গ্রন্থের উল্লেখ আমি পূর্বেও করেছি, ভবিষ্যতে সবিস্তর বর্ণনা দেবার আশা রাখি। ...কাজী কবির গ্রন্থাবলি ও এ গ্রন্থ উভয়ই প্রাগুক্ত আব্দুল কাদের যখন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের' কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁরই উৎসাহে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আপ্রাণ চেষ্টা দিয়েছিলেন, বাঙলা অ্যাকাডেমি, 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠানই যেন জন্মগ্রহণ না করতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোড়াতে ক্ষীণ কণ্ঠে বাঙলার ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যেসব দাবি উত্থাপন করা হয়, সেটাকে ঠেকাবার জন্য স্বয়ং মি. জিন্না ঢাকায় 'তশরিফ' আনেন এবং ছাতির খুন বেকার বেফায়দা ঠাণ্ডা পানিতে বরবাদ অথবা শীতল জলে অপচয় করলেন— যেটা বরফের বেশি কাছাকাছি সেইটেই বেছে নিন— সেই দাবি প্রতিদিন কঠিনতর ভাষায় এবং সর্বশেষে রুদ্ররূপ ধারণ করল। আমরা এ বাঙলায় বসে তার কতটুকু খবরই-বা রাখতে পেরেছি। শুধু জানি, কয়েকটি তরুণ দাবি জানাতে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হল— শহিদের গৌরব লাভ করল।

www.pathagar.com

কিন্তু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন অ্যাকাডেমি, বোর্ড, এমনকি এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইস্ট পাকিস্তান, জাদুঘর (এরই নবীন হর্ম্যের প্রস্তর স্থাপনাকালে গবর্নর মোনায়েম খান 'জাদু' শব্দটা সংস্কৃত মনে করে তীব্র কণ্ঠে উষ্মাভরে গোসসা জাহির করেন) সর্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, ভিতর থেকে, সরকারের তথাকথিত 'ইসলামি তমদ্দুন' (ইসলামি সভ্যতা— শব্দার্থে নাগরিকতা) দ্বারা অনুপ্রাণিত নির্দেশ সাবোটাজ করেছেন অমান্য করে, টালবাহানা দিয়ে ফন্দিফিকির মারফত বানচাল করে দিয়ে। এ সংগ্রামের কাহিনী খুদ ঢাকাবাসীদের মধ্যেই জানেন অল্প লোক।

প্রাগুক্ত 'রাজমর্যাদায় আপ্যায়নের' ফলে আমার মতো অকিঞ্চন জন পরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখকদের কাছ থেকে প্রায় ষাটখানা পুস্তক-পুস্তিকা উপহার পায়। আমাকে (এসব সজ্জন) ভ্রমবশত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রতীকরূপে ধরে নিয়েছিলেন, এবং সে চর্চার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বলতে পারবেন, কত না দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, লৌহযবনিকার ছিদ্র দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছেছে পুব বাঙলার বই সমালোচনার জন্যে— চব্বিশটি বৎসর ধরে। পশ্চিম বাঙলার স্বীকৃতি ছিল তাঁদের হার্দিক কামনা।

লৌহযবনিকাপ্রান্তে পুস্তকগুলো বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ভয় তো আছেই, তদুপরি পুস্তক স্মাগলিং নামক পাপাচার প্রচেষ্ট ব্যক্তির যে ন্যূনতম শাস্তি— সেটা অর্থদণ্ড। সীমান্ত অতিক্রম করবার সময় যে বিংশতি মাত্র পাকিস্তানি মুদ্রা আইনত অনুমোদিত, সে মুদ্রা কটি অবশ্যই ওই অর্থদণ্ড পরিশোধ করার জন্য অপ্রচুর। ফলঃ শ্রীঘর বাস।

কিন্তু আল্লা মেহেরবান। সীমান্তেও কিছুসংখ্যক বঙ্গসন্তান ছিলেন যাঁরা পূর্বোক্ত রাষ্ট্রাদেশ লঙ্ঘনকারীদের ন্যায় সুচতুর এবং সদৃশ পাপী-তাপীদের প্রতি সদয়। তাই মমাগ্রজদের লিখিত দু-চারখানা পুস্তক বৈতরণীর এ কূলে আনতে সক্ষম হয়েছি— প্রতিবার।

উভয় বাঙলা— স্বর্ণসেতু রবীন্দ্রসঙ্গীত

এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই, যে এক বাঙলা আরেক বাঙলা থেকে যদি পাকেচক্রে কোনওদিন স্নেহপ্রীতির ভুবনে দুই দিনান্ত চলে যায়, এস্তেক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানের ফুটবল খেলা বন্ধ হয়ে যায়, ঘটিমাত্রই ইহসংসারে বাঙাল নামক যে একটা প্রাণী আছে সে তত্ত্ব বেবাক ভুলে গিয়ে তাকে হাইকোর্টটা পর্যন্ত দেখাতে রাজি না হয়, এবং পদ্মার ওপারে কুট্টির সঙ্গে ঘটির ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি শুনে ঘোড়াটা যদি না হাসে, তবু একটি বেরাদরি রেওয়াজ দুই বাঙলা থেকে কিছুতেই লোপ পাবে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কেন্দ্রীয় পাক সরকার উভয় বাঙলায় চলাচলের পথ প্রতিদিন দুর্গমতর করতে লাগল— আন্তর্জাতিক জনসমাজের নিতান্ত হাস্যাস্পদ হবে বলে বনগাঁ-যশোরের সঙ্কীর্ণ পথটিকে কণ্টকাকীর্ণ অগম্য করার জন্য দু-কান-কাটার মতো বে-আব্রু বে-হায়া হতে তার বাধল— খবরের কাগজ, বইপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড এমনকি আমাদের পরম শ্লাঘার 'ট্রপিকাল স্কুলের' গবেষণাজাত অমূল্য তত্ত্ব তথ্য যেগুলো পূর্ব বাঙালির পক্ষে নিরঙ্কুশ অর্জনীয় যার স্থান নেবার

www.pathagar.com

মতো দম্ভাধিকার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনও প্রতিষ্ঠানই করতে গিয়ে বিশ্ব-বৈদ্য-সমাজে হাস্যাস্পদ হতে চাইবে না, সবকিছুরই আদানপ্রদান নিরন্ধ্র বন্ধ করে দিল তখনও কিন্তু কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুব বাঙলার যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারল না। দিনের পর দিন, গভীর রাত্রি অবধি কলকাতা বেতার, পরে এক্কেবারে খিড়কিদরজার গোড়ায় জুটল আরেক বৈরী, আগরতলা-কেন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, যন্ত্রে সুর শোনায়, রেকর্ড বাজায়, পণ্ডিত পঙ্কজ সে সংগীত শেখান, অনুরোধের আসরে অকাতরে— আমার পাপমনে কেমন যেন একটা সন্দ আছে পুব বাঙালির অনুরোধের প্রতি কলকাতা বেতারের একটু বিশেষ চিত্তদৌর্বল্য ছিল— একই রেকর্ড দশবারের স্থলে বিশবার বাজিয়ে কলকাতা বেতার যে প্রতিহিংসা-বিষে জবজবে হৃদয় দিয়ে বিঘ্নসন্তোষীর কৈবল্যানন্দ, বিজয়ী বীরের আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নিজকে কৃতকৃতার্থ চরিতার্থ মনে করত। কারণ কলকাতা বেতার অবগত ছিল, পিণ্ডি-ভাতারের হুকুমে ঢাকা বেতারের রাধারানির তরে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত কানুর পীরিতির মতো নিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেম। কলকাতা বেতার তখন বললে, 'বটে! আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি কালাচাঁদের বাঁশির সুরটি ঠ্যাকাও কী কৌশলে?'

ধ্বনি মাত্রই ঠেকানো বড় কঠিন। কারণ ধ্বনির আসন আত্মন্-ব্রহ্মণের পরেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজর্ষি জনক ও ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আছে, জনক শুধোলেন, 'মানুষের জ্যোতি কী?' অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকা, কাজকর্ম করা কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়? যাজ্ঞবল্ক্য : 'সূর্য।' জনক : 'সূর্য অস্ত গেলে?' 'চন্দ্রমা।' 'সূর্যচন্দ্র উভয়ই অস্তমিত হলে?' 'অগ্নি।' সূর্যচন্দ্র অস্তমিত, অগ্নি নির্বাপিত তখন কোন জ্যোতি পুরুষের সহায়ক হয়?— অস্তমিত আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য-চন্দ্রনসস্যস্তমিতে শাঞ্জেগ্নৌ কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ?'

'ধ্বনি। এই জন্যই যখন নিজের হাত পর্যন্ত ভালো করে দেখা যায় না, তখন যেখানে কোনও শব্দ হয়, মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে।'

কলকাতা বেতারের ধ্বনি-তরঙ্গ সমস্ত পুব বাঙলায় দিনযামিনী সে দেশের বাতাবরণে সঞ্চারিত ছিল। সে ধ্বনি-তরঙ্গকে যন্ত্র সাহায্যে কোনও অবস্থাতেই বিকৃত অবোধ্য করা যে যায় না, তা নয়। যাজ্ঞবল্ক্যও জনকের শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন শব্দও যদি নিরুদ্ধ হয়ে যায় তবে 'আত্মাই' তখন তার 'জ্যোতি'; আত্মজ্যোতি প্রসাদাৎ সে তখন সর্ব কর্ম সমাধান করে। কিন্তু ধ্বনিতরঙ্গ সংগ্রামে পিণ্ডি নামতে সাহস করেনি। কারণ পুব বাঙলার চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে আমাদের যথেষ্ট বেতার-কেন্দ্র। আমাদের ভাণ্ডারে আছে প্রচুরতর। পিণ্ডি পুব বাঙলা থেকে আমাদের একটা কেন্দ্র জ্যাম করতে না করতেই আমরা তাদের ছটা কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অবোধ্য করে দিতে পারব। ফলে পুব বাঙলা করাচি-পিণ্ডি থেকে প্রেরিত সংবাদ তো পুনঃপ্রচার করতে পারবেই না, তদুপরি নিজের দেশের সংবাদ সরকারি হুকুম কিছুই বেতার মারফত বিকিরণ করতেও পারবে না। এমনকি মিলিটারির গোপন বেতারে ফরমান আলির ফরমান পর্যন্ত অনায়াসে রুদ্ধশ্বাস করা যেত।

খ্রিস্ট বলেছেন, মানুষের পক্ষে রুটিই যথেষ্ট নয়। তার হৃদয়-মনেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।

বহু অভিজ্ঞতার পর আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পুব বাঙলার তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী আমাদের তুলনায় আজ বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। এদের এবং আমাদের অনেকের কাছেই হয়

www.pathagar.com

তো কবির ছোটগল্প প্রিয়তর। কিন্তু পুব বাঙলায় একদিন এমন দুঃসময় এল যখন কবির কোনও পুস্তকই সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। শুনেছি, কোন এক হিন্দু কবি মুসলমান রমণী বিয়ে করার পর জন্মভূমি কাশীতে যখন ফিরলেন তখন পূজারি-পুরোহিত সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিল। কবি নিরাশ হলেন না। মা গঙ্গার উদ্দেশে বললেন, তোমাকে মা রুদ্ধদ্বার করতে পারে এমন লোক আজও জন্মায়নি। কবি তাঁরই উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করলেন।

হুবহু রবিতীর্থে যাত্রা করার জন্য সর্বপন্থা যখন রুদ্ধ হয়ে গেল তখন রইল শুধু কলকাতা বেতারের রবীন্দ্রসঙ্গীত। সেই হয়ে গেল তাদের সুরধুনী (যতদূর জানি ধুনী শব্দের অর্থ নদী), গঙ্গা। কবির গানেও আছে,

'হাটের ধুলা সয় না যে আর
কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায়
করাও আমায় স্নান।'

হুবহু একই পদ্ধতিতে হয়ে গেল সমস্যার সমাধান— আংশিক, কিন্তু মধুর। পিণ্ডির রাজা রাজর্ষি জহ্নু নন যে সে-সুর-ধুনী পান করে নিঃশেষ করবেন।

আরও একাধিক কারণ, যোগাযোগ, জনপদসুলভ সহজাত হৃদয়াবেগ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি পুব বাঙলায় আসক্তি নিবিড়তর করে তুলেছে, যেমন ধরুন সঙ্গীতজগতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম উপহার— তাঁর বর্ষার গান। শান্তিনিকেতন বীরভূমে দীর্ঘ গ্রীষ্মের খরদাহনে দগ্ধপ্রায় বিবর্ণ জীবন্মৃত আতম্র তৃণপত্র যখন মুহ্যমান বিষণ্ন বিশ্ব যখন নির্মম গ্রীষ্মের পদানত, শুষ্ক কানন শাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে, এবং রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন, তৃষাতপ্ত জনপদবধূ কাতর কণ্ঠে রুদ্রকে অনুনয় জানায়, সম্বরো এ চক্র তব, একচক্রা রথের ঠাকুর! রক্তচক্ষু অগ্নি-অশ্ব মূর্ছি পড়ে, আর তারে ছোটাবে কতদূর— সে সময়কার শুষ্ক কালবৈশাখীর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, তার দু-তিন দিন পরেই যখন নামে প্রবল বেগে বারিধারা, 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে যখন বৃষ্টি নামল, সকালে উঠে দেখি, এ কী! কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেখে মেখে'— অকস্মাৎ এই কল্পনাতীত পরিবর্তন পুব বাঙলায় রাজশাহী বারেন্দ্রাঞ্চল, আরও দু চারটি জায়গা ছাড়া অন্যত্র বিরল। কিন্তু পূব বাঙলার লোক বর্ষার যে রূপের সঙ্গে সুপরিচিত— 'ছাড়ল খেয়া ওপার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে, দুলছে তরি নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর', কিংবা হয়তো 'কে ডাকিছে বুঝি মাঝি রে, খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে', কারণ দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে যখন পদ্মা তরঙ্গে তরঙ্গে মেতে ওঠে তখন কী করে গাই, 'পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে, পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরের তরী'— খেয়া ঘাট, ভরা পাল তুলে পাগল-পারা ছুটেছে তরী তার সঙ্গে কত না সুখ কত না দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়— 'সে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধু পারে আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে হয়েছে আমার চেনা—' সঙ্গে সঙ্গে যেন এক কঠোর আঘাতে বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, কবি কী সামান্যতম ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি তাঁর কত না প্রিয়জনের অকারণে-অকালে তার পড়ল যখন ডাক তখন তাকে খেয়ায় একান্ত একাকী উঠতে দেখেছেন শোকাতুর চিত্তে, অশ্রুহীন শুষ্ক নয়নে। এখন তিনি সে খেয়ার সঙ্গে বেদনা বেদনায় এতই সুপরিচিত যে তিনি

www.pathagar.com

যেন প্রস্তুত হয়ে আছেন, ভাবছেন— নিয়ে যাব ইহার উত্তর নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া পার করি ভয়!

রবীন্দ্র-স্পেশালিস্ট আমি নই, কাজেই শপথ করতে পারব না, কবির বর্ষাগীতিতে পুব বাঙলার অধিকতর বর্ণনা আছে। কিন্তু একথা সত্য খেয়াঘাট, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার, হে বিরাট নদী, এসব মোতিফ ভাটিয়ালি গীত মারফত বহুকাল ধরে পূর্ববঙ্গীয়ের নিত্য-দিনের সখা। কভু বা পার্থিবার্থে— চিন্তামণির সন্ধানে সে ওপারে যেতে চায়, কভু-বা সে নদীকে দেখে বৈতরণী রূপে। গহীন গাঙের নাইয়া, তুমি যদি হও গো নদী, তুমি কেবা যাও রে, লাল নাও বাইয়া, একখানা কথা শুন্যা যাও নীল বৈঠা তুল্যা, মানিকপীর ভবনদীপার হইবার লা— এসব দিয়ে গড়া তার হৃদয়। সেইখানেই তো রবির প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তারা জেগে উঠে সাড়া দেবে— এতে আর কিমাশ্চর্যম?

উভয় বাঙলা— ফুরায় যাদেরে ফুরাতে

মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় অর্থাৎ রাঢ়ভূমির পশ্চিমতম প্রান্তে, অতএব উভয় বাঙলারই অস্তাচলে বসবাস করার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত, কিন্তু বাল্যে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বর রাজেন বন্দ্যো, নন্দলাল, অবন ঠাকুরের শিষ্য ওই পরিবারের চিত্রকর শ্রীযুত সত্যেন, শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির আজীবন একনিষ্ঠ সেবক ঈশ্বর সত্য, পরবর্তীকালে তাঁর কন্যা উভয় বঙ্গে গণমোহিনী গায়িকা, স্বয়ং পূর্ববঙ্গের প্রতি সবিশেষ অনুরক্তা শ্রীমতী কণিকা মোহর, এঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছি কয়েক বৎসর ধরে। শ্রীযুত সত্যেনকে কলাজগতের বিস্তর রসগ্রাহী চেনেন সরল, নিরলঙ্কার, দৈনন্দিন জীবনের সহজ চিত্রকর রূপে, কিন্তু তাঁকে আমি পেয়েছিলুম উপগুরুর ছদ্মবেশে। আমার খাজা বাঙলা উচ্চারণ তিনি মেরামত করার চেষ্টা দিতেন কথাচ্ছলে, আমাকে অযথা আত্মসচেতন না করে দিয়ে। এবং একটু মৃদু হাস্য যোগ দিয়ে বলতেন, 'বাঁকড়োয় আমরা কিন্তু বলি...।'

পূর্বতম প্রান্ত সিলেট-কাছাড় আমি ভালো করেই চিনি। দুই অঞ্চলে নিশ্চয়ই নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। বস্তুত প্রথম দর্শনে অনভিজ্ঞজনের চোখে পার্থক্যগুলোই ধরা পড়বে বেশি। কিন্তু একটু গভীরে তলালেই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করে ফেলবেন যে সাদৃশ্যটাই ঢের বেশি। এবং এত বেশি যে ঠিক ওই কারণেই পার্থক্যগুলো আরও যেন স্পষ্টতর হয়। সাদৃশ্যের স্বচ্ছ জলে পার্থক্যের একটিমাত্র কালো চুল চোখে পড়ে। আবিল আবর্তে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড লুকিয়ে থাকে। গুণীরা তাই বলেন, সাধুজনের অতি সামান্য পদস্খলন নিয়ে পাঁচজন সমালোচনা করে, অসাধুর পর্বতপ্রমাণ পাপাচার সম্বন্ধে মানুষ অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

কথাপ্রসঙ্গে দুই বাঙলার পার্থক্যের প্রতি যদি আমি ইঙ্গিত করি তবে উভয় বাঙলার পাঠক যেন সাদৃশ্যের মূল তত্ত্বটা ভুলে গিয়ে অনিচ্ছায় আমার প্রতি অবিচার না করেন।

মহানগরী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম প্রান্তে, এমনকি পুব বাঙলারও কিয়দংশে যে প্রভাব বিস্তার করে সে তুলনায় মফঃস্বলের ওপর ঢাকার প্রভাব যৎসামান্য। তদুপরি কলকাতা

www.pathagar.com

যে শুধু ঢাকার তুলনায় বহুলাংশে বৃহত্তম তাই নয়, বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লিকেও অনায়াসে বহু বিষয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় রেখে সে চীন-জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। কিন্তু সে আলোচনা আরেকদিন হবে। উপস্থিত আমার বক্তব্য, যদিও কলকাতা পরশুদিনের আপস্টার্ট নগর তবু ধীরে ধীরে তার একটা নিজস্ব নাগর্য বা নাগরিকতা গড়ে উঠছে। নাগরিক বলতে একটা শিষ্ট, ভদ্র, রসিক এবং বিদগ্ধজনকে বোঝাত। এমনকি চলতি কথাও নাগরপনা, নাগরালি এবং শহরবাসী অর্থে নগুরে, আজকাল বলি শহুরে, এককালে খুবই প্রচলিত ছিল। উর্দুতে কৃষ্টি, বৈদগ্ধ্য অর্থে ইদানীং তমদ্দুন শব্দ ব্যবহার করা হয়। তারও মূল মদিনা বা শহর— আমরা মদিনা বলতে যে নগর বুঝি সেটার পূর্ণ নাম 'মদিনাতুন নবী' অর্থাৎ নবীর (প্রেরিত পুরুষের) নগর।

উন্নাসিক নাগরিক জনের কৃত্রিম আচার-ব্যবহার সর্বদেশেই সুপরিচিত। তাই ইংরেজিতে সফিসটিকেটেড শব্দের অর্থে যেমন কৃত্রিমতার কদর্থ আছে তেমনি উচ্চাঙ্গের সার্থক জটিলতার সদর্থও আছে। ১৯৭১-এ আমরা প্রায়ই বিদেশি রিপোর্টারের লেখাতে পড়েছি, 'সাদামাটা রাইফেল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কী করে লড়বে পশ্চিম পাক আগত সর্বপ্রকারের সফিসটিকেটেড হাতিয়ার, যেমন রাডার, স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান ইত্যাদির বিরুদ্ধে?... তাই হাফবয়েলড, অর্ধসিদ্ধ আসিদ্ধ সাফিসটিকেটেড জন, প্রাচীনার্থে নাগরিক যদি তার নাগরিমায় সত্যকার বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনশীলতা না দেখাতে পারে তবে সে নিছক 'নতুন কিছু কর' প্রত্যাদেশ মেনে নিয়ে অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্ভাবনায় লেগে যায়।

প্রাক্তন বেতার মন্ত্রী শ্রীযুত কেশকার একদা ফরমান দিলেন, যার ভাবার্থ : আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভূরি ভূরি রাগ-রাগিণী অনাদরে অবহেলায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আকাশবাণী যেন অচলিত রাগ-রাগিণী যাঁরা আজও গাইতে পারেন তাঁদের পরিপূর্ণ মাত্রায় উৎসাহিত করে।

একথা অবশ্যই সত্য, গণতন্ত্রের যুগে গানের মজলিসে আসে হরেক রকমের চিড়িয়া। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী শ্রীমতী অর্চনা রীতিমতো বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে শুধিয়েছেন হাবিজাবি লোকের কথা বাদ দিলেও তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না, সঙ্গীতের প্রতি যাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই সেসব হোমরাচোমরারা শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতের আসরে আদৌ আসেন কেন?

তাঁদের আসাটা অর্থহীন নয়, উভয়ার্থে। কিন্তু ক্ষতি যেটা হয় সেটা সুস্পষ্ট। কর্মকর্তাগণ, এবং তাঁদের চাপে পড়ে আকছারই ওস্তাদরাও অতি প্রচলিত হালকা, এমনকি তার চেয়েও নিরেস গানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখেন, হোমরাদের প্রীত্যর্থে। অচলিত দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ কিন্তু বহুজনপ্রিয় রাগ-রাগিণীও অবহেলিত হয়।

কিন্তু শ্রীযুত কেশকারের ফরমান আনল বিপরীত ফল। সরকারি প্রতিষ্ঠানমাত্রই 'ডেকে আন' বললে 'বেঁধে আনাটাই' প্রশস্ততম পন্থা বলে সমীচীন মনে করেন— জাসট টু বি অন দি সেফ সাইড। তাবৎ ভারতের কুল্লে স্টেশন থেকে 'মার মার' শব্দ ছেড়ে বেরুলেন কর্মচারীরা 'অচলিতের' সন্ধানে। হাওয়ার গতি ঠাহর করে যতসব আজেবাজে গাওয়াইয়ারা অচলিত রাগ-রাগিণীর স্থলে বাঘ-বাঘিনীর লম্বা লম্বা ফিরিস্তি পাঠাতে লাগলেন বেতারের কেন্দ্রে কেন্দ্রে। তাঁরা গাইলেন সেগুলো, বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রেরই কর্মচারী রচিত নাতিদীর্ঘ বাগাড়ম্বর সমৃদ্ধ ভূমিকাসহ; সে অবতরণিকায় বোঝানো হল, 'এই ভয়ঙ্কর রাগটি কী প্রকারে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত জীবন্মৃত থাকার পর অদ্য রজনীতে ওস্তাদস্য ওস্তাদ অমুক তাকে

www.pathagar.com

সগরসন্তানবৎ প্রাণদান করলেন।' আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চারের কথা বাদ দিন— আমার কান ঝালাপালা— একাধিক বিদগ্ধজনকে দেখলুম, বেতারের কান মলে সেটাকে বন্ধ করতে।

কেউ শুধাল না, যুগ যুগ ধরে এসব রাগ জীবন্মৃত ছিলই বা কেন আর মরলই-বা কেন?

একটা কারণ তো অতি সুস্পষ্ট। রসিক বেরসিক কারওরই মনে রসসঞ্চার করতে পারেনি বলে।

তুলনাটা টায় টায় মিলবে না, তবু সমস্যাটা কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হবে। ঋতুসংহার নাকি টোলের ছাত্রেরা পড়তে চায় না; সর্বনাশ, ওটা অচলিত ধারায় পৌঁছে যাবে। বন্ধ কর মেঘদূত। চালাও ঋতুসংহার, জগদানন্দ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেন বলে! বন্ধ কর চণ্ডীদাস, অষ্টপ্রহর গাও, 'ভনয়ে জগদানন্দ দাস।' কী বললে, কবিগুরুর প্রথম কাব্য *কবি-কাহিনী* অনাদৃতা। বন্ধ কর *পূরবী*। চালাও দশ বছর ধরে *কবিকাহিনী*।

এইবারে আমি মোকামে পৌঁছেছি।

জানেন আল্লাতালা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই অচলিতের সন্ধান কী প্রকারে কখন মহানগরীর বিদগ্ধ সফিসটিকেটেড রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গেল— আচম্বিতে। তাঁদের চেলারা লেগে গেলেন শতগুণ উৎসাহে। শুনেছি সেসব প্রাচীন গানের অনেকগুলিরই স্বরলিপি নেই এমনকি সামান্যতম রাগ-রাগিণীরও নির্দেশ নেই। খোঁজো খোঁজো অথর্ব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যারা হয়তো-বা কোনও দিন ব্রক্ষমন্দিরে ওইসব অচলিত গানের দু-চারটে শুনেছিলেন এবং কষ্ট করলে হয়তো-বা স্মরণে আনতে পারবেন। অবশেষে এই প্রচণ্ড অভিযানের ফলে এমন দিন এল যখন কেউ 'এস নীপবনে' বা 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি' গান ধরল আর সবাই,

কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে যায় ঘরে—

হয়তো-বা ফিসফিসিয়ে একে অন্যকে শুধোয়, 'এর চেয়ে হ্যাকনিড গান কি খুঁজে পেল না মেয়েটা?'

প্রথম যুগের গানে উত্তম গান নেই এহেন প্রগল্‌ভ বচন বলবে কে?

আনন্দের দিনে, গানের মজলিশ শেষ হয়ে গিয়েছে, কবিও চলে গিয়েছেন, কিন্তু দীনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী, উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত দু চার জন প্রবীণ গায়ক, অপেক্ষাকৃত নবীনদের ভিতর নুটুদি, হয়তো অনাদিদা— পরে হয়তো এসে জুটবেন কাঙালীচরণ— এঁরা তখন সবেমাত্র তেতে উঠেছেন। এঁদের মুখে তখন শুনেছি কিছু কিছু প্রাচীন দিনের গান। প্রধানত সুরের বৈশিষ্ট্য, অজানা কোনও বৈচিত্র্যের জন্য বা আমার অজানা অন্য কোনও কারণে, কিন্তু তাঁরা বার বার ফিরে আসতেন প্রচলিত গানে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এঁদের সকলেরই ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপর্যাপ্ত অধিকার। ১৯১৯ সালে সিলেটে কবিগুরুর কণ্ঠে শুনেছিলুম, 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।' তার কয়েক-বছর পরে শুনলুম আরেক ওস্তাদের গলায়। মাত্র তিনটি ছত্র— গেয়েছিলেন প্রায় আধঘণ্টা ধরে।... কিন্তু অচলিত গানের তরে এই উৎসাহেরও একটা মাত্রা থাকা উচিত। অবশ্য জানিনে অধুনা এ সফিসটিকেশন কোন সপ্তকে গিটকিরির টিটকিরি দিচ্ছে, বা অন্য কোনও সফিসটিকেশনে মেতে উঠেছে।

www.pathagar.com

পুব বাঙলায় এ হাওয়া কখনও রয়েছে বলে শুনিনি! খুদ ঢাকা-ই সফিসটিকেটেড নয়— ছোট শহর গ্রামাঞ্চলের তো কথাই ওঠে না। একটা কথা কিন্তু আমি বলব, এ বাঙলার রসিকজন আমার ওপর যতই অপ্রসন্ন হন না কেন, পুব বাঙলার তরুণ-তরুণী যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম তৈরি করে বা প্রাণের আনন্দে গান গায় তাদের নির্বাচন প্রায় ব্যত্যয়হীন চমৎকার। তারা লিরিকাল শব্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হৃদয় দিয়ে চিনে নেয় অক্লেশে, গান গায় অতি সহজ ভঙ্গিতে। মাস কয়েক পূর্বে টেলিভিশনে দেখলুম, শুনলুম, এক বিলিতি পাদ্রি সাহেব বরীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যাপ্টিস্ম হয়ে গাইলেন, বাঙালের সরল ভঙ্গিতে : 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর, প্রভু।' অপূর্ব! অপূর্ব!!

উভয় বাঙলা— অকস্মাৎ নিবিল দেউটি দীপ্ততেজা রক্তস্রোতে

এ বাঙলার পুস্তক প্রকাশকরা অবশ্যই পাকিস্তানি ব্যান দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেশবিভাগের পূর্বে পশ্চিম বাঙলায় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেফারেনস পুস্তক, কথাসাহিত্য, মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তর পুস্তক পুব-বাঙলায় নিয়মিত বিক্রি হত। একদা সাধনোচিত ধামে গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন, কলকাতার পরই জেলা হিসেবে ধরলে সিলেটে তাঁর কাগজ 'প্রবাসী' সবেচেয়ে বেশি বিক্রি হত। প্রকাশক সম্পাদক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের চেয়েও বেশি বিপদে পড়ে লেখক। তখন কিছু লেখক বিক্রি বাড়াবার জন্য আরও 'জনপ্রিয়' হতে গিয়ে লেখার মান নামিয়ে দেন। একাধিক সম্পাদক প্রকাশক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক, জটিল সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাময় কথাসাহিত্য ছাপতে দ্বিধাবোধ করেন। পক্ষান্তরে হুজুগে বাঙালি কোনওকিছু একটা নিয়ে মেতে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রকাশক সেটা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাশি রাশি ফরমাইশি বই রাতারাতি ঝপাঝপ বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেন। তড়িঘড়ি লেখা ফরমাইশি কেতাব অধিকাংশ স্থলেই নিম্নমানের হতে বাধ্য। পাঠকের রুচিকে এরা নিম্নস্তরে টেনে নামায় এবং তথাকথিত 'গ্রেশামের' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চমানের পুস্তক সম্মান হারায় ও মুক্ত হট্ট থেকে বিতাড়িত বা অর্ধ-বহিষ্কৃত হয়।

পশ্চিম বাঙলার প্রকাশক লেখক ওই নিয়ে অত্যধিক প্রতিবাদ আর্তনাদ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। না করে ভালোই করেছেন। একে তো তাতে করে কণামাত্র লাভ হত না, উল্টো পিণ্ডি সেগুলো বিকৃতরূপে ফলাও করে পশ্চিম পাকে প্রপাগান্ডা চালাত— "যে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকাদির মারফত পূর্ববঙ্গীয় 'মোহাচ্ছন্ন' মুসলমানদের ওপর তার সনাতন 'কাফিরি হিন্দু' প্রভাব প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, তারা কিছুতেই বাঙালি মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান হতে দেবে না।" সম্পাদকরা অবশ্য তাঁদের মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন— সেটা করা তাঁদের কর্তব্যও বটে। পিণ্ডি তার পূর্ণ 'সদ্ব্যবহার' তখন করেছে : এখনও মি. ভুট্টো নানা কৌশলে এদেশের খবর, সম্পাদকীয় মন্তব্যের কদর্থ নিত্য নিত্য করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

আইয়ুব-ইয়েহিয়ার জুন্টার জুতো মি. ভুট্টো পরে নিয়েছেন— এইটুকুই সামান্য পার্থক্য। এমনকি জুন্টা পুব বাঙলার সম্মানিত নাগরিক মওলানা ভাসানী, শেখ সায়েবকেও প্রপাগান্ডা থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি— ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর আগেও। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানী কল্পনাতীত বিরাট এক জনসভাতে তুমুলতম হর্ষধ্বনির মধ্যে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন— অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও মওলানাকে সমর্থন জানান। শেখ তখনও আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন পশ্চিম পাকের সঙ্গে দেশের মর্যাদা রক্ষা করে একটা সমঝোতার আশায়। ভাসানীর ঘোষণা যেন ছাপ্পর ফোড় কর অপ্রত্যাশিতভাবে কিস্মতের কারণহীন বখশিশের মতো জুন্টার মস্তকে বর্ষিত হল। পিণ্ডি, লাহোর, করাচিতে তখন দিনের পর দিন ভাসানীর আপন দেশের অবিরল বারিধারার মতো, লাহোর পিণ্ডি ক্লাব-কাবারের উচ্ছ্বসিত মদিরাধারাকে পরাজিত করে চলল কুৎসা প্রচার : 'ভাসানী আসলে "হিন্দু ভারতের" এজেন্ট। ভারতেরই প্ররোচনায় লোকটা হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ফাটিয়েছে। শুধু তার দলই যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় তাই নয়, ভাসানীর (একদা) সহকর্মী অনুগামী শেখও ঠিক এইটেই চায়, সমঝোতার নাম করে শুধুমাত্র ভণ্ডামির মুখোশ পরে আপন "ন্যায়সঙ্গত সামান্যতম দাবি"র একটা কেস (আলিবি) খাড়া করতে চায় বিশ্ববাসীর সামনে, শেষটায় যাতে করে পাকিস্তানের নিতান্ত ঘরোয়া মামুলি মতভেদটাকে এক ভীষণ প্রলয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক সঙ্কটময় রূপ দিয়ে ইউএন ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, দু-একটা অর্বাচীন পক্ব-নিতম্ব ছোটাসে ছোটা দেশের দরদভি হাসিল করতে পারে। মোদ্দা কথা : ভাসানী যা শেখও তা।'... যতদূর জানি আচারনিষ্ঠ মওলানা আপন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত (যদি সে বিদ্বেষ তিনি পোষণ করেন) তিনি বিশেষ বিশেষ নিরপরাধ হিন্দুর প্রতি না-হক নির্দয় হবেন এটা চট করে মেনে নিতে মন চায় না। যা হোক, তা হোক— তাঁকে 'ভারতপ্রেমী' আখ্যা দিলে তিনি খুব সম্ভব মৌল ইদের মতো 'তুর্কি নাচন' আরম্ভ করবেন না, আম্মো পূর্ববৎ এটা চট করে গলতল করতে পারব না। কিন্তু এহ বাহ্য।

এদিকে কিন্তু ঢাকার প্রায় তাবৎ পাবলিশার মিশ্রিত উল্লাস বোধ করলেন বটে কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কোনও বই-ই ছাপাতে পারবেন না— সে লেখক ভারতচন্দ্রই হোন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমই হোন। যাঁদের পুস্তকে কোনও কপিরাইট নেই, কাউকে কোনও রয়েলটি দিতে হবে না— সেইটে হল তাঁদের প্রধান শিরঃপীড়া। কিছু কিছু লেখক অবশ্য অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করলেন। তাঁদের ধারণা : পশ্চিম বাঙলার সরেস বই গায়েব হয়ে গেলে তাঁদের নিরেস বই হু-হু করে, গরমকালে ডাবের মতো, শীতের সাঁঝে চায়ের মতো বিক্রি হবে। এই কিছু-কিছুদের অনেকেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সৃষ্টি আদৌ নিরেস নয়, বিশেষত যাঁরা 'ইসলামি তমদ্দুন'— সভ্যতা বৈদগ্ধ্য— সম্বন্ধে কেতাব রচনা করতেন। একজন কথাসাহিত্যস্রষ্টা আমাকে বলেন, 'পূর্ব বাঙলার লোক যে কলকাতার বই পড়ে সেটা একটা বদঅভ্যাস মাত্র। সেই কফি হোঁস, গড়ের মাঠ, কলেজ স্ট্রিট, ট্রামগাড়ি, বোটানিকাল কিংবা "ছেরামপুরী" পাদ্রি, হেস্টিংসের কেলেঙ্কারি ওসব ছাড়া অন্য পরিবেশের বই, যেমন বুড়িগঙ্গা, রমনা মাঠ, নবাববাড়ি, মোতিঝিলের কর্মচঞ্চলতা, নারায়ণগঞ্জের জাত-বেজাতের বিচিত্রতা— এদের গায়েতে এখনও সেই রোমান্টিক শ্যাওলা গজায়নি, ব্রোনজ মূর্তির গায়ে

www.pathagar.com

প্ল্যাটিনার পলেস্তরা পড়েনি— ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমি বললুম, 'পুব বাঙলার পরিবেশ, পুব বাঙলার জীবন নিয়ে যদি একটা সার্থক সাহিত্য গড়ে ওঠে তবে পশ্চিম বাঙলার কাছে সেটা হবে নতুন একরকমের রোমান্টিক সাহিত্য। পাঠক হিসেবে বলছি, আমার মতো বহু সহস্র লোক সেটা সাদরে গ্রহণ করবে। আর এই তো হওয়া উচিত। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডের এক বৃহৎ অংশ আর খাস জর্মনি তিন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে জর্মন সাহিত্যের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা বয়ে আসছে বহুকাল ধরে— পরিপূর্ণ সহযোগিতাসহ। টমাস মান-এর জন্ম-উত্তর জর্মনিতে অথচ জীবনের বেশিরভাগ কাটালেন সসম্মানে সুইটজারল্যান্ডে। সঙ্গীতে দেখি, বেটোফেনের জন্ম বন শহরে অথচ জীবন কাটালেন ভিয়েনাতে। পুব বাঙলা যে একদিন নতুন গানের ঝরনা-তলা রসের ধারা নির্মাণ করবে সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।'

কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঢাকার প্রকাশকমণ্ডলী খেয়ালি পোলাও খাওয়ার জন্য অত্যুৎসাহী হতে চান না।

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য থাক!
দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'
(কান্তি ঘোষ)

ওদিকে আবার আছে তাদের দেদার নিউজপ্রিন্ট, নেই কিন্তু যথেষ্ট বই ছাপাবার কাগজ, এটা ওটা সেটা বিস্তর জিনিস। এবং টেকসট বই যে সর্বাধিকার পাবে সে তত্ত্ব তো তর্কাতীত।

এবং যে নিদারুণ সত্য পুব বাঙলায় তো বটেই, পশ্চিম বাঙলারও ভুলতে সময় লাগবে সেটা যখন ঠেকাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্মৃতিতে আসে তখন দেহমন যেন বিষিয়ে যায় : শহিদ হয়েছেন যেসব অগ্রণী পথপ্রদর্শক লেখক তাঁদের সংখ্যা আদৌ নগণ্য নয়, প্রতিভাবান উদীয়মান লেখক অনেক, ছাত্রসমাজের উজ্জ্বল উজ্জ্বল মণিরাশি, অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক, বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক, আমার ভাগ্নের মতো শত শত যুবক-যুবতী যারা সাহিত্যিকদের সেবা করত সগর্বে সানন্দে, সাহায্য করত তাদের অতিশয় ক্ষীণতম বটুয়া থেকে যা বেরোয় তাই দিয়ে, বই কিনত সিনেমা জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, বাঙলা ভাষার কণ্ঠরোধ করার জন্য পিণ্ডির হীন খল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা সম্পাদককে পাঠাতো স্বনামে তীব্রতম তীক্ষ্ণতম ভাষায় বেপরোয়া প্রতিবাদ— যার অধিকাংশ ছাপা হলে সম্পাদক লেখক গয়রহ নিঃসন্দেহে হতেন গবর্নর মোনায়েম খানের 'রাজসিক' মেহমান। এরাই ছিল পূর্ণার্থে সর্বার্থে স্পর্শকাতর। তাই এরাই ছিল সব প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা, এরাই মুক্তিযুদ্ধে আহ্বায়ক, সহায়ক এবং নায়করূপে প্রথমতম শহিদ। এদের অনেকেই বেরিয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে একা একা, বর্ষ তখনও হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা কিন্তু হায়, 'চৈত্রদিনের মধুর খেলা' খেলতে নয়, সেই চৈত্র মুসলিম গণনায় ছিল মহরমের মাস, আদর্শের জন্য শহিদ মাস—

'আমারে ফুটিতে হল
বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ন যখন বিশ্ব
নির্মম গ্রীষ্মের পদানত,

www.pathagar.com

রুদ্র তপস্যার বনে
আধো ত্রাসে আধেক উল্লাসে
একাকী বাহিরি এনু
সাহসিকা অপ্সরার মতো।'
(সত্যেন দত্ত)[১]

পিশাচের দাবানলে ভস্মীভূত হবার জন্য।

উভয় বাঙলা— বাঙলা দেশের প্রধান সমস্যা

মাতৃভাষার ইতিহাস অধ্যয়ন, মাতৃভাষাকে জনসমাজে উচ্চাসন দান, সে ভাষাকে 'পূত-পবিত্র' করার জন্য তার থেকে 'বিদেশি' শব্দ লৌহ-সম্মার্জনী দ্বারা বিতাড়ন নানারূপে নানা দেশে বার বার দেখা দিয়েছে এবং দেবে। এ সঙ্গে অনেক স্থলেই রাজনীতি জড়িয়ে পড়ে, কিংবা বিদেশি রাজার প্রতাপে যখন প্রপীড়িতজনের আপন বলে ডাকবার আর কোনও কিছুই থাকে না তখন অনেক ক্ষেত্রেই নিছক আত্মানুভূতির জন্য— 'আমি আছি, আমার কিছু একটা এখনও আছে' সে তার শেষ আশ্রয় অবহেলিত মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাকে পরিপুষ্ট করার জন্য দেশে আন্দোলন চালায়, চরমে পৌঁছে কভু-বা মাতৃভাষা থেকে তাবৎ বিদেশি শব্দ ঝেঁটিয়ে বের করে, কভু বা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় তাকে বয়কট করে, ২১শে ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে, সেদিনটাকে বড়দিনের মতো সম্মানিত করার জন্য হয় হরতাল করে, নয় সরকারের ওপর চাপ আনে সেটাকে যেন হোলি ডে রূপে স্বীকার করা হয় ও হলি ডে রূপে অনধ্যায় দিবস বলে গণ্য করা হয়। আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাবদে এযাবৎ উদাসীন সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ানরা (সুবিধাবাদী বলাটা নিষ্প্রয়োজন— অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির বর্ণনাতে অন্ধকার না বললেও চলে) গুড়ি গুড়ি দলে ভিড়তে থাকেন এবং যারা সত্য সত্য মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগতবশত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল তাদের হাত থেকে আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষমতা কেড়ে নেন।

এরপর যদি ধীরে ধীরে স্বরাজ আসে তবে মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত তথা সে ভাষায় সুশিক্ষিত জন কিছুটা অবকাশ পান ভাষাটাকে গড়ে তোলার জন্য, যাতে করে স্বরাজ লাভের পর মাতৃভাষার সাহায্যেই সব শিক্ষাদীক্ষা রাষ্ট্রের সর্ব দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাপন করা যায়।

---

১. উদ্ধৃতিতে ভুল থাকাটা আদৌ অস্বাভাবিক হবে না। ৫০/৫৫ বছর হল 'চম্পা' কবিতাটি প্রথম পড়ি, তার পর এটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। 'চম্পার' প্রথম দর্শনেই কবিগুরু এমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সেটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। আমার বাসনা যায় জানতে আর কোন কোন বাঙালি কবির কবিতা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। বহুকাল ধরে আমার আন্তরিক প্রার্থনা ছিল, সত্যেন দত্তের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলি সম্পাদন করার।

www.pathagar.com

এ জাতীয় গঠনমূলক কর্মের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা খবরের কাগজে ফলাও করে আত্মপ্রশস্তি গাওয়ার সুযোগ নেই, স্বরাজ লাভের পর তো আরও কম।

জনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয় লেখক 'শঙ্কর' মাস দুই পূর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ উপলক্ষে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, 'বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতেও তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না, যা কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছে। বাংলা ভাষাকে একাদশ কোটি মানুষের ভাবপ্রকাশের সার্থক মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, তার সূচনা কোথায়?'

পশ্চিম বাঙলা বাবদে তাঁর ক্ষোভ : 'এক শ্রেণির উচ্চশিক্ষিত বাঙালি আবার মাতৃভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।... ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে, ইংরেজি গান শুনে... এঁরা অজান্তে নিজ বাসভূমে পরবাসী সৃষ্টি করছেন। এঁদের ধারণা সন্তানদের বাংলা শিখিয়ে লাভ নেই। চাকরির জন্য প্রয়োজন ইংরেজি ইত্যাদি।'

এর সঙ্গে শ্রীযুক্তা উমা চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন, 'কোনও কোনও স্বনামধন্য লেখক আজও ইঁট পাটকেলের মতো অযথা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেন।'

অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে উভয় বাঙলার সমস্যা এক নয়। যদিও চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার সমস্যা প্রায় একই, বিশ্বসাহিত্যেও প্রায় তাই-ই। উভয় বাংলার সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকবে অত্যল্প এবং সেগুলো রসের বিচারে গৌণ। পুব বাঙলার অধিকাংশ লেখক মুসলমান— তাঁদের সৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ চিত্রিত হবে অপেক্ষাকৃত বেশি। পশ্চিম বাঙলায় চিত্রিত হবে হিন্দু সমাজ। এ স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, একশো বছর পূর্বে যখন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছিলেন তখন বাঙলা দেশের অনেকেই আশা করেছিলেন এঁরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নগরের আলেখ্য অঙ্কন করবেন, অন্ততপক্ষে দূর দেশে বাঙালির জীবনধারা তাঁদের নির্মিত অশ্রুজলে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো রসের মাধ্যমে কিছুটা চিনতে শিখবে। সে আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়নি ঠিক, সেইরকম পুব বাঙলা থেকে আমরা সার্থক সাহিত্য তো আশা করিই। তদুপরি সে সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অজানা অচেনা নয়া নয়া ছবি দেখতে পাবেন নিছক ফাউ হিসেবে গ্রেস মার্কের মতো। 'জয় বাঙলা'।

কিন্তু উপস্থিত পুব বাঙলার মোট সর্ববৃহৎ সমস্যা— এবং একদিন সে সমস্যা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে সত্যও জানি— সেটা বাংলাদেশের তাবৎ সরকারি বে-সরকারি কাজকর্ম বাঙলারই মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় কী প্রকারে? যেমন ধরুন, খাদ্য-সমস্যা। ঢাকায় খবর এল চাটগাঁয়ে চাল বড্ড আক্রা, রংপুরে ভালো ভালো ফসল হয়েছে। সে চাল তড়িঘড়ি ট্রেনে করে পাঠাতে হবে চাটগাঁ। ইতোমধ্যে ঢাকাতে টেলিফোনের নামকরণ হয়ে গেছে 'দূরালাপনী' বা 'দূর-আলাপনী'— 'দূরালাপী' বোধ হয় নয়। আমি অবশ্য 'দূর-বাকী', 'দূর-বাচনী' নাম দিতে চেয়েছিলুম, কারণ প্রয়োজন হলে উষ্মা প্রকাশার্থে সন্ধি করে নিলেই হল, 'দুর্বাকী' 'দুর্বাচী' যা খুশি। কিন্তু কী দরকার। দীর্ঘ উ-কে হ্রস্ব করে দিলেই হল। 'দুরাশয়গণ অহরহ দুরালাপ করে', এই অর্থে 'দুরালাপনী' বললে চলে যেতে পারে। কিন্তু 'অনপনেয় কালি দিয়ে নাম সই করবেন' সত্যি প্রথম দর্শনে আমার মুখ কালিমাখা করে দিয়েছিল। কিন্তু ইনডেলিবিল্-এর অন্য কী বাঙলা শব্দ হতে পারে? দূরপনেয় কলঙ্ক বাঙলাতে খুবই চলে। সে কলঙ্ক কষ্টসহ 'মুছতে হয়' সেই ওজনে যে কালি কিছুতেই 'মোছা যায় না'। অবশ্য উন্নাসিক সম্প্রদায় আপত্তি তুলতে

www.pathagar.com

পারেন। 'অনপনেয় কালিতে' গুরুচণ্ডালি দোষ বিদ্যমান। বলা উচিত ছিল অনপনেয় মসি। তদুত্তরে বক্তব্য, ইহলোক ত্যাগ করার তিন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলতি বাঙলা ভাষার একটা খতিয়ান নেন বা সিংহাবলোকন (সার্ভে) করেন; ইতোপূর্বে কবি বাঙলা ভাষা শব্দ-ধ্বনি-তত্ত্ব ব্যাকরণ নিয়ে অজস্র রচনা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো প্রধানত বা সর্বত সাধুভাষা নিয়ে। কিন্তু চলতি ভাষা এনে দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সে সমস্ত আদ্যন্ত আলোচনা করার পর বাঙ্ময় সম্রাট দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে রাজাদেশ প্রচার করেন।

'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।'

অপিচ

'অমুকের কণ্ঠে গানে "দরদ" লাগে না বললে ঠিক কথাটি বলা হয়। গুরুচণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে অমান্য করলে অপরাধ হবে না।' (বাংলা ভাষা পরিচয়, র র ২৬ খণ্ড পৃ. ৩৯৫ ও প.)

কিন্তু এহ বাহ্য। তবু যে এই সঙ্কটের কথাটা উল্লেখ করলুম, তার কারণ পুব বাঙলার লোক গুরুচণ্ডালি পত্তৎপ্রকর্ষতা দোষ সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার চেয়ে ঢের বেশি সচেতন।

মোদ্দা কথা এই ফোন যন্ত্রটির পরিভাষা কী হল না হল তার চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক রেলের এঞ্জিনচালক, সিগনেল ম্যান, গার্ড সাহেব, বিজলির মিস্ত্রি ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য লোক তাদের তরো-বেতরো যন্ত্রপাতি কলকব্জার কী পরিভাষা নির্মাণ করছে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুর্ঘটনা ঘটাটা মোটেই অকল্পনীয় নয়।

ওদিকে প্রাচীন দিনের ব্যুরোক্রেটরা রাতারাতি বাঙলাতে জটিল জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ তাদের টীকা, প্রস্তাবের মুসাবিদা লিখবেন কী প্রকারে? সিকিশিক্ষিত এক ইমাম সাহেব খামোখা বেমক্কা আমাকে বলেন, 'আপনি তো "বাঙলা বাঙলা" বলে চেল্লাচ্ছেন কবে সেই বাবা আদমের কাল থেকে— যদিও এ বাবদে আমাদের ইঁটের মান দিকধিড়িঙ্গে প্রামাণিক গ্রন্থে আপনার উল্লেখ নেই—।' আমি হাতজোড় করে বললুম, 'রক্ষে দিন, ইমাম সাহেব! আপনার পরবর্তী ইস্টিশন বেহেশতে ফিরিশতাদের বাঙলা বলতে হবে এহেন ফতোয়া তো আমি কখনও দিইনি—।' 'জানি, জানি। কিন্তু ওই যে আপনাদের সংবিধান না কী যেন তৈরি হল তার দুটো তসবির। একটা বাঙলাতে অন্যটা ইংরেজিতে। এবং সাফ জবানে বলা হয়েছে, অর্থ নিয়ে মতবিরোধ যদি হয়, তবে ইংরেজি তসবিরই প্রামাণিক আপ্তবাক্য।' আমি বিশ্বাস করিনি এবং হলেও আমার কণামাত্র ব্যক্তিগত আপত্তি নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং শেখজি থেকে বিস্তর লোক হরহামেশা বাঙলার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। কিন্তু তাঁদেরও তো মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, কোনও ইংরেজি শব্দের সঠিক বাংলা পরিভাষা কী। তখন ফোন করা হয়, কিংবা ডাক পড়ে প্রবীণ সাহিত্যিককে বা সাহিত্যিকদের। তাঁরাই বা কজন সর্বসাকুল্যে বেঁচে আছেন তখনও টিক্কা, অল-বদর, শান্তি কমিটি, বেহারিদের টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ

www.pathagar.com

সংযুক্ত 'ডবল জালের ছাঁকনি এড়িয়ে!' দেশের কাজকাম যদি বন্ধ হয়ে যায়— হবে না, আমি জানি— তবে,

কাগজ কলম মন
লেখে তিন জন

এর প্রথম দুটি বস্তু আসবে কোথা থেকে? কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের সদরে সে দেশের মোস্ট ইমিডিয়েট নির্ঘণ্টের যে বয়ান শুনলাম, জনৈক করিতকর্মা ব্যক্তির কাছ থেকে, তার থেকে আমার মনে হল, উভয় বাঙলার যেসব সাহিত্যিক, শব্দতাত্ত্বিক পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কুইন্টপ্লেট থাকলেও মোটামুটি চলনসই কিন্তু অতি অবশ্য দেশ শাসনের সর্ব শাখা-প্রশাখা পরিব্যাপ্ত পরিভাষা নির্মাণ শেষ হবে না। এবং যেটুকু হবে, তাতেও থাকবে প্রচুর অসম্পূর্ণতা, বিস্তর অনূদিত ইংরেজি লাতিন শব্দ পুব বাঙলার শস্যশ্যামল দেশে সঙ্গিনের মতো খোঁচা খোঁচা খাড়া দাঁড়িয়ে স্পর্শকাতরা শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক নর-নারীকে পীড়া দেবে, যদিও তাঁরা প্রধানত সাহিত্যেই এ অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু উপায় কী? একমাত্র আশা ওই অসম্পূর্ণ দুর্বল পরিভাষা দিয়েই কোনও গতিকে কাজ চালিয়ে যাবে।

বারান্তরে সমস্যাগুলো নিয়ে আরও আলোচনা করার আশা রাখি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com